ভ্রমণ অমনিবাস

তৃতীয় খণ্ড

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন— পূর্ণেন্দু রায়

BHRAMAN OMNIBUS VOL-III
ravelogue by Umaprasad Mukherjee published by Mitra & Ghosh
'ublishers Pvt. Ltd. 10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-73

ISBN 81-7293-111-5

ত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা— ৭৩ হইতে এস.
ন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা— ৮৫
হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

শেরপাদের দেশে

মানবমনের কত কামনাই পূর্ণ হয়। কত কল্পনাও বুদ্বুদের মতন মিলিয়ে যায়। আবার, আশাতীত কত দুর্লভ বস্তুরও অকস্মাৎ প্রাপ্তি ঘটে। হিমালয়ের পথে পথে ঘুরতে সেই কথাই মনে ভাসে।

ভাবি, কার কোন্ আকাঙ্ক্ষা অলক্ষ্যে বসে কে পূরণ করেন, কেই বা জানে?

বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত-শিখর,—মাউন্ট এভারেস্ট। আর, সামান্য এক পরিব্রাজক আমি।

কখনও কি ভাবতেও পারি, সেই গিরিচূড়ারই পাদদেশে পৌঁছানো সম্ভব হবে আমার পক্ষে?

পুলকিত বিস্ময়ে দেখি, তাই-ই একদিন হয়।

কেমন করে ঘটে,—তারই এই কাহিনী।

১৯৬৬ সাল।

কলকাতায় ডাক্তার বিশ্বাস দম্পতি আবার পরামর্শ করতে আসেন, এবার হিমালয়ের নতুন কোন্‌দিকে যাওয়া যায়? বলি, মাউন্ট এভারেস্ট চূড়ায় ওঠার কথা তো ভাবা যায় না, তার পায়ের কাছেই ঘুরে এলে পার। সেই শেরপাদের দেশ,—নামচেবাজার, থিয়াংবোচি—বই-এতেই সে-সব নাম পড়া, ছবিও দেখা।

মণি ও ভক্তি দুজনেই উৎসাহিত হন। বলেন, চমৎকার প্রোগ্রাম। কাঠমাণ্ডুতে জানাশোনা দু-একজন আছেন। এখনি লিখে পারমিটের ব্যবস্থা করি। কিন্তু আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

তাঁদেরই আগ্রহে সব ব্যবস্থা ঠিকমত হয়ে যায়। কদিন আগেই আমি কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছুই, মণিদের জন্যে অপেক্ষা করি।

কাঠমাণ্ডুতে পরম আনন্দে আরামে দিনগুলি কাটে ডাক্তার ব্যানার্জির আন্তরিক আতিথেয়তায়। হিমালয়ে ঘোরার পথে বারংবারই দেখি, যেখানেই যাই না কেন, সব কিছু ব্যবস্থাদি কে যেন অলক্ষ্যে বসে আগে থেকেই ঠিক করে রাখেন। আশ্চর্য লাগে।

এখানেও তাই হয়। ব্যানার্জি 'ডাক্তার' অর্থে চিকিৎসক নন; বটানিস্ট—উদ্ভিদ বিদ্যাবিশারদ। নেপালে বটানিক্যাল সার্ভের কাজে সাহায্য করার জন্য ভারত সরকার তাঁকে এখানে পাঠান। বছর কয়েকই তিনি এখানে আছেন। নামচেবাজারের পথের খোঁজখবরের কথা তাঁকে বলতেই তিনি বলেন, এই তো কদিন আগেই ও-অঞ্চল থেকে ঘুরে এলাম। আমার সার্ভের কাজে যেতে হয়েছিল। এর আগে ১৯৪৮ সালেও নিজেই একবার গিয়েছিলাম। পথঘাট সবই এখনি ম্যাপ-এ দেখিয়ে দিচ্ছি। কাঠমাণ্ডু থেকে যাবার রাস্তা

মাঝে মাঝে দু-তিন দিক থেকে পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে গেছে,—কোন্ পথ ধরে যাবেন তাও বলে দিচ্ছি। রাস্তায় জানাশোনা লোকও আমার রয়েছে, তাদের নামে চিঠিও সঙ্গে দিয়ে দেব। আর দাঁড়ান, গিরমিকেও এখনি খবর দিই। এবার আমার সঙ্গে ছিল। নাম শোনেন নি তাঁর? গিরমি দোরজে—এখানকার নামকরা শেরপা। ১৯৫৫ সালে Evans-এর সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘায় গিয়েছিল, ১৯৫৬তে সুইসদের সঙ্গে এভারেস্টে যায়, ১৯৬০ সালে ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানে ছিল, পরে আবার আমেরিকানদের সঙ্গেও যায়,—আটাশ হাজার ফুট ওপরের ক্যাম্পে ক'বার মালপত্র নিয়ে উঠেছিল,—সেও নাকি একটা রেকর্ড। আরও অন্য অনেক অভিযানেই গেছে। আমেরিকাতেও ঘুরে এসেছে। মানুষটিও খুব ভাল। রান্নাবান্নাও জানে। তাছাড়া, ঐ নামচেবাজার ছাড়িয়ে কুন্‌ডে গ্রামে ওর ঘর। শেরপাদের গ্রামে কদিন থাকতেও পারবেন। ওকে সঙ্গে রাখুন,—কাজ তো দেবেই, আমিও নিশ্চিন্ত থাকব।

শুনে বলি, কথাগুলো তো ভালই বললেন। কিন্তু, অত বড় নামী শেরপা সঙ্গে নিয়ে কি করব? দরকার আছে কোন? এ যেন মশা মারতে কামান দাগা হবে।

ব্যানার্জি বলেন, সঙ্গে একজন গাইড তো রাখতেই হবে। একেই নিয়ে যাওয়া ভাল। তাছাড়া, আরও এক কথা আছে। আমাকে একটু ভাবিয়েই তুলেছেন। মিসেস্ বিশ্বাসও যাবেন বলছেন, কিন্তু পথ অতি দুর্গম। পারবেন তিনি? একমাত্র বাঙালী মহিলা ও-পথে গিয়েছিলেন, তিনিও আর এক মিসেস ব্যানার্জি। ফরেস্ট সার্ভিসের এক অফিসারের স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে তিনিও যান—১৯৪৮ সালে। অবশ্য স্টেট্ থেকেই সব ব্যবস্থা হয়েছিল। স্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকায় সে-সময়ে তিনি দুটো সুন্দর প্রবন্ধও লিখেছিলেন তাঁর অভিযানের বর্ণনা দিয়ে।

হেসে বলি, জানি। সেই মিসেস্ ব্যানার্জি সম্পর্কে আমার ভাগিনেয়ী। আশ্চর্য! এবার কলকাতা থেকে রওনা হবার ঠিক আগেই হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা—বেশ কয়েক বছর পরে। তাঁকে বললাম, তোমার সেই ঘুরে-আসা পথে এবার চলেছি আমি। শুনে সে খুব খুশী। কিন্তু মিসেস্ বিশ্বাসের জন্যে চিন্তার কোন কারণ নেই। তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, সাহস আছে; পাহাড় চড়ার ট্রেনিং তিনি নিয়েছেন। পারবেন। এই তো গত বছর একই সঙ্গে মুক্তিনাথ ঘুরে আসা গেল।

ব্যানার্জি বলেন, পারলেই ভাল। তবে মুক্তিনাথ? সে আর তেমন শক্ত কি? মুক্তিনাথের বড় চড়াই হল—উলেরি-ঘোড়েপানি। ঐ একটাই শুধু। আর এদিকে নামচের পথে? ওর চেয়ে বড় বড় চড়াই প্রতিদিনই পাবেন। এ-পথটা কিভাবে যায় জানেন? এ-অঞ্চলের পাহাড়ের রেঞ্জগুলি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি নেমে এসেছে। প্রতিটির মাঝখানে এক একটা নদীর ভ্যালি। তার ফলে, কাঠমাণ্ডু থেকে যেতে হয় পূর্বমুখে—প্রত্যেকদিনই একটা রেঞ্জের ওপরে ওঠা, আবার ওদিকে এক নদীর ভ্যালিতে নামা। পরদিন আবার আর এক

রেঙ্গে ওঠা, আবার অপর দিকে নামা। কেবলি, চড়াই উৎরাই। এইভাবে দুধকোশিতে পেঁছুলে তার পর সেই নদী ধরে উত্তর মুখে চলা—এভারেস্ট-এর দিকে। বেশ কণ্টকর পথ,—তবে পথ আছে, পাহাড়ে চলার আনন্দ তো আছেই। তিনি যেতে পারেন, বাহাদুরিই বলতে হবে।—যাক, আজ গিরমিকে খবরটা পাঠাই। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি। সে সঙ্গে থাকলে আমার ভাবনাই থাকবে না।

আমি বলি, আর এক কথা। আমার হাতে সময়ের কোন টানাটানি নেই—নিরঙ্কুশ হয়ে হিমালয়ে আসি, জানেনই। কিন্তু ডাক্তার বিশ্বাসের সময়ের দাম আছে। তাঁর ঠিক এক মাসের প্রোগ্রাম। এর মধ্যে ঘুরে আসা হবে তো?

ব্যানার্জি আশ্চর্য হন। বলেন, আপনি কথা বলছেন যেন হিমালয় সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই! এখান থেকে নামচেবাজার-থিয়াংবোচি পায়ে হেঁটে ঘুরে আসতে এক মাসের ওপর তো লাগবেই,—তারপর দু'একদিন সে অঞ্চলে কাটাবেনও তো? তা'ছাড়া এ-সব পথের মাঝে অনিশ্চয়তা কত রকম থাকে,—কোথাও একদিন কি কারণে হঠাৎ আটকে গেলেন, কিছুই বলা যায় না। আর সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে দু'এক জায়গায় খানিক পথ ঘোড়ায় চড়ে যাবার চেষ্টা করতে পারেন বটে, তবে তাতে হাঁটা বাঁচবে, সময় বাঁচবে না। কেন না, গ্রামে গিয়ে বললেই তখনি ঘোড়া পাওয়া যায় না। ঘোড়া হয়ত তখন চরছে জঙ্গলে, ধরে নিয়ে এসে ঠিকঠাক করতেই দুদিন কেটে যাবে। আপনার তো এসব জানা কথা। ও-ভাবে সময় বেঁধে হিমালয়-পথে এগুনো চলে না।

জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, শুনেছি লেফটেনাণ্ট কর্নেল জে. ও. এম্. রবার্ট্স্ ঐ অঞ্চলে কতদূর পর্যন্ত প্লেনে করে ট্যুরিস্ট নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন,—তার খোঁজখবর কি করে পাওয়া যায়?

ব্যানার্জি বলেন, সে-সব আমেরিকান ও অন্যান্য বিদেশীদের জন্যে কারবার। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কে রাখে বলুন? আমাদের পায়ে হেঁটে বনে জঙ্গলে ঘুরতে হয়,—নতুন গাছগাছড়া, ফুল—এই সবের সন্ধানে ঘোরা। নেপালে পায়ে হাঁটা পথের যা জানতে চান এখনি বলে দেব,—কিন্তু দাঁড়ান, ভাল কথা, গিরমি তো এখন সেই রবার্ট্স্-এরই সঙ্গে কাজ করছে,—সে এলে তার কাছে জানতে পারবেন হয়ত।

এদিকে ডাক্তার বিশ্বাসদের কাঠমাণ্ডু পেঁছতে তখনও দিন সাতেক দেরি। চুপ করে শহরে বসে থাকতে মন চায় না। ব্যানার্জিকে বলি, এর মধ্যে গোসাঁই-কুণ্ড ঘুরে আসা যায় না? কিন্তু, পারমিটে গোসাঁইকুণ্ড লেখা নেই, শুধু নামচেবাজার-থিয়াংবোচিরই উল্লেখ আছে।

ব্যানার্জি জানান, পারমিটে লিখিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদিকে ঘুরে আসতে হলে অন্ততঃ দিন দশেক হাতে রাখা উচিত। এর মধ্যে ও-প্রোগ্রাম না করাই ভাল। ডাঃ বিশ্বাসরা এসে হয়ত আপনার জন্যে আটকে যাবেন। তা ছাড়া, নামচের ব্যবস্থাদি ঠিক করতে দু-একদিন আপনার তো এখানে লেগেই যাবে।

কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যায় আশ্চর্য এক যোগাযোগ হয়।

বিকালে বাড়ির সামনে বাগানে পায়চারি করি, দেখি গেটের কাছে ছোট্ট একটা বিলাতী টকটকে লাল 'স্পোর্টস্ কার্'-মোটর এসে দাঁড়ায়। লম্বা সুশ্রী এক সাহেব নামেন। মুখের ফরসা রঙ দেখে দূর থেকে সাহেবই ভাবি। এগিয়ে এলে দেখি, না, এই দেশীয়ই হবেন। তাঁর সঙ্গিনী কিন্তু দেখতে ছোটখাটো, সুন্দরী এক নেপালী মহিলা। কোলে ফুটফুট করে গোলাপের মত একটি শিশু। ব্যানার্জির খবর নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকেন। ব্যানার্জিও আমাকে ডাকেন। হেসে বলেন, এই দেখুন, সকালে বলছিলেন গোসাঁইকুণ্ডে যাবার পারমিটের কথা। আদত লোক এসে গেলেন আজই হঠাৎ। পারমিটটা এনে এঁকে দিয়ে দিন, কালই আবার পেয়ে যাবেন। পরিচয় করিয়ে দেন। ভারতীয় মিলিটারী অফিসার। এখন নেপাল সরকারের সঙ্গে নিযুক্ত। রাজস্থানী। যেমন দেখতে সুপুরুষ, তেমনি কথাবার্তায় ভদ্র। ভদ্রতার মুখোশ পরা নয়,— মনখোলা কথাবার্তা, আচরণও। বলেন, পারমিট কালই পেয়ে যাবেন, কিন্তু এর মধ্যে আপনার ঘুরে আসার সময় হবে না, নামচে থেকে ফিরে এসে তখন যদি যান,—কিন্তু সে-ও তো আবার খুব দেরি হয়ে যাবে, ওদিকে বরফ পড়তে শুরু করে দেবে। যাক, পারমিটটা করিয়ে তো রাখুন!

তারপর গল্প জমে। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। হেসে বলেন, ইংরেজিটা এখনও ওঁকে শেখাতে পারি নি।

দেখি, কোলের ছেলেটি একটু অসাধারণ। বসতে শিখেছে, তাই সোফার উপর মায়ের পাশেই বসে থাকে। মায়ের হাসিখুশি মুখ, গোলাপী রঙ। ছেলেটিরও রঙ তেমনি। সুগোল সুডৌল মুখ। গাল দুটি যেন ছোট রাঙা আপেল। খুদে খুদে দুটি চোখ। নীল তারা। চোখের পাতা ভারী। যেন সজল মেঘের ভার। কোঁকড়ানো কটা চুল। ঠিক 'বেবি-ফুড'-এর বিজ্ঞাপনের ছবি। একেবারে ছবি-ই বটে। স্থির ধীর শান্ত হয়ে বসে। ছোট শিশু, মায়ের পাশে তা না হয় কোন রকমে বসল, কিন্তু মুখখানি এমনি গাম্ভীর্যে ভরা, চোখের চাহনিতেও এমনি তন্ময় ও আত্মস্থ ভাব,—দেখে সত্যই আশ্চর্য বোধ হয়। মিসেস ব্যানার্জি কোলে তুলে আদর করেন। সে আপত্তি জানায় না, আনন্দের ভাবও প্রকাশ করে না। যেন নির্বিকার পুত্তলিকা। খেলনা হাতে দিলে, চোখে তার কোন কৌতূহল ফোটে না, হাত বাড়িয়ে ধরার আগ্রহও দেখায় না। অথচ, পূর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য। অফিসারকে বলি, চমৎকার ছেলেটি তো আপনার। একে দেখে আমার কেবলি দালাইলামার কথা মনে হচ্ছে। তিনি যখন শিশু, তখন তাঁকে খুঁজে বার করে আনে। নানান্ পরীক্ষা করে মৃত দালাইলামার অবতার প্রমাণিত হলে তাঁর গদিতে তাঁকে বসানো হয়। সে-সময়কার একটা ফটো তাঁর দেখেছি। ঠিক এই ধরনের। ছোট্ট ছেলে,— অথচ কি রকম গাম্ভীর্য ভরা মুখ, বিজ্ঞের মত চাহনি,—যেন সব কিছু বোঝে, জানে!

অফিসারের স্ত্রী মৃদু হেসে তাঁর স্বামীর দিকে তাকান, মনে হয় আমার কথার মর্ম কিছু বোঝেন। অফিসারও তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন, তারপর আমাকে বলেন, ঠিকই ধরেছেন। দালাইলামার সে ছবি আমরাও দেখেছি। এর হাবভাব, চেহারা তার সঙ্গে খুব মেলে। শুনে আশ্চর্য হবেন নিশ্চয়, এর নাম আমরা 'দালাইলামা'-ই রেখেছি। আপনি হয়ত নজর করে থাকবেন,—'দালাইলামা' কথাটা শুনলেই ও তখনি অল্প মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে,—যেন অল্প সাড়া দেয়।

দেখি, তাই বটে। অতি অদ্ভুত।

বাপ-মায়ের কিন্তু এই কারণেই দুর্ভাবনা। এইটুকু ছেলে, এত গম্ভীর, কোন কিছুতেই আকর্ষণ নেই। অসুখের লক্ষণ নয় তো? তাই ডাক্তার দেখান। কোন রোগেরই উপসর্গ পাওয়া যায় না। তাঁদেরও ভাবনা তাতে আরও বাড়ে।

কথা ঘোরাবার জন্যে অফিসারকে বলি, আপনার নেপালে কয়েক বছরই কাটল দেখছি।

আশ্চর্য হয়ে তিনি বলেন, কই? না তো। এখনও এক বছর হয় নি।

তারপর হেসে ওঠেন। বলেন, বুঝতে পেরেছি, আপনার অনুমান ভুল হয়েছে। এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে এখানে নয়। ইনিও এই প্রথম নেপালে এলেন—আমারই সঙ্গে। এর আগে কয়েক বছর দার্জিলিঙে ছিলাম। সেইখানে এঁর সঙ্গে পরিচয় এবং বিয়েও। আপনি হয়ত ভাবছেন, কোন স্কুল কলেজে পড়ত, পথেঘাটে দেখা হত,—তারপর যা হবার তাই হল। তা মোটেই নয়।—স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে নেপালী ভাষায় কি যেন বলেন। স্ত্রীও মুচকে হাসেন। গাল আরও রাঙা হয়, টোল খায়। লজ্জায় মুখ নীচু করেন। মিসেস্ ব্যানার্জিও হেসে তাঁর হাত ধরে অন্য ঘরে নিয়ে চলেন। বাচ্চাটি চুপ করে সোফায় বসে থাকে, বাপের পাশে। অফিসার অসঙ্কোচে গল্প করে চলেন, আমাদের বিয়েটা কি ভাবে হল জানেন? ওঁর মা হলেন চা-বাগানের সামান্য কুলি, মাথার পিছনে পিঠে টুকরি ঝুলিয়ে চায়ের পাতা তোলে। মেয়েটাও ছোট্ট একটা চুপড়ি পিঠে মায়ের সঙ্গে কাজ করে। পথ দিয়ে যাই, আসি, প্রায়ই চোখে পড়ে। পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড চা-বাগান। সবুজ গাছে ভরা,—যেন কার্পেট পাতা। তারই মধ্যে মেয়েটার মুখখানা দেখতে পাই—গোলাপ ফুলের মত যেন বাতাসে দোলে। তারপর—কিন্তু থাক সে-সব গল্প। বিয়ের তো ঠিক করে ফেললাম। কিন্তু ওদিকে এক মহা বিপত্তি। দেশে বাবা-মা আছেন। তাঁদের জানাতেই হয়। আমরা আবার গোঁড়া জৈন,—রাজস্থানী তো। মা ততো আপত্তি করেন না, বাবার ভীষণ অমত। নানান্ রকম উপদেশ দেন, ভয়ও দেখান। চুপ করে শুনি। ফিরে এসে বিয়েও করি।

জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের কাছে পরে বৌ নিয়ে যান নি?

বলেন, সে মজার ব্যাপার শুনুন না।—না, তখন নিয়ে যাই নি। তারপর চলে আসি নেপালে। এদিকে বাবা-মাও কিছুকাল থেকে আছেন ঐ বিরাট-

নগরে—নেপালের পাহাড়ের নীচেই। সেখানে বাবার বড় ব্যবসা। মাঝে মাঝে একা ঘুরে আসি। বৌকে নিয়ে যাবার কথা ভাবি, কিন্তু বাবা বাড়িতে তার নাম পর্যন্ত তুলতে দেন না, তাই আমার সাহসও হয় না। ইতিমধ্যে হঠাৎ তাঁর খুব অসুখ, যায়-যায় অবস্থা। ভাবলাম, শেষ সময়,—বৌ ও ছেলেকে নিয়ে একবার অন্ততঃ দেখিয়েও আনি। তারপর চাকা একদম অন্যদিকে ঘুরে যায়। ইনি গিয়ে বাবার সেই রোগে সেবা যা করলেন,—সবাই অবাক। মা তো নাতি পেয়ে মহা খুশী। বাবাও সেরে উঠে নাতি নিয়ে মাতেন, বলেন, এ তো অবতার আছে। তার পর, তাঁরা এখন কেবলি চান, এরা গিয়ে তাঁদের কাছে থাকে। ভাগ্যক্রমে দালাইলামার জন্যেই একটা সুরাহা হয়েছে,—পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে গরমে থাকতে ওর বেশ কষ্ট হয়, বোঝা যায়। বাবা, মাও সেটা বোঝেন, তাই রক্ষে। না হলে এদের ছেড়ে আমিই বা থাকি কি করে বলুন।—দেখুন, দালাই-এর দিকে তাকিয়ে একবার।

দেখি, সে গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এমনি চোখমুখের ভাব, যেন সব কিছুই শুনছে, বুঝছে। আশ্চর্য শিশু। তার সান্নিধ্যে বসে মনে পড়ে, হিমালয়ের সাধুদের কথা। এই দুঃখদৈন্যজীর্ণ জগতের ঊর্ধ্বে কোন্ এক অজানা লোকের ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়—এই শিশুরই মুখের আলোকে। ভাবি, **Dostoyevsky** তাঁর **The Idiot** উপন্যাসে ঠিকই লেখেন, **The soul is healed by being with children.**

গিরমি দোরজে খবর পেয়ে আসে। শের্পা। পরনে ফিটফাট সাহেবী পোশাক। ফরসা রঙ। গোল মুখ। ছোট চোখ। যেমন পাহাড়ীদের হয়। লম্বা নয়, বেঁটেও নয়। রোগাও নয়, মোটাও নয়। ছিমছাম গড়ন। চোখে মুখে দেহে সজীব সক্রিয়তা। স্থির ধীর হয়ে চুপচাপ বসে থাকা যেন তার ধর্ম নয়। দেখেই মনে হয়, সারাক্ষণই কোন কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকাই তার স্বভাব। সোফায় এসে বসে যেন মেল-ট্রেনের এঞ্জিন ;—স্টেশনে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ানো। ব্যানার্জি সাদর অভ্যর্থনা জানান। তখনি চা এনে দেন। চোখ টিপে হেসে বলেন, সে-সবের তো ব্যবস্থা এখানে নেই! এখন গিরমি শোন, কাজের কথা বলি। এই আমার দাদা। এসেছেন—

কথা চলতে থাকে নেপালী ভাষায়। আভাসে বুঝি। গিরমি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে। হাসিখুশি ব্যবহার। খবর পাওয়া যায়, রবার্ট-এর চার্টার্ড (Chartered) প্লেন মাঝে মাঝে ও-অঞ্চলে যাতায়াত করে। যাবার সময় বিদেশী অভিযাত্রীদের ভিড় থাকেই—অনেকদিন আগে থেকেই রিজার্ভেশনও করা থাকে, তবে ফেরাবার সময় প্লেনে জায়গা পাওয়া শক্ত হয় না। সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে নেওয়াই ভাল। তার নিজের সম্বন্ধে জানায়, রবার্টস্-এর কাছেই সে এখন কাজ করে। সাহেব তাকে ছাড়লেই সে সঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু অক্টোবরের ২২শের পরই আমেরিকান একটা দল আসছে, তাদের সঙ্গে তার যাবার ব্যবস্থা আছে। তাই, তার

আগে তাকে ফিরতে হবে। তবে, সে নিজে যাক বা না যাক, জিনিসপত্র, পোর্টার—সব কিছুরই আয়োজন সে এখানে ঠিকঠাক করে দেবে নিশ্চয়। বিশ্বাসদের সঙ্গে সব মালপত্র এসে পেঁছুলে পোর্টার কতজন লাগবে, বোঝা যাবে।

অতএব, ডাক্তার বিশ্বাসদের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। গোসাঁইকুণ্ডের পারমিট হাতে এলেও যাবার সময় থাকে না। মণি ও ভক্তি যথাসময়ে এসে পেঁছান। তার আগে তাঁদের ভাগনেও আসে, সেও সাথী হবে।

দুদিনের মধ্যেই এর আয়োজনও সহজেই হয়ে যায়।

জিমি রবার্টস্ অতি উৎসাহী মিশুক ব্যক্তি। এককালে মিলিটারীতে ছিলেন। গুর্খা রেক্রুটিং অফিসারের কাজও করেন অনেকদিন। নেপালে মাউনটেনিয়ারিং-এর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। মাউণ্ট এভারেস্ট, ধবলগিরি প্রভৃতি অভিযানেও ছিলেন। অতএব, নেপালে শুধু তাঁর বাসই নয়, এ-দেশের লোকজন, পাহাড়-পর্বত সব কিছু সম্বন্ধেই তাঁর ব্যক্তিগত গভীর পরিচয়। সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এখন সদ্ব্যবহারও করেন। **Mountain Travel** নামে পর্যটক প্রতিষ্ঠান খোলেন। কয়েকটি ভাল শেরপাকেও রাখেন। শহরের বাইরে—বালাজুর পথে—সুন্দর সাজানো গোজানো নতুন দোতলা বাড়ি। ফুলভরা বাগান। ঘরের মধ্যে শেরপারা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। হাসিমুখে মাথা নত করে অভ্যর্থনা জানায়। ঘরের ভিতর রঙিন শিলপিং ব্যাগ, আইস্-অ্যাক্স ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম দেখা যায়। দোতলায়ও সাজানো বসবার ঘর। আলমারি-ভরা হিমালয়-অভিযানের দামী দামী বই। পাহাড়ের জীবজন্তু, পাখি, ফুল প্রভৃতি সম্পর্কেও। দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় ফটো,—সবই হিমালয়ের মনোহর দৃশ্য। বাড়ির মধ্যে ঢুকলেই মনে হয়, যেন হিমালয়-পূজারীর নিভৃত মন্দিরে প্রবেশ করি। ঘর-ভরা যেন হিমগিরিরই স্নিগ্ধ সুবাস। অতএব, তাঁর বৃহৎ অভিজ্ঞতার অনুপাতে আমাদের ভ্রমণ অতি সামান্য হলেও সাগ্রহে সাহায্য করতে চান—যেন মন্দির-অঙ্গনে তীর্থযাত্রীর ভেদাভেদ নেই। শুনি, প্রথম এভারেস্ট-বিজয়ী স্যার এডমণ্ড হিলারী কাঠমাণ্ডুতে এলে এখানেই থাকেন। তাঁর ঘরও দেখান। বলেন, এখন আবার ঐ এভারেস্টের পথেই আছেন। হয়ত দেখাও হবে। এখানে অন্য যাত্রীদের ব্যবস্থাও রাখেন দেখি। কিন্তু কথার ফাঁকে বোঝা যায়, আমাদের মত সাধারণ লোকের নাগালের এসব বাইরে। খরচ লাগে প্রচুর। বিদেশী--বিশেষতঃ আমেরিকান ট্যুরিস্টদেরই এসব পোষায়।

জানান্, তাঁদেরই জন্যে রয়াল নেপাল-লাইন-এর ছোট ডাকোটা প্লেনও তিনি প্রয়োজন মত ভাড়া—Charter করেন। লুক্লা পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেখান থেকে নামচেবাজার দেড়দিনের পথ। ১৮ই ১৯শে অক্টোবর একদল আমেরিকানদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। ওখানে তাদের নামিয়ে দিয়ে সেইদিনই প্লেন ফিরে আসবে, আমরা চাই তো তাতে ফিরতে পারি। মাথাপিছু ভাড়া দেড়শো টাকার বেশি পড়বে না। গিরমিকে যদি সঙ্গে নিয়ে

যেতে চাই তাকেও প্লেনে ফিরিয়ে আনতে হবে। এখান থেকে ২৩শে নাগাদ আবার আর এক দলের সঙ্গে পাহাড়ে তার যাবার কথা।

ডাক্তার বিশ্বাস নিশ্চিন্ত হয়ে আমার দিকে তাকান। বলেন, এ তো চমৎকার ব্যবস্থা। রাজি হওয়া যাক, কি বলেন দাদা? আমায় তো এক মাসের মধ্যে কলকাতায় ফিরতেই হবে। হেঁটে গিয়ে হেঁটে ফিরতে হলে, হাতে যে সময় আছে, হওয়া সম্ভবই নয়। হেঁটে গিয়ে প্লেনে ফিরলে দিন কুড়িও লাগবে না। খরচের দিক থেকেও বেশি পড়বে না। দেখুন না, হেঁটে ফিরলে ওখান থেকে কাঠমাণ্ডু পৌঁছতে প্রায় সপ্তাহ দুই লাগে। আমাদের সঙ্গে অন্ততঃ তিনজন পোর্টার ফেরবার পথে রাখতেই হবে,—এক একজন দৈনিক আট টাকা নেবে। তাছাড়া আমাদের খাওয়াদাওয়ার খরচাও আছে, প্লেনে ফিরলে সে খরচাও বাঁচবে, কুলি রাখারও আবশ্যক হবে না। আর গিরমিকে দৈনিক দশ টাকা দিতে হবে, ফেরবার পথে প্লেনে সেইদিনই পৌঁছে যাচ্ছি, তারও পনেরো দিনের মাইনে ঐ প্লেনের ভাড়ার সমানই হবে। সময়মত পৌঁছানোও যাবে, টাকাও বেশি কিছু লাগবে না।

অতএব, তখনি সবাই রাজি হই। কথা থাকে, ১৯শের প্লেনে লুক্‌লা থেকে সকলে ফিরব।

রবার্ট‍্স্‌ও বলেন, ঠিক রইল তাই। টাকা আগাম এখন দিতে হবে না। ফিরে এসে দিলেই চলবে।—তারপর হাসতে হাসতে জানান, তবে একটা কথা জেনে রাখবেন। সবই ঠিক রইল বটে, কিন্তু নেপালে নিশ্চয়তা বলে কোন কথা নেই। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না, কিন্তু প্লেন যাওয়া-আসা সম্পর্কে হিমালয়ের আবহাওয়ার পরিস্থিতি যেমন সবই অজানা, তেমনি সরকারী প্লেনও আগে থেকে ব্যবস্থা থাকলেও সেইদিনই ঠিকমত পাওয়া যাবে কিনা তাও কেউ আগে বলতে পারে না। আমার অভিজ্ঞতা আছে বলেই জানিয়ে রাখছি;—মনে রাখবেন, এটা নেপাল।—স্বাধীন রাজ্য!—বলে আবার হাসেন, আমাদের যাত্রার সাফল্য কামনা করেন।

বাড়ি ফিরলে ব্যানার্জিও একটা সুখবর আনেন। কাঠমাণ্ডু থেকে নেপালের অন্তবর্তী পাহাড়ের অন্যত্র কোথাও যাতায়াত করার পায়ে-হাঁটা ভিন্ন অন্য কোন পথই আগে ছিল না। গত কয়েক বছরের মধ্যে যেমন দু-এক জায়গায় প্লেন চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি বাস, মোটর, জীপ চলার মত কয়েকটি বড় রাস্তাও তৈরি হচ্ছে। এইসব উন্নয়ন অন্য রাষ্ট্রের সহায়তায় করা। ভারত থেকে নেপালে যাবার এই ধরনের দুটি মোটর-সড়ক ভারত সরকার নিজেদের খরচায় করে দিয়েছেন। এখন তাই রক্সৌল থেকে কাঠমাণ্ডু অতি সহজেই মোটরে যাওয়া যায়। অপর দিকে চীনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে মোটরের অতি-প্রশস্ত পাকা সড়ক চীন সরকারও তৈরি করে দিচ্ছেন। কাঠমাণ্ডু উপত্যকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করার এক সহজগম্য গিরিবর্ত্ম বা পাশ্‌ আছে। কোডারী পাশ্‌। সেইদিকে

মোটর-পথ অনেকখানি সে-সময়ে তৈরি হয়ে এসেছে। ব্যানার্জি জানান, কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রা করে আপনাদের প্রথম দুদিনের রাস্তা সেই কোডারীর নতুন সড়ক ধরেই যেতে হবে,—এর অধিকাংশই সমতল, তারপর পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আপনারা দুটো নদীর সঙ্গমে পৌঁছুবেন। কোডারী-সড়ক উত্তর দিকে ইন্দ্রাবতী নদী ধরে চলে যাবে, আপনারা ইন্দ্রাবতী, সুনকোশি দুটো নদীই পার হয়ে পূর্বদিকে ভিন্ন পথ ধরবেন। খবর পেলাম, 'স্পেশাল পারমিট' নিয়ে ঐ ইন্দ্রাবতী পর্যন্ত আজকাল জীপ যাচ্ছে। ভাড়া পাওয়া যায়। এতেও আপনাদের একটা দিন বেঁচে যাবে—আর এদিকে 'প্লেনস'-এ দেখবারও কিছু নেই। পোর্টাররা আগে হেঁটে রওনা হবে, কাল আপনাদের ঐখানে ধরবে,—তারপর একসঙ্গে হাঁটা শুরু।

সেইমত ব্যবস্থারও ঠিক হয়।

দিন কুড়ির জন্য আমাদের কয়জনের চাল, ডাল, আটা, ঘি, মসলা, চায়ের সরঞ্জামাদি, কিছু তাজা সবজি কেনা হয়। পোর্টাররা নিজেদের ব্যবস্থা করবে। গিরমি আমাদের জন্যে রাঁধবে। আমাদের সঙ্গে খাবেও। সে মালপত্র বইবে না। এককালে পোর্টার ছিল বটে, এখন শেরপা। মাউন্টেনীয়ার, গাইড, আমেরিকা-বিলাত ফেরত। তার মর্যাদায় বাধে। শুধু ছোটখাটো জিনিস—ক্যামেরা, বাইনোকুলার, ফ্লাস্ক ইত্যাদি নিতে পারে। কয়জন পোর্টার লাগবে সে-ই মাল ওজন করে স্থির করে। ভাবা গিয়েছিল, তাকে বাদ দিয়ে চারজন পোর্টারেই হয়ে যাবে। কিন্তু, খাওয়ার রেশনের ভার বাড়ে। গিরমি বলে, আরও একজন নিলে ভাল হয়। ডাক্তার বিশ্বাস জানান, যা ভাল মনে কর সেইমতই নাও,—চারজন পাঁচজন যা লাগে। যা বইতে পারে তার বেশি যেন চাপিও না, ওদেরও কষ্ট হবে, পথে ডেরায় পৌঁছুতেও দেরি করবে।

পাঁচজন পোর্টারই অবশেষে ঠিক হয়। ফেরবার পথে আমাদের পোর্টারের প্রয়োজন হবে না, প্লেনে ফিরব। তাই যে-পোর্টারদের ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের ফেরবার দরুনও কিছু দিতে হবে। তবে ফিরবে বোঝাশূন্য হয়ে তাই অর্ধেক সময়েই ফিরতে পারবে। গিরমি বলে, ওদের মধ্যে দুজন শেরপা পোর্টার নিই, যাদের ঐ অঞ্চলেই ঘর এবং দেশে ফিরছে, তাদের তাহলে ফেরার পথের ভাড়া দিতে হবে না।

দুজনকে নিয়েও আসে। একজন বিরাট জোয়ান। গোল মুখ। ঘাড়ে-গর্দানে,—মাংস-পেশিতে সারাদেহে যেন ঢেউ-খেলানো। পা দুটোর গোছ—যেন গদার মত। মুখভরা হাসি। নাম শুনি, আঙ্ দোরজে।

গিরমি বলে, এও এখন শেরপা গাইড-এর কাজ করে। বাড়ি পাংবোচেতে। থিয়াংবোচি ছাড়িয়েই। এ বাড়ি যাচ্ছিল। রাজি করিয়েছি, মোট নিয়ে যাবে, অন্য পোর্টারের সমান রেট-এ। বাড়ি ফেরবার পথে এদের কিছু রোজগার হবে। এমনি কি, আপনারা চান তো আমাকে বাদও দিতে পারেন। হুঁশিয়ার লোক। আমার জানাশোনাও। পথঘাটও এর জানা,—

নিজেরই গ্রামে যাবার রাস্তা তো।

গিরমিকে ছাড়তে রাজি হই না। কারণ, আঙ্ দোর্জে আমাদের কোন ভাষাই বোঝে না,—হিন্দী, ইংরেজি কোনটাই নয়। জানে শুধু তিব্বতী, আর ভাঙা-ভাঙা নেপালী। লোকটা দেখতেও কিরকম গুন্ডার মতন। তা ছাড়া, গিরমি রবার্টস্-এর কাছে রান্নাবান্নাও শিখছে। অতএব, গিরমিকে সঙ্গে থাকতেই হয়।

অপর শের্পাটি দেখে আশ্চর্য হই,—এও কি মাল বইবে? কতটুকু নিতে পারবে? বেঁটে ছোট ছেলে। তবে, গাঁট্টাগোট্টা। দেখতে কতকটা আঙ্ দোর্জেরই মতন। গোল মুখভরা হাসি। প্রকাণ্ড মাথা। যেন ফুটবলের উপর কটা রেখা টেনে চোখ মুখ ও একটু নাকের ডগা আঁকা। ঠিকই ধরি। আঙ্ দোর্জেরই আপন ভাই। সেও বাড়ি চলেছে দাদার সঙ্গে। শুনি, তার বছর পনেরো বয়স। পুরো একজনের বোঝা সহজেই বইতে পারবে।

আর তিনজন পোর্টার সম্বন্ধে গিরমি জানায়, দেখে শুনে টামাঙ্ পোর্টার নেবে। শের্পাদের বাস পাহাড়ের খুব উঁচু জায়গায়। শীতপ্রধান দেশে। বরফের রাজ্যে। তাই পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে এলে তারা গরম বোধ করে। ভার বইতে কষ্টবোধও হয়। টামাঙ্রা থাকে পাহাড়ের নীচের দিকে। মাল বওয়াই তাদের অনেকের পেশা। অথচ, শের্পাদের মত টামাঙ্দের পূর্বপুরুষরাও এককালে তিব্বত থেকে নেপালে আসে। কিন্তু এখানে এসে এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। নেপালীদের সঙ্গে মিলেমিশে, বিবাহাদি করে এক নতুন উপজাতির সৃষ্টি করে। নাম হয়, টামাঙ্। কেউ কেউ বলেন, তিব্বতী 'Ta-mangpo' (বহু অশ্ব) শব্দ থেকেই এই নামের উৎপত্তি। কেন না, এরা তিব্বত থেকে যখন নেমে আসে, এদের সঙ্গে অনেক ঘোড়া ছিল। আবার কারও মতে টামাঙ্ কথাটা আসে তিব্বতী 'Ta-marpo' থেকে,—অর্থাৎ তিব্বতী লাল ঘোড়ার পশুপালক। এই উপজাতির প্রধান বিশেষত্ব হল এদের ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার। ধর্মমতে এরা বৌদ্ধ, সেইমত এরা পুজোদিও করে। তিব্বত থেকে আসায় তাই হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এরা হিন্দুমতে চলে। এমন কি, দশেরা-দুর্গাপুজো, তিহার-ভাইফোঁটা ইত্যাদি মানে। বিবাহাদিও নেপালীমতে অনুষ্ঠিত হয়। এরও যথেষ্ট কারণ থাকে। এদের অনেকেই হিন্দু নেপালী মহিলার সন্তান। তাই, তাদের মায়ের মেনে-চলা হিন্দু প্রথা এরাও দেখে শেখে, পালন করেও চলে। এদের ভাষার মধ্যেও একটা সংমিশ্রণ হয়ে নতুন এক ধরনের ভাষারও প্রচলন হয়। টামাঙ্দের জীবনে এই অদ্ভুত ধর্মসংকরের চিত্র তাদের নিজেদেরই এক লোকগাথায় ধরা পড়ে;—বারো টামাঙ্ আঠারো জাত। গরুকো টাউকো ধানকো ভাত॥—অর্থাৎ বার টামাঙ্ আঠার জাত, গোমাংসের সঙ্গেও চালায় ভাত। এর ফলে, গোঁড়া বৌদ্ধ শের্পারাও যেমন এদের ভাল চোখে দেখে না, হিন্দু নেপালীরাও মন খুলে এদের সঙ্গে

মেশে না। ইদানীং টামাঙ্রা কেউ কেউ 'লামা' পদবী নেয়,—নামের পদবীমাত্র, প্রসিদ্ধ তিব্বতী লামা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই। এদের অনেককে দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলেও দেখা যায়।

পোর্টারদের ব্যবস্থা শেষ হয়। আমরাও নিজেদের কাপড়-জামা গুছিয়ে কিট্ ব্যাগে ভরি। মিসেস্ ব্যানার্জি আমার উপহার-পাওয়া ভাল পশমের তৈরি একটা পুলওভার দেখে বলেন, এই রাস্তায় ওটা নিয়ে চলেছেন? একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে যে! ওঁর একটা তিব্বতী মোটা পশমের গলাবন্ধ পুরো হাতা সোয়েটার আছে,—ট্যুরে গেলেই ব্যবহার করেন; খুব গরম,—আপনার গায়েও ঠিক হবে। সেইটে এনে দিই, নিয়ে যান, কাজ দেবে,—ঐ শীতের দেশে সব সময়েই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে, একটা কথা,—নানা বিচিত্র রঙের জবড়জঙ দেখতে,—যেন বাঘের ছাল। রঙের জন্যে আপত্তি না থাকলেই হল।

বলি, ও-পথে আর দেখছে কে? পাহাড়ে-জঙ্গলে না হয় বাঘ সেজেই থাকা যাবে,—সেটা ভাবনার কথা নয়। কিন্তু আপনার কর্তার সম্পত্তি,—যদি ছিঁড়ে বা খারাপ হয়ে যায়?—বলে ব্যানার্জির দিকে তাকাই।

ব্যানার্জি হাসেন। বলেন, দাদা, বহুদিনের পুরনো ব্যবহার-করা, গেলেও আর ক্ষতি নেই। বরং আবার নতুন একটা লাভ হবে আমার! আপনার কাজে এটা লাগলে সে তো ভাগ্যের কথা। নিয়ে যান, কাজ দেবেই।

পরে, যাত্রাপথে একদিন এই সোয়েটারই যে এক 'কমেডি'র কারণ হবে, তখন তা ভাবতেই পারি না।

১৯৬৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। সকাল সাড়ে ন'টা। জীপ-এ যাত্রা শুরু হয়। গিরমি সঙ্গে আছে। মালপত্রও জীপ-এ। পোর্টাররা গতকাল খালি হাতেই রওনা হয়েছে। ভাবি, সত্যিই চলেছি এভারেস্টের দিকে! মন আনচান করে। লোকে এভারেস্ট দেখে বহু দূর থেকে। সেই দার্জিলিঙ-এর সান্ডাকফু, ফালুট গিয়ে। নেপালেও দু' একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে। কিন্তু, সে-সব নামমাত্র দেখা। দেখেছিও। অনেক ভাল ভাবে নজর করে বুঝেসুঝে জানা যায়,—ঐ যে সামান্য একটু মাথা দেখা যাচ্ছে—ঐ পাহাড়গুলোর পিছনে—না, না, ওটা নয়, ঐ ঐখানে—ঐটেই এভারেস্ট!—যত না চর্মচক্ষে দেখি, মানস-লোচনে কল্পনা করতে হয় বেশি। না বুঝলেও স্বীকার করে নিতে হয়,—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,—ঐটে তো?

আজ এতদিনে যাত্রা শুরু হল—সেই এভারেস্টেরই নিকটে যাওয়ার। মন ভরা আশা, হৃদয়-ছাওয়া কল্পনা।

ব্যানার্জিও সঙ্গে চলেন এগিয়ে দিতে। বলেন, সুযোগ যখন পাওয়া গেল, জীপ-এ যতটুকু পারি ঘুরে আসি। জীপ তো ফিরবেই বিকেলে, আমিও ওতেই ফিরব।

দুঃখ প্রকাশ করেন, এই তো মাসখানেক আগে ঘুরে এসেছি ঐ অঞ্চল থেকে,

তবুও আবার যাবার জন্যে মন উসখুস করে।

ভাবি, হিমালয়-পথে ঘোরার এই হল বিষম দায়। একবার গেলে বার বার যেতে হয়, বার বার গেলেও আশ মেটে না।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার উপর দিয়ে জীপ চলে। বিস্তীর্ণ সমভূমি। মাঝে মাঝে শীর্ণকায়া পাহাড়ী নদী। ধু ধু করে চারিপাশে মাঠ, শস্যভরা ক্ষেত। তারই মাঝে ছোট, বড় গ্রাম। দূরে চারিদিক ঘিরে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের ঘন নীল প্রাকার। যেন, পাহাড়-ঘেরা জলশূন্য বিশাল হ্রদ। পুরাকালে হয়ত তাই-ই ছিল।

পথের অদূরে ভাটগাঁও শহর পড়ে থাকে। জীপ ছুটে চলে। দিগন্তের পাহাড় নিকটে আসে। ঢেউ-খেলানো ছোট ছোট পাহাড় শুরু হয়। যেন, সম্মুখের পাহাড়-তটে বাধা পেয়ে সমতলে তরঙ্গ ওঠে। পথও তাই ওঠে নামে। ক্রমে পাহাড়ী এলাকায় পেঁছে যাই। প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা। মোটর, বাস, ট্রাক, লরী অনায়াসে কয়েক সারি পাশাপাশি চলতে পারে এমনি প্রশস্ত পথ তৈরি হয়। কাজ করে দেখি, সব চীনদেশের লোকজন। অফিসাররা তো বটেই, এমন কি কুলি-মজুরও। কেউ অযথা বসে নেই। পথের পাশে জটলা পাকিয়ে গল্পগুজব বা ধূমপানেব দৃশ্য নয়, সবাই আপন আপন কর্মব্যস্ত। দেখে ভাবি, চীনরাজ্যেই এলাম নাকি? শুনি, আর কয়েক দিনেই পথ তৈরির কাজ শেষ হবে। কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে সোজা পিকিং-এর সহজ সুগম সংযোগ হয়ে যাবে। আবার কি? ওদিকে ভারত থেকে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত রাজপথ—সে তো ভারত নিজেদের খরচাতেই করে দিয়েছে!

পাহাড়ের অল্প উপর দিকে উঠতেই ছোট বসতি। খানকয়েক ঘর। রাস্তা আটকে বেড়া। চেকপোস্ট। নেপালী পুলিস আসে। বলে, মালপত্র নামিয়ে দেখাতে হবে। এটা খোল, ওটা খোল.—বিরক্তি বোধ হয়। মাল তো কম নয়। বলবার কিছু নেই। পুলিস তার কর্তব্য করছে। ভাবি, যেখানে করবার সেখানে ঠিক করে তো? এমনি সময়ে হঠাৎ পথের সুমুখ দিকে কিছু দূরে কলরোল ওঠে। লোকজন ছোটাছুটি করে। একজন হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে পুলিসকে খবর দেয়, সামনে ঐ ওখানে রাস্তা থেকে যাত্রীসমেত একটা জীপ উল্টে পড়েছে।

পুলিস গেট খুলে দেয়, ঐদিকেই যায়। আমরাও ছাড়া পাই। জীপে উঠে আবার তখনি রওনা হই। পল্লী ছাড়িয়ে এসেই দেখি, পথের উপর লোকজনের ভিড়, আতঙ্ক ভাব। পথের বাঁ পাশে সাত-আট হাত নীচু ঢালু জমি, চাষের ক্ষেত। তারই উপর কাত হয়ে পড়ে একটা জীপ। জনকয়েক লোক আহত যাত্রীদের সাহায্য করতে ব্যস্ত। একটি বয়স্থা নেপালী মেয়েকে দুদিকে দুজন হাত ধরে রাস্তার দিকে তুলে আনছে। রঙিন জামাকাপড় রক্তমাখা। সে-রঙে এ-রঙে কত প্রভেদ! প্রকাণ্ড একটা নথের মত গহনা নাকে

ঝোলে,—বোধ হয় সোনার। আলো পড়ে চিকমিক করে। তারই পাশে গালের উপর রক্তের ধারা। চিৎকার-রবে কাঁদে। চোখমুখ তীব্র বেদনায় ও আতঙ্কে বিকৃত।

ক্ষণিকমাত্রের দৃশ্য। কারণ, চলন্ত জীপ। চালক গতিবেগ একটু কমায় মাত্র। স্টিয়ারিং ধরে চলার মুখেই সে-ও চকিতে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নেয়। চালকের পাশে গাড়ির সামনের দিকে আমি বসে। আমার তাই অবাধ দৃষ্টি। ডাক্তার বিশ্বাসরা জীপের ভিতর দিকে মালপত্রের স্তূপের মধ্যে বসে। আমার পিছনেই। তাঁদের দৃষ্টিপথে কতটুকু আসে, জানি না। কিন্তু কানে শুনি, ডাক্তার উদ্বেলিত কণ্ঠে চালককে বলে ওঠেন, থেমো না—থেমো না যেন,—জলদি বেরিয়ে চল। গাড়িও তখনি সজোরে এগিয়ে চলে। যেন পালিয়ে আসে। পালানোই বটে।

আমার চোখের উপর কিন্তু তখনও ভাসতে থাকে সেই রক্তাক্ত করুণ দৃশ্য, কানে বাজতে থাকে ডাক্তারের ত্রাস বিচলিত কাতর কণ্ঠ।

আশ্চর্য লাগে। অস্ফুটে ডাক্তারকে বলি, নেমে দেখলে হত না,—কোন রকম সাহায্য করবার আছে কিনা? উত্তর আসে না। জীপ ছুটে চলে। সবাই নির্বাক। কি জানি, হয়ত ভাবে, যাত্রার শুরুতেই এমন অশুভ দৃশ্য! অল্প পরেই ডাক্তারের অস্ফুট কণ্ঠ শুনি। যেন আমার কানে কানে বলেন, কিংবা হয়ত স্বগতই মন্তব্য করেন: উঃ! ও-সব আর এখানে নয়,—সারা বছরই তো হাসপাতালে, ঘরে-বাইরে ঐ নিয়েই কাটে—রোগ, রক্ত, মৃত্যু! এখানেও আবার তাই! ক্ষণিক মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তো পালিয়ে আসা,—আবার এখানেও ঐ! নাঃ, পারা যায় না আর। কী পেশাই না নিয়েছি।

চুপ করে শুনি। ভাবি, মানুষের কর্তব্যের শুরুই বা কোথায়, শেষই বা কখন? হঠাৎ মনে পড়ে যায়, আমার পিতামহের এক উক্তি। বাবা ও মার কাছে শোনা। আমরা ভাই-বোনেরা কেউ জন্মাবার কয়েক বছর আগেই তাঁর দেহাবসান হয়। তাই তাঁকে দেখবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু তাঁর হাতে-লেখা কয়েকটি নিদর্শন দেখি। বালির কাগজে মলাট দেওয়া কয়েকটি খাতা। সুস্পষ্ট, সুন্দর হস্তাক্ষর। বাল্মীকির রামায়ণের বাংলা অনুবাদ। ছন্দোবদ্ধ। তাঁরই সযত্ন রচনা। সাহিত্যনিষ্ঠা। খাতার পাতার সাদা রঙ কালের কবলে লালচে হয়েছে। কালো কালিও বিবর্ণ। তবুও তারই মধ্যে যেন দেখি, তাঁর মনের সুগভীর শান্ত স্বচ্ছ ভাবধারা। ফল্গুর অন্তঃসলিল প্রবাহ। অথচ, তিনি ছিলেন চিকিৎসক। সেকালের মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দিকের পাস-করা ছাত্র। বিচক্ষণ চিকিৎসক বলে শহরে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু কি প্রকৃতির ডাক্তার, তারও ছবি পাই তাঁরই হাতে-লেখা দৈনন্দিন জমা-খরচের হিসাব বইগুলির মধ্যে। সেগুলিও পরিচ্ছন্ন ভাবে স্পষ্টাক্ষরে বাংলায় লেখা। একশত বছর আগে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে কি ভাবে ও কত খরচে সংসার চলত, তখনকার দিনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামই বা কিরকম ছিল, তার প্রমাণ তাতে পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ি রেখে তিনি চিকিৎসকের পেশা

চালিয়ে যেতেন। ডাক্তারের ফি ছিল দু' টাকা। জমায় অঙ্কে তা দেখতে পাওয়া যায়। আবার, খরচের মধ্যে দেখি, রোগীর পথ্য, রোগীর ঔষধ ইত্যাদির দাম। অর্থাৎ, সে-সব ক্ষেত্রে ফি নেওয়া তো নয়ই, উলটে রোগীর পথ্যাদির ব্যয়বহন করা। তাই, এক-একদিন জমার অঙ্কের চেয়ে খরচের ভার বেশি হয়, আশ্চর্য কি? সেদিন 'জমা'র মধ্যে দেখা দেয়, 'জগৎতারিণীর নিকট হাওলাত—দশ টাকা'! নইলে খরচ কুলায় না। জগৎতারিণী আমার পিতামহীর নাম। কদিন পরেই আবার জমার অঙ্ক বেশি হলেই খরচের মধ্যে পাওয়া যায়—'জগৎতারিণীর হাওলাত শোধ'। ডাক্তারী জীবনে সাফল্য সত্ত্বেও তিনি, শুনি, বাবা-মাকে বলে যান আমার নাতি হলে কাউকে যেন ডাক্তার হতে দিও না। ডাক্তার হতে হলে ভাল ডাক্তারই তাকে হতে হবে, না হলে হয়ে লাভ কি? আবার, ভাল ডাক্তার হলে জীবনে শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, স্বস্তি নেই। রোগী দেখার ডাক এলে যেতেই হবে,—সময় নেই, অসময় নেই, নিজের সুখসুবিধা, স্বাস্থ্যের কথা ভাববার অবকাশ নেই,—না গেলে তার পেশার অধর্ম হবে। অথচ অমনভাবে ছোটাছুটি করে রোগী দেখা,—ঠিকভাবে হয়ও না, ভেবেচিন্তে চিকিৎসাও সম্ভব নয়। ফলে, নিজের স্বাস্থ্য ভাঙে, মনের শান্তি যায়, রোগীর প্রতি অবিচারও হয়,—নাতিদের কাউকে যেন ডাক্তার হতে দিও না!

হইনিও কেউ আমরা। ঐ কারণেই কিনা তা অবশ্য জানা নেই।

অগোচরে আপন মনের কোণে পুরনো স্মৃতি ফোটে। যেন, শৈশবে ছেড়ে-আসা আপন গ্রামের নিরালা খিড়কিপুকুরে মাছেরা খেলা করে। ওদিকে জীপও ছুটে চলে আপন বেগে নিজ পথে। পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল পথ এঁকেবেঁকে খানিক ওঠে, অপর দিকে নেমে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকিয়ে দেখি, চারিদিক পাহাড়-ঘেরা। তারই মধ্য দিয়ে পথ করে বয়ে চলে পাহাড়ী বড় নদী। ইন্দ্রাবতী। নদীর উপর প্রকাণ্ড পাকা পুল। পুলের দুই পারে পাহারা দেবার জন্য ছোট ঘর,—সেনট্রি বক্স্ (Sentry box)। এখনও রাস্তা তৈরির কাজ চলে। নদীর দুই পারেই। বহু লোকজন। চীনদেশীয়ই বেশি। কর্মরত মানুষের ব্যস্তসমস্ত চঞ্চলতা, পাহাড়ের বুকে যন্ত্রপাতির সশব্দ আঘাত,—হিমগিরির নিবিড় শান্তি হরণ করে।—জীপ এখনও নদীর ওপারে যায় না। পোর্টাররা দেখি আগেই পৌঁছে গেছে। মালপত্র এইখানেই নামিয়ে নেয়। জায়গার নাম দোলাল ঘাট। ২০০০ ফুট উচ্চতা। বেলা বারোটা বাজে। কাঠমাণ্ডু থেকে দুদিনের হাঁটা পথ। মাইল ত্রিশের উপর। আড়াই ঘণ্টায় চলে আসি। ব্যানার্জি এইখান থেকেই আবার এই জীপে কাঠমাণ্ডু ফিরবেন। গাড়ি ছাড়তে এখনও কিছু দেরি। তাই বলেন, চলুন, ওপারে হাঁটাপথে যাত্রা করিয়ে ফিরব। মন খারাপ লাগছে। খাসা চললেন হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে, আমার আবার শহরে ফিরে সেই ঘানিতে ঘোরা!

পুল পার হয়ে যেতে ডানদিকে কিছু দূরেই দেখা যায়, নদীর বুকে হঠাৎ বিশাল বিস্তৃতি। ব্যানার্জি বলেন, অপর পারের সামনের ঐ পাহাড়ের পিছন

দিয়ে সুনকোশি নদী এসে নীচে ঐখানে ইন্দ্রাবতীর সঙ্গে মেশে, তাই সঙ্গমে অতো চওড়া দেখায়। ইন্দ্রাবতী নামেরও ঐখানে শেষ। সুনকোশির নামই থেকে যায়। নেপালের সপ্তকোশির এক প্রধান ধারা। আপনারা হাঁটা শুরু করেই সামনের পাহাড়ের অপর দিকে নেমে সুনকোশিও পার হবেন।

ইন্দ্রাবতীর অপর পারে আসি। বাঁ দিকে—অর্থাৎ উত্তর মুখে, যে ধার দিয়ে নদী নেমে আসে, সেই তীর ধরে চীনেদের তৈরি কোডারীর মোটর রাস্তা চলে যায়,—তিব্বত অভিমুখে। কোডারী বা ভৈঁসে পাস এখান থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে। সেই পাস-এর উচ্চতা ৬,৫০০ থেকে ৬,৭০০ ফুট। হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করার এই নাকি সব চেয়ে নিম্নতম গিরিবর্ত্ম। আমাদের পথ উল্টা দিকে। ডান হাতে। যেদিকে নদী নেমে চলে। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যই। সামান্য এগিয়ে নদীর এপারের পাহাড়ের উপরপানে খানিক ওঠা। তাও অতি অল্পই। উপরে উঠতেই দেখা যায় পাহাড়ের অপর দিকে আর এক ভ্যালি। সুনকোশি প্রচণ্ডবেগে সেই পথে নেমে আসে। আমাদের মনও তখন চলবার আবেগে উন্মুখ। অযথা এখানে কালক্ষেপ করার কোন সার্থকতা নেই, যতোদূর আজ এগোনো চলে। পথের সামনেই, শুনি, একটু পরেই চড়াই। ভাবি, তা তো হবেই, হিমালয়ে হাঁটতে আসা, গিরিরাজ প্রথমেই একটু পরীক্ষা করে নেবেন. আশ্চর্য কী!

সোৎসাহে যাত্রা করি। ব্যানার্জি নিরুৎসাহে জীপের দিকে ফেরেন। গিরমি পোর্টারদের মালপত্র ভাগ করে আসছে বলে। আমরা এগিয়ে চলি। বেলা একটা বাজে। সুনকোশির উপর পুল। অপর পারে পেঁাছে নদীর বাম তীর ধরে সোজা পথ। অল্প এগিয়ে খানকয়েক ঘর, দোকানপাটও। পথের ডান দিকে কিছু নীচেই সুনকোশি ও ইন্দ্রাবতীর সঙ্গম। যেদিকে তাকাই মাথা তুলে পাহাড়ের সারি। কিন্তু পার্বত্য নদীর মিলনশোভা, হিমালয়ের শান্ত নিভৃতি,—উপভোগ করার মত মন খুঁজে পাই না। মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য। দুপুরের প্রচণ্ড রোদ। পাহাড়ের গায়ে নগ্ন শিলারাশির স্পর্ধিত উত্তাপ। মিলিত দুই নদীর বিস্তীর্ণ বালুচরের দীপ্ত কটাক্ষ। তরুচ্ছায়াবিরল বিরস পথ। চারিদিক দেখে ভাবি, এ যেন হিমালয়ের পথে নামতেই তপস্যার অগ্নিপরীক্ষা! এরও উপর আরও 'সুখবর' শুনি, এই সরল পথ ও নদীর সঙ্গ এখনি ছাড়তে হবে। বাঁ দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে ঐ যে পায়ে-হাঁটা সরু চড়াই-পথ—আমাদেরই অপেক্ষায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। আমরাও ঘাড় তুলে তাকিয়ে দেখি। দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপি। সঙ্গী—মণির ভাগনে—হেসে বলে, মামা, সামনেই চায়ের দোকান। এক গেলাস করে গরম চা খেয়ে চড়াই শুরু করা যাক। 'বিষেই বিষক্ষয়'—বলে না?

চড়াই শুরু করি। ধীরে ধীরে। পাহাড়ের বুকে পাথর-সাজানো ধাপ। ধাপের পর ধাপ উঠেই চলে। একাই চলি। আপন মনে। এঁকেবেঁকে পথ ওঠে। চরণতলে ছন্দ জাগে। দেহের স্বেদ-স্রাবে যেন শহরবাসের ক্লেদ-মুক্তি ঘটে। মনের মধ্যে কিসের গুঞ্জরণ ফোটে। শ্রান্ত দেহেও আনন্দ-হিল্লোল

ওঠে। পাহাড়ের নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি। সুনকোশির বিশাল বিস্তৃতি ক্ষীণকায় দেখায়। নদীর ধারের সেই ক্ষুদ্র পল্লী খেলাঘরে পরিণত হয়।

চড়াইয়ের মাঝপথে বিরাট এক পিপল গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে স্নিগ্ধ ছায়ার আসন বিছায়। গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ির নীচের দিক চারিপাশ বাঁধানো। কয়েকজন নেপালী বিশ্রাম করে। দেখে বসবার লোভ জাগে। কিন্তু, সামনের পথ যেন নিষেধ করে। ধীরে ধীরে এগিয়েই চলি। পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতলভূমি। ছোট গ্রাম। একটানা চড়াই উঠে সোজা পথে পা ফেলে চলায় আরাম পাই। আবার, চড়াইও শুরু হয়। অনবরত ধীরে ধীরে উঠেই চলি। অবশেষে এই পাহাড়ের কাঁধে পেঁছাই। অনেকগুলি গাছপালা। তিন-চারটি চালাঘরও। এখানেও এক পিপল গাছের নীচে বাঁধানো। সেইখানে বসে বিশ্রাম নিই। ধীরে বাতাস বয়। কে যেন অলক্ষ্যে পাখার হাওয়া করে। দেহের ক্লান্তি নিমেষে মিলায়। পথের ধারে গাছের ছায়ায় তিনটি ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করে। ধুলোবালি পাথর নিয়ে খেলা শিশুমনে তাইতেই অনাবিল আনন্দের উৎস। পরদেশী লোক দেখে ভয় পায়। খেলা ফেলে আড়ালে লুকায়। আবার, উঁকি মেরে দেখে। ইশারা করে ডাকি। তবু, ভয় ভাঙে না। শ্রীমতী ভক্তির সযত্নে গুছিয়ে দেওয়া লজেন্স পকেটে। বার করে দেখাই। এবার সন্তর্পণে এগিয়ে আসে। সলজ্জ ছোট ছোট হাত পেতে আড়চোখে মুখের পানে তাকায়। লজেন্স পেয়ে মুখে হাসি ফোটে। জিজ্ঞাসা করি, জায়গার নাম কি ?—ভাষা বোঝে না। হাসতে থাকে। সাহস বাড়ে। আবার হাত পেতে লজেন্স চায়।

গিরমি বলেছিল, চড়াই শেষ হলেই ডুমরে (Dumre) গ্রাম। সেইখানেই আজ রাত্রিবাস। তাই, এই ঘর দেখে মনে আশা, হয়ত আজকের মত পথ চলা শেষ।

ভাগনে এসে হাজির হয়। বলে, ছোট মামারা উঠছেন ধীরে ধীরে। চড়াইটা মন্দ নয়। তার ওপর দুপুরের রোদটাও বেশ কড়া। বাঃ! গাছের ছায়ায় জায়গাটি তো চমৎকার। বাতাসও দিচ্ছে সুন্দর। এই-ই ডুমরে নাকি ? বলি, এ বাচ্ছাগুলোকে জিজ্ঞাসা করে তো উত্তর পাচ্ছি না। একটু জিরিয়ে নিয়ে খোঁজ নাও দিকি। আর কাউকে দেখছি না তো।

সে চোখের চশমা খোলে। কাঁচের উপর থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলে, জিরোনোর আর কি আছে? মনে হয়, এইটেই। চোখে আবার চশমা লাগিয়ে চারিদিকে তাকায়। বলে ওঠে, ঐ তো, ঐ চালাঘরটায় লোক দেখা গেল। দাঁড়ান, জিজ্ঞাসা করে আসি। হয়ত, চা-ও পেয়ে যাব, মামা!—খুশিভরা মুখে সাগ্রহে এগিয়ে যায়। ঘরের ভিতর ঢুকে অল্প পরেই বেরিয়ে আসে। একমুখ হাসি। বলে, সবই হিসেবে ভুল। এখনও প্রায় মাইলখানেক হাঁটা। তবে, চড়াই নেই, সোজা পথ। তা না হয় হাঁটা যাবে। কিন্তু, 'দিদি' চা খাওয়াতে পারল না। ঘরের মধ্যে কয়েকটা লোক জমায়েত হয়েছে, জলীয় যা পান করছে, আমাদের তা তো চলবে না।—চায়ের কথা বলতেই ওরা হেসেই

খনুন। বলে, চা খাবে কি? এই পিয়ো, চলে এস;

অতএব, দুজনে আর সময় অপচয় করি না। এগিয়েই চলি। চালাঘরের দিকে নয়। সোজা পথ ধরে। এই পাহাড়ের অপর দিকের গা দিয়ে রাস্তা ঘুরে যায়। বাঁয়ে বহু নীচে অন্য আর এক গিরিনদীর উপত্যকা। পথের দু পাশে ঘন গাছের জঙ্গল। ছায়া-শীতল। ভাগনে বলে, চড়াই উঠতে রোদে তখন মাথা ফাটল। এখন পাহাড়ের মাথায় ঠাণ্ডা জায়গা.—সেইখানে ছায়!

বাঁ দিকে দূরে উপত্যকার অপর পারে আরও উঁচু পাহাড়। দুজনে বলাবলি করি, কাল বোধ হয় আবার ঐটে ডিঙিয়ে ওরই অপর দিকে নামতে হবে। ওর মাথার ওপর খানকয়েক ঘরের মতন দেখাচ্ছে না? পাহাড়ের গা বেয়ে যেন পথেরও রেখা দেখা যায়। ঐটেই নিশ্চয় কালকের পথ!

কৌতূহল ও চলবার প্রেরণা বাড়ে। দুজনে সোৎসাহে এগিয়ে চলি। সময়ের জ্ঞান থাকে না। পথের পাশে আবার খানকয়েক ঘরবাড়ি আসে। ডুমরে কিনা একজন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করি। ঘাড় নেড়ে 'না' জানায়। ভাগনে বলে, এরই মধ্যে আসবে কি করে? বলেছিল, প্রায় মাইলখানেক।—দুজনে আরও এগিয়ে চলি। চারিপাশে পাহাড়ের অপরূপ শোভা। চমৎকার লাগে। অনেকখানি যাবার পর দেখি, পাহাড়ের কিছু উপরে কয়েকটি ঘর। আর একটা পথ উঠে যায় সেইদিকে। সন্দেহ জাগে, ঐ বুঝি ডুমরে? সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। পাথরের উপর দুজনে বসে হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করি। বেশ কিছুক্ষণ পরে গিরমি আসে দেখা যায়। দূর থেকেই আমাদের ডাকাডাকি করে। ব্যাপার কি? ইশারা করি, তুমিই এগিয়ে এস। আমরা আবার ফিরব কেন?

কিন্তু, ফিরতেই হয়। ডুমরে ছাড়িয়ে চলে এসেছি অনেকক্ষণ। সেই পিছনে ফেলে-আসা গ্রামই ডুমরে। গ্রামবাসীই ভুল বলেছিল, অথবা, আমরাই ভুল বুঝেছিলাম,—সে বিচারে আর প্রয়োজন নেই। আবার প্রায় মাইলখানেক ফিরতি-পথে আসা। অপরিমিত উৎসাহের নিগ্রহ।—সন্ধ্যা ছয়টা বাজে। গ্রামের একটা দোতলা বাড়ির উপরের ঘরে আশ্রয় মেলে। নীচের ঘরে গিরমি রান্না করে। আনন্দে যাত্রাপথের প্রথম রাত্রি কাটে। প্রায় হাজার ছয় ফুট উঁচুতে গ্রামখানি, মনে হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর। সকালে শীতবোধ হয়। জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রথম দিনে সবারই তৈরি হতে দেরি হয়। যাত্রা করতে ছটা বাজে। সোজা পথ। বরং প্রথমদিকে খানিকটা উৎরাই। তারপরেই আবার চড়াই। এঁকেবেঁকে zig-zag পথ ওঠে। চার-পাঁচ হাত চওড়া। ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। চলতে কষ্ট বোধ হয় না। তবে, সকালের শীতভাব কেটে যায়। একা একা এগিয়ে চলি। মনে আনন্দ জাগে। গতকালের দূর থেকে দেখা সেই পথেই চলি মনে হয়। একদল নেপালী উপর দিক থেকে নেমে আসে। কোথায় চলেছি, প্রশ্ন করে। 'নামচেবাজার' শুনে বুঝতেই পারে না। তারপর

একজন বোঝে, অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে, ওঃ! নামছে?—বহুদূর। পারবে যেতে?—জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আসছ কোথা থেকে?—বলে, এক নম্বর।

নেপালে জেলা ভাগ হয়,—নম্বর দিয়ে। তাই, জেলার নাম নেই, নম্বর দিয়ে পরিচয়। আমাদের পথ এখন চলে, ১ নং-এর মধ্য দিয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে চড়াইয়ের একটা মাথায় এসে উঠি। পথের ধারে একখানা মাত্র চালাঘর। অল্প দূরে জলের ধারা। সেখানে কয়েকটা বড় গাছের ছায়া। একটা পাথরে বসে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করি। বিশ্রামও হয়। সম্মুখে দূরে গতকালের পার-হয়ে-আসা সেই পাহাড় এখন মাথায় ছোট দেখায়। সবুজ বনে ঢাকা।

গিরমি এসে পৌঁছায়। বলে, সাথীরা পেছিয়ে আছে। অতি ধীরে চড়াই উঠছে। এখানে পৌঁছুতে সময় নেবে। দুপুরের খাওয়া চৌবাসে হবার কথা, কিন্তু দেখছি এখানেই সেরে নেওয়া ভাল। সারাদিন তাহলে চলা যাবে।

গিরমি সেইমত ব্যবস্থাও করে।

আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে যেটুকু সমতলভূমি, সেখানে চাষের ক্ষেত, বসবার উপায় নেই। বড় গাছগুলির তলায় আরামে বসা চলে, কিন্তু তার নিকটে জলের ধারা। জনকয়েক নেপালী সেখানে বিশ্রাম করে। হৈচৈ-রবে গল্পগুজব চালায়। অগত্যা একটু তফাতে বড় রাস্তা ছাড়িয়েই ক্ষেতের দিকে পায়ে হাঁটা যে সরু পথ যায়, তারই উপর প্লাসটিক সীট্ বিছিয়ে লম্বা হয়ে বসি। দেহ আরাম বোধ করে, মনেও পরম শান্তি নামে। ভাবি, ধরণীর কোলে এই তো প্রকৃত সুখশয্যা।

সঙ্গীরা আসেন। তাঁরাও বিশ্রাম নেন। সকালের সুখস্পর্শ রৌদ্র। পাহাড়ের মাথায় স্নিগ্ধ শীতল বায়ু। সবারই মন-ভরা আনন্দ।

আহার-শেষে আবার যাত্রা। বেলা ১১টা ২০ মাত্র। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ কিছু দূর সোজা চলে। তারপর ধীরে ধীরে আবার উঠতে থাকে। ক্রমে এই পাহাড়ের মাথায় গাছের সীমারেখা ছাড়িয়ে আসে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ মালভূমি। অল্প ঢেউ-খেলানো। সবুজ ঘাসে ভরা। মাঝে মাঝে শিলাস্তূপ। ছোট ছোট জলের ধারা। মনে হয়, শিখরদেশ। কিন্তু ঠিক তা নয়। অদূরে পাহাড়ের অংশ আরও উঁচুতে উঠে যায়,—সেইখানে প্রকৃত চূড়া। তারই ঠিক নীচে দিয়ে পথ। সোজা সরলরেখা এঁকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ থেকেই বাজনার শব্দ কানে আসে। নিকটেই কোথাও মনে হয়। অথচ লোকজন দেখি না। ভাবি, হয়ত পাহাড়ের আড়ালের গ্রাম। অল্প পরেই ভুল ভাঙে। পাহাড়ের মাথার দিক থেকে শব্দ যেন ক্রমে এগিয়ে আসে। হঠাৎ দূরে দেখা যায়, উপর থেকে কয়েকজন লোক নামতে থাকে। রঙিন বেশভূষা। কেউ [illegible] বাজায়, কেউ বা মাদল, কারও হাতে বা খঞ্জনী। পাহাড়ের ঢাল [illegible] বেয়ে হেলেদুলে অনায়াসে দ্রুতপদে নেমে আসায় দেহে তাদের নাচের ভঙ্গি ফোটে। মাঝে মাঝে সমস্বরে কি যেন রব তোলে। ভাবি,

ব্যাপার কি ? বিয়ে করতে বর চলে নাকি ? অথবা, কি জানি বাজনা বাজিয়ে শবযাত্রাই যায় হয়ত। দেখেছি তো কতো দেশের কতো প্রথা। কোথাও বা শিশু ভূমিষ্ঠ হলে আনন্দ-উৎসব, মানুষের মৃত্যুতে শোকবিহ্বলতা। আবার, কোন দেশে সন্তানের জন্মকালে শোকের প্রকাশ, মানুষের মরণে আনন্দ-উচ্ছ্বাস! দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। কিছু দূর দিয়ে লোকগুলি নেমে চলে যায়। বরও দেখি না, শবদেহও নেই। গিরমি আসে। কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি। শুনি, যাত্রার দল। নীচে থেকে এসেছিল উপরে কোন এক গ্রামের উৎসবে। এখন ফিরে চলেছে।

মনে পড়ে, সেই কলকাতার শহরে বসেও এককালে কতো যাত্রাগানের পালা শোনা। দৃশ্যপটহীন মঞ্চে মানুষের নিছক অভিনয়। মানব-হৃদয়ের সুখ-দুঃখের, ভক্তি-প্রেমের অথবা বীরত্ব-ব্যঞ্জক রসঘন ভাবের কৃত্রিম প্রকাশ। ভাবি. সুদূর হিমালয়ে প্রকৃতির এই রূপরাজ্যেও মানুষের আনন্দ-লাভের সেই একই প্রচেষ্টা। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে মানুষও স্বভাবতঃ রূপস্রষ্টা।

এগিয়ে চলি। এবার পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে সোজা পথ। কোথাও গাছপালা নেই। সেই রুক্ষ আবেষ্টনে পথের উপর ছোট গ্রাম। চৌবাস। মনে হয়েছিল পাহাড়ের অনেক উঁচুতে পেঁছেছি ; কিন্তু শুনি, চৌবাস মাত্র ৬,২০০ ফুট উঁচু। দলের সকলে এখানে মিলিত হই। গ্রামবাসীরা বৌদ্ধ। এ-পথে এই প্রথম বৌদ্ধ অধিবাস। গিরমি শেরপা। তাই বৌদ্ধধর্মী। এদের সঙ্গে জানাশোনাও। বলে, খোঁজ নেব ? এখানে ঘোল পাওয়া যেতে পারে। শীতের দেশ হলেও রোদের এখন তেজ আছে। তার উপর আহারের পরই ঘণ্টাখানেক পথ চলা। তাই সাগ্রহে ঘোলই পান করা হয়। কিন্তু তৃপ্তি আনে না। বড় বেশি জলীয় বোধ হয়।

আবার হাঁটা। বসলে তো পথের শেষ হবে না। এখনও ঘণ্টা পাঁচ-ছয় হাঁটা বাকি। রাত কাটানোর কথা রিসিংগোতে। নেড়া পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে রাস্তা চলে। ধীরে ধীরে আরও উঁচুতে ওঠে। তবু চলার কোন কষ্ট নেই। পশ্চিম থেকে পূব দিকে পাহাড়ের মাথা লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে। প্রায় সাত হাজার ফুট উপর দিয়ে চলি। পরিষ্কার সুনীল আকাশ। দূর দিগন্তে বরফের পাহাড়। প্রধানতঃ উন্নতশির ধুগল হিমল শিখর।

সকলে সানন্দে এগিয়ে চলি। তারপর শুরু হয় নামা। নামবার আগে গিরমিকে জিজ্ঞাসা করি, রিসিংগো কোন্ দিকে ?—ভাবি, পাহাড়ের এই মাথায় দাঁড়িয়ে হয়ত দেখা যাবে। গিরমি আঙুল দিয়ে দেখায়ও,—নীচে ঐ যে নদী,—এখন নামতে হবে তারই ধারে,—তারপর অপর পারে সামনের যে পাহাড় দেখছেন, তারই ওপর উঠলে রিসিংগো,—এখান থেকে ঘরবাড়ি দেখা যায় না, ঐ পাহাড়ের অপর দিকে কিনা।

কথাগুলি বলে যায় সহজভাবেই, যেন ঐ তো ঐখানে। কিন্তু তাকিয়ে দেখি সেই পাহাড়ের দিকে, ওখানে যে লোকজনের বাস থাকতে পারে বোঝাই

যায় না। ঘন বনভূমিতে ঢাকা। দূরে থেকে দেখায় যেন গাঢ় নীল রঙের আবরণে গা ঢেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এক দৈত্য। হেলে-পড়া সূর্যের ঘোলাটে আলোর কেমন যেন সেদিকে আবছা ভাব। মনে হয় এখান থেকে বহুদূর। তবে ভরসা এই, এখন একটানা নেমে চলা, এ পথ যেতে সময় নেবে না।

সাথীদের সঙ্গ ছেড়ে একাই নেমে চলি। নিঃসঙ্গ চলার অপূর্ব আনন্দ। আপন ভাবে মন মাতে। মনের গভীরে অজানা সুদূরে মধুর সঙ্গীত শোনায়, চরণে পথ চলার ছন্দ জাগায়। দেখতে দেখতে এই পাহাড়ের কাঁধ থেকে নেমে আসি। এদিকের গাছপালা কাছে আসে, যেন স্নিগ্ধ সবুজ স্বাগত জানায়। অরণ্যের আবেষ্টনে ঘুরে ঘুরে পথ আরও নেমেই চলে। অনেকক্ষণ চলবার পর পথের ধারে পাহাড়ের কোলে উন্মুক্ত একফালি সমতলভূমি দেখি। কয়েকটি চালাঘরও। পাশেই ঝরণা। আশেপাশে ক্ষেত। নিবিড় বনের ধারে স্বল্পতুষ্ট মানুষের সংসারআশ্রম।

সামনে দূরে অবারিত দৃষ্টি চলে। রিসিংগোর পাহাড তখনও গাঢ় নীলাভ। নীচে উপত্যকার নদীও তেমনি ক্ষীণকায়া। সম্মুখের যাত্রাপথের এখনও দূরত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই। পিছনে পায়ের শব্দে চমক জাগায়। ফিরে দেখি, গিরমি এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করি, সঙ্গীরা কতো দূরে ?—বলে, পাহাড থেকে নামবার মুখে আমিও ছেড়ে এসেছি। ধীরে ধীরে নামছেন।

রিসিংগোর পাহাড় দেখিয়ে বলি, সন্ধ্যার মধ্যে ওখানে পেঁাছনো যাবে তো ?

সে হেসে বলে, চললেই পেঁাছনো যাবে। ও আর কতটুকু ? ঐ তো !

প্রশ্ন করি, সাথীরাও এসে পেঁাছুবেন তো ?

গিরমি জানায়, তাঁরাও তো বলেছেন, ঐখানেই আজ রাতে থাকা। আর এই যে গ্রাম দেখছেন, এর পর তো আর থাকবার জায়গাও নেই। তা ছাড়া, রিসিংগোই এ-পথের 'পড়াও'।

অর্থাৎ, একদিনের যাত্রাশেষের আশ্রয়স্থল,—পথের ঘাঁটি।

ভাবি, তাহলে তাড়াতাড়ি চলাই ভাল। বেলাবেলি যদি পেঁাছনো যায়, দেখেশুনে থাকবার জায়গা ঠিক করা যাবে। গ্রামের একজন লোক এগিয়ে আসে। গিরমির সঙ্গে কথা বলে। আবার আমি একাই এগিয়ে যাই।

পথ চলার চিরন্তন ধর্ম, চলতে থাকলে পথের শেষ আসেই। একসময়ে নীচে নদীর ধারে নেমেও আসি। তবে, দীর্ঘ পথ। ঘুরে ঘুরে নামে। তাই, সময়ও বয়ে যায়। ঘড়ির কাঁটা দেখায়, তখনও বেলা আছে। কিন্তু, আকাশে সেকথা গোপন রাখে। প্রায় হাজার দুই ফুট নেমে এসেছি। এখন চারিপাশে উঁচু পাহাড়। যেন, নদীর ধারাপথের অন্দরমহল আকাশ-ছোঁয়া দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে চায়। পশ্চিমদিকের পাহাড় সূর্যদেবের আলোক-রশ্মি অবরোধ করে। যেন, অসূর্যম্পশ্যা এই গিরিতনয়া।

মনে হয়, সন্ধ্যা নামে। তার উপর, নদীর দুই কূলে বড় বড় গাছের জটলা। দিনের আলোটুকুর হাত থেকে তালপাকানো অন্ধকারকে বাঁচিয়ে নদীর বুকে আরও ঘন ছায়া ফেলে। কোথাও কোন জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, থাকবার কথাও নয়। শুধু উন্মত্ত নদীর উচ্ছল ধারার একটানা কলকল শব্দ,—আবছা অন্ধকারে কার যেন খিলখিল পিশাচী হাসি। নদীর উপর পুল। পার হতে দু'পাশে তাকাই। গা-ছমছম করে। ওপারে গিয়েও ঘন বন। পথও কেমন সরু দেখায়। কিসের ভয়ে যেন জড়সড়, সঙ্গোপনে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে চলে। আমিও নিঃসঙ্গ উঠে চলি। সারাদিন পথ চলা। দিনশেষে সামান্য চড়াইও দেহে ক্লান্তি জাগায়। ভাবনা হয়, সঙ্গীদের জন্য। কত পেছিয়ে আছেন, কি জানি! এ জায়গা যখন পার হবেন দিনের অবশিষ্ট ক্ষীণ আলোটুকুও থাকবে তো? না হলে, বনের ঘন ছায়ার মায়াজালে পথ হারানো বিচিত্র কি! তখনি আবার মনে পড়ে, পোর্টার পাঁচজন তো পিছনে আছে। ভাগনেও আছে।—নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে চলি। চড়াইও শেষ হয়। এ পাহাড়ের কাঁধের উপর পৌঁছুই। এতক্ষণে বোঝা যায়, বেলা এখনও যায় নি, এখনও এখানে বেশ দিনের আলো। মনের দুর্ভাবনাও মিলিয়ে যায়।

অল্প এগিয়ে পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই পথের ধারে দু-চারটে ঘর। ভাবি, নিশ্চয় রিসিংগো। যাক, দিনব্যাপী যাত্রা এতক্ষণে শেষ হল!

একটা বড় পিপল গাছের তলায় সেই রকম পাথর-বাঁধানো বসবার জায়গা। সেইখানে বসি। গিরমির অপেক্ষা করি। কি জানি, হয়ত সামনের ঐ ঘরগুলির একটাতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করবে। গতকাল এগিয়ে গিয়ে ফিরতে হয়েছিল।

অল্প পরেই গিরমি উঠে আসে। একমনে হনহন করে এগিয়ে চলে। ডেকে জিজ্ঞাসা করি, এই-ই তো রিসিংগো? কোথায় ওঠা যাবে?

বলে, চলে আসুন। আরও খানিক এগিয়ে।

অতএব, পিছন পিছন চলি। সে থামেই না। আরও কয়েকটা ঘর পার হই। আশ্চর্য হয়ে বলি, গিরমি, গ্রাম যে শেষ হয়ে এল? চললে কোথায়?

নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দেয়, চলে আসুন। এ-সব টামাঙদের বসতি,—ওখানে ওঠা চলবে না। গ্রাম পার হয়ে মনাস্ট্রি, সেইখানেই থাকবেন। পরিষ্কার জায়গা। আরাম পাবেন।

কথা শুনে মনে পড়ে টামাঙদের প্রতি শেরপাদের জাতি ও ধর্মগত অবজ্ঞার ভাব।

গ্রাম শেষ হয়। বড় রাস্তা ছেড়ে গিরমি ডান দিকে মাঠ ও ক্ষেতের মধ্যে ঢোকে। সামান্য এগিয়ে যেতেই পাহাড়ের একান্তে বৌদ্ধমঠ। পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড এলাকা। সিংহদ্বার পেরিয়ে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের মাঝখানে দোতলা প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির। সদর-তোরণের পাশেই একটা ছোট বাড়ি। সেইখানে লামাদের থাকবার ঘর। একজন লামা বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানান, মন্দিরের কপাট খোলেন। বিরাট হলঘর। চারিপাশের দেওয়ালে নানান বৌদ্ধ দেব-

দেবীর রঙিন চিত্র আঁকা। ঘরের একদিকে বুদ্ধদেবের মূর্তি। সম্মুখে বেদীর উপর দীপ জ্বলে। ধূপের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পাশের একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ঢাকা-বারান্দায় আমাদের নিয়ে চলেন। রাত্রিবাসের মনোরম আশ্রয়। সারাদিনের পথশ্রম সার্থক মনে হয়। একে দেবস্থান, তায় আবার হিমালয়ের শান্তিপূর্ণ প্রশান্ত পরিবেশ। মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

রিসিংগো ৬,২০০ ফুট উঁচু। মন্দির থেকে নেমে এসে মঠের এলাকার আশপাশও ঘুরে দেখি। পাঁচিলের বাইরে কয়েকটি বিশাল দেওদার গাছ। যেন, অরণ্যদেবের প্রতিনিধি। মন্দিরের দ্বাররক্ষী। দীর্ঘদেহ। শাখাপ্রশাখা যেন অস্ত্রশস্ত্র। স্থির মৌন আপন কর্তব্যনিষ্ঠ।

গাছের ডালপালার ফাঁকে হঠাৎ দেখি, পাহাড়ের মাথার পাশ দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। দিনের শেষ আলো চাঁদের জ্যোৎস্নায় মিশে যায়। দিগ্‌দিগন্তে সোনালী আলোর স্নিগ্ধ ছটা ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতি যেন স্বপ্নে বোনা মায়ার জালে পাহাড় ঘেরে। প্রাঙ্গনে লোকজনের স্বর শুনি। সঙ্গীদের এই স্বর্গরাজ্যে স্বাগত জানাতে বিপুল উৎসাহে এগিয়ে যাই। পোর্টারদের পাঁচজনকেই দেখি, কিন্তু তাঁরা কই? প্রশ্ন করে জানি, সেই নদীর ধারে তাঁদের সঙ্গে এদের ছাড়াছাড়ি। এরা এগিয়ে চলে আসে। তাঁরা ধীরে ধীরে আসছেন শুনি। আশ্চর্য হই। দুশ্চিন্তাও জাগে। সবাই চলে এল তাঁদের ফেলে। দু-একজন সঙ্গে থাকলেই পারত। নীচে সেই বনের মধ্যে আবছায়া পথ, এতক্ষণে অন্ধকার নিশ্চয় আরও গাঢ় হয়েছে, চাঁদের আলো সেখানে পেঁছনোর আশাও নেই। উপরন্তু গ্রামের নিকটে এসে দু-তিন দিকে রাস্তা গেছে,—এ-মঠও গ্রাম ছাড়িয়ে এসে, বড় রাস্তার উপরও নয়,—পথও এখন জনমানবহীন।—পথ চিনে সঙ্গীরা আসবেন কি করে? গিরমিকে বোঝাতে চেষ্টা করি। এসবের মর্ম সে বোঝে না। ভাবটা এই,—ভয়টা কিসের? ঠিক চলে আসবে, পথ হারাবে কেন? এগিয়ে আনতে লোক যাবার কোনই দরকার নেই।

আধ ঘণ্টা কাটে। তাঁদের দেখা নেই। গিরমি জিনিসপত্র গোছগাছ করে। সকলের বিছানা খুলে পাতে। রান্না চড়ায়। চায়ের জল গরম করে রাখে। সব কিছু নিখুঁতভাবে করে, শুধু তাঁদের আসার এই বিলম্বের জন্যে তার কোন ভাবনাই দেখি না। কথার ফাঁকে প্রকাশ পায়, তার একমাত্র দুশ্চিন্তা, —এখন এত সোজা পথ, এখানেই এইভাবে দেরি করে ধীরেসুস্থে চললে,— নামচে পেঁছুবে কি করে? এখনও তো বড় বড় চড়াই আসেই নি।

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, আমরা সমতলের মানুষ, পাহাড়ে এসে চলায় অভ্যস্ত হতে দু-তিনদিন প্রথম যায়ই। তা ছাড়া যেভাবে আমরা হাঁটতে পারি, সেই ভাবেই হাঁটব। দু-চারদিন তাতে বেশি লাগে, লাগবে,—উপায় কি! শেষ পর্যন্ত সকলেই ঠিকমত পেঁছুব ঠিকই।—এখন আপাততঃ এগিয়ে গিয়ে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার একান্ত দরকার;—এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে, আমরা এসেছি।

অগত্যা, দুজন পোর্টারকে সঙ্গে নিয়ে গিরমি যায়। উদ্বেগ নিয়ে আমি অপেক্ষায় থাকি। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তারা এসে পৌঁছান। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

মণি ও ভক্তি দুজনেই স্বভাবতঃই বিরক্তি প্রকাশ করেন,—দাদা, লোকগুলো কী রকম? সবাই ফেলে চলে এল? একজনও থাকল না সঙ্গে? গিরমিরও কি দায়িত্বজ্ঞান নেই? দুদিনেই কি পাহাড়ে হাঁটবার অভ্যেস ফিরে আসে? ধীরে ধীরে আসতেই তো হবে,—তার ওপর এতখানি লম্বা পথ! আবার শেষের দিকেও চড়াই! ওদিকে অন্ধকারও হয়ে গেল। ভাগ্যিস ভাগনেটা সঙ্গে ছিল। কি রকম মানুষ এরা? এদেরই ভরসায় চলতে হবে?

প্রকৃতই ভাবনার কথা।

আহারান্তে সকলে শয্যাগ্রহণ করি। সঙ্গীদের ভারাক্রান্ত মন। তবুও ক্লান্ত দেহে নিদ্রা আসে। বারান্দার কাঠের দেওয়ালের জালিপথে চাঁদের কিরণরাশি প্রবেশ করে। সবারই গায়ে আলোছায়ার ডুরে-কাটা সোনালী চাদর বিছায়, যেন ঘুমন্ত শিশুর দেহে শীতের রাতে সন্তর্পণে জননী এসে সযত্নে ঢাকা দেন। শুয়ে শুয়ে খোলা জানলাপথে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। হিমালয়ের নিঝুম নিস্তব্ধ রাতের জ্যোৎস্নাময়ী শান্ত মূর্তি। আনত নয়নে স্নেহ-কোমল দৃষ্টি ফেলে।

ভাবি, মনের প্রশান্তিই বুঝি এই রূপের আলোক ধরতে পারে;—অশান্ত বিক্ষুব্ধ জলে ছায়া পড়ে না।

৩০শে সেপ্টেম্বর। হিমালয়ের আবহাওয়ার অপরূপ প্রভাব। পথ চলায় ক্লান্তি আসে, অথচ মন আনন্দে ভরে ওঠে। এ-যেন হৃদয়ের সমুদ্র-মন্থন। দেহের গরল উথলে পড়ে, অমৃতের স্বর্ণভাণ্ড উঠে আসে। ক্ষণিক বিশ্রামেও ক্লান্তি হরণ করে। সারাদিনের পথশ্রান্তির পর রজনীর দীর্ঘ বিশ্রাম যেন নতুন জীবন আনে। প্রথম সূর্যের আলো শীতের প্রখরতায় মাধুর্য ঢালে। দিগন্ত হাসে। দূরের পাহাড় মাথা তুলে ডাকে। বিগত দিবসের দেহের অবসাদ, মনের সব গ্লানি পথ চলার আনন্দের স্পর্শে কোথায় অদৃশ্য হয়,—যেন রাতের তারা দিনের আলোকে লুকায়। সঙ্গীরা আবার নবীন উৎসাহে সাজগোছ করেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে তোলেন। গিরমিকে সাগ্রহে ডেকে পরামর্শ করেন, আজ কতো দূর যাওয়া? দুপুরের খাওয়াই বা কোথায়? কাল দুপুরে স্নান হয় নি,—আজ হবে তো?

আবার পথ চলা শুরু হয়। সাদরে পথও যেন সহজ হয়ে সুমুখে বিছিয়ে থাকে। পাহাড়ে গা দিয়ে সোজা পথ। খানিক গিয়ে নামতে থাকে। উৎরাই শেষে গ্রাম। পার্বত্য দেশে মানুষের বাস। তাই তার প্রয়োজন মেটাবারও অশেষ প্রয়াস। পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে ক্ষেত। কঠোর-হৃদয় পর্বত-দেবতাও উদারতা দেখান। ঝরণার ধারা পাশেই বহান। পথের বাঁকে সমতল-ভূমি। তারই কোলে লম্বা পাকা বাড়ি। প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুমুখের মাঠে

সার বেঁধে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে। শিক্ষক ড্রিল করান। বিদেশী যাত্রী দেখে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। প্রভাতের নির্মল সূর্যালোকে কচি কচি ফুটফুটে ছেলেগুলির সকৌতুক চাহনি উজ্জ্বল দেখায়। ভোরের আলোয় একরাশ ফুল ফুটে ওঠার আনন্দ বিলায়।

এতদিনে নেপালের গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রবর্তনের আয়োজন দেখে মনে পরিতৃপ্তি আসে। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে দেখি। আবার চলা শুরু করি। উৎরাই শেষ, তাই সুমুখেই আবার চড়াই। এই যাত্রাপথের দেখি, এই-ই রীতি। উঠলেই নামা, নামলেই ওঠা। ধাপের মত পথ উঠে যায় পাহাড়ের গা বেয়ে। আমারও গতিবেগ কমে। ধীরে পা ফেলে উঠি। অবিরাম চলার ফলে অনেকখানি উঠেও আসি। পথের পাশে প্রকাণ্ড পিপল গাছ। দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা বার্ধক্যের পরিচয় দেয়। এখানেও গাছের গুঁড়ির চারিপাশ ঘিরে বাঁধানো। ছায়াতলে শ্রান্ত পথিকের ক্ষণিক বিশ্রামের আমন্ত্রণ। নেপালের পাহাড়ে চলার পথে এ-ব্যবস্থা বহুস্থানেই দেখি। এগুলিকে চৌতারা বলে শুনি। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাই। দূর দিগন্ত জুড়ে পাহাড়ের শ্রেণী। নীচে নদীর উপত্যকা। ফেলে-আসা পথের রেখা। সেই গ্রাম। সেই স্কুল। সেই ছাত্রের দল। ড্রিল-শেষে এখন মাঠে ঘোরে-ফেরে। দেখায় যেন পিপীলিকার সারি।

গাছের ছায়াতলে বিশ্রামরত তিনজন নেপালী পথিক। একজনের পরিচ্ছন্ন বেশভূষা। বোঝা যায়, শহরের ছাপ। সে এগিয়ে এসে হিন্দীতে প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছি?—'নামচেবাজার' শুনে অবাক হয়। বলে, সে কি এখানে? বহুদূর, পারবেন যেতে? ব্যবসা করতে চলেছেন বুঝি? ঘর কোথা?

হেসে বলি, ব্যবসা? হাঁটা। হিমালয়ে তোমাদের দেশ দেখতে আসা। বাড়ি? কলকাতায়।

শুনে চমকে ওঠে। একমুখ হাসি নিয়ে চোখ কুঁচকে ঘাড় নেড়ে আমাকেও চমকে দেয় পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে,—আচ্ছা! কলকাতা থেকে আসছেন? বাঙালী? আমারও দেখেই তাই সন্দেহ হয়। এত দূর দেশে চলে এলেন? সেই নামচে যাবেন,—শুধু বেড়াতেই? আশ্চর্য! থাকেন কোথায় কলকাতায়? একাই এসেছেন?

এক নিশ্বাসে অনেকগুলাই প্রশ্ন করে।

অবাক হয়ে বলি, সুন্দর বাংলা শিখেছ তো? কলকাতায় থাকতে বুঝি?

সেইখানেই তো চাকরি করি। ছুটিতে ঘর গিয়েছিলাম। এখন এই ফিরে চলেছি আবার কলকাতায়। সেখানে বাড়ি কোন্ পাড়ায় আপনার?

ভবানীপুরে। চেনো? চাকরি কর কোথায়? বড়বাজারে নাকি?

ভবানীপুর! খুব চিনি। ঐ তো কালীঘাট যাবার পথে। আমার চাকরি? কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! নেপালে সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে হঠাৎ এই নাম শুনে বিগত কতো দিনের কতো কথাই মনে পড়ে। যেন, ভুলে-থাকা আপন

দেশের কথা শুনি। অপরিচয়ের যেন সব আবরণ সরে যায়। চেনা লোককে হঠাৎ দেখে না চিনতে পারার পর যেন চেনার আনন্দ।

সঙ্গীরা এসে পড়েন। মণি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি দাদা, দাঁড়িয়ে? আপনি তো চলা শুরু করলে দাঁড়াতেই চান না! এ-লোকটার সঙ্গে জমিয়ে কথা বলছেন,—ব্যাপার কি?

ইউনিভার্সিটিতে কাজ করে শুনে মণিরও সানন্দ কৌতূহল হয়। প্রশ্ন করে, কোন্ দপ্তরে আছ?

রেজিস্ট্রার সাহেবের—

নাম উল্লেখ করে বলি, অমুকের দপ্তরে তা হলে?

লোকটি মহাখুশী হয়ে বলে, চেনেন আপনারা?

মণি হেসে মন্তব্য করে, চিনবেন না ইনি?—আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। লোকটি আরও আশ্চর্য হয়,—আপনি? এখানে? আপনাদের বাড়ির অনেককেই চিনি। আপনাকে তো ইউনিভার্সিটিতে কখনো দেখি না, তাই চিনতেও পারি নি।

ভাবি, আশ্চর্য মানুষের গতিবিধি! সুদূর হিমালয়ে নেপালে কোন্ নিভৃত অঞ্চলের বাসিন্দা। কলকাতার কর্মচঞ্চল শহরে সে ছোটে জীবিকার্জনের আকর্ষণে। আবার, আজন্ম কলকাতা নিবাসী আমি কোলাহলমুখর সেই শহর ছেড়ে হিমালয়েরই সুদুর্গম পথে পথে ঘুরি,—কিসের সন্ধানে, কি জানি!

দূর প্রবাসে আপন দেশের লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের অপর এক ঘটনা মনে পড়ে। শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রকুমার বসু ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের নাম-করা বড় উকিল। যেমন রাশভারী চেহারা তেমনি মেজাজও। নির্ভীক স্পষ্টভাষী। সকলেই শ্রদ্ধা করতেন, আবার অনেকে সভয়ে দূরেও থাকতেন। অথচ, আমরা জানতাম, তাঁর হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। তিনি থাকতেন ভবানীপুরে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়িতে। একবার ছুটিতে তিনি সেই সুদূরে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকাতে বেড়াতে যান। হঠাৎ সেখানে আর এক ভদ্রলোক নরেন্দ্রবাবুকে দেখে এগিয়ে এসে অভিবাদন করেন,—আপনি এখানে! নরেন্দ্রবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, চেনেন নাকি আমাকে? আমি কিন্তু আপনাকে এখনও ঠিক চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, স্যার, চিনবেন কি করে আমাকে? পরিচয় তো কখনো হয় নি। আমি থাকি ভবানীপুরে আপনার বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িটাতে।

নরেন্দ্রবাবু প্রাণখোলা অট্টরবে হেসে ওঠেন, বলেন কি মশাই! পাশের বাড়ির লোক,—পরিচয় হল এই কেপ্ কমোরিন্-এ এসে!

আবার পথ চলা। কখনো চড়াই ওঠার দীর্ঘশ্বাস, কখনো বা সমতল সহজ পথে স্বচ্ছন্দে চলার উল্লাস। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। বাঁ দিকে পাহাড়ের

উঁচু গা। ডান দিকে নীচে গড়িয়ে যাওয়া ঢালু জমি। তারই বহু নীচে দেখা যায় পাহাড়ী নদীর সর্পিল রেখা,—সবুজ বনময় উপত্যকা।

বেলা বাড়ে। পথের পাশে কয়েকটা চালাঘর। আশেপাশে স্তরে স্তরে চাষের জমি। গিরমি বলে, এইখানেই আজ দুপুরের খাওয়াদাওয়া। গ্রামের নাম ধাধিং।

মণি বলে, আজ বলেছিলে ঝরণা পাব, নাওয়া চলবে?

গিরমি জানায়, ঘরের পিছন দিকে খানিক উঠলেই ঝরণা।

চালাঘরের দাওয়ায় আশ্রয় নেওয়া হয়। তার একটা বাড়ির ঘরের ভিতর গিরমি রান্নার ব্যবস্থা করে।

নির্মল আকাশ রৌদ্রের প্রভায় স্বচ্ছ রূপালী রেশমী চাদরে মোড়া। পাহাড় পর্বত—তারই দীপ্তিতে ঝলমল করে। রোদে বসে দেহে তাপের স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলাই। একে একে স্নানের উদ্দেশে জলের সন্ধানে চলি। গিরমি দেখায়, ঘরের পিছন দিকে কোথায় যেতে হবে। নির্দেশ অনুযায়ী যাইও। বলে, এই পিছনেই। কিন্তু, চলি তো চলিই। পাহাড়ের গা বেয়ে একটু চড়াইও উঠতে হয়। অবশেষে আরও দু-তিনখানা ঘর দেখি। সেগুলি ছাড়িয়েই ঝরণা। জল পরিষ্কার। কিন্তু কুটিরবাসীদের কল্যাণে ঝরণার ধারে নামতে সংকোচ জাগে,—চারিপাশে নোংরা, দুর্গন্ধ। অগত্যা আরও এগিয়ে যাই। আরও একটি ধারা পাই। সেইখানে পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্নান সারি। দেহ-মন প্রফুল্ল হয়।

দুপুরে আহারান্তে ক্ষণিক বিশ্রাম। তারপর,—আবার পথে নামা। গিরমি জানায়, এখন একটানা হাঁটা—সারা দিন কাটবে রাতের আশ্রয়ে পৌঁছুতে।

ভাবি, হলই বা তাই,—পথ চলতেই তো পথে নামা।

সরল সহজ পথ যেন হাসিমুখে হাত ধরে এগিয়ে নিযে চলে;—একটানা নামতে থাকে নীচে নদীর ধারে। পাহাড়ী বড় নদী। এবার তারই তীর ধরে পথ। বাঁ দিকে মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণার ধারা নামে। কলকল ছলছল শব্দ তুলে এগিয়ে যায়। নদীর জলে মেশে। ঝরণার উপর কাঠের পুল। একটা বড় ঝরণার উপরের পুল ভেঙেছে, ভাঙাচোরা ছড়ানো কাঠ। সম্ভবত গত বর্ষার প্রকোপের চিহ্ন। অগত্যা পথ ছেড়ে ঝরণার বুকে নামতে হয়। বড় বড় পাথর, তারই আশপাশে ঘিরে ঘিরে চলে জলের ছোট ধারা। কোন রকমে লাফিয়ে জুতো বাঁচিয়ে পার হই। ওপারে পৌঁছে পিছন ফিরে তাকাই। সঙ্গীদের দেখা যায় না। আবার পথ ধরি। বড় নদীর ধার দিয়ে আরও খানিক এগিয়ে যাওয়া। অপর পারে বড় গ্রাম দেখা দেয়। এপারের পথ একসময়ে নদীর বুকে নেমে হারিয়ে যায়। যেন, মায়ের কোলে উঠে বুকের আঁচলের আড়ালে সলজ্জ শিশু মুখ লুকোয়। নদীর বালুকাময় প্রশস্ত চর। তারই উপর দিয়ে সবেগে নেমে চলে জলের বিভিন্ন নীল ধারা। হলুদবরণ শাড়ির উপর টানা নীল ডুরে কাটা। গিরিরাজের

আদরিণী নন্দিনী। পিতৃগৃহে হেলেদুলে উম্বেলিত আনন্দে চলে।

চারিপাশে তাকাই। পুল কই? অথচ, একটি ধারার গভীরতা আছে, সন্দেহ হয়। হঠাৎ নজর পড়ে, নদীর দুই পাড়ে ভাঙা পুলের চিহ্ন। সেখানে নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জল। গাঢ় সবুজ। ভাবি, পার হই কোনখান দিয়ে? গিরমি আসুক। কিন্তু, অপেক্ষা করতে হয় না। কিছু দূরে, যেন পথ দেখাতে, ওপারের গ্রামের দুজন লোক নদীর জলে নামে, ঘুরেফিরে সহজেই পার হয়ে আসে,—সেদিকে হাঁটুজল। জুতো-মোজা খুলে আমিও সেইখানের জল ভেঙে অপর পারে চলি। সেখানে জলের ধারে বালির উপর বিশালকায় কালো পাথর। যেন গ্রামের বাঁধানো ঘাট। তারই উপর আরামে বসি। রোদে ভিজা পায়ের জল শুকায়, শুকনা বালি ঝরে পড়ে। চারিদিকে হিমালয়ের শোভা উপভোগ করি। সঙ্গীদের অপেক্ষার অজুহাতে শ্রান্ত দেহও বিশ্রাম পায়।

কিন্তু অল্প পরেই চরণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবি, কি হবে অযথা বসে থেকে? ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। গ্রামের মাঝখান দিয়ে পথ। দুপাশে সারি সারি ঘরবাড়ি। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নাম,—ফেদি। ৫,০০০ ফুট উঁচুতে। লোকজন ঘোরে-ফেরে। কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে আমার দিকে। গন্তব্য পথের সন্ধান নিই। একজন আঙুল তুলে দেখায়, সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে ঐ উঠে গেছে। তখন শুনি, 'ফেদি' মানে চড়াই আরম্ভ হবার নীচেই।

আবার চড়াই! ভাবি, তা হোক, নদীর ধারে নেমেছি যখন, উঠতেই হবে। কিন্তু, সঙ্গীরা আসুক আগে,—রোদের যা তেজ! গ্রাম ছাড়িয়ে একটা বড় গাছের ছায়ায় সুন্দর কালো পাথর,—যেন সাদরে নিকটে ডাকে। এগিয়ে আরামে তারই উপর বসি। গাছের ডালগুলি সবুজ পাতার পাখা দুলিয়ে বাতাস করতে থাকে। কী স্নিগ্ধ মধুর হওয়া! শ্রান্ত দেহের উপর কার যেন স্নেহময় কোমল স্পর্শ। মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। কোথায় লাগে সভ্য জগতের বৈদ্যুতিক পাখা! তার হাওয়ার মধ্যে কেমন এক হৃদয়হীন উদ্ধত অহমিকা,—যেন, দাম্ভিক ধনীর হাতের দান!

কোথা দিয়ে সময় বয়ে যায়,—ঐ স্বর্ণময় বালুপথে নদীর স্বচ্ছ ধারার স্বচ্ছন্দ গতির মতন।

সঙ্গীদের দেখা যায়। নিকটে আসেন। এ কী! মণির মুখ গম্ভীর! বিরক্তিতে ভরা। এগিয়ে এসে বলে, দাদা, আচ্ছা গাইড সঙ্গে আনা গেছে! এভারেস্ট-হিরো শের্পা! লোকটা কোন কাজেরই নয়, কোন সাহায্যেই আসে না। সঙ্গে সঙ্গেও থাকে না। মস্ত ভুল হয়েছে এই একটা এক্সপার্ট শের্পা এনে। এখন তো সারা পথই বাকি। একে দিয়ে কোন কাজই পাওয়া যাবে না। দেখুন না কাণ্ডটা!

দেখে সত্যই চমকে উঠি। মণির প্যান্ট, জামার এক অংশ ভিজে জবজবে। হাতে ক্যামেরার ব্রাউন চামড়ার কেস-ও জলে ভেজা,—কালচে স্যাঁতসেঁতে!

ব্যাপারটা সব শুনি। সেই পুল-ভাঙ্গা ঝরণা। গিরমি সেখানে পথের দুরবস্থা দেখেও দাঁড়ায় নি,—এগিয়ে এসেছে। মণি তখন একাই আসছিল। জল পার হতে গিয়ে পেছল পাথরে পা হড়কে জলের ওপর পড়ে। পিঠে তার নিজের রুকস্যাক, এক কাঁধ থেকে ঝুলছে এক ক্যামেরা, এক হাতেও আর এক ক্যামেরা,—'মুভি'। এই লটবহর নিয়ে অমন জায়গায় বিপর্যয় ঘটা আশ্চর্য কি! ভাগ্যক্রমে ঝরণায় সামান্যই জল, তাই জামাকাপড়, ক্যামেরাই ভিজেছে। কিন্তু ভাবনা,—এত কষ্ট করে ছবি তুলতে তুলতে আসা,—ক্যামেরার মধ্যে ফিল্ম নষ্ট হয়ে থাকলেই, গভীর আপসোসের ব্যাপার।—ঝরণা পার হয়ে এসে গিরমিকে দেখতে পায়, তাকে নিজের দুরবস্থা দেখায়,—কিন্তু সে কোন কথাও বলে নি, দেখে দুঃখ উদ্বেগ বা অনুশোচনার কোন ভাবও মুখে তার প্রকাশ পায়নি! শুধু তাই নয়। তার পরেই সেই নদী পার হওয়া,—সেখানেও গিরমি নিজে পার হয়ে অপর পারে চলে যায়, কোথা দিয়ে পার হতে হবে, তা দেখানো বা কোন রকম সাহায্য করার জন্যে অপেক্ষাও করে নি। ভাগ্যক্রমে এক পাহাড়ী এসে পড়ে, সেই আপনা থেকে এগিয়ে এসে পথ দেখিয়ে জল পার করায়।

মণি বলে, গ্রামে ঢুকে দেখি গিরমি কার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আমি আর ওর দিকে তাকাইও নি, কিছু বলিও নি। কি বলব বলুন! একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন।

শুনে আশ্চর্য হই। পাহাড়ের সর্বত্রই—বিশেষতঃ গাড়োয়ালের পথে—দেখা যায় পোর্টাররা ত বটেই, সাধারণ পাহাড়ীরাও বিদেশী যাত্রীদের নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বিপথে বা দুরূহ পথে সাহায্য করে। গিরমি গাইড,—এসব করার জন্যই তার সঙ্গে আসা। গিরমিকে কদিন ধরে যেটুকু দেখেছি, লোকটা মোটেই খারাপ নয়। চালচলন ব্যবহারেও ভদ্র। কথাবার্তাও যেটুকু বলে তাও সভ্য। সহজ বুদ্ধিও ধরে। তবু, কেন এমন হল? অবশ্য, চলা শুরু করা অবধি তার হাবভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পায়,—আমাদের হাঁটার বেগ সম্বন্ধে সে সন্তুষ্ট নয়। কয়েক বারই মন্তব্য করেছে, এভাবে চললে নামচে পৌঁছানো যাবে কি করে?—অথচ, এ দুদিনই তারই করে-দেওয়া পূর্ব প্রোগ্রাম অনুযায়ী দিনের শেষে নির্ধারিত রাত্রি-বাসের স্থানেই রাত কাটানো হয়েছে। কিন্তু তার সে-মনোভাব এরকম কর্তব্যহানির কারণ হতে পারে না। হঠাৎ অভিনব এক হেতুর সন্ধান যেন পাই। ঘটনাটির গুরুভার হালকা করার উদ্দেশ্যে মণিকে সেই কথাই হাসতে হাসতে জানাই,—ঠিকই বলেছ মণি, যা পথ দেখছি এত প্রসিদ্ধ শেরপা আনার প্রয়োজনই ছিল না, অবশ্য পরে এর সাহায্যের দরকার কতখানি হতে পারে, এখন জানা নেই। তবে, এখানে লোকটা কেন এরকম করল তার একমাত্র গূঢ় কারণ আমার মনে হয় কি জান? আমরা যেটা এর কর্তব্য মনে করছি, এর ঠিক সেইখানেই জ্ঞানটা নেই। তোমাদের ডাক্তারীশাস্ত্রে বলে শুনি, মানুষবিশেষের চোখের **blind spots** থাকতে পারে নাকি,—সবই ঠিক দেখে, তবু হঠাৎ দু-একটা দৃষ্টিকোণে কিছুই

ধরা পড়ে না। গিরমিরও মনে হয়, হয়েছে তাই। এভারেস্ট-অভিযানে অভিজ্ঞ শেরপা, আমরাও চলি সেই এভারেস্টেরই দিকে,—অবশ্য মাথায় নয়, পায়ের তলায়। তবু, এর হয়ত ধারণা, যারা চলেছে সেই অঞ্চলে, তাদের আবার এইখানে এই সামান্য ঝরণা বা নদী পার হতে সাহায্যের কথাই ওঠে না, —ওর কাছে এটা কিছুই নয়, তার কর্তব্যের ত্রিসীমানাতেই আসে না।

মণি মুখ ঘুরিয়ে হেসে বলে, যাই বলুন দাদা, ওকে আনাটা ভুল হয়েছে,—সামলাতে হয় ওকে, সামলাবেন আপনি।

আমি পাহাড়ে ঘুরি নিশ্চিন্ত মনে, নির্ভাবনায়। কারও উপর কিছু আশাও রাখি না, আশাভঙ্গের কারণও ঘটে না। তাই কাউকে সামলাবার দায়িত্বও থাকে না। অথচ, দল বেঁধে গেলে এ-সবের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু কখনও সঙ্গী আমার কেউ থাকলে সে ভার তিনিই নেন, এখানে কর্মা মণিই সব করছে।

তাই, আবার হেসে বলি, চল, ও-সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমিই ওকে সামলে নেবে।

তখন কি আর জানি, ঘটনার বিবর্তনে আগামীকাল থেকেই আমিই হব এপথে গিরমির একমাত্র সঙ্গী অভিযাত্রী!

মণি চিন্তিত বিমর্ষ মুখে বলে, দাদা, আপনি যেমন চলছিলেন চলুন। আমরা একটু পরে ধীরে ধীরে যাব। দেখি একবার ক্যামেরাটার কী দুর্দশা হল!

আবার একাই এগিয়ে চলি। প্রথম দিকে অল্পই চড়াই। তারপর ধীরে পথ উঠে চলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে সমতল পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়। কিন্তু ক্রমশঃ উঠেই যে চলেছি বোঝা যায় ডান দিকে নীচে নদীর পানে তাকালেই। নদী ক্রমে শীর্ণ দেখায়, তীরের গাছপালাও ঝোপঝাড়ের রূপ নেয়। নির্জন পথ। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিম্নগতি পাহাড়ী নদীর একটানা জলধ্বনিও আর কানে আসে না। পথের দু পাশে গাছপালাও বিরল। রৌদ্র-দীপ্ত পথকে যেন সঙ্গ দিতে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসে এক উচ্ছলিত ঝরণাধারা। তার কাছে এসে পথ কিন্তু হঠাৎ মুখ ঘোরায়! সরাসরি পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল ভঙ্গিতে উঠে চলে। এবার খাড়া চড়াই। দু পাশে বড় বড় গাছের ঘন বন। পথের উপর কালো ছায়া পড়ে। বনের মধ্যে হলেও পথ ভোলার আশঙ্কা নেই। এই একটিই পথ। প্রশস্তও। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথাও গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যায়, যেন বন্ধ ঘরের ঈষৎ জানলা খোলে। দু'পা এগোতেই আবার তখনি বনে ঢাকা পড়ে। যেন, সুদূর ও নিকট লুকোচুরি খেলা করে। আমিও অজানা কিসের ভাবে বিভোর হয়ে চলতে থাকি। এই জনহীন পথের একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ মানুষ দেখে চমকে উঠি। আগে আগে এক পাহাড়ী চলে। অতি মন্থর গতি। মাথায় কালো নেপালী টুপি। পরনে নেপালী পোশাক,—যোধপুরী ব্রিচেস্-এর

মত পা-জামা, গায়ে কালো কোট। সবই কেমন মলিন ধুলিময়। পিঠে ছোট্ট ঝোলা। ঝরা পাতার উপর আমার পায়ের শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকায়। আনমনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাছে যেতে দেখি, নেপালী যুবা। রোগা শরীর। ফরসা রঙ। মুখে সামান্য গোঁফ-দাঁড়ির রেখা। চোখের নীচে কালি-পড়া। কেমন এক করুণ চাহনি। বিষণ্ণ বদন। চুপ করে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়। পাশ কাটিয়ে যেতে আমার পা যেন আপনা থেকেই থেমে আসে। ভাবি, অসুস্থ নাকি? সহানুভূতি প্রকাশ করে মৃদু হেসে কথা বলতে যাই। ঝরঝর করে চোখ ফেটে তার জল নামে। ব্যাপার কি? ছেলেটার হয়েছে কি? জিজ্ঞাসা করি, কোথায় চলেছ?—আঙুল দিয়ে দেখায়, পাহাড়ের উপর দিকে, যেদিকে আমিও চলি। বলি, অসুখ হয়েছে নাকি?—নেপালী ও হিন্দী ভাষা মিশিয়ে কথা বলে। কাঁদতেও থাকে। সব কথা বুঝি না। তবে তার গভীর শোকের কারণ জানা যায়। নীচে গ্রামে শ্বশুরবাড়ি। মাত্র কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছে। বৌয়ের অসুখের খবর পেয়ে সেখানে দেখতে যায়। কদিন আগে স্ত্রী মারা গেছে। এখন ফিরে চলেছে নিজের গ্রামে। ঝরঝর করে দু গাল বেয়ে চোখের জল নামে। পথে-দেখা অপরিচিত একজন মানুষের কাছে মনের গভীর শোক নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করে। বিয়োগব্যথাতুর সরল গ্রাম্য মানুষ। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে করে মানুষের দুঃখ মানুষই বোঝে। সহানুভূতি মানব-মনের স্বাভাবিক রীতি। যেমন দুর্গম পথের উপর বনের এই ছায়া। শিলাময় কঠিন পথে নামে ঐ সুনীল স্বচ্ছ ধারা। ক্লান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করে হিমাঞ্চলের এই স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া। তাই, প্রকৃতির হাতে-গড়া সহজ মানুষ অপরের কাছেও অকপটে আপন অন্তরের গোপন ব্যথা ব্যক্ত করে।

হঠাৎ মনে পড়ে কলকাতা শহরবাসী এক ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব।

অনেকদিন আগের ঘটনা। সেই ভদ্রলোককে চিনতাম। কলকাতার অনেকেই তাঁকে জানতেন। সবঘটেই তাঁকে দেখা যেত। যেমন চেহারা, তেমনি নামও। একবার দেখলে ভোলবার উপায় নেই;—নামও নয়, চেহারাও নয়। কলকাতার খাস বাসিন্দা। পরনে পাতলা কোঁচানো কালাপাড় ধুতি। মাটিতে কোঁচা লুটোয়। পায়ে কালো চকচকে পাম্পসু। গায়ে পাতলা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। দু হাত গিলে-করা। গলায় ধবধবে সাদা কোঁচানো পাতলা চাদর। রিং-এর মত গোল করে গলায় জড়ানো, বুকের কাছে ফাঁস দেওয়া। প্রকাণ্ড গোলাকার মুখ। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। বড় বড় চোখ,—ভাঁটার মত। ড্যাবড্যাব করে তাকান—এদিক ওদিব চোখের তারা ঘোরে। বড় নাকও চ্যাপ্টা। ফোলা গলা। চেটাল চোয়াল। কথিত ভাষায় যাকে বলে, হাঁড়ির মতন মুখ। কিন্তু, ঠিক তা নয়;—জীবন্ত চোখের জ্বলন্ত চাহনি,—বাঘের মত। নামও তাই। সকলে ডাকে, বাঘাবাবু! ঘাড়ে-গর্দানে তেমনি বিশাল দেহ। হাতের চেটো,—বাঘের থাবা। সেকালের কলকাতার

গণ্যমান্য অনেক বড়লোকের আসরে তাঁর গতিবিধি। প্রচুর খাতিরও। এর বিশেষ কারণও থাকে। বাঘাবাবু পারেন না এমন কাজ নেই। যে কোন জটিল বা গুপ্ত কাজ উদ্ধার করতে হলেই ডাক পড়ে বাঘাবাবুর। আসেনও তখনি সোৎসাহে বিরাট মুখে হাসির লহরি তুলে। কাজও ঠিক উদ্ধার হয়। যেন, সিদ্ধিদাতা গণেশ। একবার তাঁদের পাড়ায় সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে সে কী প্রচন্ড চাঞ্চল্য! পুজা শেষ, তবুও প্রতিমার নিরঞ্জন হয় না। হবে কি করে? জীবন্ত দেবীকে কি বিসর্জন দেওয়া চলে? সরস্বতীর বুকের মালা সারাক্ষণই দোলে। বাতাস নেই, দোলবার অপর কোন কারণও নেই, তবুও মালা দুলছে। শুনি, কাতারে কাতারে শহরের লোক ছোটে দেখতে। বড় বড় মোটরও এসে দাঁড়ায়। প্রণামীও পড়ে থালা উপচে। বাংলা দৈনিক কাগজেও খবর বার হয়। শহরময় উদ্দীপনা। তারপর, হঠাৎ একদিন সব চুপচাপ। শোনা যায়, রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেছে। লম্বা সরু ইলেকট্রিক তার মালায় লাগিয়ে পিছনের কোন্ এক ঘর থেকে এই প্রহসন চলেছিল! অনেকেই মুখ টিপে হেসে বলেন, এ বাঘাবাবুরই কীর্তি।

বাঘাবাবু কিন্তু স্বীকার করেন না। হাসেন।

এ-হেন বাঘাবাবুকে হঠাৎ একদিন দুপুরে দেখি, হাইকোর্টে উকিলদের বসবার বড় হল্-এ দেখেন। হলের বিরাট দরজা, তারই মুখে সেই বিশাল দেহ। দেখা মাত্রই চারিদিক থেকে রব ওঠে, আরে! বাঘাদা! আসুন, আসুন—এখানে কি ভেবে?—অনেকে উঠে গিয়ে ঘিরে ধরে। সেই প্রকান্ড মুখে তেমনি স্ফূর্তি। বড় বড় চোখে তেমনি ঘূর্ণিত চাহান। হাসি মুখে সবারই সঙ্গে কথা বলেন। থাবা তুলে পিঠ চাপড়ান। দূর থেকে আমাকে দেখে চোখ টিপে ইশারা করেন। কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসেন নিকটে। চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ান। দু-চারজন ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করেন, আছেন কেমন বাঘাদা?

ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে বলেন, খাস্-আ! চ-ম-ৎ-কা-র! তোরা আছিস ভাল তো? চল্—যাচ্ছি ওদিকে।—তাঁরা সরে যেতেই মাথা নামিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, মুখুজ্যে মশাই! খাসা থাকব না তো কি? কাল ছাব্বিশ বছরের ছেলেটা গঙ্গায় চান করতে গিয়ে তলিয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল—এখনও লাশ পাওয়া যায় নি—তারই খোঁজে ঘুরছি।—দরকার কি জানিয়ে লোকেদের?

চক্ষের নিমেষে সেই বিরাট দেহ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে চলে যান। কানে আসে আবার চারদিকে ডাক,—ও বাঘাদা! এই যে,—এদিকে!—আর বাঘাবাবুর মুখে সেই হাসির শব্দ!

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। ভাবি, মানুষের প্রকৃত অন্তর চেনে সাধ্য কার? এ শুধু অতল-সমুদ্রের তীরে বসে দেখা, বালুচরে ভেঙে-পড়া তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস!

পাহাড়ের বড় চড়াই কখন শেষ হয়ে আসে বুঝতে পারি না। সম্মুখে

দেখি, পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সবুজ ঘাসে ভরা। বড় গাছপালা দূরে সরে গেছে। সেই শ্যাম-স্নিগ্ধ মাঠের বুকে স্বচ্ছনীল ঝরণাধারা। দূরে মাঠের শেষে গ্রামের ঘরবাড়ি। তারই পিছনে আকাশপানে মাথা তুলে এই পাহাড়ের শিখরদেশ। চড়াই-শেষে পাহাড়ের কোলে অতি মনোহর পরিবেশ। ঘন বনময় দুরূহ চড়াই ভেসে উপরে এসে মনে হয়, শহরের সহস্রতলা অট্টালিকার ছাদে উঠে দাঁড়াই। বহু নীচে দেখা যায় কোন্ এক উপত্যকা, পাহাড়-রাজ্যে বেগবতী নদীর রাজপথ।

অদূরে এক শিলার উপর এগিয়ে গিয়ে বসি। সঙ্গী নেপালীকেও ডাকি। সে বসতে রাজি হয় না। বলে, এবার আমাদের পথের ছাড়াছাড়ি। আপনার পথ, ঐ যে গ্রাম দেখা যায়, তা ছাড়িয়ে আরও অল্প পাহাড়ের ওপর উঠে,—আমি যাব এই দিকে—আমার গ্রামে,—আর বেশি দূর নেই।—যায়ও তাই,—সেই বিষাদ-ভরা মুখে। জীবনের পথে মৃত্যুর-আঘাত-পাওয়া শোকের বোঝা কাঁধে।

একা বসে থাকি সেই পাথরের উপর। মন ভেসে চলে,—সংসারজীবনের সব ভাবনা, আবিলতার ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলে ধীরে মিশে যায় হিমালয়ের অসীম শান্তিসাগরে।

হঠাৎ চমক ভাঙে। নিকটে পায়ের শব্দ শুনি। গিরমি নীচে থেকে উঠে আসে। একা। ডেকে জিজ্ঞাসা করি, সাহেবরা কই ?

বলে, আসছেন পিছনে আস্তে আস্তে। আমি এগিয়ে এলাম, নইলে ডেরায় পৌঁছুতে সন্ধ্যে হবে. আগে থেকে থাকবার জায়গা ঠিক না করলে অসুবিধে হতে পারে।

দুজনে এগিয়ে যাই। আধ মাইলের উপর মাঠ দিয়ে সোজা পথ গিয়ে সেই ঘরগুলি পাই। জিজ্ঞাসা করি, এই গ্রামেই তো থাকা ?

বলে, আরও খানিকটা যেতে হবে। কাল সকালবেলায় চড়াইয়ের ঠিক মুখেই আমরা থাকব,—ভোরে উঠেই যাতে চড়াই শেষ করা যেতে পারে।

গ্রাম ছাড়িয়ে সামান্য চড়াই। তারপর পাহাড়ের গা দিয়ে সমতল পথ। মাঝে মাঝে পথের আশপাশে বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো,—মনে হয় যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে এসে পড়েছে। পথের উপর সেখানে ধুলোবালি, কাঁকর, ঘাসের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, পথের রেখাও নেই, তাই বোঝাও যায় না। বড় বড় পাথরগুলোর এপাশ ওপাশ ঘুরে চলা,—যেন গোলকধাঁধা। মিনিট পাঁচেকের মাত্র এ ধরনের পথ। তবুও ভাবনা জাগে, সঙ্গীদের পৌঁছুবার আগে দিনের আলো চলে গেলে পথ ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে।—গিরমিকে বলি। সে আশ্চর্য হয়,—এ তো অতি পরিষ্কার পথ। তাছাড়া পোর্টাররা ওদের সঙ্গেই থাকবে।

আরও খানিক এগিয়ে খান দুই-তিন মাত্র চালাঘর। তারই একটা খালি বাড়ির দোতলায় একপাশে সম্পূর্ণ খোলা ছোট বারান্দা। হাত দশেক লম্বা, হাত চারেক মাত্র চওড়া। সেইখানে রাত-কাটানোর ব্যবস্থা হয়। নীচের ঘর

যেমন নোংরা, তেমনি অন্ধকার,—জানলাহীন। সেখানে পোর্টাররা মালপত্র নিয়ে থাকবে, রান্নাও হবে।

সঙ্গীরা এসে পৌঁছল অনেকক্ষণ পরে। দিনের আলো বহু আগে নিভে গেছে। সন্ধ্যার ছায়া কেটে চাঁদ উঠেছে। মাইল দশেক একবেলা হাঁটা হয়েছে। সেটা এমন কিছুই নয়, তবে দিনের শেষভাগে চড়াই ওঠার ক্লান্তির আধিক্য থাকেই। চড়াইখানিও নেহাৎ কম নয়। নদীর ধারে সেই ফেদি গ্রাম,—৫,০০০ ফুট, আর পাহাড়ের উপর যেখানে রাত্রিবাস করি,—প্রায় ৭,৫০০ ফুট।

মণি পৌঁছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হেসে বলে, দাদা, নাম শুনেছেন এ-জায়গাটার? চিৎরে! চড়াই উঠে চিৎরে পড়ারই কথা।

বারান্দাটি এতই অপরিসর, আড়াআড়ি বিছানা পেতে চারজনকে কোন রকমে কুলোয় বটে, কিন্তু ভাগনের লম্বা পা ছড়িয়ে শোওয়া অসম্ভব। আমারও কিছু অসুবিধা। দুজনে তাই বারান্দায় ওপার খোলা সিঁড়ির মুখে পা ছড়াই, মণি ও ভক্তির বিছানা দেওয়ালের কোণের দিকে।

খাওয়া তো কোন রকমে গেল, কিন্তু পাশের দিকে দেওয়াল বা ছাত নেই,—অবারিত পথ মুক্ত আকাশ দেখা যায়, সুদূর পাহাড়ের দৃশ্যও চোখে পড়ে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসও ঢোকে। প্রচণ্ড শীত বোধ হয়। উপায়ান্তরও থাকে না। স্লিপিং ব্যাগের আচ্ছাদনে সবাই জড়সড় হয়ে শুই।

আমার ঘুম পাতলা। সামান্য শব্দেই ভাঙে। রাত্রের মধ্যে কয়েকবার খুট্ খুট্ আওয়াজে মুখ বার করে দেখতেও হয়। ইঁদুর না কিছু না তো। মণিদের কোণে দু-একবার টর্চ জ্বলতে দেখি। ফিস্‌ফিস গলার শব্দও কানে আসে। ভাবি, শীতের প্রকোপে নিশ্চয় ভালভাবে ওদের ঘুম আসে না।

১লা অক্টোবর। অভ্যাসমত অতি ভোরে উঠি। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। ভাগনেও ওঠে। মণির দুজনে তখনও ঘুমিয়ে। জাগাতে সঙ্কোচ হয়। শীতে হয়ত সারারাত ঘুমই হয় নি। দিনের আলো ফোটে। এবার ভাবি, ডাকতেই হয়। ডাকবার আগেই মণি চোখ তাকায়। বিছানা ছাড়বার আগ্রহ দেখায় না। কারণও তখনি জানা যায়। উদ্বেগ-মেশানো স্বরে বলে, দাদা, সাধে কি আর উঠছি না। ভক্তির মাঝরাতে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ওষুধ খাওয়াতে হয়। এখন অল্প ঘুমিয়েছে। কেন এমন হঠাৎ হল বুঝছি না। আজ কি এগোনো ঠিক হবে?

সবারই ভাবনা জাগে। অসুস্থ শরীর নিয়ে চলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুনি, ভক্তির পূর্বে কখনও এ ধরনের যন্ত্রণা হয় নি। মণিকে বলি, আজ না হয় এখানে থাকাই হল। কিন্তু আসল ভাববার কথা হচ্ছে, যন্ত্রণা আপাততঃ কমে গেলেও, তাঁকে নিয়ে এ পথে আরও এগোনো ঠিক হবে কিনা। পথের দুর্গমতা তো বাড়বেই, তাছাড়া প্রতিদিনই কাঠমাণ্ডু থেকে আরও দূরে সরে যাওয়া। এখন তবু দু দিনের মাত্র পথ আসা হয়েছে। এর পরে হঠাৎ যদি আবার বাড়ে ও ফিরতেই হয়,—ফেরবার সময় লাগবেও বেশি,—যানবাহন

ঘোড়া পাবার আশাও নেই,—ডাক্তার হিসেবেই তুমি এখন বল, কি করা উচিত ?

মণির মুখ আরও গম্ভীর হয়। কিন্তু তখনি অবিচলিত কণ্ঠে মন্তব্য জানায়, দাদা, সেকথা যদি বলেন, আর এগোনো কখনো উচিত নয়। যন্ত্রণা যে রকম অসহ্য হয়েছিল,—ঠিক কি কারণে এমন হল, এখনি তো ধরা যাচ্ছে না,—আবার যে-কোন সময়ে recur করা আশ্চর্য কি ? এ risk নেওয়া ঠিক নয়।

বলি, তা হলে যাওয়ার সম্বন্ধে ভাববারও আর কিছু নেই,—এখান থেকেই কাঠমাণ্ডু ফিরতে হয়।

ভক্তির ঘুম ভাঙে। সব কথা চুপ করে শোনে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, যন্ত্রণাটা বড্ড বেশিই বোধ হয়েছিল,—এখনও দুর্বল বোধ হচ্ছে, আর একটু ঘুমুতে পারলে ঠিক হয়ে যাবে, মনে হয়। কেন হঠাৎ এমন হল, কি জানি। যাওয়া সম্বন্ধে যা আপনারা ঠিক করেন, তাই হবে, তবে, এত ব্যবস্থা করে এসে—ফিরে যাওয়া—-

আমি বলি, তা আর উপায় কি ? অসুস্থ অবস্থায় এ-পথে এভাবে আর এগিয়ে যাওয়া তো ঠিক হবে না। আজ এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল কাঠমাণ্ডুর দিকে ফেরা। সেরে ওঠ, আবার এ-পথে আসবে, ভাবনা কী ?

হঠাৎ এমন ভাবে অভিযান ভেঙে যাওয়ায় সকলেরই মনে আশাভঙ্গের মনঃক্ষুণ্ণতা জাগে। তবুও, কাঠমাণ্ডু ফেরবার সিদ্ধান্ত মন থেকে অনিশ্চয়তার ভার নামায়। মণি বলে, তাহলে দাদা, এখন আরও কিছুক্ষণ লম্বা হয়ে গড়ানো যেতে পারে, কি বলেন ? আজ যখন এখানেই থাকা, করবারও এখন কিছু নেই।

কিন্তু তখনি সঙ্গীদের চমকে দিই, আমার নিজের সম্বন্ধে ভিন্ন সিদ্ধান্ত জানিয়ে। বলি হ্যাঁ, সুস্থির হয়ে তোমরা এখন আরও বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পার,—আমি কিন্তু তৈরি হয়ে নিই,—

সকলে একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকায়। মণি তড়াক করে উঠে বসে বলে, তার মানে ?

হেসে বলি, কাঠমাণ্ডু ফিরে যাবে তোমরা, ফেরা নিশ্চয় দরকারও। কিন্তু, আমি এগিয়ে চলি, দেখে আসি নামচেবাজার-থিয়াংবোচি। না হলে ভবিষ্যতে আর হয়ে উঠবে না,—এখনি বয়েস হয়ে গেছে,—ব্যবস্থা যখন এমন ভাবে সব কিছু করা আছে,—এ সুযোগও আর হয়ত হবে না,—অবশ্য তোমরা ফিরবে, আর আমি যাব,—এর জন্যে দুঃখ থাকবেই, কিন্তু উপায়ও তো নেই।

মণি অবাক হয়ে বলে, কিন্তু আপনাকেই বা একা ছাড়া চলে কি করে ?

হেসে বলি, চিরকাল একাই তো বেড়াই; তার জন্যে ভাবনা নেই। ক্বচিৎ কখনও হয়ত সঙ্গী থাকে। এবারও না হয় থাকবে না। আমার দুঃখ শুধু, একসঙ্গে এসেও সবারই যাওয়া হল না।—আর, একাই বা কই ? গিরমি চলেছে সঙ্গে।

মণি গম্ভীর হয়ে বলে, ঐ গিরমির ভরসায় আপনি যাবেন? ওর হাতে আপনাকে ছেড়ে যাব? তা হলেই হয়েছে! ভাগনে বরং যাক আপনার সঙ্গে।

আমি বোঝাই, তা সম্ভবই নয়। তার মামীমা অসুস্থ,—এখন ফিরতে হবে তোমাদের দু'দিনের হাঁটাপথে,—দোলালঘাট থেকেও ফেরবার জীপ পাবে কিনা সন্দেহ,—তোমাদেরই কাছে ওর থাকার বিশেষ দরকার।

অবশেষে সেইমতই ঠিক হয়। সঙ্গীরা এখানে আজ বিশ্রাম নিয়ে কাল কাঠমাণ্ডুর পথে ফিরবেন, আমি আজই পূর্ব-প্রোগ্রাম মত নামচের পথে এগিয়ে যাব। কাঠমাণ্ডু পৌঁছে মনি জিমি রবার্টসকে জানাবে, নামচে থেকে ফেরবার জন্যে প্লেনে শুধু গিরমি ও আমার—দুজনের জায়গা রাখলেই হবে, গিরমি সময় মতই তাঁর কাছে কাঠমাণ্ডুতে ফিরবে। ভক্তির শারীরিক অবস্থা বুঝে মণিদেরও অগত্যা কলকাতায় চলে যেতে হবে।

রেশনের জিনিসপত্র তখনি ভাগ করে ফেলতে গিরমিকে বলে দেওয়া হয়। তার ও আমার কদিনের জন্যে যা দরকার তাই শুধু সঙ্গে রাখবে, বাকি সব কাঠমাণ্ডুতে ফিরে যাবে। আমার একার মালপত্রের জন্য একজন পোর্টার হলেই চলে। তবে শেরপা দুজন দেশে যাচ্ছিল, তাদের সারাপথ সঙ্গে নেবার কথা দেওয়া হয়েছে। তাই, এখন দরকার না থাকলেও পথের মাঝে তাদের কাউকে ছাড়ানো উচিত মনে হয় না। ওদের দুজনকে তাই রাখতেই হয়। বাকি তিনজন টামাঙ পোর্টার মনিদের সঙ্গে কাঠমাণ্ডু ফিরবে।

গিরমির হাতে ভাগাভাগির ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দিই। বিছানাপত্র বেঁধে নিজে তৈরি হতে থাকি।

আয়োজন শেষ হলে নীচের ঘরে মালপত্র দেখতে চলি। অবাক কাণ্ড! গিরমি সব গুছিয়ে বেঁধে ঠিক করেছে বটে, কিন্তু আমার একা-যাত্রার জন্য এত মালের বহর! ব্যাপার কি?

গিরমি স্বকীয় বিচারধারা প্রকট করে। খাবার জিনিসপত্র আমাদের দুজনের জন্য এত বেশি দরকার নয়, ঠিকই। কিন্তু এ-সব পাহাড়-পথে বেশি করে নেওয়াই ভাল। কোথায় কখন আটকে যেতে হয়, বলা যায় না তো,—পথে এ-সব আর মিলবেও না। তাছাড়া, কাঠমাণ্ডুতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েই বা লাভ কি?

আশ্চর্য হয়ে দেখি ও ভাবি, লাভ থাক বা না থাক, আমার একক যাত্রার ব্যায়ভার অযথা যে বাড়ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এভাবে মালের ভার বেড়ে যাওয়ায় গিরমি শেরপা পোর্টার দুজনকে ছাড়াও আরও একজন টামাঙ পোর্টারকেও সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ, আমি চলেছি একা, সঙ্গে সঙ্গে চলে গাইড গিরমি, আর তিন মূর্তি পোর্টার। এ যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, সঙ্গে সৈন্যবল, আর আমি সুসজ্জিত বলি! এমন রাজকীয় ব্যবস্থা করে কখনও হিমালয়-পথে ঘুরি নি, ঘোরবার কথাও ভাবি নি। হিমালয়-যাত্রাপথে জিনিসপত্রের আমার প্রয়োজনও সামান্য, আয়োজনও

চিরদিনই নগণ্য। যা না হলেই নয়, কেবল সেইটুকু নেওয়া। কোথাও কোনোরূপ বাহুল্য মনকে পীড়া দেয়, অযথা বোঝা বাড়ায়।

মণিকে গিয়ে জানাই। শুনে সে হাসেও যেমন, উদ্বিগ্ন হয়ও তেমনি। বলে, কি দাদা, বলছি না আপনাকে? এর জিম্মায় আপনাকে ছেড়ে যাই কি করে তাই তো ভাবছি। চলুন ফিরে আমাদের সঙ্গে। পরে আবার কখনো এলেই হবে।

হেসে বলি, আমার জন্যে কোনও ভাবনা কোরো না,—ভালভাবেই ঘুরে আসব ঠিক। তবে অকারণ এত বোঝা বাড়ানো,—এতগুলো পোর্টার একার জন্যে নেওয়া—সেইটেই ভাল লাগে না। তবুও, গিরমি যেমন চায়, যেমন ব্যবস্থাও করেছে,—তেমনি চলুক, বাধা দেব না।

অতএব, আয়োজন সেইমতই থাকে। যাত্রা শুরু করতে একটু বেলাও হয়ে যায়। সাড়ে সাতটা বাজে। গিরমি ও পোর্টার তিনজন এগিয়ে চলে। আমিও পিছনে একা ধীরপদে মাঙ্গা-দেওরালি পাশ-এর শেষ চড়াইটুকু উঠতে থাকি। সঙ্গীদের সঙ্গে মনের বাঁধন পিছুপানে টানতে থাকে। চারজনে একসঙ্গে সানন্দে যাত্রা শুরু হয়েছিল, হঠাৎ পথের মাঝে এমন ভাবে ছাড়াছাড়ি, তাদের ফেলে রেখে আমার একা এগিয়ে যাওয়া,—ভাবতে মন বিষাদে ভরে। কিন্তু তখনি এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজি, উপায়ই বা কী? একেই বোধ হয় বলে যার ভাগ্যে যা আছে।

সেদিন পথে এগিয়ে যেতে মনে হয়েছিল, সঙ্গীদের এই আকস্মিক যাত্রাভঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক মনঃক্ষুণ্নতার বন্যা। তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি, অথচ, আমার ভাগ্যে অব্যাহত লাভ। অমন লাভে মনে বেদনার কাঁটাই বেঁধে।

কিন্তু তখন কি আর জানি, ওদের ঐ ক্ষতির ভিত্তির উপরই তাঁদেরই আর এক আশাতীত ভ্রমণযোগের সৌধ গড়ে ওঠে? নেপাল হিমালয়ের অপর এক দুর্গম অঞ্চলে—যেখানে যাওয়ার কথা আমি ভাবি, যাবার আয়োজনও করি, অথচ আমার যাওয়া ঘটে না, ওঁরা যেখানে যাওয়ার কথা কখনও ভাবেনও না—হঠাৎ এই দুর্দৈবেরই 'সুযোগে' সেইখানে ওঁদেরই যাওয়া হয়, আমার নয়।

ব্যাপারটা আমি জানতে পারি থিয়াংবোচি যাত্রা শেষ করে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে। ব্যানার্জির কাছে তখন খবর পাই, মণিরা নিরাশ হয়ে চিৎরে থেকে কাঠমাণ্ডুতে ফেরেন। ভক্তি তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। তাঁরা ভাবেন কলকাতায় তো ফিরতেই হবে। কাঠমাণ্ডুর কাছাকাছি কোথাও নিরিবিলি দু-তিনদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরবেন। মোটরে চলে যান এক পাহাড়ের উপর সুন্দর বাংলো,—কাকনিতে। সেখানে দুদিন পরেই ভক্তির শরীর স্বাভাবিক মনে হয়। দেহের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আবার সবারই মনে নতুন পরিকল্পনার সাহস যোগায়। পরামর্শ করেন, ঘুরে আসা যাক আর কোথাও। যাত্রাও করেন সেই গোঁসাইকুণ্ডে—যেখানে যাওয়ার আমার বহু বছরের সংকল্প।

কাঠমাণ্ডুতে আমার ফেরবার একদিন পরেই তাঁরাও গোসাঁইকুণ্ড থেকে

ফেরেন। আবার সকলে মিলিত হই। একই সঙ্গে নেপাল ছাড়ি। হিমালয় যাত্রার সার্থকতায় সবারই মন আবার আনন্দে ভরা।

তাই ভাবি, কার কোন্ যাত্রাভিলাষ কে কবে পূর্ণ করেন, কেউ কি জানে?

সেই গোসাঁইকুণ্ড দর্শন হয় আমারও একদিন,—আরও চার বৎসর পরে। ১৯৭০ সালে। সে-কাহিনী এখন থাক।

এখন চলি মাঙ্গা-দেওরালি পাস্-এর দিকে।

এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে আবার অপর দিকে আর এক পার্বত্যনদীর উপত্যকায় নামতে হবে। তারপর? আবার চড়াই। পরবর্তী শৈলমালা পার হওয়া। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা',—এ পথের তাই-ই তো নিত্য রীতি।

তবে, আজ ভরসা এই, মাঙ্গা-দেওরালির গিরিপথ তেমন কিছু উঁচু নয়। মাত্র আট হাজার ফুট। তাও আবার, এর আসল চড়াই কালই শেষ হয়েছে। এখন চিৎরে থেকে মাত্র আর শ'পাঁচেক ফুট ওঠা। তাও ধীরে ধীরে। ছায়ানিবিড় বনপথে। পরিচিত গাছের মধ্যে দেখি রোডোডেনড্রন—Rhododendron arboreum। এখন পুষ্পশোভাবিহীন। মে-জুন মাসে এলে দেখা যেত বন-আলো-করা সেই বক্তরূপসম্ভার। এখন শুধু সবুজ পাতার মেলা। চারিপাশে রাশি রাশি ফার্ণ। পাহাড়ের গায়ে যেন কোথাও সবুজ, কোথাও সোনালী ঝালর দোলায়। গিরমি ও পোটাররা গল্প করতে করতে চলে। তাদের পাশ দিয়ে,—তাকিয়ে অল্প হেসে, এগিয়ে চলি। চওড়া রাস্তা। পথ ভোলবার আশঙ্কা নেই।

চড়াই শেষ হয়। পাস্-এর মাথায় পৌঁছুই। চোখের সামনে থেকে যেন পর্দা সরে। তরঙ্গায়িত বিস্তীর্ণ মালভূমি। নিকটে বড় গাছপালা নেই। সবুজ ঘাসে ছাওয়া ময়দান। তারই উপর মাঝে মাঝে শিলাস্তূপ। ঘাসের মধ্যে অজস্র ছোট ছোট ফুলের বাহার। Anaphalis বা Everlastings-এর পুঞ্জ পুঞ্জ শ্বেতগুচ্ছ। দেখায় যেন, শ্যামল জলে ফেনিল তরঙ্গ। অদূরে উত্তর দিগন্তে সুনীল গগনে মাথা তুলে হিমগিরির তুষার-শিখর। রৌদ্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল। যেন, রৌপ্য-কিরীটী গিরিরাজের রাজসভা। প্রাধান্য পায় গৌরীশঙ্কর চূড়া। ২৩,৪৪০ ফুট। তার অল্প ডান পাশে মেনলুংগৎসে। ২৩,৫০০ ফুটের উপর উঁচু। এ-পথে এই প্রথম তুষার-গিরির এমন মনোহর দৃশ্য। গৌরীশঙ্কর চূড়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, ঐ নামই একসময়ে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর বলে ভ্রম ছিল। পরে প্রকাশ পায়, এভারেস্ট আরও প্রায় ছয় হাজার ফুট উঁচু। এখনও কারও কারও ধারণা, এভারেস্টেরই ভারতীয় নাম—গৌরীশঙ্কর।

একটা পাথরের উপর বসি। প্রকৃতির অপরূপ শোভা উপভোগ করি। অপেক্ষা করার আর এক কারণও থাকে। সুমুখের পথ দু'ভাগ হয়। একটা

এগিয়ে যায় সামনে ডান দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে দূরে ঘুরে যায়। সেদিকে লোকালয় দেখি না। অপর পথ যায় বাঁ দিকে। মালভূমির শ্যাম-তৃণ-ঘন শিরে যেন সিঁথি কেটে। সেদিকে আধমাইলটাক দূরে পাহাড়ের মাথায় অনেকগুলি ঘরবাড়ি। কোন্ পথ ধরব, বুঝি না।

গিরমিদের গলার আওয়াজ শোনা যায়। পরস্পরে কথা কইতে কইতে উঠে আসে। থেকে থেকে হাসিরও রব ওঠে। গত তিনদিন পথ চলতে ওদের বিশেষ সঙ্গ রাখি নি। ওদের হাবভাব আচরণের প্রতি দৃষ্টি যায় নি। আজ থেকে ওরাই আমার পথের সঙ্গী। তাই অলক্ষ্যে বসে তাদের সহাস্য পরিহাস শুনে মনের যেন ব্যবধান ঘোচে। নিকটে এলে পথের নির্দেশ নিই। জানতে পারি, অদূরে ঐ গ্রাম,—মাঙ্গা-দেওরালি-বাজার। এ-অঞ্চলের বড় গ্রাম। কিন্তু আমাদের পথ ওদিকে নয়। ডান হাতের রাস্তা নিতে হবে। এখন খানিক দূর সমান রাস্তা। তারপরই উৎরাই শুরু। ভাবি, তা তো হবেই, পাহাড়ের মাথায় উঠেছি যখন! প্রশ্ন করে জেনে নিই, সুমুখে পথ এখন ঐ একটাই, তাই নিশ্চিন্ত মনে এগোতে পারি। দুপুরের আজ খাওয়াদাওয়া—কাটাকুটেতে।—নামটা বলে নিজেরাই আবার হো হো করে হাসতে থাকে। আমিও হাসিতে যোগ দিই।

নামটা স্মরণ রেখে একাই আবার পথ ধরি,—কাটাকুটে! ভুলব না নিশ্চয়। আবার মনে হয়, আলিবাবার সেই চিচিং ফাঁক্-এর মত হবে না তো! আজকাল বয়সের ধর্মে এমনি নাম ভুলতে শুরু করেছি।

পাহাড়ের গায়ের পাথর কেটে সমতল পথ। পথের ডাইনে পাহাড়ের উঁচু গা। বা দিকে পাহাড়ের ঢাল, বড় বড় ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে স্তূপাকার বোল্‌ডারস্। সেই দিকে বহু নীচে, যেন পাতালপ্রদেশে নদীর খাদ। কিন্তু মুখ তুলে সুমুখে তাকালেই দূরে চোখে পড়ে আকাশ-ছোঁয়া বরফের পাহাড়। জনহীন পথ। পশুপক্ষীরও সাড়া নেই। দিগদিগন্ত নীরব, নিস্পন্দ। যেন, ভুবনজোড়া পটে আঁকা মায়াময় চিত্র। প্রাণময়, অথচ স্পন্দনবিহীন। গতির ছন্দ তুলে আমিই শুধু চলি। সেই সীমাহীন নিস্তরঙ্গ শান্তিসাগরে মিলিয়ে যেতে চাই।

উন্নতশির মহান গিরিরাজও যেন করুণাভরে আপন দেহ ধীরে ছড়িয়েছেন। পথ ক্রমে নেমে চলে। খাড়া উৎরাই নয়। তরঙ্গায়িত পাহাড়ের অংশ ক্রমে নিম্নমুখী হয়ে বহু নীচের অদৃশ্য এক উপত্যকা অভিমুখে প্রসারিত থাকে। পাহাড়ের সেই বিস্তীর্ণ অংশ বনজঙ্গলশূন্য। কোমল কচি ঘাসে ছাওয়া। মুক্ত দিগন্তে নীচে বহুদূরব্যাপী অবারিত দৃষ্টি চলে। স্তরে স্তরে মাঠের পর মাঠ,—নীচে থেকে আরও নীচের দিকে গড়িয়ে যায়। যেন, বিশালদেহ পাহাড়ের কাঁধ থেকে পদতলে লুণ্ঠিত শ্যামল উত্তরীয়।

দেখতে দেখতে নেমে চলি। স্বচ্ছন্দ গতি। পুলকিত মন। মাঝপথে একদল নেপালীর সঙ্গে দেখা। কাঠমাণ্ডু চলে। কাটাকুটে-নাম ভুলি না। সন্ধান নিই। একজন পথের পাশের একটা পাথরের উপর ওঠে, দূরে আঙুল

বাড়িয়ে দেখায়,—অনেক নীচে পাহাড়ের মাথায় বিস্তীর্ণ ময়দান। সবুজ ঘাসের বুক চিরে ক্ষীণ পথরেখা, অতি ছোট খানকয়েক যেন ঘর। আকার দেখে বুঝি, এখনও বেশ দূর। তবুও জানি, পৌঁছুতে বিলম্ব হবে না। ধীর উৎরাই পথ। সকালে হেঁটেও দেহে কোন ক্লান্তি নেই। উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে নামতে থাকি। গতিবেগও বাড়ে। ছোট বাড়ি ক্রমে বড় দেখায়। মাঠের উপর মানুষ, গরু, ভেড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেলা নটার মধ্যেই কাটাকুটে পৌঁছেও যাই।

অতি শান্ত সুন্দর প্রতিবেশ। চারিপাশে ঢেউ-খেলানো মাঠ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা। এখানে ওখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটি বড় বড় গাছ। মাঠের বুকে বয়ে চলে ঝরণাধারা। পিছনে ফিরে তাকাই, পটভূমি জুড়ে, এখন দেখায় যেন, সেই কোন্ দূরে গগনচুম্বী বিশাল পাহাড়। দেখে চিনতে পারি, ঐ তো ওরই ওপর থেকে নেমে আসা ;—যেন সরু তুলি দিয়ে টানা ঐ না পথের রেখা!

ফেলে-আসা পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই। আশেপাশে তাকাই। পথের নিকটে কয়েকটি ঘর। পাথর দিয়ে গাঁথা। ছোট এক মন্দির। যত্নের অভাবে ভেঙে পড়া। ভিতরে শিবলিঙ্গ। তিনিও আর পূজা পান না। কে কবে এই উন্মুক্ত প্রশান্ত পরিবেশে দেবার্চনার আয়োজন করেন, জানি না ; কিন্তু গাছের ছায়াতলে পাহাড়ের গায়ে পাথর-বাঁধানো সারি সারি সাতটি জলের ধারা তাঁর সৌন্দর্যবোধের এখনও পরিচয় দেয়। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর সযত্নে গাঁথানো উৎস-মুখগুলি এখনও কল্লোলিত কণ্ঠে তাঁর সেবা-ধর্মের গুণকীর্তন করে।

নেপালের এই পথে কাঠমাণ্ডু, ভাটগাঁও ছেড়ে আসার পর হিন্দু দেবদেবীর মন্দির চোখে পড়ে নি,—গাড়োয়ালে-কুমায়ুনে বা হিমাচল প্রদেশে যেমন গ্রামে গ্রামে হিন্দু দেবদেউল।

ধারার নিকটে আধ-ভাঙা দোতলা ছোট একটা পাথরের বাড়ি। লোকজন থাকে বলে মনে হয় না। গিরমিরা পৌঁছুলে তারই উপরের ঘরখানি পরিষ্কার করিয়ে নিই। সেইখানে কম্বল বিছিয়ে আরামে বিশ্রাম করি। মিনিট দশেকের মধ্যে গিরমি চা তৈরি করে আনে। নিজেরাও পান করে। রান্না কি হবে জিজ্ঞাসা করে। বলি, ভাত ও একটা সবজি হলেই আমার যথেষ্ট।

আধ ঘণ্টাও যায় না। আবার উঠে এসে জানায়, রান্না তৈরি। আশ্চর্য হই। বলি, এরই মধ্যে করে ফেলেছ? বাঃ! সুখাসন ছেড়ে উঠতেই হয়। পাহাড়ের উপর থেকে সকালে নেমে আসা,—এখন এখানে রোগের তাপ কড়া লাগে। আরামে বাঁধানো ঝরণার মুখে ধারা-স্নান করি। দেহ, মন তৃপ্তি বোধ করে।

আহারান্তে এক ঘণ্টা বিশ্রাম। গিরমিরাও খাওয়া শেষ করে। পোর্টাররা বাসনপত্র মাজে, নিজ নিজ ঝোলায় গুছিয়ে নেয়। যেন, যন্ত্রচালিতের মত কাজ চলে।

আবার পথ চলার জন্য সবাই প্রস্তুত। আমিও জুতো জামা পরে নেমে

আসি। ক্ষণিকের আশ্রয়,—পোড়োবাড়ির সেই ঘরখানির দিকে ফিরে তাকাই। এখন মনে হয় যেন কতকালের চেনা!

গিরমি বলে, ঐ পথ ধরে নীচের দিকে নামতে থাকুন, আমরা একটু পরেই আসছি।

প্রশ্ন করি, রাতে আজ থাকা কোথায়?

বলে, কিরান্‌টিচাপে।

পাথরের উপর বসে তারা সিগারেট ধরায়। নজর করেছি, ওরা পথ চলতে ধূমপান করে না। বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটবার আগে খায়।

কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রার আগে ব্যানার্জি বলেছিলেন, কয়েক প্যাকেট সিগারেট সঙ্গে নেবেন, মাঝে মাঝে ওদের বিলোবেন, দেখবেন, ঐ সামান্যই তো জিনিস, কিন্তু কি খুশীই না হবে!

শুনে বলি, কথাটা ভালই। কিন্তু, ও-সব বইবার বা ভাগ করে দেবার দায়িত্ব আমাদের দলের কেউই নিতে চাইবে না,—সবাই ও-রসে বঞ্চিত! বরং গিরমিকে বলে দিন, এখানেই টাকা দেওয়া হবে, সে নিজেই যেন কিনে নেয় ও সঙ্গে রাখে,—পথে যাকে যখন যা দেবার সে-ই দেবে।

সেই মত ব্যবস্থাও হয়। তবে, পরে নজর করি, সামান্য জিনিস হলেও তাদের কাছে এও ও-পথে অমূল্য। নিজেদের মধ্যে ভাগের সিগারেট নিয়েও লেনদেন চলে, একদিন একজন হয়ত অপরের কাছে একটা ধার নেয়, পরে আবার শোধ দেয়।—শেরপারা যে জাত-ব্যবসায়ী সে-কথা জানতে পারি পরে, তাদের দেশে পৌঁছে।

আবার একাই হাঁটা শুরু। পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে পথ নামে। মাঝে মাঝে গ্রাম। চারিপাশে ক্ষেত। মাঠের রাজ্য ক্রমে শেষ হয়। পাইনের বন আসে। সেই সুপরিচিত 'সরলদ্রুম'। সেই বনের মাঝ দিয়ে চলতে পথ হারায় না, পথিক মন হারায়। অনুভব করি, কবির বর্ণনা,—'ভোলায় রে মন দেবদারু-বন, গিরিদেবের পাণ্ডাটি!' নীচে নদীর উপত্যকা অভিমুখে পথ এবার অতি দ্রুত নেমে চলে। বড় বড় গাছের গহন জঙ্গল যেন ডালপালার জাল পেতে গতিরোধ করতে আসে। পথও এঁকেবেঁকে হুড়মুড় করে নেমে পালায়। হঠাৎ চমক লাগে সেই গভীর জঙ্গলে কটা কাঠের ঘর দেখে। মানুষ নেই। হয়তো, জঙ্গল-জমা নেওয়া কাঠের ব্যবসায়ীর আস্তানা। অবিলম্বে পেঁছে যাই নীচে নদীর কিনারায়। চারিদিকের খাড়া পাহাড় ও নিবিড় বন দিনের আলোর পথ আটকে রাখে। থমথমে আবছায়া ভাব। দুই তীরের পাহাড়ের কালো পাথরের অবরোধ ভেদ করে দুরন্ত নদী প্রচন্ড বেগে বয়ে চলে। পরে গিরমির কাছে এর নাম শুনি, চর্ণবোতীখোলা।

নদীর উপর পুরনো লোহার চেন-এ ঝোলানো পুল। পা দিতেই দুলতে থাকে। যেন, স্রোতে-ভাসা ছোট নৌকোর পাটাতনে উঠে দাঁড়াই। দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে দু-দিকের রেলিং ধরে ধীরে এগিয়ে যাই। পুলের

মাঝামাঝি এলে দু'পাশের তারের রেলিং প্রায় হাঁটু অবধি নীচু হয়ে ঝুলে থাকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে দু হাতে ধরাই দায়। ওদিকে পুলও দোলনার মত দুলতে থাকে। পায়ের নীচে খরস্রোতা নদীর ক্রুর অট্টহাসি। পার হতে গিয়ে মাথা ঘুরলে নিমেষে সলিল-সমাধি বিচিত্র নয়।

কিন্তু, পরপারে ঠিকই পৌঁছাই। পিছন ফিরে পুলটির দিকে তাকাই। তখনও সে দোলে। যেন, রহস্যভরে মাথা নাড়ে। এপারে দেখি, যথারীতি চড়াই-পথ অপেক্ষা করে। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? উঠতে থাকি। কিন্তু খানিক উঠে দাঁড়াতেই হয়। পথ দু'ভাগ হয়। পাহাড়ের দুদিকে যায়। জন-মানব নেই। গিরমিদেরও দেখা নেই। অতএব, একটা শিলাসনে বিশ্রাম। আমি থামি, সময় থামে না। মনে হয়, অযথা বয়ে যায়। অবশেষে অপর পারের পাহাড়ের জঙ্গলে মানুষের স্বর শোনা যায়। গিরমিরা নিশ্চয়ই। ওদিকে তাকিয়ে থাকি। ক্রমে গাছের ফাঁকে দ্রুত-নেমে-আসা দেহগুলি মাঝে মাঝে চকিতে চোখে ধরা দেয়। পুল পার হবার সময় পাহাড়ের খাঁজে আর তাদের দেখা যায় না। কিন্তু দোদুল্যমান পুলের লোহার চেন্-এর ঝন্ঝন্ শব্দ, কাঠের তক্তার উপর পা-ফেলার ঘড়ঘড় আওয়াজ তাদের এগিয়ে আসার খবর কানে আনে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু নদীর একটানা গর্জন। তবুও, মানুষের স্বর, চলার শব্দ,—তীক্ষ্ন না হলেও এই শান্ত পার্বত্য রাজ্যে অস্বাভাবিক; নির্জন বনভূমির নিস্তব্ধতার মাঝে বেসুরো বাজে; দূর থেকেও কানে বেঁধে।

বসে বসে শুনি, কেমন তারা এগিয়ে আসে। চোখে দেখি না, শব্দ শুনে স্পষ্ট বোঝা যায়,—এই পাহাড়ের বাঁক ঘোরে, এইবার এদিকে ওঠে!—সেই পরস্পরে দু'একটা কথা, তারপরই হাসির উচ্ছ্বাস,—আবার একজনের কি যেন মন্তব্য—আবার সকলের দিলখোলা হাসি। এত হাসি কেন, বুঝি না।

বুঝি নি তখন, কিন্তু কারণ জানা যায় পরে;—দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে কাটিয়ে, তাদের গ্রামের মাঝে বাস করে। শের্পাদের প্রাণভরা স্ফূর্তি। সদাই তারা হাস্যমুখর। রহস্যপ্রিয়। কজন শের্পা একসঙ্গে হলেই রসালাপে প্রমত্ত হওয়া তাদের মজ্জাগত স্বভাব। একজন কি বলে ওঠে, অমনি সবাই হাসে, বক্তাও হাসে। আবার তখনি অপরজন কি টিপ্পনী কাটে, আবার হাসির রোল ওঠে। যতক্ষণ দুজন শের্পাও একসঙ্গে,—অনবরত এই হাসাহাসি চলেই। পথ চলতেও তাই, বিশ্রাম নিতেও তাই, দিনশেষে ডেরায় এসেও সেই। রাত্রে বিছানায় শুয়েও হাসাহাসি থামে না—যতক্ষণ না ঘুমে কাতর হয়।

গিরমিরা পৌঁছায়। আমাকে দেখে মুচকে হাসে। আবার তেমনি পরস্পরে কথা বলে হাসির খই ফুটিয়ে এগিয়ে চলে। আমিও তাদের অনুসরণ করি। কিন্তু তখনি আবার তারা পথের পাশে বিশ্রাম নিতে বসে। জিজ্ঞাসা করি, কিয়ান্টিচাপ এখনও কত দূর?

বলে, আর দূর নেই,—এই পাহাড়ের আরও খানিক ওপরে উঠে।

ভাবি, তবে চড়াই শেষ করে বসা যাবে। এগিয়ে চলি ধীরে ধীরে।

গিরমিরা হাঁটে বেশ জোরেই। পায়ের সমান দ্রুত-তাল ফেলে, অথচ সহজ স্বাচ্ছন্দ গতিতে। কিন্তু বেশিক্ষণ একটানা হাঁটে না। ঘণ্টাখানেক চলবার পর বসবেই। মিনিট পনের বিশ্রাম। পরে মৌতাত করে ধূমপান। আবার সতেজে চলা। আমার হাঁটার ধরন ভিন্ন। চলি ধীরে ধীরে একটানা। কোথাও থামি না। উৎরাই বা সমান পথে গতিবেগ একটু বাড়ে। চড়াই ওঠার সময় আরও ধীরে পা ফেলা, নিজেকে ক্লান্ত হতে না দেওয়া। ফলে, দেখা যায়, শেরপারা আমার চেয়ে দ্রুততর হাঁটলেও দীর্ঘপথে প্রায়ই পিছিয়ে থাকে, দিনশেষের আশ্রয়ে পৌঁছায়ও অনেক পরে। এ যেন সেই শশক ও কচ্ছপ-কাহিনী।

খানিক উঠতেই চারপাশে ক্ষেত। তারই মধ্যে দিয়ে পথ। বোঝা যায়, বড় গ্রাম আসে। আসেও তাই। তবে আরও অনেকখানি যাবার পর। পাহাড়ের উপর আবার সমতলভূমি। ঘরবাড়ি। বড় বড় গাছের ছায়া। নিকটে জলের ধারা। বড় একটা পিপল গাছের তলায় সেই পাথর-বাঁধানো চবুতর। সেইখানে বসে গিরমিদের অপেক্ষায় থাকি। সুমুখেই মাঠের অপর প্রান্তে খানকয়েক ঘর। একটা দোকানও মনে হয়। তারই সামনে বেঞ্চে কজন লোক বসে জটলা করে। ফিরে ফিরে আমার দিকে তাকায়। চবুতরের পাশ দিয়েই জল আনতে যাওয়ার পথ। তামার কলসী মাথায় দুজন মেয়ে চলে। তারাও মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে। পরস্পরে কি যেন বলে। খিল-খিল করে হেসে ওঠে। হিমাচল প্রদেশের মেয়েদের মত এদের পোশাকের বর্ণ-বৈচিত্র্য নেই, দেহ-ভরা অলঙ্কারের জাঁকজমকও নয়। সুমুখে মাঠে ছোট ছেলেমেয়ে ধূলোবালি নিয়ে খেলা করে। তারাও খেলা ফেলে আমার দিকে বারে বারে তাকায়। অচেনা বিদেশী পথিক চাঞ্চল্যশূন্য শান্ত গ্রামে এমনি এক বিস্ময় ও কৌতূহলের বস্তু হয়ে ওঠে। কেমন যেন এক অস্বস্তি বোধ করি।

যাক, ঐ যে গিরমিরা এসে পড়ে! পথ ধরে আরও এগিয়ে চলে। আমিও পিছু নিই। মাঠ ও আশপাশের ঘরগুলি ছাড়িয়ে চলতেই থাকে। ভাবি, ব্যাপার কি? এটা কি কিরানুটিচাপ নয়?—জিজ্ঞাসা করি। বলে, হ্যাঁ, এইটেই। প্রশ্ন করি তাহলে মাঠের পাশে একটা ঘরে উঠলেই তো হত? জলও ছিল নিকটে।—বলে, ওরা জায়গা দেবে না। গ্রামের শেষে ওদিকে থাকব।

ভাবি, দূরদেশী পথিককে জায়গা দেবে না, তা কি হয়? গিরমির, হয়ত, ব্যক্তিগত কারণবশতঃ ভ্রান্ত বিশ্বাস। বেশ বড় গ্রাম। মাঠ ছাড়িয়ে এসে পথের দু'পাশে বাড়ি। ছোট ছোট ঘর। পাথর ও মাটি দিয়ে গাঁথা দেওয়াল। কোন-কোনটার শ্লেটের ছাদ। বাড়ির চাপে পথ সরু হয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গিরমি এক-একটা বাড়ির ভিতর ঢোকে। বেরিয়ে আসে। আবার এগোতে থাকে। বলে, থাকতে দিতে রাজি নয়।

ভাবি, সাধারণ দুঃস্থ নেপালী হিন্দু গ্রামবাসী, হয়ত ঘরে স্থানাভাব

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দোতলা বাড়ি, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখে গিরমিকে বলি, এইবার এইখানে চেষ্টা কর, নিশ্চয় পাওয়া যাবে।—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ভিতরে যায় ; তখনি গৃহস্বামীর সঙ্গে বেরিয়েও আসে। ইনিও অসম্মত। ব্যাপার কি ? বৌদ্ধধর্মী শেরপাদের প্রতি অবজ্ঞা, অথবা বিদেশী যাত্রী দেখে অনাস্থা ? কিংবা স্থানীয় অধিবাসীদের আতিথেয়তার মনোভাবের একান্ত অভাব ? হিমালয়ের আর কোথাও তো এমন দেখি নি ! আশ্চর্য বোধ হয়।

অবশেষে, গ্রামের প্রায় শেষপ্রান্তে একটা ঘরে জায়গা পাওয়া যায়। খোলা বড় উঠান। তারই দু'পাশে দুখানা ছোট চালাঘর। একটাতে গৃহস্বামীরা থাকে। অপরটা গোয়ালমত। সেইটেতেই গিরমিরা ঢোকে, থাকবে, রান্নাবান্নাও করবে। আমাকেও বলে সেইখানেই রাত কাটাতে। একে ছোট্ট ঘর, তায় জানলা নেই, একটিমাত্র দরজা। উনুন জ্বললে ধোঁয়ায় ভরে যাবে নিশ্চয়। তারই ভিতর পাঁচজনের শুয়ে রাত-কাটানো ! এ কি পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহদাহের ব্যবস্থা ? ও-ভাবে বন্ধ ঘরে থাকার আমার অভ্যাসই নেই। গৃহস্বামী লোকটি ভাল। আমাকে বলে, তাদেরই ঘরে একসঙ্গে থাকবার জন্যে। সেখানেও দেখি, তারা স্বামী, স্ত্রী, চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। ঘরটাও ছোট। ওখানেও ঘরের ভিতর উনোন, মালপত্রও। অতএব, ঘরের বাইরে দরজার মুখে মাটির রোয়াকটাতেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করি। মাটি থেকে মাত্র এক ধাপ উঁচু ! দু'পাশ একেবারে খোলা। লম্বা হাত-পাঁচেক হবে। সেইখানে প্লাস্টিক সীট বিছিয়ে নিই। পোটার আঙ্দোরজে তারই উপর বসে, গাল ফুলিয়ে সজোরে ফু দিয়ে এয়ার ম্যাট্রেস ফাঁপিয়ে দেয়। ঐখানে স্লিপিং ব্যাগে রাত-কাটানো,—আবার কি চাই ? শীতও বেশি নয়। কিরানটিচাপ মাত্র ৪,৫০০ ফুট। রাত কেটেও যায়। তবে, ঘুমের ব্যাঘাত যে না হয়, এমন নয়। রোয়াকের অপর কোণে আমার পায়ের কাছে কয়েকটা ঝুড়ি জড় করা। শোবার সময় কি আর জানি, তারই ভিতর মুরগি থাকে ? সারারাত থেকে-থেকে ঝটপটানি শব্দ তোলে। একটা উৎকট তীব্র গন্ধও নাকে আসে। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও কানের পাশে। লোক নাকি ? কিংবা, জঙ্গল থেকে ভালুক এল ? টর্চ জ্বালি। দেখি, রোয়াকের খোঁটায় বাঁধা এক ছাগল ! বিছানা থেকে হাতখানেক মাত্র দূরে। আলো দেখে অদ্ভুত আওয়াজ করে। ভাবনা হয়, স্লিপিং ব্যাগটা রাত্রে চিবুবে না তো ? জড়িয়েসড়িয়ে দেওয়াল ঘেঁষে শুই। কখন ঘুমিয়েও পড়ি। হঠাৎ পা ছড়াতে পায়ের কাছে, কেমন যেন উঁচু কি ঠেকে। আবার ওখানেও কি ? সাপ নয় তো ? টর্চ জ্বালি। মাথা তুলে দেখি। একটা কুকুর ! কখন উঠে এসে পায়ের কাছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে আরামে শুয়েছে। চোখে আলো পড়তে পিটপিট করে তাকায়। কিন্তু আবার তখনি মুখ গুঁজে তেমনি শুয়েই থাকে। ভাবখানা যেন, হয়েছে কি ? একটু আয়েস করে শুয়ে আছি,—তবুও তো পায়ের তলায়,—আপত্তি কিসের ?

ভাবি, ঠিকই তো ! গ্রামে এসে দুয়ারে দুয়ারে বৃথাই ঘুরে এখন মাথা

গোঁজবার একটু জায়গা পেতেই ভুলতে পারি এখনি আশ্রয়-প্রার্থীকে ? থাক তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে। আমিই শুই পা গুটিয়ে।

তবুও নিদ্রাদেবীর কৃপা মেলে না। মিলবে কি করে ? পাশেই দেওয়ালের আড়ালে ঘর। গৃহস্বামীরা সেখানে। রাতভোর একটা ছোট ছেলে ভীষণ ভাবে কেবলি কাশে। মনে হয়, এই বুঝি বা তার দম বন্ধ হয়েই আসে। কেঁদেও ওঠে তীক্ষ্ন স্বরে।

পরদিন সকালে যাত্রার আগে ছেলেটাকে দেখতে পাই, তার মায়ের কোলে। মানুষের শিশু না, আর কিছুর ? লিক্‌লিকে চেহারা। কাঠির মত হাত-পা। চামড়ায় ঢাকা কখানা সাজানো হাড়। ফ্যাকাশে রঙ। কোটরগত দুটো চোখ,—কেমন যেন জ্বলতে থাকে। দেখেই বুঝতে পারি, ক্ষয়রোগে ভোগে।

পরে কাঠমাণ্ডুতে জানতে পারি, নেপালের এ সব দুঃস্থ অঞ্চলে ঐ রাজ-রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব।

২রা অক্টোবর। তবুও রাত কাটে। শুধু কাটেই না, অবাক হয়ে অনুভব করি, অমন বিঘ্নবহুল বিশ্রামও পথশ্রমের সব অবসাদও কাটায়। হিমালয়ের আবেষ্টনের অনন্ত বিভূতি। এ-যেন তাঁর নিত্যানন্দময় স্বভাবের খেলা। জেগে উঠি যেন আবার নতুন মানুষ। মনভরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি, পুনরায় পথ-চলার নবীন উৎসাহ।

সকাল সাড়ে পাঁচটায় চা ও রাত্রের রাখা রুটি খেয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

গিরমি জানায়, আজ দুপুরের খাওয়া-দাওয়া নাম্‌ডো গ্রামে।—ভাবি, তথাস্তু। এখান থেকে কতদূর জানবার ভাবনাও জাগে না। এ যেন নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে আনন্দে চলা।

যাত্রার আগে গিরমি আড়াই টাকা চেয়ে নেয়। গৃহস্বামী রাত্রে কাঠ ও কিছু সবজি দিয়েছিলেন, তারই দাম।—বোঝা গেল, এখন পথে দৈনন্দিন খরচা শুধু এই বাবদেই হবে। গত কদিন ডাঃ বিশ্বাসই এসব হিসাবনিকাশের ঝামেলা পোহান। আমার এ-দায়িত্বভার ভাল লাগে না। তাই গিরমিকে বলি, হিসেব দেবার তোমার প্রয়োজন নেই, কিছু টাকা তোমার কাছে নিয়ে রাখ, রোজ যা খরচা হবে তাই থেকে করো।

এ শুধু আমার দৈনিক দেনা-পাওনা মেটানোর হাঙ্গামা এড়ানো নয়, মানুষকে মুক্ত মনে বিশ্বাস করার অসীম আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগও। মনুষ্যত্বের বিকাশেরও সহায়তা হয়।

এর পরেও দেখি, গিরমি শুধু খরচ করত গ্রামের ভিতর রাত-কাটানোর জায়গায়। দুপুরে রান্নার পাট বসাতো লোকালয়ের বাইরে, কখনও বনে-জঙ্গলে,—এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করত, পথে যেতে যেতে।

কিরান্‌টিচাপ ছাড়িয়ে পথ আবার নামতে থাকে। দু'পাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল আসে। এক ঘণ্টার মধ্যেই নীচে উপত্যকায় (৩,০০০ ফুট) পৌঁছে যাই। বড় নদী। ভোট বা ভোটে কোশী। ভাল পুলও। নেপালের

সুপ্রসিদ্ধ সপ্তকোশীর এক প্রধান ধারা। উত্তরে গৌরীশঙ্কর শিখর ছাড়িয়ে তারই পশ্চিমে তিব্বত-অঞ্চলে এর উৎস। নামেও বোধ করি তাই ভোট—অর্থাৎ তিব্বত। নদীর অপর পাড়ে পাহাড়ে ওঠা। উৎরাই নামলেই এ-পথের সেই চিরন্তন চড়াই।

আজ গিরমিরা একই সঙ্গে চলে। গিরমির গায়ে রঙিন ভাল সোয়েটার। পরনে কড়ুয়ের দামী প্যান্ট। পায়ে মজবুত পাহাড়ে-চলবার বুট্ জুতা। সবই ভাল হবার কথাই। বিদেশী বড় বড় হিমালয়-অভিযানে ঘুরে-আসা শের্পা, পাহাড়ে ওঠবার সাজ-সরঞ্জাম তো থাকবেই,—তার উপর ইউরোপ-আমেরিকা-ফেরত। পিঠেও তাই বিদেশী সুন্দর এক রুক্স্যাক্। যেন, দেহেরই এক অঙ্গ। পা ফেলে চলেও কেমন সহজ সাবলীল ছন্দে। অপর সেই দু'ভাই শের্পা,—নাম জিজ্ঞাসা করলে দুজনেই ধব্‌ধবে বড় ব · দাঁত বার করে হেসে বলে,—'দোর জে,'—ষণ্ডামার্কা কুস্তিগীরের মত বড়টা,—তার গায়ে বুকের বোতামখোলা খাঁকি শার্ট, হাতের আস্তিন গুটান,—যেন 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। পরনেও খাঁকি ফুল্ প্যান্ট,—তাও হাঁটু পর্যন্ত গুটান। খালি পা। হাঁটে যখন, পায়ের ডিমজোড়া শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে মুগুরের মতন। ছোট দোর্জিরও বেশভূষা দাদার অনুকরণে। বেঁটে ও বাচ্চা-মত দেখতে হলেও দাদারই সমান মাল বয় দেখি। কিন্তু এদেব এক-একজনের দ্বিগুণ-ভারী মাল একাই বয়ে নিয়ে চলে টামাঙ্ পোর্টারটি। অথচ, তার চেহারা রোগা, দেখেও মনে হয়, দুর্বল। বছর পঁচিশ বয়স। শ্যাম বর্ণ। গায়ে ছেঁড়া তালি-লাগানো শার্ট। পরনে সাদা ও নীল ডুরে কাটা আন্ডার-ওয়্যার। হাঁটুর উপর থেকে পায়ের নীচে পর্যন্ত খালি, জুতাও নেই পায়ে। দৈন্য-দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। মাথার সামনের দিকে কপালের একটু ওপরেই চওড়া মোটা ফিতে লাগিয়ে তারই সাহায্যে পিঠে মালের বোঝা নিয়ে উঠতে থাকে। মালের ভারে বেঁকা পিঠ, হেঁট মাথা। তার অপর দুই জাত-ভাই টামাঙ্ পোর্টার ডাক্তার বিশ্বাসদের সঙ্গে কাঠমাণ্ডু ফিরে গেছে। গিরমিরা—তিন শের্পা—একসঙ্গে মেলে-মেশে, হাসিঠাট্টা চালায়,—এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কমই। ভাষারও হয়ত অন্তরায়। কিন্তু আচরণেও স্পষ্ট ফুটে ওঠে, একে নীচু চোখে দেখে। এ-বেচারীও থাকে দূরে দূরে,—সমীহ করে। মহাপ্রভু চৈতন্য-ভক্ত যবন হরিদাসের মতন। যেন আপন অশুচি স্পর্শ বাঁচিয়ে। একাই একপাশে নিজের সামান্য যেটুকু রাঁধবার, রাঁধে। শোবার বিছানা পর্যন্ত নেই। একটা শতছিন্ন কম্বল জড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। এ দু'দিনই এই তারতম্য নজর করেছি। ভাবি, গিরমিকে একবার বলি, এ-সব ভেদাভেদ কেন? একসঙ্গে মিলেমিশে সবাই চললেই পারে। তখনি মনে হয়, নিশ্চয় এটা এদের মজ্জাগত জাতিভেদ। বললেই পারে। তখনি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব? কিন্তু, ঐ মালের অন্যায় ওজন-ভাগ? তিনজনের মধ্যে সমানই হওয়া উচিত। এখানেও কি দুর্বলের প্রতি সবলের চিরন্তন অত্যাচার! আমার চোখে দেখতেও বিসদৃশ লাগে। বেচারীর ঘর্মাক্ত ক্লান্ত

দেহ দেখে মনে ব্যথা জাগে। ভাবি, এ-অন্যায়ের জন্য দায়ী হয়ত আমিও।

আজও এই চড়াই উঠতে মাঝপথে গিরমিরা যথানিয়মে বিশ্রাম নিতে বসে। টামাঙ্ পোর্টার কিছু পরে এসে পেঁছায়। পিঠের বোঝা একটা উঁচু পাথরের উপর হেলান দিয়ে রাখে। তার T-আকারের হাতের লাঠিটাও পাশে থাকে। এ তার পথ-চলার নিত্য-নির্ভর অভিন্ন সাথী। গিরমিদের এড়িয়ে অল্প দূরে আর একটা পাথরের উপর বসে,—হাঁফাতে থাকে। কপাল থেকে ঘাম ঝরে। এক পা বেঁকিয়ে তুলে খালি-পায়ের চেটোর নীচে কি-যেন একমনে দেখে। ভাবি, হয়ত কিছু ফুটেছে!—হেঁট-মাথার সামনের দিকে চুলের উপর স্পষ্ট-দেখা যায়, বোঝা-বওয়ার ফেটির চাপে সেখানে চওড়া দাগ পড়েছে। সম্ভবতঃ, ঐ-ভাবে ভার-বওয়া পেশা বলে অনবরত চাপ পড়ে মাথার ব্রহ্মতালিতে লম্বা নালার মত একটু নেমেই গেছে। তাকিয়ে দেখি। মনের মাঝে কী যেন বেদনা বাজে। গিরমির কাছে এগিয়ে বসি। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি, মালগুলো সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়াই উচিত।

সে যে ঠিক এর মর্মার্থ বোঝে, মনে হয় না। তার নিজস্ব কারণ জানায়, শেরপারা বরফের রাজ্যে বা পাহাড়ের শীতপ্রধান দেশে মাল বইতে অভ্যস্ত। এখন আমরা চলি হিমালয়ের নিম্নদেশ দিয়ে;—পাহাড় হলেও শেরপাদের কাছে এসব গরম জায়গা, তাই তারা এখানে বেশি মাল বইতেই পারে না। টামাঙরা এখানে ভারী মাল বইতে অভ্যস্ত। ওর কাছে যে মাল দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভার সে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে,—তাই যায়ও এরা। কষ্ট হবে কেন? ঐ তো ওদের পেশা। আরও ঠাণ্ডা জায়গায় পৌঁছুলে মালের ভাগাভাগি আবার নতুন ভাবে হবে। এ-পথের এই-ই নিয়ম।

কথাটা যে অনেকাংশে সত্য কদিন পরে দেখতেও পাই। কিন্তু, এ-ব্যাপারের আর একটা দিকও হয়ত থাকে। টামাঙ্ পোর্টারটির কাছে তার এই ক্লেশ-ভোগের জন্য একদিন সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে দেখি, প্রকৃতই তার এ-সম্পর্কে কোন বোধই নেই, অভিযোগও নেই।

তখন ভাবি, মনের সুখ-দুঃখ, বেদনা-আনন্দ এ-সবই ব্যক্তিগত একান্ত নিজস্ব অনুভূতি। অপর মানুষের দরদী মনও আর একজনের মনোভাবের সঠিক গভীরতায় হদিস পায় না। সহানুভূতি সম-অনুভূতি নয়। কেউ বা বড় করে ভাবে, কারও বা চোখে লঘু মনে হয়।

মনে পড়ে, আমার এক নিকট-আত্মীয়ার কথা। বয়স্থা বিধবা। কৃতি সন্তানের সৌভাগ্যবতী জননী। হঠাৎ তাঁর স্ট্রোক্ হয়। শয্যাশায়িনী হন। বড় ছেলে বিলাতী পাস-করা ডাক্তার। কাজকর্ম সেরে বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যায় বিশ্রাম নেন। হঠাৎ দেখা যায়, মাথা এলিয়ে আসে, হাত ঝুলে গেছে। কখন মৃত্যু হয়েছে, কেউ জানতেও পারে নি। ওদিকে উপরতলার ঘরে মুমূর্ষু বৃদ্ধা জননী!—এক বছর পরে। মাঝে বৃদ্ধার আবার এক স্ট্রোক্ হয়। তবু, প্রাণটুকু নিয়ে সেইভাবেই পড়ে থাকেন। মেজ ছেলেও বিলাত-ফেরত নাম-করা

প্রফেসার। মায়ের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ক'মাসের ছুটি নেন। সারাক্ষণ মায়ের নিকটেই কাটান;—কখন কি হয়, বলা যায় না। কিন্তু, যা ঘটে তাও ভাবা যায় না। একদিন ছেলেকে বিকেলে এক জরুরী কাজে বাড়ির কাছেই কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে হয়। মাকে জানিয়ে যানও। একটু পরে ফিরেও আসেন। নীচের ঘরে খাটের উপর পা ছড়িয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম নেন। হঠাৎ ঘরের পাশ দিয়ে কে যেন যেতে গিয়ে দেখেন, মাথা হেলে পড়া, হাতও পাশে ঝোলা। তখনি ডাক্তার আসে। কিন্তু তার আগেই কখন সব শেষ!—খবর পেয়েই আমরা যাই। ওদিকে ওপরের ঘরে মা তেমনি শুয়ে। কেবল খবর নেন্, কই! এখনও ফেরে নি সে? এত দেরি করছে কেন?

দেরিই হয় মাকে জানাতে। না জানিয়ে উপায়ই বা কি? শুনে তাঁর যা হবার হবে। কিন্তু, হয় না এমন কিছুই। ডুকরে কেঁদে উঠে জ্ঞান হারান।

ভোরের দিকে শ্মশান থেকে ফিরে মায়ের খবর নিই। শুনি, একটু ঘুমুচ্ছেন।

বিকালে দেখা করতে যাই। কি করে কাছে গিয়ে দাঁড়াব, বলবই বা কি, কিছু ভেবে পাই না। মনে হয়, নিজেই যেন আমি দোষী।

উপরে যাই। মেঝেতে তাঁর শয্যাপাশে চুপ করে হেঁটমাথায় বসি। দেখে কেঁদে ওঠেন। কোন কথা বলি না। তারপর, নিজেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, কতক্ষণ লাগল সব শেষ হতে? কে কে শ্মশানে গিয়েছিলে, বাবা? কখন ফিরলে?—ইত্যাদি।—যেন, আর কারও সন্তান মারা গেছেন, তারই খোঁজখবর নেওয়া। উত্তর শোনেন, মাঝে মাঝে কাঁদেনও। কিন্তু কই! যে-রকম আশঙ্কা করি, সে ভাবের ভীষণ শোকের কোন প্রকাশই তো দেখি না!

তাই ভাবি, একের সহ্য-করা দুঃখ অপরের কল্পিত-ধারণায় একই ভাবে ধরা দেয় কই?

পাহাড়ের অনেকখানি উপরে আবার উঠে আসি। অল্পদূরে গ্রামও দেখা যায়। পথের পাশেই সুন্দর ঝরণা। গিরমিরা দেখি, পথ ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে অল্প উঠে মালপত্র নামায়! আশ্চর্য হই। আর একটু এগিয়ে—ঐ তো গ্রাম! সেইখানে থামলেই হত। আবার এখানে বিশ্রাম কেন?

প্রশ্ন করে জানতে পারি। অদূরে ঐ নামুডো গ্রাম,—ঠিকই। ৪,৭০০ ফুট। গ্রামের ভিতর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, গ্রামের জল-সরবরাহও এই ঝরণা থেকেই। তাই এইখানেই বিশ্রামের ও রান্নার আয়োজন সুবিধাজনক।

সুকল্পিত সিদ্ধান্ত,—নিঃসন্দেহে স্বীকার করি।

শুধু এখানেই নয়। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে প্রতিদিনই দুপুরের বিশ্রামের আশ্রয় গিরমি যে-জায়গায় নির্বাচন করে, তা প্রশংসনীয়। পথের নিকটে, অথচ অন্তরালে। লোকালয়ের বাইরে। একান্তে। নিত্য নূতন মনোরম পরিবেশ। স্থানগুলি যে হঠাৎ গিরমির নজরে পড়ে, তাও নয়। এ-পথের

আশপাশ সব কিছুই তার নখদর্পণে। জানে, পথের কতখানি গিয়ে আনাচে-কানাচে নিভৃত বিশ্রাম নেবার কোথায় সব চেয়ে সুন্দর জায়গা। ঠিক সেই-খানেই গিয়ে থামে। তাতে কোন দিন একবেলা চলা কম বা বেশি হয়, ক্ষতি নেই।

আজও তাই সকালে সাড়ে আটটা বাজলেও থেমে যায়। বলে, খাওয়ার পাট চুকিয়ে সারাবেলাই না হয় হাঁটা যাবে,—এমন জায়গা এর পরে আজ আর পাবেন না। পথে বদলাবার আমার জামা-কাপড়-গামছা-ভরা ঝোলা ও প্লাস্টিক সীট নিয়ে পাহাড়ের আরও খানিক উপরে ওঠে। বলে, আসুন, বসবেন ঐদিকে।

যে-জায়গায় নিয়ে আসে দেখে মন পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। পাহাড়ের কোলে একফালি সমতলভূমি। সবুজ কোমল ঘাসে ছাওয়া। তখনও শিশিরে ভেজা। কয়েকটি মাথা-উঁচু পাইন গাছ। তারই শীর্ণ পাতার জালিপথে সকালের মধুময় রোদ মাঠের বুকে ঝরে পড়ে। আলো-ছায়ার আলপনা আঁকে। শিশিরবিন্দু মুক্তার মত ঝকমক্ করে। সেইখানে গিরমি আমার বিশ্রামের আসন—সবুজ-প্লাস্টিক সীট পাতে। পাশে ঝোলাটি খুলে রেখে তখনি আবার নীচে—তাদের জায়গায় ফিরে যায়। কথা বলে আমার সঙ্গে খুব কমই। আপন মনে নিজের কর্তব্য করে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে।

প্লাস্টিকে বসে বুট খুলি। ঘামে-ভেজা গেঞ্জি জামা প্রতিদিনের অভ্যাস-মত তখন বদলে ফেলি। ব্যাগের মধ্যে রাখা লম্বা দড়ি বার করি। দুটো পাইন গাছের ডালে লম্বালম্বি টাঙিয়ে দিই। জামা, প্যান্ট, মোজা রোদে শুকায়। দশ মিনিটের মধ্যেই গিরমি আসে মগ্-ভরা গরম চা হাতে। প্লেটে বিস্কুট ও সেঁকা পাঁপড়। পাশে রেখে তখনি আবার আপন কাজে ফেরে। সেবা-ব্রতের যেন জীবন্ত মূর্তি। রোদে পা ছড়িয়ে বসে চা খাই। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। উপরে নীল আকাশ। মাঠের তিনদিক ঘিরে উঁচু পাহাড়। ঊর্ধ্ববাহু পাইনের সারি। মাঠের অপর অংশ নেমে যায় নীচের পানে। সেই-খানে শিলারাশির মাঝ দিয়ে বয়ে যায় ঝরণার ধারা। একটানা উচ্ছল কলধ্বনি কানে আসে। যেন সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে মৃদুমধুর বাদ্য বাজে। গিরমিদের গলার শব্দও মাঝে মাঝে অস্ফুট শুনি। ঐখানেই জলের কাছে, গাছের ছায়ায় তারা রান্না করে। চারিদিকে প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ রূপের ছটা। গভীর অন্তরে আনন্দের অনুভূতি জাগায়। দু চোখ মেলে চুপ করে শুয়ে থাকি; কি যেন এক ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে। স্পন্দনবিহীন এই প্রাকৃতিক জড়জগতের আমিও যেন এক নিস্পন্দ অঙ্গ।

অলক্ষ্যে বয়ে-যাওয়া ঝরণাধারার মত কোথা দিয়ে সময় বয়ে যায়। বেলাও বাড়ে। হঠাৎ একঝাঁক ফড়িং উড়ে আসে। বড় বড় ডানা। লম্বা দেহ। মাথার উপর চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে। নীচেও নামে। ঘাসেও বসে। আবার তখনি ওড়ে। কয়েকটা গায়ে এসেও পড়ে। কি জানি, ভাবে হয়ত সবুজ শেওলা-ঢাকা পাথরই হবে! নড়ি না, উড়িয়েও দিই না। শুধু চোখ ফিরিয়ে

দেখি, কেমন পাতলা ফিনফিনে পাখা, তারই মাঝে বিচিত্র রেখা,—যেন কোন নিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা। হঠাৎ ছড়ানো পাখনায় ঝিরঝির করে কাঁপন জাগায়। অদ্ভুত মুখ চোখ নাড়াতে থাকে। তখনি আবার ডানা মেলে বাতাসে ওড়ে,—বনবন্ শব্দ তোলে।

হঠাৎ অদূরে পাহাড়তলীতে ঝরাপাতার বুকে খস্‌খস্ আর এক আওয়াজ ওঠে। চমকে ফিরে তাকাই। বন্যজন্তু নয়। মানুষও নয়। গরুর পাল আসে চরতে। মাঠের উপর ঘুরে ঘুরে যায়। নির্ভয়ে নিকটেও আসে। দেখে হয়ত ভাবে, গ্রামেরই কোন লোক। গরুর সঙ্গে মানুষের মনের কোথায় যেন মিল থাকে।

কিন্তু, দেখেই অপরিচিত জানতে পারে আর এক আগন্তুকের দল! কোথা থেকে এক ঝাঁক কাকও এসে দেখা দেয়। গাছের মাথায়—চারিপাশে। দাঁড়-কাকের মত চেহারা। কুচকুচে কালো রঙ। পাখা ঝাপ্‌টে এ-গাছে ও-গাছে উড়ে চলে। তারপরেই বুঝতে পারি, এদের আবির্ভাবের কারণ। কেউ নামে মাটিতে, কেউ বা বসে গরুর পিঠে। গরুর গায়ের ও লেজের কাছে ঠুকরে ঠুকরে পোকা খায়। গরু চরে আপন মনে। খুরের চাপে গর্ত হয় মাটিতে। কাকও অমনি উড়ে বসে সেইখানে,—পোকামাকড়ের সন্ধানে।

দুই প্রাণীতে খাদ্যাখাদ্য বিচার-বোধের বিভেদ আছে, তাই খাদ্য-কাড়াকাড়ির বিরোধ নেই।

কিন্তু হঠাৎ আমাকে দেখেই কাকেরা আপত্তি জানায়। কা-কা শব্দ তোলে। তখনই দল পাকায়। ঝাঁকে ঝাঁকে আমার মাথার উপর ঘুরতে থাকে। বিকট কর্কশ কা-কা রব ছড়ায়। প্রকৃতির প্রশান্তি ভাঙে। আমারও বিশ্রাম-সুখের অবসান ঘটায়।

ভাবি, বায়স জাতির প্রতি মানুষের সাধারণ বিরূপ ভাব কি এখানেও কাকদের জানা? তারই কি এই প্রতিবাদ?

স্নান আহার সেরে আবার পথ চলা। বেলা এগারোটা মাত্র। সারাদিন ধীরেসুস্থে হাঁটা যাবে। আজ যেতেও হবে অনেকখানি। ইয়ারসা-তে।

নামডো গ্রামের মাঝ দিয়ে পথ। অনেক লোকের বসবাস। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাড়িঘরের চেহারায় ও সংখ্যার অনুপাতে বোঝা যায়। আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই, গ্রাম ছাড়িয়ে এসে দিগন্তজোড়া ধানক্ষেত দেখে। চারপাশের পাহাড় হঠাৎ যেন দূরে সরে দাঁড়ায়। সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা। সোনার বরণ ধানে ছেয়ে আছে। মৃদুমন্দ বাতাসে আনন্দে ঢেউ খেলে। পথ নেমে আসে ক্ষেতের ধারে। তারই মাঝে মাঝে গ্রাম। একটার নাম শুনি, কাবুরে। পথের ধারে কয়েকটা পাথরের মন্দির। দেখে মনে হয় প্রাচীন, কিন্তু মূর্তিগুলি শিল্প-সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না। বিবিধ দেবদেবীর বিগ্রহ। শিব তো আছেনই, হরপার্বতীও, আবার গরুড়বাহন নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীরামচন্দ্র—সবারই দর্শন মেলে। তবে এখন নিয়মিত পূজা পান কিনা জানি না,—বিশেষ লক্ষণও

দেখি না। পথের পাশে হলেও গ্রামের বাইরে। লোকজন এ-সময়ে এখানে কেউ নেইও মন্দিরের সম্মুখে বড় গাছের ছায়া। নিকটেই জলের ধারা। এই সব দেখেই পথের উপর রোদের তেজ আরও উগ্র বোধ হয়। আহারের পরই হাঁটা শুরু। পা যেন চলতে চায় না। তৃষ্ণায় কণ্ঠও শুকোয়। তাই অল্প মাত্র হাঁটা হলেও ছায়াতলে ক্ষণিক বিশ্রাম নিই। স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর জুড়ায়। স্বচ্ছ শীতল জলে তৃষ্ণা মেটায়। সম্মুখের পথের আবার আহ্বান শুনি। অলস আসন ছেড়ে এগিয়ে চলি।

চওড়া বড় রাস্তা,—তবুও ধানক্ষেতের মধ্যে নিজেকে হারায়। পায়ের নীচে যেদিকে তাকাই কেবলই জল কাদা। কোথাও সরু আল,—তারই উপর কোন রকমে ভার সামলে এগিয়ে যাওয়া; কখনো বা নিছক জল ও কাদা,—অগত্যা তারই ভিতর নির্বিচারে পা ডুবিয়ে চলা। জল কাদা মেখে জুতো সপ্‌সপে ভিজে ভারী হয়ে ওঠে। কোথায় কিসের মধ্যে পা ফেলি, জানাই থাকে না। তার উপর সদাই ভয়,—এই বুঝি বা পা পিছলায়! লাঠিতে শক্ত করে ভর দিয়ে ভরসা পাবার চেষ্টা করি। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে কোন-প্রকারে গিরমিদের ঠিক পিছু পিছু চলি। তাদের সঙ্গ ছাড়লে—কোন্ দিক ধরে যেতে হবে, বোঝাই অসাধ্য।

কিন্তু, এ-সবই মনের সাময়িক চাঞ্চল্য। এই দুস্তর-কর্দম-পারাবারেরও শেষ আসে। ক্ষেতের বিশাল রাজ্য ছেড়ে সেই দিগ্বলয়ের কোন্ এক পাহাড়ের পদতলে আশ্রয় পাই। মাথা তুলে তাকাই কিন্তু পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না। সামনেই দেখি, পথের আবার চড়াই। হাসি পায় ভেবে,—জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ! কিন্তু, বনেজঙ্গলে যেমন বাঘেরও ভয় পাই না, তেমনি পাহাড়ে ঘুরতে চড়াইও ভয় জাগায় না। নাগরদোলায় উঠে উপর-নীচে ঘুরপাকের ভয় রাখলে চলে? সেই ওঠা-নামাতেই তো মনের হরষ।

গিরমি জানায়, এইবার এই পাহাড়ই ডিঙোতে হবে। তবে, আজই তা আর সম্ভব নয়। বেশ অনেকখানি উঠে ইয়রুসাখোলা নদীর ধারে ইয়রুসা গ্রাম। সেইখানে আজ রাত-কাটানো। বাকি চড়াই ওঠা কাল সকালে।

পিছন ফিরে তাকাই। সেই ভীতিবহ ক্লান্তিকর কর্দমাক্ত পথ,—কোথায় যেন লজ্জায় তার কুৎসিত মুখ লুকায়, এখন আবার দেখা যায়, সেই দিগন্ত-প্রসারী স্বর্ণবরণ ধানের ক্ষেত,—তারই উজ্জ্বল মধুর মূর্তি।

সোৎসাহে উঠে চলি চড়াই পথে। বেলা সাড়ে চারটেয় ইয়রুসাতে পৌঁছেও যাই।

গ্রামের নামের মধ্যেও যেমন তিব্বতী ইঙ্গিত, পথের মাঝেও তেমনি তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ,—সারি সারি মণিপ্রাচীর, chortens। ভাবি, যাক্,—গিরমির স্বধর্মীদের এলাকা,—এবার আর থাকবার জায়গার ভাবনা থাকবে না। কিন্তু, দেখি, গিরমির দুর্ভাবনার এখনও শেষ নেই। সব বাড়ির কর্তা-গিন্নী ঘাড় নাড়ে,—'ছুই না'—নেই! তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্মের চিহ্নগুলি শুধু পথেরই সজ্জা। গ্রামবাসীরা প্রায় সবাই নেপালী হিন্দু।

অবশেষে, আজও আবার একটা একতলা ঘরের বাইরে খোলা দালানে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়। তবে, গত রাতের মত মুরগি, ছাগল ও কুকুরের সঙ্গ বা রুগ্ন শিশুর সকাতর কান্না-কাশি,—কোন কিছু নেই। নেই বটে,—কিন্তু বারান্দার খোলা পথে দেখতে পাওয়া তারা-ভরা আকাশ এক সময়ে কালো মেঘে ছেয়ে আসে। থেকে থেকে বিদ্যুতের চমক হানে। গুরু গুরু মেঘ ডাকে। তারই মধ্যে ক্লান্ত চোখে কখন ঘুম নামে, জানি না। জানতে পারি, মাঝরাতে যখন ঘুম ভাঙে,—জলের ঝাপটা লাগে মুখে। তাকিয়ে দেখি, ঝমাঝম্ বৃষ্টি নেমেছে। ছাট আসে বারান্দার এই দিকেই। সরে শোবার কোন জায়গাও নেই। আরও একটা প্লাস্টিক্ সীট্ পায়ের কাছেই ছিল। গায়ের উপর তাই বিছিয়ে রাত কাটিয়ে দিই। বিছানা ভেজে। নিরুপায়। ভাবি, শুকিয়ে গেলে তখন আর তো ভিজে থাকবে না!—আপন মনেই হাসি।

আশ্চর্য মানুষের মন! অসীম এই হিমালয়-পথের প্রভাব। সভ্য-শহরের পাকা বাড়ির মধ্যে সুখ-শয্যায় শুয়ে রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত মনে বিরক্তি জাগায়, সকালে দেহে অবসাদ আনে। অথচ, এখানে এই বিজন রাতে ভূমিশয্যায় প্রকৃতির বিপর্যয় মনে কৌতুকময় আনন্দই জাগায়। মনে হয়, এ-পথের এই-ই তো রীতি। যেন, অবোধ শিশুর ভালবাসার উপদ্রব। রাগ-বিরক্তি,—ও-সব তো লোকসমাজে ফেলে-আসা মনের জাল-জঞ্জাল!

যথারীতি অতি ভোরেও তাই শয্যা ছাড়ি। আবার, অজানা পথের ডাকে মন মাতে।

৩রা অক্টোবর। চা রুটি খেয়ে সকাল ছ'টায় যাত্রা। মুক্ত আকাশতলে পথই যেন সারাদিনের ঘর। দু-তিনশ' ফুট চড়াই ওঠার পর গভীর বনের ভিতর পথ ঢোকে। বনের সঙ্গে যেন খেলা শুরু হয়। পথ কখনও ওঠে, কখন নামে,—তবুও বেশ বোঝা যায়, ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের উপর অংশই উঠে চলে। চারিপাশে বড় বড় গাছ। নানান্ জাতীয় গাছের সমাবেশ। **Pinus, Alnus, Rhododendron** ও **Symplocos**-ই বেশি। ঘন বন। আবছা অন্ধকার। মাঝে মাঝে ঝরণার ধারা। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। পথের উপর ও আশপাশে ভিজে ঝরা পাতা। তাই, জোঁকেরও উপদ্রব। ভাবি, জলা জায়গায় জন্ম বলেই শুদ্ধ ভাষায় কি এর নাম হয়--জলৌকা! কিন্তু ভাবনা মাথায় ওঠে। অমন ক্ষীণদেহী নগণ্য জীব, তবুও তার আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই, সাধ্য কী! পায়ে জুতোর উপর তো লম্বা হয়ে ওঠেই, এমন কি গাছ থেকে মাথার ও গায়ের উপরও পড়ে। হঠাৎ হাতের দুই আঙুলের ফাঁকেও নজর পড়তেই চমকে উঠি, এ কী! সেখানেও রক্তারক্তি কাণ্ড!—নিশ্চয় কখন হাতের লাঠি বেয়ে উঠে আঙ্গুলের খাঁজে এসে ধরেছে! টেনে ছাড়ানোই মুশকিল। যেন শিকড় গেড়ে আঁকড়ে থাকে। রক্ত খেয়ে থল্‌থলে হাত দিতে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে। শুনি, পকেটে নুন রাখলে এবং কামড়ে ধরলে গায়ে ছড়িয়ে দিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হবেও বা। তবে, এদের রক্তপানের

পর্বও ক্ষণস্থায়ী। সরু সুতোর মত দেহ, ইঞ্চিখানেকও লম্বা হবে না। কেঁচোর মত দেখতে হলেও এরা বুকে হাঁটে না। মাটির উপর লক্‌লকে কাঠির মতন খাড়া হয়ে আরও যেন লম্বা হয়, তারপর ধনুকের আকারে বেঁকে আবার মাটিতে ভর দিয়ে এগোতে থাকে। যেন শুঁড় নেড়ে স্প্রীং-এর মত চলে। জুতো, মোজা, জামা, টুপি—কোন কিছুই এদের গতিরোধ করতে পারে না,—অনায়াসে ভেদ করে শরীরের যে-কোন স্থানেই চেপে বসে। তারপর রক্ত শুষে ফুলতে থাকে ;—ছোট পটকার মত। কর্মফলও ভোগ করে। পেট ভরে অতিরিক্ত শোষণের ফলে আপনি ফেটে শেষ হয়। তখন, দেহের সেই আক্রান্ত স্থানে রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্য। এমন নিষ্ঠুর আত্মঘাতী আক্রমণ, তবু হাঁটবার সময় বোঝাই যায় না,—কখন ধরে, কখন শোষে। জামা জুতো মোজা খুলতে গিয়ে তখন দেখা যায়, গাঢ় জমাট রক্ত, জামাও রক্ত-রাঙা !

হিমালয়ের পথে স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলে ঢুকলেই এই এক বিপত্তি। বাঘ, ভালুক, সাপের কোনও অত্যাচার নয়, ক্ষুদ্রকায় জোঁকের রক্তক্ষয়ী উপদ্রব। ভাবি, এ-যেন হিমালয়েরও বিরাট উদরে কৃমি-রোগ। নশ্বর জড় দেহধারণেরই যেন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

জোঁকের আক্রমণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি চড়াই-ওঠার ক্লান্তি ভোলায়। অবহেলিত চড়াই-পথও তাই তখনি সজাগ হয়ে মাথা তুলে অস্তিত্ব জানায়। শুরু হয় খাড়া চড়াই। কিন্তু তাও অবশেষে শেষ হয়। পথ উঠে আসে এই পাহাড়ের কাঁধে। প্রায় আট হাজার ফুট উপরে। এতক্ষণের পথ চলার বাধা বিঘ্ন দুর্গমতা নিমেষে কোথায় হারিয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সুমুখে দূরে দেখি তুষার-শিখরের অপরূপ সৌম্য কান্তি। মেন্‌লুংগৎসে ও গৌরীশঙ্কর। যেন গিরিরাজ আলোকোজ্জল আননে অমল-শুভ্র-করুণাঘন দৃষ্টি ফেলেন। শিখর দুটির বাঁ দিকে বিশাল এক রুক্ষ কঠোর খাড়া পাহাড়। যেন শিলা-বর্ম-এঁটে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মায়া-মমতাহীন বর্শাধারী এক কাফ্রী প্রহরী—রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে। নাম শুনি তার তেমনি,—চবু বামারে (১৯,৫৫০ ফুট)।

এবার পাহাড়ের অপর দিকে নামা। কিছুদূর পথ ধীরে ধীরে নামতে থাকে। সুমুখে পূব দিকে সুচালো আর এক তুষারশিখর দেখা দেয়। নাম তার—নুম্‌বুর্‌। ২২,৮১৭ ফুট উঁচু। ১৯৬৩ সালে জাপানী এক পর্বতারোহীর দল ঐ চূড়ায় ওঠেন। ভাবি, কোথা থেকে তাঁদের কোথায় আসা !

কিন্তু আমার দৃষ্টি তখনি নামাতে হয় পায়ের দিকে। শুরু হয় খাড়া উৎরাই। *পথের উপর কেবলই পাথরের পর পাথর। যেন ধাপের পর ধাপ।* হাতের লাঠির উপর দেহের ভার সামলে নেমেই চলি। নিম্নমুখী পথ আপনা থেকেই চলার বেগ বাড়ায়। পাথরের ফাঁকে, পাহাড়ের গায়ে লাঠির খোঁচা মেরে গতিবেগের 'ব্রেক' দিই,—আবার হুড়হুড় করে নেমে চলি। নামার ছন্দে মনে

পুলক জাগে। Zig-zag পথ। বাঁকের কাছে মাঝে মাঝে বহু নীচে নদীর ধারে গ্রাম দেখা যায়। মনে পড়ে, গিরমি বলেছে, আজ দুপুরে উৎরাই-শেষে খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম,—সিকুরি গাঁও-এ। ভাবি, ঐ হবে, বোধ হয়, সেই আশ্রয়। গতিবেগ আরও উদ্দাম হয়। তখন স্মৃতিপথে ভেসে আসে অনেকদিন আগেকার এক ঘটনা।

মেজদাদা গেছেন সিমলা পাহাড়ে। একদিন সেখানকার জ্যাকোহিলের মাথায় ওঠেন। চড়াই-পথে ওঠার ক্লেশও ভোগ করেন। তারপর, নামার পালা। তখন দেখেন, বাঃ! নামতে আর দমই লাগে না। মনে স্ফূর্তি জাগে। সবেগে নামতে থাকেন। তরুণ বয়স, তবু ভারী দেহ। উৎরাই-পথে ক্রমেই চলার বেগ আপনা থেকেই বেড়ে ওঠে, ইচ্ছা না থাকলেও ছুটতে থাকেন। তখনি বোঝেন, চলন্ত পায়ের উপর তাঁর আব কোন প্রভাব নেই,—পাগলা ঘোড়ার মত আপন খুশি অনুযায়ী পা যেন ছুটে চলে। গতিবেগ রোধ করাব ক্ষমতা হারান। অথচ, ঐ দেখা যায় সুমুখেই পথের বাঁক। গতি মন্থর করে সেখানে মোড় ঘোরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ, বাঁকের মুখেই পাহাড়েব গভীর খাদ, যেন হাঁ করে এগিয়ে গিলতে আসে। চুম্বকের মত দেহ সেইদিকেই ছুটে চলে। জীবনরক্ষার আর কোনই উপায় নেই। একান্ত অসহায় ভাবেই দু হাত বাড়িয়ে যেন অদৃশ্য বাতাসকেই জড়িয়ে ধরতে চান। আতঙ্কে চোখ বোজেন। এখনি সব শেষ। নিমিষ মাত্র। হঠাৎ কী যেন ঘটে যায়। মোড়ের মাথায় সেই ছোটার মুখে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। শূন্য বাতাস যেন জমাট আকার নেয়। প্রাণপণে জাপটে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়েন। চমক ভাঙে যখন তাকিয়ে দেখেন, নাঃ! খাদের মধ্যে তো নয়। পথেরই উপর ধরাশায়ী দেহ। অদূরে আর এক ব্যক্তি। সেও সটান চিৎ হয়ে পড়ে। একমুখ কালো দাড়ি,—পাজামা, ওয়েস্ট কোট পরা এক মুসলমান। পথের আর এক পাশে একটা টিনের কালো বড় বাক্স,—উল্টে পড়া ডালা খোলা। রাস্তায় ছড়িয়ে আছে,—একরাশ বিস্কুট, কেক, পাঁউরুটি ইত্যাদি। সেই মোক্ষম মুহূর্তে রুটিওয়ালাও বাক্স মাথায় মোড় ঘুরেছে, ইনিও পৌঁছেছেন, জাপটে ধরেছেন। ধরাশায়ী লোকটির তখনও হতভম্ব স্তম্ভিত ভাব। উঠে বসবার চেষ্টা করে। তার আগেই মেজদাদা উঠে দাঁড়ান। পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে লোকটির কাছে ফেলে দিয়েই আবার তখনি নামতে থাকেন। কানে ভেসে আসে সেই রুটিওয়ালার মধুক্ষরী গালিবর্ষণ।

আপন মনে হাসতে হাসতে মেজদাদা নেমেই চলেন,—যেন স্বপ্নে-দেখা নিশ্চিত-মরণের কবল থেকে রেহাই পেয়ে জেগে ওঠা।

মনে পড়ে আজ এই উৎরাই নামতে সেই কথাই। আপন মনে আমিও হেসে উঠি। গতিবেগও আপনা থেকেই শিথিল হয়।

নীচে নদীর ধারে পৌঁছুই। বেলা ৯টা ১৫ মিনিট। ছোট পাহাড়ী নদী। নাম সিকুরিখোলা। কাঠের ছোট পুল। ওপারে খানকয়েক চালাঘর।

তারই একটায় গিরমিরা মালপত্র রাখে, রান্নার আয়োজন করে। আজ দুপুরের বিশ্রাম বনের মধ্যে নয়। আমার মন কিন্তু চায় না লোকালয়। তাই, চলি নদীর ধারে। জায়গাও মেলে মনোমত। চারিপাশে বড় বড় কালো পাথর। তারই মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথ করে জলধারা বয়ে চলে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে নদীর বুকে এগিয়ে যাই। জল-ঘেরা দ্বীপের মত মাথা তুলে সমতল একটা বড় পাথর। তারই উপর আরামে বসি। পা-ছড়িয়ে বিশ্রাম নিই। গিরমি দূরে থেকে দেখে। রুকস্যাক দিয়ে যায়। বোঝে, নদীতে আজ চমৎকার স্নানের আকর্ষণ আমার মন টানে। অল্প পরেই গরম চাও আনে। উত্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ পাহাড়ের পিছনেই জিরি। প্রায় ৬৮০০ ফুট উঁচুতে। মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের পথ এখান থেকে।

নাম শুনে মনে পড়ে, জিরির কথা কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জির কাছে শুনেছিলাম। সুইস্ গভর্ণমেণ্ট নেপাল সরকারকে সাহায্য করার যে-সব আয়োজন করেছেন, জিরি তার এক প্রধান কেন্দ্র। উন্নত কৃষিকর্মের শিক্ষাকেন্দ্র। উৎকৃষ্ট পনির—cheese—উৎপাদনের কারখানাও খোলা হয়েছে। শুধু ওখানেই নয়। নেপালের আরও কয়েকটি অঞ্চলে। নেপালে তৈরি এইসব পনির এখন বিদেশেও চালান যায়। হল্যাণ্ড-এর প্রসিদ্ধ পনিরের সমতুল্য বলে এর খ্যাতিও পেয়েছে। জিরিতে সুইসরা সুদূর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য চিকিৎসাদিরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজকর্মের সুবিধার উদ্দেশ্যে বেতার যোগাযোগ—Radio communication তো আছেই, এমন কি air-stripও তৈরি হয়েছে,—প্রয়োজন মত ছোট প্লেন ওঠে নামে।

আমার গন্তব্যপথে জিরি পড়ে না। এখান থেকে ও-বেলায় আজ সোজা যাব Those—থাম। জিরি ঘুরে ভিন্ন এক পথে থোসে পৌঁছানো যায়, তবে একদিন সময় বেশি লাগে। এই পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশীদের সহায়তায় এই পরিকল্পনা প্রশংসনীয় হলেও এবং জিরি-প্রবাসী সুইসদের সযত্ন সেবার সুনাম থাকলেও ও-পথে আমার মন টানে না। ভাবি, কেন আবার ঐ সভ্য সমাজের ক্ষণিক ভোগ-বিলাস? তাই গিরমিকে বলি, এখানে থেকেই সোজাসুজি থোসে এগিয়ে যাব।—রোদে গা এলিয়ে আরামে পাথরের উপর শুয়ে থাকি। নদীজলের কলগীতি শুনি। চারিপাশের উঁচু পাহাড়গুলি যেন মাথা হেঁট করে স্থিরনয়নে আমাকে দেখতে থাকে।

স্নান-আহার-বিশ্রাম সারা হয়। আবার যাত্রা। বেলা মাত্র এগারোটা। নদীর ধার দিয়ে খোলা পথ। 'খোলা'—অর্থেই ছোট নদী। অল্প গিয়ে যাবার পর নদীর বুকে নামতে হয়। আশ্চর্য লাগে,—ছোট নদী, বুকে হঠাৎ এতো প্রকাণ্ড চর! অতোগুলি জলের ধারাই বা এল কোথা থেকে? তখন দেখি, সিকরি এখানে একাকিনী নন, অনেকগুলি গিরিবালার সম্মেলন। চারিদিকের পাহাড়ের খাড় থেকে নেমে-আসা কয়েকটি নদীরই এটা সঙ্গম। তাই দেখায় যেন পাহাড়ের বাঁধ-ঘেরা শুকিয়ে আসা প্রকাণ্ড এক দীঘি। সেই

চর ভেঙেই চলা। কাদা নয়, পাথর নয়,—নরম বালির উপর দিয়ে হাঁটা। দুবার জলের ধারাও পার হতে হয়। তাতেও অসুবিধা নেই। লম্বা কাঠের তক্তা ফেলে যাতায়াতের ব্যবস্থা। টাল সামলে চলতে পারলেই হল।

নদী ছাড়িয়ে আসতেই অপর দিকের পাহাড় যেন দু হাত ছড়িয়ে গতিরোধ করে। ভাবটা দেখায়, হিমালয়ে এসে বেশ মজা করে সোজাপথে হাঁটছে? আরাম পেয়েছে খুব। এবার ওঠো চড়াই।—যেন শাসন-প্রিয় কঠোর শিক্ষক ছাত্রকে সুস্থির হয়ে থাকতে দেন না। কিন্তু ভয়েরও কারণ থাকে না। অক্লেশে চড়াই শেষ করি। পাঠশেষে তুষ্ট শিক্ষকও যেন এবার হাসিমুখে বলেন, বেশ, এখন যেতে পার আবার নেমে।

পাহাড়ের অপর দিকে দেখি শুরু হয় আবার উৎরাই। ভাবি, এইজন্যেই কি বলে, The way up is the way down! চারিদিকে পাইনের গাছ। পাইনের ঝরঝরে বিশুষ্ক পরিবেশ। সুমিষ্ট সুবাস। নতুন উপত্যকা। নতুন এক নদীও। খিমটি খোলা। অপর পারে কিছু দূরে নদীর তীরে থোসে-গ্রামের বাড়ি-ঘর। লোহার পুল পার হয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলি। বেলা মাত্র তিনটা। পথে গেরুয়াধারী এক সাধুজির সঙ্গে দেখা। সঙ্গে তাঁর তিনজন অনুচর। আমার দিকে তাকান। প্রশ্ন করেন হিন্দীতে, এদিকে কোথায় চলেছি?—ভাষা ও মুখের আকৃতি দেখে বোঝা যায়, ভারতের অধিবাসী। থোসেতে রাত কাটাব শুনে সাগ্রহে জানান, তাঁর আশ্রম এখানে। পথের নিকটেই। অথচ গ্রামের বাইরে। শান্ত জায়গায়। স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকতে পারি। কয়েক বছরই হল এখানে আছেন, নিজের আশ্রমও গড়েছেন।

আমারও কৌতূহল জাগে। এ-পথে আর ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসী দেখিনি। আগে নয়, পরেও নয়। হিমালয়ের এটা কোন নির্দিষ্ট হিন্দু-তীর্থপথও নয়। ভাবি, গিয়ে তাঁর সঙ্গে রাত কাটালে মন্দ কী! দেখা যাবে, কি ধরনের সাধু, গ্রামের নিকটে এখানে আশ্রম করার উদ্দেশ্যই বা কী!—যদিও কথাবার্তার বাঁধুনি দেখে মন তেমন টানে না। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁর সঙ্গে কথা বলি। হিমালয়ের কতো দুর্গম তীর্থগুলিতে ঘুরেছেন, সাধন-ভজনের কতো অনুকূল হিমালয়ের আবেষ্টন, সংসারে কতো মায়ার বন্ধন ইত্যাদি শোনাতে থাকেন। তাঁর ভক্ত সহচররা শ্রদ্ধা-বিগলিত-নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়ে।

গিরমিবা এসে পৌঁছায়। সাধুজির আশ্রমে রাত-কাটানোর প্রস্তাব শোনা-মাত্রই নাকচ করে। দৃঢ় মত জানায়, গ্রামের মধ্যেই থাকতে হবে। সেখানে বড় বাজার, দোকানপাটও। পোর্টারদের আটা আলু ইত্যাদি কেনা প্রয়োজন। তাছাড়া কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জি সঙ্গে চিঠি দিয়েছেন থোসের নাম-করা ধনী ব্যবসায়ী—অমৃত বাহাদুরের নামে। এখানে তাঁর চমৎকার বাড়ি। থাকবার ব্যবস্থা সেইখানেই হবে।—সাধুজির দিকে কটাক্ষ করে বলে, ওঁর ওখানে আবার থাকবেন কি?

গিরমি কাঠমাণ্ডু শহরে থাকে। সেখানে পশুপতিনাথ-দর্শনে বহু সাধু

আসেন। তাই, হরেকরকম সাধু-সন্ন্যাসী তার দেখা। মতামতও তার সেই ভাবেই গড়ে ওঠে।

অতএব, সাধুজিকে নিরাশ করে গ্রামের দিকেই এগিয়ে যেতে হয়।

থোসে প্রায় ৫,৭০০ ফুট উঁচু। গ্রামের নিকটেই ছোট আর এক নদী পাহাড় থেকে নেমে এসে খিম্‌টিখোলায় মেশে। তারই উপর কাঠের পুল। ওপরে অতি সুন্দর কয়েকটি বাড়ি। পাথর ও কাঠের তৈরি। তিনতলা। চারিপাশে জানলা, বারান্দা। কাঠের উপর কারুকার্য। গিরমি সগর্বে জানায়, এর অধিকাংশ বাড়ি সোলুর শেরপা ব্যবসায়ীদের।

পুল পার হয়ে বাড়িগুলির এলাকায় প্রবেশ করি। ফুল ও ফলের সাজানো বাগান। নানারকম ফুল ফুটে আলো করে আছে। আপেল গাছে তখনও কয়েকটি ফল ঝোলে। বাগানের মাঝে মাঝে পথের উপর কাঠ ও বাঁশের তৈরি তোরণ। কোথাও আঙ্গুরের সবুজ লতায় ছাওয়া। কোথাও বা লতানে গাছে সাদা ও লাল গোলাপগুচ্ছের বাহার। বাগান ও বাড়ির চেহারা দেখে ভাবি, কোন্ রাজার প্রাসাদ-এলাকাতেই বুঝি ঢুকি। গিরমি বাড়ির ভিতরে যায়। আমি বাগানে অপেক্ষা করি। অল্প পরেই ফিরে আসে। অমৃত বাহাদুর বাড়িতে নেই। দুটি সুশ্রী তরুণী বাড়ির বাহিরে আসেন। রাজ-কন্যার মতনই দেখতে। যেমন রঙিন দামী বেশভূষা, তেমনি গায়ের রঙ, চোখমুখের গড়নও। কিন্তু এ কী - অমৃত বাহাদুর নাম শুনে ভেবেছিলাম নিশ্চয় নেপালী হিন্দু। এঁরা কাথা। তিব্বতীদের মতো সাজসজ্জা, প্রসাধন। হাতে গলায় কানে সেই সবুজ, নীল, লাল পাথর-বসানো একরাশ অলঙ্কার ঝলমল করে। পিঠে ঝোলানো বেণীতে কেশের বিন্যাসও পরিপাটি। মুখভরা হাসিখুশি।—গিরমি পরিচয় দেয়,—অমৃত বাহাদুরেরই দুই মেয়ে। বাপের-নামে-লেখা চিঠিখানি হাতে নিয়ে দুজনে কোনরকমে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে। আমার দিকে তারই ফাঁকে বার বার তাকায়। অবশেষে গিরমিকে জানায়, তাদের বাবার বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হবে,—সামনের ঐ যে তিনতলা আর একটা বাড়ি, ঐখানে আমরা রাত কাটাতে পারি।—তারপর দুই বোনে আবার কি যেন পরামর্শ করে বলে, মালপত্র ওখানে রেখে তাদের বাড়িতে যেন চা খেতে আসি।

সেই বাড়িতেই গিয়ে উঠি। দেখি ব্যবসার মালপত্র রাখার ব্যবস্থা সেখানে। তা হোক। প্রকাণ্ড বাড়ি। নড়বড়ে উঁচু উঁচু ধাপের কাঠের সিঁড়ি। তাই বেয়ে তিনতলায় যাওয়া। সেখানে মালপত্র। কাঠের বড় বড় বাক্স, চটের বস্তার স্তূপও। তাতেও অসুবিধে নেই। বিরাট হলঘর। বড় বড় খোলা জানলা। পাশেই কাঠের খোলা বারান্দা। জানলার ধারে বারান্দাতেই বিছানা পাতি। অল্প পরেই গিরমি এসে ডেকে নিয়ে যায়,—চা খাওয়ার ডাক পড়েছে। অমৃত বাহাদুরের বসবাসের বাড়ির বাইরের ঘরে ঢুকি। গিরমি বাইরেই থাকে। ঘরখানি সাজানো-গোছানো। মেঝে ও

তিব্বতী মোটা কার্পেট বিছানো। ভাল পালিশ-করা কাঠের বড় বড় গদিওয়ালা চেয়ার। ঘরের কাঠের দেওয়ালে তিব্বতী টঙ্কা, ছবি, মুখোশ ইত্যাদি ঝোলে। বাড়ির বাইরে শীত। ঘরের ভিতর গরম ভাব। চীনা কাপ-ডিসে চা আসে। সঙ্গে বিস্কুটও। মেয়ে দুটি সমাদরে অভ্যর্থনা করে। কিন্তু কেউ কারও ভাষা বুঝি না। তাই কথাবার্তাও চলে না। দুই বোনে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে, কেবলই হাসে। আমিও মুখে হাসি নিয়ে চা পান করি।

আবার নিজের আস্তানায় ফিরি। প্রচুর বেলা আছে তখনও। ভাবি, কি হবে ঘরে বসে? বাজার অপর পারে। সেদিকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তবু একবার ঘুরে দেখে আসি। রাস্তার দুধারে দোকানপাট। ছোটখাটো শহরের মতন। লোকজন ঘোরে, কেনাবেচাও চলে। গিরমিদেরও দেখা যায় একটা দোকানে। আবার ভাবি, কি হবে রাস্তায় ঘুরে এখানে? ফিরে আসি। নদীর ধারে নির্জনে গিয়ে বসি। স্রোতের দিকে তাকিয়ে মন ভেসে চলে কোন সে সুদূরে, কি জানি। অলক্ষ্যে সময়ও কেটে যায়, বেলাও পড়ে আসে। শীতের পরশ পেয়ে সজাগ হই। নিজের ডেরায় ফিরি। স্লিপিং ব্যাগ গায়ে টেনে আরামে লম্বা হয়ে শুই। বাইরে দিনের আলো আরও ক্ষীণ হয়ে আসে, দূরের পাহাড় কালো হতে থাকে। হলের মধ্যেও অন্ধকার জমে ওঠে। নিরিবিলি বিশ্রাম-সুখ চোখে তন্দ্রা নামায়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পায়ের শব্দ কানে আসে। গিরমিরা ফিরল তাহলে? অস্পষ্ট ছায়ার মত তিনটি মূর্তি হলে উঠে আসে। নাঃ! তারা নয়ত। এই বিজন পুরীতে এরা আবার কারা? নিকটে এলে দেখি তিনটি পাহাড়ী ছেলে। বছর পনের-ষোল সব বয়স হবে। সটান এসে আমার বিছানার পাশেই জানলার ধারে বসে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। আমি যেন কাঁচের জলভরা-পাত্রে-রাখা লাল-নীল মাছ! বিরক্তি বোধ হয়। জিজ্ঞাসা করি, কি চাই?

একজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে জানায়, গ্রামের মধ্যে গিরমিদের কাছে আমার খবর পেয়ে দেখতে এসেছে। এখানকার স্কুলের ছাত্র। ছেলেটি সগর্বে নিজের গ্রামের গৌরব জানায়,—থোসে এ-অঞ্চলের গ্রাম নয়,—শহর! কতো বড় বড় বাড়ি, দেখেছেন? বড় বাজারও।—ব্যবসার মস্ত একটা কেন্দ্র কিনা। জানেন? ঐ খিমটিখোলায় যে-সব পাহাড়ী নদী এসে মিশেছে, তার মধ্যে একটা হল ঘাট্রেখোলা। সেই ঘাট্রেখোলার ধারে পাহাড়ের মধ্যে লোহার খনি আছে,—শহর থেকে মাত্র এক ক্রোশ দূরে। সেই লোহা চালান যেতো তিব্বতে। এখন অবশ্য খনির কাজ বন্ধ,—আবার খোলবার চেষ্টা হচ্ছে।—গম্ভীর হয়ে খবরগুলি জানায় দূরদেশী এক পথিককে।

ভাবি, ঐ খনির কাজ যে কেন বন্ধ করতে হয় তা বেচারীর জানা নেই। জানা থাকলে একজন ভারতীয়কে সে ভিন্ন-দৃষ্টিতে দেখতো।

প্রকৃতই, থোসে গ্রামের সেই খনিজাত লোহা তিব্বতে চালান যেত এবং

সুদূর তিব্বতের লোহা আমদানি করার এই-ই ছিল পথ। পরে, কালিম্পঙ-গাংটক হয়ে তিব্বতে প্রবেশ করার বড় রাস্তা খোলে, সেইদিকে মোটর-পথও অনেক দূর এগিয়ে যায়, তিব্বতে লোহাও চালান হতে থাকে ভারত থেকে। থোসের খনির কাজও বন্ধ হয়।

কিন্তু তখনি আবার মনে হয়, অমৃত বাহাদুরের গৃহে ঐ যে তিব্বতীয় রমণীয় প্রভাব এও হয়ত সেই সব ব্যবসারই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা মুক্তা-মণিমালা।

ছেলেটি সরল উচ্ছ্বাসে থোসের প্রশংসা করে। তার আর এক সঙ্গী—দেখেই মনে হয় চালাক-চতুর—আমার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসে। বিজ্ঞের মত তার বন্ধুর কথার স্রোত থামায়। পরিষ্কার হিন্দীতে বলে, দেখেনি তো ও কলকাতা শহর, তাই আপনার কাছে থোসের গল্প করে।—তখনি জানতে পারি, তার বন্ধুকে এই তাচ্ছিল্য করার কারণ। এও দুই প্রতিবেশী দেশের যোগাযোগের নিদর্শন। এখানে ব্যবসা-সূত্রে নয়। উদ্দাম অ্যাডভেঞ্চারের প্রেরণায়। বছর দুই আগে ক্লাস-ফোরে যখন সে পড়ে, বাড়ি থেকে পালায়। কলকাতায় গিয়েছিল। মাস তিনেক সেখানে কাটায়ও। শুনে ভাবি, এও এক মজা মন্দ নয়, সে যায় পালিয়ে এখান থেকে কলকাতা শহর দেখতে, আমিও আসি সেখান থেকে এখানে তাদের দেশ দেখতে।—ছেলেটি একে একে নাম করে যায়,—হাওড়া ব্রীজ, বড়বাজার, হ্যারিসন রোড, কালীঘাট ইত্যাদি। প্রচুর উৎসাহ ও বাহাদুরির ভাব প্রকাশ করে। অনর্গল বকতে থাকে। আমারই কাছে কলকাতার গল্প শোনায়। তার সরল গ্রাম্য বন্ধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হিমালয়ের এই শান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এ-সব শুনতে আমার মন উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে। তবু চুপ করে শুনতেও হয়। ভাবি, এদের হাত থেকে অব্যাহতি পাই কি করে? যাক্—ঐ গিরমি এসে গেছে। একাই ফেরে দেখি। বলে, পোর্টাররা বাজারেই থাকবে। সেইখানেই তাদের সুবিধে।

বুঝতে পারি, পাহাড়ের মধ্যে শহরের আবহাওয়া, শীতের দেশে শরীর গরম রাখার সহজ পন্থার প্রলোভনও। কিন্তু, ভোরে ঠিক আসবে তো?

গিরমি জানায়, অমৃত বাহাদুর এখনও ফেরেননি। মেয়েরা রুটি সব্জি এইখানেই পাঠিয়ে দিলেন।

বলি, খুব ভাল কথা। গরম-গরম এখনি খেয়ে নেওয়া যাক্।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলি, তোমরা তাহলে এখন এস, ভাই। আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম।

তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে যায়। মনের কোণে কে যেন বলে, শেষের ঐ অযথা কথাগুলি না বললেই কি চলত না?

ভাবি, সত্যই তো! এমনি করেই সামাজিক শিষ্টাচার-বোধ অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যার মুখোশ পরায়!

"বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্"-এর সংকল্প থাকে কই?

আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করি। আরামে রাত্রিও কাটে।

৪ঠা অক্টোবর। গত সন্ধ্যায় দোরজেদের বাজারে রাত কাটানোর খবরে যে আশঙ্কা হয়েছিল তা অমূলক। ভোরে ঠিক সময়েই এসে তারা হাজির হয়। গিরমি বলে, অমৃত বাহাদুরের বাড়ি থেকেই চা পাঠিয়ে দেবার কথা, নিয়ে আসে।

চলে গিয়ে আনেও তখনি। শুনি, অমৃত বাহাদুর অনেক রাত্রে ফিরেছেন, এখনও ওঠেননি। তাই, তাঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয় না, ধন্যবাদও জানানো হয় না। পিতার অনুপস্থিতিতেও কন্যা দুটির সযত্ন অতিথি-সেবা মন মুগ্ধ করে রাখে। তাদেরও কাছে মনের এ-ভাব প্রকাশ করার সুযোগও থাকে না।

দ্বিধা-জড়িত চরণে পথে নামি। কিন্তু মন ভরে থাকে এক অব্যক্ত আনন্দে।

ভোর পোনে ছটা। আবার হাঁটা শুরু। খিমটিখোলা যেদিক থেকে নেমে আসে, সেই অভিমুখে চলা। নদীর পূব তীর ধরে পথ। গ্রাম ছাড়িয়ে চাষের ক্ষেত, ফলের বাগানও। মাইল দুয়েক অক্লেশে সোজা হাঁটা। তারপরই পথ নদীর সঙ্গ ছাড়ে, পূবে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে আবার উঠতে থাকে। সুমুখেই বুলুদাণ্ডার লম্বা চড়াই। ন'হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। ওরই মাথার উপর দিয়ে এই পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে। ভাবি, তাতেই বা ভাবনা কিসের? ধীরে ধীরে উঠতে থাকি। বনের মধ্যে দিয়ে পথ। Quercus ও রোডোডেনড্রন গাছই বেশি। অধিকাংশই বিকলাঙ্গ, ক্ষতবিক্ষত দেহ। কারণও বোঝা যায়। নিশ্চয়ই নিকটে গ্রাম আছে। গ্রামবাসীদের কাঠের এদেশে নিত্য প্রয়োজন, হাতের কাছে বনের গাছপালার উপর তাই এই নিদয় অত্যাচারও।

চড়াইপথে অনেকখানি উঠে আসার পর পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড ঝোলা পাথর। তারই নিকটে খানিক খোলা জায়গা। সামান্য চাষবাষও। অদূরে জলের ধারা। দু-তিনটে চালাঘর। গিরমি বলে, এইখানেই খাওয়াদাওয়া সারা সুবিধা। কাঠ, জল সবই আছে।

বেলা মাত্র নটা কুড়ি। তাই জিজ্ঞাসা করি, পাশ পার হতে আর কতোখানি? শেষ করে বসলে হোত না?

বলে, আর সামান্যই বাকি। খেয়েদেয়েও পার হতে অসুবিধা হবে না।

শুনি, পাশ-এর উত্তর দিকে পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘন্টা দেড়েক গেলে,—থোটাং। সেখানেও সুইসদের তত্ত্বাবধানে আর এক কৃষিকেন্দ্র। পনিরও তৈরি হয়। আমাদের যাবার পথ অবশ্য পাশ থেকে ভিন্ন দিকে নেমে যাবে।

নিকটস্থ চালাঘরগুলি দেখিয়ে বলে, ঐখানে আশপাশের সব গ্রাম থেকে দুধ এনে জড় করা হয়, তারপর থোটাং-এ চালান যায়।

বলি, দেখ না, দুধ মেলে কিনা, কেনা যাবে কিছু।

পাওয়া যায়ও। চমৎকার ঘন দুধ। দুধগুঁড়ো-ভরতি এনে গরম করে সবাই মিলে খাই। দাম নেয় এক টাকা। দইও পাওয়া যায়। শুনি, তিন 'মানা'—তিন টাকা। ভাতের সঙ্গে খেয়ে তৃপ্তিবোধ হয়।

বেলা সাড়ে এগারোটাতে খাওয়াদাওয়া শেষ। তবু, তখনি আবার রওনা হতে হয়। সম্মুখে বুলুদাণ্ডার শেষ চড়াই।

মাথার উপর আকাশে ঘন কালো মেঘ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। খানিক চড়াই ওঠার পর আবার জঙ্গল। তারই মধ্যে দিয়ে পথ ঘুরে ঘুরে ওঠে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঝরনা। তার উপর কাঠের পুল। জলধারার আশপাশে কালো বড় বড় পাথর। কেমন একটা থমথমে ভাব। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড পাথরের মাথায় এক বিরাট মৌচাক। গরুর গাড়ির চাকার আকারে ওপর থেকে ঝোলে। ভনভন গুঞ্জরণ তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ওড়ে। যেন নাচের ঘুঙুর বাজে। দাঁড়িয়ে মাথা তুলে দেখতে থাকি। গিরমি দূর থেকে দেখতে পায়। ব্যস্ত হয়ে ইশারা করে,—তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে। দ্রুতপদে এসে সাবধান করে,—হাত বাড়িয়ে দেখায়ও,—মৌচাক ঐ একটাই নয়, পাহাড়ের গায়ে অনেক জায়গাতেই ঝুলছে। ইতিমধ্যে কয়েকটা মৌমাছি আমার গায়ে এসেও বসেছে। গিরমি উড়িয়ে দেয়। পোর্টাররাও সকলেই খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়। তবুও, ঐ অল্প সময়েই,—মানুষের দেহেও মধুর সন্ধানে কিনা জানি না,—সকলেরই মাথায় ও গায়ে কয়েকটাই মৌমাছি এসে বসে।

আরও চড়াই ওঠা শেষ করে বুলুদাণ্ডার মাথায় এসে পৌঁছুই। ন'হাজার ফুটেরও উপর, তাই গাছপালাও বিরল। ঘাসের উপর নানা রঙের ছোট ছোট ফুল,—সাদা, বেগুনি, লাল, নীল। বোলডারস্-এর আশে-পাশেও। এদের মধ্যে পরিচিত মুখ দেখি,—**Primula** ও **Saxifraga**।

পাশ পার হয়ে এলে আরম্ভ হয়,—খাড়া উৎরাই। এই পাহাড়ের অপর দিকে আবার **Quercus** ও রোডোডেনড্রনের বনও আসে। তাই মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে খানিক দূর নামতেই হঠাৎ ঘন ফগ্ নিঃশব্দে উড়ে এসে দূরের দৃষ্টি রোধ করে! তাতে ক্ষতি বোধ হয় না, বোধ করার অবসরও মেলে না। একে উৎরাই, তার উপর পাহাড়ের ঢালু-পথে পিছল মাটি। অতি সাবধানে পা ফেলতে হয়। চলার গতিও আড়ষ্ট হয়। চোখের দৃষ্টি সদাই সতর্ক থাকে, মনও একাগ্র হয়, কোন্‌খানে এবার পা ফেলি, এই বুঝি বা পিছলে পড়ি! পা হড়কায়ও কয়েকবারই। ভাগ্য ভাল, তবু পড়ি না। ফগ্ এসে যেন দু হাত দিয়ে চোখ টিপে ধরে, শুধু দেখতে দেয় পায়েরই তলায়। গিরমিরাও কাছে কাছে চলে। তাদের অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেহ যেদিকে চলে, আমিও চলি। এই অস্বচ্ছন্দ গতি সময়ের ও পথের দূরত্বের বোধ হরণ করে। মন আবার জেগে ওঠে, অকস্মাৎ যখন এক সময়ে ফগের পর্দা ছিঁড়ে দূরের ডাক শোনা যায়। পেঁজা তুলারাশির মতো হালকা হালকা ফগ্ চারিপাশে উড়ে

চলে। পুঞ্জীভূত ফগের মাঝে মুক্ত বাতায়ন খোলে, ক্রমে সেই উন্মুক্ত হালকা গবাক্ষ দিগন্ত-বিস্তৃত হয়। যেন, দূরদিগন্ত ঘন-নীল নয়নের পলক খুলে বিস্ময়ে তাকায়। ফগের আর চিহ্নমাত্রও কোথাও দেখা যায় না। মনে হয়, স্বপ্ন যেন চকিতে জাগরণে হারায়। অবাক হয়ে দেখি, সম্মুখে অপরূপ নূতন রাজ্য। পাহাড়ের আরও নীচে বিস্তীর্ণ মালভূমি। স্নিগ্ধ শ্যামল তরঙ্গিত ক্ষেত্র। মাঠের পর মাঠ। তারই বুকে ছোট ছোট নদীর সুনীল ধারা। বালুচরের স্বর্ণাভ রেখা। মাঝে মাঝে লোকালয়ের দু-একটা ঘর-বাড়ি। দূরে একান্তে লাল ও সবুজ রঙে রঙিন বৌদ্ধ বিহার—মনাস্ট্রি। এ সবই যেন পরিচিত ধূলিমলিন জীবন্ত জগতের বাইরে। চারিপাশের পাহাড়ের ফ্রেমে-বাঁধানো ধরণীর-পটে-আঁকা অপূর্ব এক আলেখ্য।

স্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকি। ভাবি, এইমাত্র পিছনে-ফেলে-আসা মৌসুমির আক্রমণ, পথের দুরূহ চড়াই, ভীতি-বহুল পিচ্ছিলতা, ঘন ফগের পরিব্যাপ্তি, — তারা যেন সেই রূপকথার রাজকন্যার প্রাসাদ-দ্বারের রাক্ষস-প্রহরী। তাদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে এখন সম্মুখে দেখি, ধরিত্রীর স্বর্ণপালঙ্কে অঘোরে নিদ্রালসা প্রকৃতি মনোরমা।

গিরমির মুখে হাসি ফোটে। এগিয়ে আসে। পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে দেখায়। সগর্ব উৎসাহে বলে, চিয়াংমা।

[illegible] স্বদেশ প্রবেশে তার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি স্মরণে আনে ঃ

"Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land!"

ভাবি ঠিকই তো! ডঃ ব্যানার্জির টাইপ করে দেওয়া যাত্রা-সূচিতে লেখা, --চিয়াংমা প্রকৃত শেরপাদেশের সিংহদ্বার। এর আর এক নাম ভণ্ডারা।

কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রা করার আগে ব্যানার্জি সাগ্রহে বলেন, চলেছেন শেরপাদের মুলুকে, আসুন ভাল করে ম্যাপে দেখিয়ে দিই, ওদের দেশ বলতে নেপালের কোন্ অঞ্চলগুলি বোঝায়। সাধারণ ধারণা, শেরপাদের দেশ সোলু-খুম্বু—Solu-Khumbu। কিন্তু, "সোলু-খুম্বু" কোন একটা স্থান বিশেষের নাম নয়। এক অঞ্চলের নাম সোলু, অপর আর এক অঞ্চল খুম্বু। খুম্বু এভারেস্টের পায়ের কাছে,—বরফের পাহাড়ের রাজ্যে। নামচে, থিয়াংবোচি—সেই খুম্বুতে,—যেখানে আপনি চলেছেন। আর সোলু হল পাহাড়ের আর ও নীচের দিকে। আপনার যাবার পথে পড়বে।—বলে ম্যাপ পেতে ভালভাবে বুঝিয়ে দেন, শেরপাদের বসবাসের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি ও তাদের বিশিষ্টতা।

এখন আমরা প্রবেশ করি শেরপাদের সেই সোলু অঞ্চলেই। এখানকার উচ্চতা মাত্র ৬,৫০০ ফুট। তবে, হিমালয়ের অনেকখানি অভ্যন্তরে, তাই

শীতের কিছু প্রখরতা আছে।

শেরপা-ভূমিতে প্রথম পদক্ষেপ মনে বিপুল উৎসাহ জাগায়। প্রকৃতির রমণীয় শোভা অন্তরে আনন্দ-তরঙ্গ তোলে। দেখতে দেখতে উৎরাই পথ শেষ হয়। এবার পাহাড়ের গায়ে সোজা সহজ পথ এগিয়ে চলে। ডান দিকে অল্প নীচে বিশাল শ্যামল প্রান্তর। তারই মাঝে নদীর সর্পিল গতি। সূর্যের আলো পড়ে দেখায় যেন রূপা গলে বয়ে চলে। সমতলক্ষেত্রের বিশাল বিস্তৃতি দেখে ভাবি, কবে হয়ত প্লেনই নামবে এই অঞ্চলে।

এগিয়ে চলি মনের আনন্দে। দূরে দেখা মনাস্ট্রি নিকটে আসে। কিন্তু, সেদিকে যাই না। গিরমির দিকে তাকাই, কোন্ দিকে চলেছি আবার? সে জানায়, আরও এগিয়ে গ্রাম, সেইখানে থাকব।

পথের বাঁ পাশের পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খাড়া কালো একটা পাথর,—যেন দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ। তারই কাছে এসে পথ ঘুরে যায়। তখন দেখতে পাই, বাঁদিকে দুই পাহাড়ের মাঝখানে আর এক উপত্যকা, অপর আর এক পাহাড়ী নদী। সেদিকেও ঢেউ-খেলানো সবুজ মাঠ। নদীর ধারে গ্রামের ঘরবাড়ি, সাদা সাদা তিব্বতী চোরটেন—বৌদ্ধ স্তূপ। মনাস্ট্রির নিকটে পৌঁছে ভেবেছিলাম, গ্রাম বুঝি এসে গেছে। এখন দেখি, আরও আধ মাইলের উপর যেতে হবে। হোক্,—তাতে কোন ক্ষতি নেই, চলার কোন কষ্টও নেই। মনভরা অফুরন্ত উদ্দীপনা।

পৌঁছে গেলাম বেলা আড়াইটার মধ্যেই। চারিপাশে চাষের জমি। ফসল কাটা হয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, ভুট্টা লাগিয়েছিল। আলুব ক্ষেতও আছে। নদী থেকে খানিক উপরে খোলা জায়গায় ক্ষেতের মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ি। খালি পড়ে আছে। নীচে একখানা লম্বা ঘর। উপরেও তাই। নিকটে নলে জলের ধারা। সেই বাড়িতেই গিরমি ওঠার ব্যবস্থা করে। এতদিন যত গ্রাম পাওয়া গেছে, থাকবার ব্যবস্থা করতে গিরমিকে প্রায়ই বেগ পেতে হয়েছে। সেই সব গ্রামবাসীদের সঙ্গে তার সহৃদয়তার পরিচয় পাইনি। এখানে এসে দেখি, অল্পক্ষণের মধ্যে গিরমিরা জমিয়ে বসে, চেনা লোকজন দেখা করতে আসে। হাসি-ঠাট্টা গল্পের আসর জমে।

একতলার ঘরে গিরমিরা রান্না চড়ায়। দোতলার ঘরে আমার রাত কাটাবার ব্যবস্থা। কাঠের তক্তা-পাতা মেঝে। পাথর-গাঁথা দেওয়াল। ঘরে ঢোকবার প্রকাণ্ড দরজার ফাঁক, দেওয়ালেও জানালা বসাবার ফাঁকা জায়গা,—কিন্তু কোথাও পাল্লা নেই, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। হু হু করে বাতাস ঢোকে। এ-সবে এ-পথে আপত্তি চলে না। মুড়িসুড়ি দিয়ে রাতটা কাটানো। মাথার উপর আচ্ছাদন আছে, এই যথেষ্ট।

শয্যা খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে বসি। পায়ের বুট খুলতে গিয়ে দেখে চক্ষুস্থির! কলকাতা থেকে যাত্রার আগেই নতুন হান্টিং বুট কিনি। কয়েক বছর থেকে এই ধরনের বুটই পাহাড়ে ব্যবহার করছি। ভালই কাজ দেয়।

বছর তিন-চার টেকেও। কিন্তু, আশ্চর্য। নতুন জুতোর একপাটির গোড়ালির নীচে হিল-এর রবার খুলে আসছে, যেন মুখ হাঁ করতে চলেছে। চটি ছাড়া আর অন্য জুতোও সঙ্গে নেই। চটি-পায়ে এ-পথে হাঁটা চলেই না। খালি-পায়ে অক্লেশে দোরজে ও টামাং পোর্টার চলেছে বটে, কিন্তু সে-অভ্যাস তো আমার নেই। এখন কি করা যায়, তাই ভাবি। এখান এর বিহিত না করলে—a stitch in time saves nine-এর সতর্ক-বাণী উপেক্ষা করা হবে। কি করবই বা কি? রবার-সোলিউশন সঙ্গে নেই। চামড়া বা ক্যানভাস নয় যে সেলাই করার চেষ্টা করব। অতএব, যা হবার হবেই। কিন্তু কাঁটার মতো দুশ্চিন্তা মনে খোঁচা দিতে থাকে।

চটি পরে নীচে গিয়ে নলের ধারায় হাত মুখ ধুই। আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখি। দূর-থেকে-দেখা গ্রামের মধ্যের সেই সারি সারি সাদা চোরটেনগুলি এই ঘরের নিকটেই। পথের পাশে। ভক্তদের কপালে যা দেখে যেমন চন্দনের তিলক, বৌদ্ধ-প্রধান গ্রামে, অথবা, সে-সব অঞ্চলে যাতায়াতের পথে, তেমনি এই চোরটেনগুলি ধর্মাচরণের চিহ্ন। তিব্বতে মানস-সরোবর ও কৈলাসের পথেও এই ধরনের বহু দেখেছি। কোথাও এদের গায়ে বোধিসত্ত্বের বা বুদ্ধদেবের মূর্তি আঁকা. কোথাও বা ওঁ মণিপেদ্ম হুঁ মন্ত্রাদি লেখা। সবুজ, গেরুয়া, লাল, নানাবর্ণ রঞ্জিতও। এগুলি বৌদ্ধস্তূপেরই মতন। ছোট বড় নানান্ আকারের। মৃত ব্যক্তিদের আত্মার উদ্দেশে স্থাপিত, অথবা ধর্মস্মারক-স্বরূপ।

চোরটেনগুলির নিকটে দু-চারজন গ্রামবাসীকেও ঘোরাফেরা করতে দেখি। তিব্বতী ধরনের ঝলঝলে পোশাক-পরিচ্ছদ। আমার দিকে হাসিমুখে সকৌতুক দৃষ্টি ফেলে। হাবভাবে বুঝতে পারি, গিরমির কাছে আগেই খবর পেয়েছে, আমরা নামচে চলেছি। একজন কাছে এগিয়ে আসে, তাদেরই ভাষায় বলে, হাতের ইশারা করে দেখায়ও, তাতে বুঝতে পারি,—নীচে নদীর উপত্যকার অপর পারে ঐ যে পূর্বদিকে আকাশ-জোড়া বিরাট পাহাড়—ঘন নীলবরণ দেখায়,—ঐ পাহাড় এবার ডিঙোতে হবে। ওরই মাথায় লামজুরা পাশ্—প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। হাতের দুটো আঙুল তুলে বোঝাতে চায়,—এখন দু'দিন লাগবে ঐ পাহাড় পার হতে!

পথের দূরত্ব ও গুরুত্ব দেখিয়ে ভয় দেখানো নয়, উৎসাহ দিয়ে হালকা করা। আমিও হেসে ঘাড় নাড়ি, মাথা তুলে দেখতে থাকি, সুদূরের সেই গাঢ় নীল বিশাল আকার যেন প্রহেলিকাচ্ছন্ন মায়াময় এক মেঘরাজ্য!

ফিরে চলি গিরমিদের রন্ধনশালার দিকে। দূর থেকেই বোঝা যায়, ঘরে আগুন জেবলেছে। ওখানেও দরজার পাল্লা নেই, সেই খোলা-পথে একরাশ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বাইরে আসে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। গোয়ালঘরের জন্যেই ঘরটার ব্যবহার মনে হয়। তারই এক ধার কিছু পরিষ্কার করে উনুনে আগুন দিয়েছে। আসার পরই একপ্রস্থ চা আমাদের সবারই খাওয়া হয়েছে, এদের এখন আবার দ্বিতীয় পর্ব চলে।

ধূমায়মান মগ হাতে আগুনের পাশে বসে সেই পরস্পর কথা বলা ও হাসির উচ্ছ্বাস চলে। আর এক পাশে টামাং পোর্টার তার নিজের আয়োজন করে। হঠাৎ নজরে পড়ে উনুনের কাছে পিছন ফিরে বসে অপর এক ব্যক্তি। মাউনটেনিয়ারিংয়ের পোশাক,—নীল রঙের জ্যাকেট। আমার দিকে মুখ ঘোরাতেই দেখি, বিদেশী। একমুখ কোঁকড়ানো কটা-রঙ দাড়িগোঁফ। মাথায় ঝাঁকড়া চুলও সেইরকম। চোখে নীল তারা। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানায়। প্যান হাতে আগুনে কি যেন সিদ্ধ করতে ব্যস্ত। গিরমি এসে বলে, সাহেবও এইমাত্র এসেছে। নামচেবাজার ঘুরে এখন কাঠমাণ্ডু ফিরছে। সঙ্গে আর কেউ নেই।

সাহেব খাওয়া শেষ করে বাইরে আসে। বলি এখানে থাকবে কোথায় বড় নোংরা। ওপরে বড় ঘর। পরিচ্ছন্নও। দুজনের থাকবার কোনই অসুবিধে হবে না

সাহেব সঙ্কোচ জানায়। হাসে। বলে, এ পথে পরিষ্কার কি - গ্রামের মানুষদের চেয়ে খারাপ জায়গায় থাকতে হয়েছে। সেখানে যেমন, তেমনিই তো নিতে হবে। এ-পথে ঘুরতে সেও তো এক শিক্ষা। ওপরে আপনি উঠেছেন, সেই খবর পেয়েছি [illegible] আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, —এই ঘরেই এদের সঙ্গে আরামে রাত কাটিয়ে দেব।

বলি, তা কি করে হয় [illegible] ওপরের অত বড় ঘর আমি একা দখল করে থাকব আর নীচে [illegible] এ-পথের প্রথা নয়।

অবশেষে সাহেব রাজি হয় [illegible] বলে, চলুন আপনি আমার জিনিসপত্র নিয়ে এখনি আসছি।

এখনি আসে। জিনিস বা কি [illegible] কিছুই সঙ্গে নেই। শুধু পিঠের এক ঝোলা —রুকস্যাক। আর স্লিপিং ব্যাগ। দু-একটা সামান্য জামা-কাপড় [illegible] একটা মগ [illegible], আর ঐ প্যান। ম্যাচেও প্রয়োজন কিছু নেইও। না-খাবার অভাব বোধও নেই। বলে, এই কাঠের ওপরই শুয়ে পড়ব

আমার প্লাস্টিক সীটটা বিছিয়ে দিই। আহারের কি ব্যবস্থা, জিজ্ঞাসা করে জানি, সঙ্গে যা শুকনো সবজি স্যুপ আদির প্যাকেট ছিল, কদিনে ফুরিয়ে গেছে। হেসে বলে, যাত্রাও প্রায় শেষ হল তো।

খাদ্যাভাবের দুঃখ প্রকাশ নয়, যাত্রা-সমাপ্তিরই বিষণ্ণতা।

শুনি, গত দুদিন পথে ডিম কিনতে পেরেছে, তাতেই চলে যাচ্ছে, আজও নীচের ঘরে তাই সিদ্ধ করে খেয়ে এল। এখান থেকে কালই জিরিতে পৌঁছবে, —সেখানে সুইসরা আছে —তারপর তো কাঠমাণ্ডু।—বলে আবার হাসে।

বলি, তা কি হয় [illegible] আজ রাত্রে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে, দুজনে খাব। দেখ খেয়ে আমাদের রান্না কেমন

প্রথমে রাজি হয় না। তারপর গিরমি খাবার আনলে দুজনে ভাগ করে খাই। খেয়ে খুশী হয়। আবো চেয়েও নেয়।

বলে, কম পড়বে না তো ?

কটা-রঙের একমুখ দাড়ি-গোঁফে বয়স তার চাপা থাকে। প্রথমে দেখে ভাবি, বছর পঞ্চাশ হবে। কিন্তু, পরে কথাবার্তায়, হাসিখুশির উচ্ছ্বাসে মনে হয়, ছেলেমানুষ। অল্পক্ষণেই আলাপ জমে। বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে পথচারীদের মধ্যে যেমন সহজেই হয়ে থাকে। কোন কালে আগে দেখাসাক্ষাৎ নেই ; ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন আচার-ব্যবহার, তবু কোথায় যেন প্রগাঢ় পরিচয়, অন্তরে পান্থ-জীবনের নিবিড় বাঁধন। আজন্ম অপরিচয়ের আবরণ অজানা কোন যাদুবলে নিমিষে অন্তর্ধান করে। মনপ্রাণ খুলে দুজনে কথা বলি,—হিমালয়-পথের অফুরন্ত কাহিনী, পথ-চলার অসীম, অতুল আনন্দ।

বয়স তার মাত্র চব্বিশ বছর। অস্ট্রিয়ান। মেকানিক্যাল ড্রাফটস্‌ম্যান। চাকরি করে অস্ট্রেলিয়ায়। এখন দেশে ফিরছে। বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। রোজগারকরা টাকায় কয়েকটা দেশও দেখে যাচ্ছে। ভারতে আগে কখনো আসেনি। নেপালে তো নয়ই। তবু, হিমালয়ের কথা বহু শোনা। তাই দেখতেও আসা। পাহাড় ভালবাসে। দেশে আল্‌প্‌স-এ অনেক ঘুরেছে, সেখানে পাহাড়ের শিখরে-শিখরেও উঠেছে। বলে, কিন্তু সে-সবের সঙ্গে হিমালয়ের কোন তুলনাই চলে না,—চোখে না দেখলে হিমালয়ের বিরাটত্ব কল্পনাতেও ধরা যায় না। এবার এসে চাক্ষুষ পরিচয়মাত্র করে গেলাম। কিন্তু জানি, আমার এই সবে শুরু। আবার ফিরে আসতেই হবে।

নিজের অভিজ্ঞতা বলে। জয়নগরের পথ দিয়ে নামচেবাজার পর্যন্ত যায়। থিয়াংবোচির অনুমতি পত্র ছিল না। এখন এই নতুন পথে কাঠমাণ্ডু ফিরে চলে। এদিকের পথঘাটের খবর নেয়। অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে শুয়ে শুয়ে হিমালয় ও ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নানান গল্প হয়। কতোবার দুজনে শুভ-রাত্রি জানিয়ে ঘুমের আশায় পাশ ফিরি, অল্প পরেই আবার হঠাৎ প্রশ্ন শুনি, ঘুমোলেন নাকি ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অজন্তা-ইলোরা তাহলে এবারই যাওয়া যাবে দিল্লী ঘুরে ? কোন্ পথে যেতে হবে, বলুন তো ? আবার আরম্ভ হয় কথা। তারপর, কখন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ি, কেউ জানতে পারি না।

৫ই অক্টোবর। ঘুম ভাঙে যথারীতি ভোরে। উঠে যাত্রার জন্য তৈরি হই। সেও জেগে ওঠে। ঘুম-জড়িত স্বরে 'গুড্ মর্নিং' বলে আবার পাশ ফিরে আরামে শোয়। বলে, একটু বেলা হলে রওনা হব,—সারাদিন হাঁটব।

জুতো পরতে 'গয়ে 'হিল' হাঁ করে তার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি। সে তখনি তড়াং করে উঠে বসে। বলে দেখি।

তারপর জানায়, রবার সোলিউশন আমার কাছে অল্প আছে, স্লিপিং ব্যাগ ছিঁড়লে কাজে লাগবে বলে। কিন্তু জুতোর এ রবার আটকাবার মত জোর তাতে নেই।—তবুও, উৎসাহের সঙ্গে তাই ধার করে লাগিয়ে দেয়।

আপাততঃ মুখটা জোড়া লাগে। ভরসা হয়, এতেই হয়ত কাজ চলে যাবে।

কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জির নামে একটা চিঠি লিখে সাহেবের হাতে দিই। আমার যাত্রা ভালভাবেই চলেছে, সেই সংবাদটুকু জানানো। বলি, কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছে টিকিট মেরে একটা ডাকবাক্সে ফেলে দিও।

পরে, কাঠমাণ্ডুতে ফিরে শুনি, সে নিজেই ডঃ ব্যানার্জির বাড়ি খুঁজে বার করে, তাঁর হাতে চিঠিখানি দিয়ে আসে।

আজ ছয় বছরেরও উপর কেটে গেছে তারপর। তাকে আর ধন্যবাদ জানানো হয়নি। জানাবার উপায়ও ছিল না। নাম জানি না, ধাম জানি না। পথের ঐ এক রাত্রির পরিচয়। তবুও মনে হয় যেন পরম আত্মীয়। কি জানি, হয়ত হিমালয়ের পথে আবার হঠাৎ-ই হবে দুজনের দেখা।

সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে আবার হাঁটা শুরু। খানিক উৎরাই নামা। গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর ধারে নামা। ছোট পুল। ওপারে গিয়ে পথ বনের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর সোজা উৎরাই নামতেই থাকে। মেঘলা আকাশ। ঘন বনের মধ্যে সেই অন্ধকার ভাব। জোঁকের উপদ্রবও। আবার পিছলপথে নামার সন্ত্রস্ত সতর্কতা। ক্রমশই শেষ হয়। গিরিনদীর স্বচ্ছ ধারা মধুর কলতানে স্বাগত জানায়। পাহাড়গুলিও যেন তাকে সম্ভ্রম করে অদূরে সরে দাঁড়ায়। পাহাড়ের গায়ে চাষভূমি স্তরে স্তরে স্নিগ্ধ রূপের ছটা যেন গড়িয়ে নামে। নদী ধরে পথ এগিয়ে চলে। পুলের উপর দিয়ে দুবার পারও হতে হয়। লিখুখোলা নদী। ছাড়িয়ে এসে আবার চড়াই আরম্ভ। পথের নিকটে বড় বড় গাছের ঝোপ। ছোট একটা গ্রাম। মাথার উপর কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলে। গিরমি মাথা তুলে দেখে। বলে, বৃষ্টি নামবে এখনি। এইখানেই কোথাও বসে খাওয়া-দাওয়া সারা যাক্—কিন্তু কোন কুটিরেই আশ্রয় দিতে চায় না। সেই নেপালী বনাম শেরপা মনোবিবাদ। অগত্যা গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা শূন্য দোকানের সামনে ফাঁকা রোয়াক,—তাতেই উঠে বসি। মাত্র তিন-চার হাত লম্বা-চওড়া। মাথার উপর চাটাইয়ের আচ্ছাদন। টিপটিপ বৃষ্টিও এখনি আরম্ভ হয়। চাটাই ভেদ করে গায়ে জল পড়ে। ছাতা খুলে বসি। ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া হাতে মুখে লাগে। হাসি পায়। ভাবি, গ্রামের লোকের যেমন শীতল আচরণ, আবহাওয়ারও তেমনি যেন দয়াহীন ব্যবহার। গ্রামের নাম—ছেনতো। নামেও যেন শ্রী-হীন। বেলা ন'টা চল্লিশ। চারিপাশে বড় বড় গাছের গাঢ় ছায়া, তার উপর কালো মেঘের ঘনঘটা,—সকালেই যেন সন্ধ্যার ছায়া নামায়। চুপ করে ছাতা-মাথায় পা গুটিয়ে বসে থাকি। ভাবি, গিরমিরা গেল কোথায়? তখনি দেখি, আলাদীনের প্রদীপ-জাত সেই আজ্ঞাবহ দৈত্যের মতো কোথা থেকে উদিত হয়,—হাতে ধূমায়মান মগে গরম চা, প্লেটে পাঁপর সেঁকা, বিস্কুট। সামনে রেখে দিয়ে তখনি বৃষ্টির মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়। আমারও চোখে এতোক্ষণে বাদল-বরিষণের আনন্দময় রূপ ফুটে ওঠে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই গরম ভাত ও সবজিও তৈরি। আজ দুপুরে গ্রামের মধ্যে

বসা। তাই, কাঠ কিনতে দামও লাগে এক টাকা। খাওয়াদাওয়া সারা হতেই তখনি আবার রওনা। যদিও এখন মাত্র সাড়ে এগারোটা। সম্মুখে লামজুরা পাশ্-এর চড়াইয়ের এক বড় অংশ। সেও এক কারণ. তাছাড়া, রোয়াকে লম্বা হয়ে বিশ্রাম নেবারও উপায় নেই। ভরসার মধ্যে, মেঘ না কাটলেও বৃষ্টি আপাততঃ থামে। মেঘলা দিনের আবছায়ায় একঘেয়ে একটানা চড়াই উঠে চলি। সেই ধীরে ধীরে পা ফেলা। পায়ের ছন্দে গতির আনন্দে মন মেতে থাকা। বেলা দুটো পনের মিনিটে পৌঁছে যাই সাঁতা (Seta) গুম্ফায়। ৮,৪০০ ফুট উঁচুতে। পথের পাশে ফসলের ক্ষেত। পথ ছেড়ে অল্প ভিতরে গেলেই তিব্বতী গুম্ফা। প্রকাণ্ড একটা কুকুর চিৎকার করে ছুটে আসে। গিরমি লামাকে বলে কুকুরটাকে সরিয়ে নেয়। ক্ষেতের আশেপাশে খান তিন-চার ছড়ানো বাড়ি। তারই একটার দোতলার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় মেলে। পৌঁছনো মাত্রই এক পশলা জোর বৃষ্টি নামে। যেন, ভগবানও দম ধরেই পথিকের আশ্রয় পাওয়ার অপেক্ষায় শান্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি থামে। কিন্তু প্রচণ্ড শীত নামে। এতক্ষণ চড়াই ভেঙে পরিশ্রমে শীতবোধ ছিল না, এখন বিশ্রামরত অবস্থায় দেহ সহজেই শীতকাতর হয়। বিলাস-শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। জানি, অন্ধকার হলেই শীত বাড়বে। বাইরে এখনও দিনের আলো। বাড়ির বাইরে এসে আশপাশে ঘুরি। নজরে পড়ে, নিকটে এক বাড়ির আঙিনায় গাছভরা শিম। থোকা থোকা ঝুলছে. কাঁচা সবুজ রঙ। গিরমিকে ডাকি। বলি, কিনে নাও কিছু। আজ রান্না হবে,—নতুন সবজি। সঙ্গে পথের জন্যেও কিছু নিয়ে রেখো। ঘরের বাইরে একটা নেপালী মেয়ে দাঁড়িয়ে। গিরমি তাদের ভাষায় কি যেন বলে,—শিম ও দেখায়। মেয়েটা চোখ পাকিয়ে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়, মুখে বলে, 'ছুই না'। আমি হেসে বাঙলাতেই বলি, 'ছুই না' কি রে? গাছ-ভর্তি শিম, আর বলিস—'ছুই না'! দে-না কিছু, টাকা মিলবে!

সে ঘাড় নাড়ে, আবার জানায়, 'ছুই না'। টাকার কথা তোলাই। শেষে ঘাড় বেঁকিয়ে, 'শিম নেই' জানিয়ে পিছন ফিরে চলে যায়।

মনে পড়ে যায়, কলকাতায় এক ধনী ব্যবসাদারের মুখে শোনা এক মন্তব্য: জগতে টাকায় হয় না, এমন কোন কিছুই নেই। শুধু কত দিতে হবে, তাই নিয়েই প্রশ্ন। ভাবি, এ-জগৎ তাঁদের টাকার জগতের বাইরে।

গিরমি হেসে বলে, আমাদের কোনমতেই দেবে না। বলে লাভ নেই।

কিন্তু সন্ধান করে গিরমি দুধ যোগাড় করে।

ওদিকে সন্ধ্যাও নামে। কনকনে শীতও পড়ে। স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে আরামে রাতও কাটে।

৬ই অক্টোবর। ভোরে উঠতে বেশ শীতবোধ হয়। তবু, শয্যা ছাড়ি। শুধু আয়েসের লোভে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা, এ-পথে মনে স্থানই পায় না।

ছটার সময় পুনরায় যাত্রা। আজই লামজুরা পাশ্ পার হওয়া। খাড়া চড়াই পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতেই থাকে। সকালে এ-দুর্গম চড়াইও কষ্টকর লাগে না। প্রফুল্ল মনে সোৎসাহে চলি। ভোরের সেই শৈত্য ভাব অন্তর্হিত হয়।

বহু নীচে দুই পাহাড়ের মাঝে নদীর উপত্যকা। কিন্তু নদীর রেখাও দেখা যায় না, দুই পাহাড়ের তলদেশও নয়। মেঘের মতো পুঞ্জীভূত বাষ্প সেখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। মনে হয়, অদৃশ্য কোন পাতালপুরীতে কারা বুঝি বা শীতের ভোরে বিরাট ধুনি জ্বালে, আগুন পোহায়। তারই অজস্র ধূম্ররাশি গোলাকারে নিঃশব্দে উঠে আসে উপর দিকে। পথের নিকট পৌঁছে পেঁজা-তুলার মতো ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। দূরের পাহাড়-পর্বত চকিতে চোখের আড়ালে লুকোয়। নিকটের গাছপালা, সম্মুখের পদরেখাও ঝাপসা হয়ে আসে। দেখায় যেন জাপানী শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি। অল্প পরেই ফগ্ সরে। আবার সব সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। নতুন ফগ্ আবার আসে। চারিদিক আবার ঘেরে। এ যেন পাহাড়পথে লুকোচুরির খেলা। কোন্ অদেখা সাথীর সঙ্গে, কি জানি। মন বিভোর থাকে তারই আনন্দে।

চারিদিকে গাছের জঙ্গল। **Rhododendron** ও **Acers**-ই বেশি। মাঝে মাঝে **Tsuga** ও **Abies**। ছোট চারাগাছও বহু। ফুলের বাহারও ক্রমে দেখা দেয়। **Potentillas**-এর ছড়াছড়ি। কোথাও বা **Primulas**। ভাবি, এ বুঝি বা দেবাদিদেবের পাদপদ্মে ছড়িয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ ভক্তের দেওয়া অঞ্জলি।

দু ঘণ্টা চড়াই ওঠার পরও পাশ্-এ পৌঁছুই না। তাতে ভাবনাও থাকে না। সবে আটটা বাজে। কিন্তু গিরমিরা থেমে পড়ে। বলে, এইখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে হবে! খেয়েদেয়ে আবার একটানা চলা। শুনে হাসি পায়,—এ-পথের মজা মন্দ নয়,—সকালেই দুপুরের খাওয়া।

তখনি আবার মনে পড়ে, এককালে শহরের কর্মজীবনে এও তো অভ্যাস ছিল! সেই সকাল ন'টার মধ্যেই নাকে-মুখে ভাত গুঁজে সারাদিনের কাজে বেরুনো। কিন্তু, সে-জীবন, আর এ-জীবন! সভ্য-জগতের কর্তব্যের বর্মে-বাঁধা মানুষ, আর প্রকৃতির কোলে স্বাধীনমতি স্বচ্ছন্দবিহারী হিমালয়-পথিক!

কিন্তু তা তো হলো, কোথায় বসা যায় এখানে? পাহাড়ের ঢালু গা কেটে রাস্তা। হাত তিনেক মাত্র চওড়া। সেইটুকুই সমতল। গিরমিরা তারই উপর পাথর সাজিয়ে উনান বানায়। আশেপাশে খর্বকায় রোডোডেনড্রন গাছ—**stunted** বা **dwarf rhododendrons**। শেওলায় সবুজ তার গা। খুকরি দিয়ে তারই কাঠ কেটে আনে। গতরাত্রের বৃষ্টিতে সব ভেজা। জ্বলতে চায় না। কোন রকমে অল্প আগুন জেলে সেই কাঠ শুকিয়ে নেয়, তবে উনান ধরে।

হাত কয়েক দূরে পথ ছেড়ে পাহাড়ের গড়ানো গায়েই ফুলের রাজ্যে প্লাস্টিক সীট পাতি। পা ছড়িয়ে আরামে বসার চেষ্টা করি। পুষ্পশয্যায়

মন বসলেও দেহ কেবলই গাঁড়য়ে আসে। ভারকেন্দ্র কোনপ্রকারে রক্ষা করা মনের একটা খেলা হয়ে ওঠে। শিশু যেন নিদ্রাতুর মায়ের কোলে আশ্রয় খোঁজে, মা কেবলই সরিয়ে দেন। ওদিকে নীচ থেকে ফগ্ ওঠারও বিরতি নেই। মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়, আবার একটু পরেই চারিদিক ঘিরে ফেলে। হাত দশেক দূরে গিরমিদেরও স্পষ্ট দেখা যায় না। যেন, ছায়াছবি নড়ে,—হাসে, কথা বলে, আগুনের লাল শিখা জ্বলে।

যথারীতি গরম চা আসে। দশটার মধ্যে আহারের পাটও শেষ হয়,—গরম ভাত, সবজি। সাড়ে দশটায় আবার পথে নামা। প্রতিদিন দুপুরে যাত্রার আগে এক মগ জল পান করি। আজও গিরমি এনে দেয়। মগ ধরতেই বুঝতে পারি, আজ ঈষদুষ্ণ করে আনা। সন্তুষ্ট নয়নে তার দিকে তাকাই, মৃদু হাসি। সে কিন্তু নির্বিকার। খালি মগ হাতে নিয়ে ফিরে চলে। নিজেদের মধ্যে অমন হাসিখুশি প্রাণবন্ত, কিন্তু আপন বিচার অনুযায়ী কর্তব্য পালনে সে নির্বাক, যন্ত্রচালিত। প্রশংসাদির মর্ম বোঝে না।

পথের দু'পাশে রোডোডেনড্রনের বন। কোথাও বা Betulas। একনাগাড়ে চড়াই ওঠা। টিপ্‌টিপে বৃষ্টি শুরু হয়। গায়ে বর্ষাতি পরি। জলও আটকায়, শীতও কম বোধ হয়। মাথার উপর ছাতাও খুলি। মেঘ ও বৃষ্টির বিন্দু চারিদিক ঝাপ্‌সা করে তোলে। তারই মধ্যে পথ চলে কোন্ সময়ে চড়াইও শেষ হয়। পাহাড়ের মাথায় পথ পৌঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে এবার সোজা সমতলে চলে। প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। তবু সহজ সরল পথ। এগিয়ে যেতে আরাম বোধ হয়। লাম্ডুরো পাস্-এ পৌঁছুই পৌনে বারোটায়। যেদিকে তাকাই, বড় বড় পাথর। তারই খাঁজে খাঁজে দু-এক জায়গায় সাদা বরফ জমে আছে। হয়ত, গত কালের বৃষ্টি এখানে তুষার-পাতের রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের ও পাথরের চেহারা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, বছরের অনেক সময়েই এ জায়গা বরফে আচ্ছন্ন থাকে।

গিরমিরা বিশ্রাম নিতে বসে। আবার সেই পরস্পরের দু একটা বাক্যালাপের টিপ্পনী, হো হো রবে হাসি। আমাকেও অপেক্ষা করতে হয়। বারোটা পনেরতে আবার হাঁটা। এবার পাহাড়ের অপর দিকে নামা। সুন্দর coniferous—সরলবর্গীয় গাছের বন। Tsuga ও Abies। এক ঘণ্টা একটানা নামার পর গ্রাম আসে।

পাহাড়ের এপাশে এখন মেঘহীন সুনীল আকাশ। সোনালী রোদ। সকালের সেই ফগ্-এর খেলা এখন শুধু অতীত দিনের স্মৃতি। পথও সোজা এগিয়ে যায়। একটা Rock face-এর পাশ দিয়ে আসার অল্প পরেই সম্মুখে জুনবেশি ভ্যালির মনোরম দৃশ্য হঠাৎই চোখে পড়ে। কে যেন সাগরের সুনীল জলে ডুব-সাঁতার কেটে সহসা মাথা তুলে ভেসে ওঠে। দুই পাশে ঘন সবুজ ঢেউ-খেলানো পাহাড়। মাঝখানে বয়ে আসে জুনবেশিখোলা,—পাহাড়ী নদীর সুনীল ধারা। নদীর দুই তীরে কোথাও গাঢ় নীল পাইনের বন,

কোথাও বা তরঙ্গ-ভঙ্গে মাঠের পর মাঠ,—কোমল সবুজ ঘাসে ছাওয়া। দূরে পিছনে মাথা তুলে নুম্বুর—Numbur তুষার-শিখর।

জুনবেশি পেঁছে যাই পৌনে তিনটেয়। ন'হাজার ফুট উঁচু। অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার ফুট নেমে-আসা লামজুরা পাশ থেকে। ছোট নদী। তারই কোলে খানকয়েক পাথরের ঘর। শেরপা-গ্রাম। তাই, পরিচ্ছন্নও। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সেই জঞ্জালাকীর্ণ কর্দমাক্ত দুঃস্থ গ্রামগুলি থেকে কতো পৃথক। গ্রামের মধ্যে দুটো বড় বাড়ি। কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরী। সাদা চুনকাম করা দেওয়াল। দুইটা গুম্ফা—বৌদ্ধ, মনাস্ট্রি। একটার চাকচিক্য ও নতুন রঙ দেখে বোঝা যায়,—নতুন তৈরি। অপরটি পুরানো। তারই দোতলায় আশ্রয় নেওয়া হয়। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল। বৌদ্ধ দেবদেবীর বর্ণাঢ্য চিত্র চারিদিকে। নীচের হল-এ প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। বেদির উপর ধূপ ও বাতি জ্বলে। শান্ত পবিত্র পরিবেশ।

কিন্তু শান্তিতে থাকা সেও বোধ করি ভাগ্যের বিষয়।

উপরে বিছানা পেতে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করি, হঠাৎ দুই লামার আবির্ভাব হন। ঝলঝলে লাল তিব্বতী পোশাক। জোব্বার সামনের দিকে বুকের নীচে পেটের কাছে ঝোলার মতো ফুলে থাকে। একজন জামায় বুকের কাছে হাত দিয়ে বার করে এক পোর্সেলিনের বাটি। পাত্রের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য রঙেরও বৈচিত্র্য। দেখেই চিনতে পারি, চীনদেশের সামগ্রী। কেনবার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই। তবু কৌতূহল হয়, দাম জিজ্ঞাসা করি। বলে, পঞ্চাশ টাকা! বলি, চাই না।—তবু সে ছাড়ে না, দরাদরি করতে চায়। কোন রকমে তাদের বিদায় করি।

ভাবি, আপদ গেল। অল্প পরেই আর এক লামার উদয়। তিনিও এসে হাসিমুখে জোব্বার ভিতর হাত পোরেন,—ম্যাজিকের মতন বার করে আনেন,—ছোট্ট একটা কুকুরছানা! চমৎকার দেখতে। পশমের তৈরী খেলনার মতন। তিব্বতী ম্যাসটিফ কুকুরের বাচ্চা। বিক্রী করতে চায়। আর দাম জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল থাকে না। মুখে হাসি টেনে জানাই, কোন কিছুই কেনবার আমার শখ নেই।—তবুও ঘোরাঘুরি করে। আরও দু-তিনজন এসে হাজির হয়। তাদেরও বোধ করি বেসাতি করার জিনিস আছে।

ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি। আমার উৎসাহের অভাব দেখে অবশেষে সবাই চলে যায়।

আমিও নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিই।

গিরমি এসে জানায়, দুধ পাওয়া গেছে। আলুও সঙ্গে কিছু কিনে রাখছে।

আহারান্তে গাঢ় ঘুমে রাত কাটে।

৭ই অক্টোবর। ছটার মধ্যেই আবার সবাই প্রস্তুত। যাত্রাও শুরু। পথই যেন ঘর। চলাই যেন জীবন। পুল পার হয়ে আবার চড়াই। প্রায় চল্লিশ

মিনিট ধরে ওঠা। গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলা। চড়াই-শেষে পাহাড়ের গা ঘুরে সমতল পথ। পিছন ফিরে তাকাই। দূরে গিরি-শিরে গতকালের পার হয়ে আসা সেই লামজুরা পাশ্। এখন স্বপ্ন দেখার মতো মনে হয়। সুখ-স্মৃতির বিলাস যোগায়। পথের আর এক বাঁক ঘুরতেই সম্মুখে অদূরে তুষার-কিরীট এক গিরিচূড়া,— অচেনা দেশের কুহক ভরা।

সোজা পথ বনের মধ্যে এগিয়ে যায়। বাঁ দিকে অল্প নীচে পাহাড়ী নদী। ডান দিকে পাহাড়ের গা মাথার পানে ওঠে। গিরমিরা দেখি মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢোকে। শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে। মনে মনে ভাবি, পান্থনিবাসে এবার দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা বাজে। ঠিক তাই। আটটা ত্রিশেই থামে। আবার পথের উপর উনান পাতে। আজ আর গতকালের মতো পাহাড়ের ঢালু গায়ে বসবার স্থানের অভাব নয়। পাহাড় স্তরে স্তরে উঠে গেছে। তাই ফালি ফালি সমতল ভূমি। এখানেও ছোট ছোট ফুলে ভরা। কিন্তু চার-পাশেই ছড়ানো ছোট-বড় পাথর। গিরমি এসে পাথর সরিয়ে ফুলেরই উপর প্লাসটিক বিছায়। আরামে পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিই। হিমালয়-জীবনের এই রীতি,—চলতেও আনন্দ, বসেও তৃপ্ত। চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা। চোখের আড়ালে পাহাড়ী নদীর নেমে-যাওয়ার পদধ্বনি। প্রকৃতির প্রশান্ত নিভৃতি। আরও গভীর শান্তিতে মন নিমগ্ন থাকে। হঠাৎ কানে ভেসে আসে ঘড়ঘড় এক শব্দ: অপরিচিত নয়, অথচ এই পরিবেষ্টনে অপ্রত্যাশিত যেন, নিরালা গ্রামাঞ্চলে নিঝুম নিস্তব্ধ দুপুরে ঘরের ভিতর সহসা ভিমরুল উড়ে এসে বোঁ বোঁ শব্দ তোলে। হিমালয়ের প্রসুপ্ত প্রকৃতির শান্ত আকাশের ভিমরুলই বটে। শব্দ এগিয়ে আসে। গিরিমিরা রান্না ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মুখ তুলে আকাশপানে তাকায়। এধার-ওধার দেখে। ঐ—ঐ যে! আঙুল তুলে দেখায়,—দুই পাহাড়ের ছিদ্র-পথে ছোট এক প্লেন উড়ে আসে। দেখে ভাবি, ধ্যানমগ্ন মহামৌন শুভ্রকেশ হিমালয়ের প্রতি অর্বাচীন এক বালক ছুটে এসে উপহাস করে, অট্টহাসি তোলে, ত্বরিৎগতিতে আবার উধাও হয়! পাহাড়ের অন্তরালে প্লেন অদৃশ্য হলেও শব্দ অনেকক্ষণ ভেসে থাকে। তারপর আবার চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। যোগীন্দ্র তেমনি অবিচলিত ধ্যানরত।

গিরমি চা দিতে এসে বলে, লুক্‌লায় গেল ঐ প্লেন। আমাদেরও ফেরবার কথা ঐ রকমই প্লেনে।

শুনে, কি জানি কেন, মনে উৎসাহ পাই না। অন্তরে কীসের এক বেদনার কাঁটা বেঁধে।

সাড়ে দশটা। আবার চলা। বনের মধ্যে বড় ঝরনা। পার হয়ে অনেকখানি সোজা পথ। নিস্তব্ধ বনে প্রাণী চলাচলের শব্দ ওঠে। পথের দিকে এগিয়ে আসে। চমকে উঠি। মানুষের গলা শুনে আশ্বস্ত হই। গ্রামের লোক কাঠ কেটে নিয়ে চলে। এবার এই পাহাড়ের অপর দিকে নামা। সুন্দর উপত্যকায় পৌঁছুই। রিংমো গ্রাম ছাড়িয়ে চলি। শেরপাদের সেই সোলু-

অঞ্চল দিয়ে এখনও যাওয়া। চারিপাশে গগনস্পর্শী পাহাড়। কিন্তু এদিকের শের্পাদের বসবাস পাহাড়ের নিম্নদেশে, নদীর উপত্যকায়। নিকটে বড় বড় গাছপালার বনজঙ্গল। নদীর দুই তীরে উর্বর জমি। নানা ফসলের চাষ। স্নিগ্ধ সবুজ। শের্পারাও সাধারণ পাহাড়ীদের মতন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। নদীবহুল হিমালয়ও প্রসন্নমুখে আপন অফুরন্ত রাজভাণ্ডার খুলে দেন। কৃষিপ্রধান এই সোলু-অঞ্চলের শের্পাদেরও তাই চাষবাসই প্রধান পেশা। খুম্বুর শের্পাদের থেকে এদের সম্পূর্ণ ভিন্নরকম জীবনযাপন। তবুও, এরাও জাতিতে শের্পা, ধর্মে বৌদ্ধ। তাই, উভয় অঞ্চলবাসীদের মধ্যে মেলামেশা, বিবাহ আদিও চলে। যদিও খুম্বুর শের্পারা নিজেদের উন্নততর শ্রেণীর বলে মনে করে।

একাই এগিয়ে চলি। প্রশস্ত একটাই পথ। ভুল করার আশঙ্কা নেই। গ্রামের আশপাশে ক্ষেত। ছোট নদী। ভাঙা পুল। পার হয়ে গ্রামের নিকটে পথের দু-তিনটে শাখা। সবগুলিরই উপর লোক-চলাচলের পদচিহ্ন। সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলি নিশ্চিন্ত মনে। হঠাৎ পিছনে ডাক শুনি। গিরমি ছুটে আসে। পথ-নির্বাচন আমার ভুল হয়েছে। ভাবি, ভাগ্যে সময়মত দেখেছিল। না হলে ছাড়াছাড়ি হয়ে হয়রানি হতো যথেষ্ট। অযথা সময় যেতো, বেশি হাঁটার কথা ছেড়েই দিই। ফিরে এসে ওদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলি।

গিরমি জানায় কাঠমাণ্ডু থেকে এ-অঞ্চলে আসার জন্য আর একটা পথও আছে। ওখালধুংগা—Okhaldhunga হয়ে সোলু-ভ্যালির মধ্য দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে সেই পথ আসে। এই রিংমো গ্রামের নিকটে সেই পথ এ রাস্তার সঙ্গে যোগ দেয়। ঐ পথ ধরেও যাত্রীরা কেউ কেউ এসে থাকেন। আবার কাঠমাণ্ডু থেকে যাত্রা না করে, যারা জয়নগর হয়ে নামচে আসতে চান, তাঁদের পথও সেই ওখালধুংগা হয়ে খারিখোলায় চলে যায়, এই পথের সঙ্গে মিশে।

সামনেই আবার চড়াই দেখা যায়। রিংমোর উপত্যকা ছেড়ে তাকসিন্দুর উপত্যকায় গিয়ে নামতে হবে। মাঝখানে এই পাহাড় প্রাচীর সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে। ভাল কথাই। আবার ওঠো চড়াই। ক্ষণিকের সঙ্গ দিতে আবার **Tsuga** ও **Abies**-এর ঘন বন আসে। বনভূমি পার হয়ে তাকসিন্দু পাশ-এও পৌঁছুই। প্রায় ১০,৫০০ ফুট উঁচু। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ ময়দান। সমতল পথ। দু পাশে ছোট ছোট পাথর জড় করে স্তূপ, রঙিন কাপড়ের টুকরো বাঁধা। বাতাসে পতাকার মতো ওড়ে। কোথাও বা সারি সারি চোর্টেন —**chortens**। দূরে নীল আকাশে সাদা বরফের পাহাড় দিগন্ত উজ্জ্বল করে রাখে।

পাশ অতিক্রম করে অপর দিকে আবার নামা। সেদিকেও গহন বন আসে। রেডোডেনড্রন ও ওক-ই বেশি।

পাহাড়ের গা বেয়ে পথ ঘুরে ঘুরে নামে। বনের মধ্যে পথের উপর এঁটেল

মাটি। নামার মুখে কেবলি পা পিছলায়। অতি ধীরে সাবধানে পা ফেলি। গিরমিরা পথ ছেড়ে বনের মধ্যে দিয়ে পাকদণ্ডী ধরে সহজেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। টামাং পোর্টারের পিঠে প্রকাণ্ড ভারী বোঝা। গাছপালার মাঝ দিয়ে খাড়া পথে নামা তার হয়ত সম্ভব নয়। আমার আগে আগেই চলে। খালি পা তার। তবু, কেমন স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে পিছল পথে পা ফেলে। আমি চলি, অস্বাভাবিক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। মনে পড়ে যায়, শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ির কথা। রূপনারায়ণের তীরে। একেবারে নদীর ধারে। দেউলটি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে মাইল দেড়-দুই হাঁটাপথ। ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গেলে দূরত্ব কম হয়। সময়ে-অসময়ে প্রায়ই তাঁর কাছে যাই। সেবার গিয়েছি ভরা-বর্ষার মাঝে। স্টেশনের নিকটে এক দোকানে জুতো রেখে খালি পায়ে চলি। মাঠ-ক্ষেত জলে ভরা। বাঁধের বরাবর ধরে ঘুরে যেতে হয়। বাঁধের উপর এঁটেল মাটি। কেবলই পা হড়কায়। অথচ, পাশ কাটিয়ে হনহন করে গ্রামের লোক এগিয়ে যায়—খালি পায়ে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে। আমি চলি যে-কোন মুহূর্তে পড়বার ভয়ে পায়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টার জায়গায় দেড় ঘণ্টা লেগে যায়। কাদা-মাখা পায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসেন খুশীও হন, বলেন এই রকম বাদলা জল কাদায়ও এসে গেছ, চল, পুকুরে পা ধুয়ে আসবে।

হেসে বলি, আশ্চর্য! গ্রামের লোক। কিন্তু এ কাদাতেও কেমন অনায়াসে আসছে।

তিনি চাপা-হাসি গম্ভীর মুখ করে তখন বলেন, ওঃ! তুমি ভাল করে দেখ নি বুঝি? ওদের পায়ে যে বর্ষাকালে খুর গজায়। তুমিও বর্ষাকালে আসা শুরু করলে, তোমারও গজাবে, ভাবনা নেই।—বলে এবার হেসে ওঠেন।

টামাং পোর্টারের পায়ে, কিন্তু, নিশ্চয় খুর গজায় নি। সশব্দে বোঝাসমেত পথের উপর পিছলে পড়ে। গিরমিরা নাচে কিছু দূরে তখন বিশ্রাম নিচ্ছে,—গাছের ফাঁকে দেখা যায়। তাদের চেঁচিয়ে ডাকি। তখনি উঠে আসে। হাসা-হাসি করে। টামাং উঠে দাঁড়ায়। পিঠের বোঝা মাটিতে পড়ে। কেমন-এক করুণ মুখে সবার দিকে তাকায়। মুখে তার নানান ভাবের অভিব্যক্তি। পথে-পড়ে-থাকা বোঝার দিকে দেখে, আমার পানে চোখ ফিরায়,—ভয় ও লজ্জা-মেশানো দৃষ্টি। অপ্রতিভ ভাব। আবার, তখনি গিরমিদের দিকে তাকিয়েই তাদের হাসির প্রত্যুত্তরে নিজের মুখে হাসি ফোটাবার প্রয়াস করে। সহসা আঘাত পাওয়ার ব্যথাও মুখে সুস্পষ্ট ছায়া ফেলে। তখন তাকিয়ে দেখি, পাথরের খোঁচা লেগে তার পায়ের আঙুলে রক্ত ঝরে,—কাদার উপরও লাল রক্তের ছাপ। যেন, রক্তরাঙা কেঁচো আঙুল থেকে সড়সড়িয়ে মাটিতে নামে। হাতে ধরে তাকে পথের পাশে পাথরের উপর বসাই। গিরমিকে বলি আমার ঝোলা খুলতে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মারকিউরোক্রোম লাগাই। স্টিকিং প্লাসটার আটকে দিই। গিরমিদের বলি, ওর বোঝার ভার কিছু কমিয়ে

দিয়ে তারা নিয়ে চলুক। তাদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারি, এরা এই বিপদ ও ওরা দুর্ঘটনাই মনে করে না,—এ-যেন অতি সাধারণ ব্যাপার। তবু আপত্তি করে না। পালোয়ান দোরজে এর পুরো বোঝাটাই তুলে নেয়। নিজের বোঝার উপর অক্লেশে বেঁধে নিয়ে আপন পিঠে চাপায়। এগিয়ে এসে টামাং-এর কাঁধে হাত রেখে যা বলে তার মর্মার্থ বুঝি,—চল্, তুই খালি-পিঠেই চল্।—বলে আবার সবাই হেসে ওঠে।

আবার পথ চলাও শুরু হয়। হঠাৎ এতক্ষণে মনে পড়ে আমার জুতোর কথা। তাকিয়ে দেখি, জুতোর হিল্ আরও হাঁ হতে আরম্ভ করেছে। ভালো এতক্ষণ যে চলেছে, এই যথেষ্ট। কিন্তু এখনি আবার চিন্তা জাগে, তা তো হলো, কিন্তু এখনও যে ক'দিন পথ চলা বাকি। মনের মধ্যে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে। এ তো স্টিকিং প্লাস্টার! কেটে লাগালাম টামাং-এর ক্ষতস্থানে। জুতোর ক্ষতেও ব্যবহার করলে কেমন হয়? আজই সন্ধ্যার আশ্রয়ে এসে তারই সাহায্য নিতে হবে। হাসি পায় ভেবে সেই ছেলেবেলায় খেলাধুলোয় হাত-পা মচকালে মালিশ করা হতো—Horses' embrocation দিয়ে জুতোর ক্ষতে স্টিকিং প্লাস্টার! এ-সব পথে এও এক বুদ্ধির খেলা,—যা সঙ্গে আছে বা আশেপাশে সহজে মেলে, তারই সাহায্যে কাজ চালানো।

পথ নেমে এসে আবার সোজা চলে। বনের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনা পথের উপর ছড়িয়ে পড়ে। সে সব জায়গায় ঝরনার জলের তলায় পথের চিহ্ন হারায়। চারপাশে ছোট-বড় কালো পাথর। তাই ঘিরে ঘিরে বয়ে চলে জলের বিভিন্ন ধারা। কুলকুলু কলধ্বনি। ছোট ছেলেমেয়েদের খিলখিল হাসি। আট-দশ হাত দূরে ঝরনার অপর পারে দেখা যায় পথ আবার জেগে উঠে বনের মধ্যে চলতে থাকে। এ-যেন ছেলে পাথরের আড়ালে ক্ষণিকের জন্য মুখ লুকিয়ে আবার মুখ খুলে চাওয়া। পথ ছেড়ে পাথর থেকে পাথরে সাবধানে পা ফেলে জল ডিঙিয়ে ওপারে উঠি। আবার পথ ধরি। সমতল পথ। বনময় শান্ত, মন-ভোলানো পরিবেশ। হিমালয়ের প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে পথ চলার আনন্দ। অজানিতে গতিবেগ বাড়ে। গিরিমিরা পিছনে পড়ে থাকে। একা এগিয়ে চলি। মনের গোপন কোণে ভুলে থাকা কতো পরিচিত গানের সুর বাজতে থাকে। পায়ে হাঁটার ক্লান্তি নেই। দেহের কোন ভারবোধ নেই। অনাবিল আনন্দস্রোতে আপনা থেকেই ভেসে চলি প্রয়াসহীন ভঙ্গিতে। আবার ঝরনা এসে গতিরোধ করে। আবার ওপার থেকে হাতছানি দিয়ে পথ যেন ডেকে নেয়। চলার আবেগে চলতেই থাকি। ঝরনার পর ঝরনাও আসে। জলের বুকে পাথরগুলিও যেন পরিচিত হয়ে ওঠে। নির্ভয়ে পা ফেলে সমান গতিবেগে পার হয়ে যাই। আবার আর এক ঝরনা। আত্মভোলা হয়ে অসাবধানে পাথরে-পাথরে পা ফেলি। তখনি ফলভোগও করি। দুরন্ত অস্থির এক পাথর মাথা হেলায়।

তখান বাও হয়ে পড়ি জলের উপর। সামান্যই গভীরতা। এক বিঘতও নয়। শুধু প্যান্ট ও জামা অল্প ভেজায়। পাথরে পায়ে সামান্য আঘাতও লাগে। নিমেষে উঠে দাঁড়াই। তখনি চোখের উপর ফুটে ওঠে, টামাং-পোর্টারের সেই করুণ অপ্রতিভ মুখ। তাকিয়ে দেখি চারিপাশে। কোথাও কেউ নেই। তাই, হাসির রোল ওঠে না। জলেরই শুধু খিলখিল হাসি। দাঁত বার করে আর একজনও নিঃশব্দে হাসেন। দেখে গা জ্বলে। জুতোর ফিতে আরও মুখ হাঁ করে। রুমাল বার করে কোন রকমে বেঁধে রাখি। চলার গতিবেগ সংযত করি। পায়ের আঘাত তেমন কিছুই নয়।

আরও কিছুদূর যাবার পর বনের এলাকা শেষ হয়। সামনে [illegible] গ্রাম দেখা দেয়। পাহাড়ের কোলে ঘরবাড়ি, চাষের জমি। [illegible] মত [illegible]। শেষ [illegible] আগ্রহে এগিয়ে চলি,—জুতোর ফিতে [illegible] [illegible] [illegible]।

গ্রামে ঢোকবার আগে পথ ধনুকের আকারে বেঁকে যায়। [illegible] পথ চলে তিনটি শেরপা যুবতী। পিঠে ঘড়া। হয়ত জল নিয়ে ফেরে। দেখি, [illegible] পথের উপরে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পরস্পর গা ঠেলাঠেলি [illegible]। এগুতে চায় না, হাসাহাসি করে। নিকটে এসে পড়ি। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে [illegible] [illegible]। এড়িয়ে পথ ছেড়ে পাশে ঘাসের উপর দিয়ে এগুতে যাব,—সমস্বরে [illegible] ওঠে ভয়চকিত কণ্ঠে। কি বলে বুঝি না। [illegible] [illegible] [illegible]। আবার [illegible] মধ্যে হাসতে থাকে। [illegible] [illegible] দিকে তাকিয়ে অর্থহীন হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে আমি এগিয়ে চলি। এরা হা [illegible] দাঁড়িয়ে পথ রোধ করে,—যেতে দেয় না। চোখে তাদের ভয়-চাহনি, অথচ মুখে হাসি। ভাবি, হলো কী? এরা চায়-ই বা কী?—একজন তখন সুমুখ দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। তবুও অর্থ বুঝি না। [illegible] [illegible] গজ দূরে পথের আর একটা বাঁক। একফালি ছোট মাঠ। [illegible] [illegible]। মাঠে [illegible] একটা মহিষ ঘোরে। [illegible] [illegible]। পাহাড়ি গ্রামের সাধারণ চিত্র। [illegible] দেখে আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেয়ে [illegible]। গিরমি এসে পড়ে। উত্তেজিত ভাবে [illegible] [illegible] [illegible] কি বলে। গিরমি দূরের মোষটার দিকে তাকায়। [illegible] [illegible] নাড়ে। পথের পাশ থেকে কয়েকটা টুকরো পাথর [illegible]। মোষটার [illegible] একটা ছোঁড়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য। মোষটার গায়ে লাগতেই [illegible] দুলিয়ে [illegible] নেড়ে এগিয়ে আসতে চায়। গিরমি তখনই আরও একটা ছোঁড়ে। [illegible] [illegible]। মোষটা এবার পিছু হটে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথা তুলে [illegible] করে তাকায়। গিরমি আবার আর একটা পাথর ছোঁড়ে অতো দূরে। [illegible] ঠিক গিয়ে লাগে। মোষটা আরও খানিক সরে যায়। গিরমি তখন জানায়, চলুন এবার এগিয়ে। পাগলা মোষ ওটা। অল্প আগেই একটা লোককে গুঁতিয়েছে।

মেয়েগুলিরও উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি। গিরমির দিকে সপ্রশংস মুগ্ধ নয়নে

তাকায়, আমাকেও কি যেন বলে, খিলখিল করে হেসে।

গ্রামের মধ্যে ঢুকি। সুন্দর বাড়িগুলি। একে একে ছাড়িয়ে যাই। তবু গিরমি দাঁড়াবার লক্ষণ দেখায় না।

অগত্যা জিজ্ঞাসা করি, আজ এইখানেই থাকবার কথা না?

সে বলে, হাঁ। কিন্তু এখানে থাকব না। বেলা রয়েছে। আরও খানিক এগুনো যাক। সোজাই তো রাস্তা। গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই আবার খানকয়েক বাড়ি-ঘর। ছোট গ্রাম। নাম শুনি, ছোড়কু। পথের বাঁদিকে একতলা সুশ্রী একটা বাড়ি। সুমুখে পুথর ধারে বেড়া, ছোট গেট্। তারই ভিতর দিয়ে গিরমি নিঃসঙ্কোচে ঢোকে, যেন নিজেরই বাড়ি। বাড়ির এলাকার মধ্যে বাঁ দিকে ক্ষেত। বোধ হয় আলুর চাষ হয়েছিল। এখন খালি জমি। এবড়ো-খেবড়ো। ডানদিকে জমি-ভরতি মানুষ-উঁচু প্রকাণ্ড মাচান। সবুজ লতায় ছাওয়া। সুপুষ্ট স্কোয়াস—Squash—ঝুলছে অপর্যাপ্ত। গিরমিকে দেখাই। বলি, দেখ না, যদি কিছু কিনতে পাওয়া যায়,—আবার না, 'ছুই না' বলে!

গিরমির মুখে মৃদু হাসি ফোটে, ঘাড় নাড়ে ভাবটা যেন,—হবে, হবে, এখানে সবই মিলবে।

বাড়ির ভিতর থেকে এক শেরপা মহিলা বেরিয়ে আসেন। গিরমিকে দেখে যে ভাবে আপ্যায়ন করে কথা বলেন, বেশ বোঝা যায়, আগে থেকেই জানাশোনা।

গিরমিরা গিয়ে ওঠে একটা বড় ঘরে, সেইখানেই এ-বাড়ির সকলে বাস করেন। আমার স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা হয়, সামনের অপর একটা ঘরে। সাধারণ ঘর নয়। প্রকাণ্ড এক হল। কাঠের দেওয়াল। কাঠের মেঝে। দুপাশে বড় জানলা। একপাশে দেওয়ালের গায়ে উঁচু বেদী। তারই উপর বুদ্ধদেবের মূর্তি। ধূপ দীপ সাজানো। দেওয়ালে আঁকা দেবদেবীর নানাবর্ণের চিত্র। অত বড় ঘর, তবু আমার বিছানাটুকু পাতবার জায়গা কোথায় পাই, ঘরে ঢুকে তাই ভাবি। এ-যেন সমুদ্রের উপর ভেসে চলি, পানীয় জল দেখি না কোথাও। মেঝের উপর চারিধারে স্তূপাকার মাল। কাঠের বড় বড় বাক্স, প্রকাণ্ড বস্তা ইত্যাদি তো আছেই, পাহাড়-প্রমাণ রাশি রাশি আলুও। বুঝলাম, বাইরের সেই ক্ষেতের ফসল এখন ভাণ্ডার ভরেছে। বুদ্ধদেব এখন তারই পাহারায় রত। আমিও ভাবি, তাঁরই চরণতলে আশ্রয় নিই। গিরমীকে ডাকি। বেদীর নীচে আলু সরিয়ে বিছানা পাতা হয়। একদিকে বেদী, অপর তিনদিকে আলুর বেড়া হয়ে থাকে। কিন্তু গোলাকার পৃথিবীর মতো আলুও নিশ্চল থাকে না, কেবলই গণ্ডগোল পাকায়, গড়িয়ে বিছানার উপর চলে আসতে থাকে। সারারাত ইঁদুর বাহিনী যাতায়াত করে, আলুর পাহাড়েও ধস্ নামে। খস্‌খস, ঘড়ঘড় শব্দ হয়। মাথার কাছে বুদ্ধদেবের প্রশান্ত মূর্তি, বরাভয় মুদ্রা। তাই স্মরণ করে আমিও রাত্রের বিশ্রামসুখের সাধনায় মগ্ন থাকি।

একসময়ে রাতও কাটে।

৮ই অক্টোবর। যথারীতি খুব ভোরে উঠি। এখনও বাইরে অন্ধকার। টর্চ হাতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করার উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে চলি। কাল বিকেলে দেখা আলুর ক্ষেতের এক কোণে একটা জায়গাও মনে মনে ঠিক করাও আছে। বাড়ি থেকে অল্প দূরেই। অন্ধকারে বেশিদূর যেতে হবে না। একে ছোট গ্রাম, লোকজন কম, তার উপর অত ভোরে পাহাড় অঞ্চলে কেউ বিছানাও ছাড়ে না। নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে বসি। হঠাৎ পিছনে যেন বাতাসের স্পর্শ অনুভব করি। ভাবি, পাহাড়ের দেশ ভোরের বাতাস। কিন্তু গরম ঠেকে কেন? বেশি ভাবতে হয় না। পিছন থেকে কে যেন মৃদু ধাক্কা দেয়। চমকে উঠি। হুমড়ি খেয়ে পড়ি বুঝি! কোন রকমে সামলে নিই। ফিরে তাকাই। বিরাট এক তিব্বতী কুকুর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। টর্চের আলো ফেলি কুকুরের মুখে। ভালুকের মত দেখতে। সেও মুখ তুলে তাকায়। লক লকে জিব বার করে। ভাবি এই বুঝি কামড়ে। না—সুসভ্য সারমেয়। কিছুই বলল না। চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হয় সে-ও যেন অবাক। মুখ তুলে বুঝি জিজ্ঞাসাই করে, হলো কি? অমন হাঁচড়ে পাঁচড়ে তড়াক করে উঠলে কেন? ঐ কি 'টেবল্‌-ম্যানার্স'?

সেদিনকার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিষয় পরে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে ব্যানার্জির কাছে গল্প করি। তিনি বলেন, ও অভিজ্ঞতা ঐ-সব অঞ্চলে গেলে সবারই হয়। আমারও জানা আছে। ঐ কারণেই তো ওদিকের গ্রামগুলোতে নোংরা থাকে না, দুর্গন্ধও নেই। দেখেন নি

ছটা বাজবার আগেই আবার যাত্রা। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত। তারই মাঝ দিয়ে সরু পথ। দুপাশে কোথাও ডালপালা দিয়ে ক্ষেতের বেড়া কোথাও বা পাথর সাজিয়ে পাঁচিল। দূরে দূরে ছোট গ্রাম। পাহাড় থেকে পথ ক্রমে নেমে চলে। মাঝে মাঝে জঙ্গল আসে। আবার ক্ষেতভূমি আবার গ্রাম আবার জঙ্গল। পথের আশেপাশের পট-পরিবর্তন হলেও সর্বক্ষণই নিম্নমুখী গতি। খাড়া উৎরাই। জঙ্গলের মধ্যে পথ ঢুকলেই সঙ্গদোষে পথ পিছল হয়, গতিবেগও শিথিলতা আনে। সুমুখে আকাশের বুকে পাহাড়ের মাথায় বরফের চূড়া। যেন নীল সরোবরে শ্বেত শতদল। মাঝে মাঝে দাঁড়াই। বিস্ময়ে তাকাই। তুষারগিরির রাজ্যের এলাকা আর বেশি দূরে নয়.— ভাবতেও মনে আনন্দ লাগে। পথ চলার নবীন উদ্দীপনা আনে। কিন্তু, পথ যে নেমেই চলে একটানা। গিরমি বলে, আজই নেমে যাব দুধকোশির ধারে।

দুধকোশি! ম্যাপে দেখা সেই সে-নদী? এভারেস্ট গিরিশ্রেণীর দক্ষিণ অংশের জলভার সংগ্রহ করে নেমে আসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে? তবে কি এভারেস্টও দেখা দেবে এখনি?

না, তা হবার নয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর। অতো সহজে কি তার দর্শন মেলে? নিকটে হলেও দৃষ্টির বাহিরে।

ভক্তবৃন্দ ঘেরা মহাপুরুষদের মতো।

কিছুক্ষণ থেকে শব্দ উঠে আসে পাহাড়ের নীচের দিক হতে। নদীর জল-ধ্বনি নয়, লোকজনের কন্ঠস্বর। বাজনার সুরও। জঙ্গলের পথ। কাউকে দেখা যায় না। কিন্তু, বোঝা যায়, ক্রমে ক্রমে শব্দ নিকটে আসে স্পষ্টতর হয়ে। আমরাও নেমে চলি। তাই দু'দলে দেখাও হয় অল্প পরেই। প্রথম উঠে আসে পাঁচ-ছয়-জন লোক, দুটো ঘোড়া। গিরমি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলে। সোৎসাহে তখনি আমার কাছে এগিয়ে এসে জানায়,—থিয়াংবোচির প্রধান লামা! এই এখনি উঠে এলেন-বলে, এইখানে,—বলে পথের নীচের দিকে উদ্‌গ্রীব ভাবে তাকায়।

তাকাবার কারণই বটে। থিয়াংবোচির লামা! থিয়াংবোচিতেই তাঁকে দেখব, আলাপ করব,—কতো কীই না শুনি তাঁর সম্বন্ধে, আর পথে এই ভাবে দেখা হবে, ভাবতেই পারি নি। গিরমিকে বলি, কোন্ ব্যাগে 'কাটা' আর ধূপ রাখা হয়েছে—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির বার কর।

'কাটা'—মসলিন কাপড়ের মত,—হাত দুই-তিন লম্বা, বিঘতখানেক চওড়া। যেন, রেশমী গলাবন্ধ, স্কার্ফ—scarf! কাঠমাণ্ডুতে বাম্নাজি বলে দেন, দু-তিনটে 'কাটা' কিনে নিয়ে সঙ্গে রাখবেন, কিছু ধূপ, কয়েকটা মোমবাতিও। লামাদের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঐ 'কাটা' তাদের গলায় পরিয়ে দিয়ে অভিবাদন করা প্রথা। বাতি ও ধূপকাঠিও সেই সঙ্গে দেবেন। থিয়াংবোচির বড় লামাকে তো দিতেই হবে।

গিরমি তাড়াতাড়ি ঝোলা খুলে বার করে। দোরজেরাও সসম্ভ্রমে পথের পাশে বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লামাও সদলবলে এসে হাজির হন। সবাই হেঁট হয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়, তিনিও হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।

বয়স বেশী মনে হয় না। হয়ত, ত্রিশের কোঠায়। মাথায় লামাদের উঁচু টুপি। পরনে সেই ঝলঝলে জোব্বা,—গাঢ় লাল রঙ। ভাল দামী সিল্কের। পায়ে মোজা, সাধারণ চামড়ার স্যু-জুতা। হাসিমুখে হেঁটে চড়াই-পথ উঠে এলেন। তাঁরই হাতে ট্রানজিস্টার,—যার বাজনা কানে আসছিল। সঙ্গে জনতিনেক সঙ্গী। আমিও এগিয়ে গিয়ে 'কাটা' গলায় পরিয়ে দিই। তিনি মাথা নামিয়ে গ্রহণ করেন। হেঁট হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাই। তিনিও সঙ্গীর হাত থেকে আর একটা 'কাটা' নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দেন। ধূপ ও বাতিও তাঁকে দেওয়া হয়।

লামার এক সঙ্গী পি. ডব্লিউ. ডি.—P. W. D-র অফিসার। ইংরাজি জানেন। তাই কথাবার্তার অসুবিধা হয় না। লামা জানতে চান, কোথা থেকে

আসছি, কোথায় চলেছি, কি কারণেই বা আসা ?

উত্তর দিয়ে জানাই, থিয়াংবোচিতে তাঁর দর্শনলাভও যাত্রার একটা মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনিই তো চলে এলেন এইখানে। ফিরবেন কবে ?

তিনি গিরমিকে বলে দেন, থিয়াংবোচিতে লামার ভাই আছেন, তাঁর সঙ্গে যেন আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। থাকবার সব ব্যবস্থা তিনিই করিয়ে দেবেন। লামার ফিরে আসতে দিন দশেক দেরি হবে।—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে যা বলেন মর্মার্থ বুঝতে পারি, থিয়াংবোচিতে আবার হয়ত দেখা হবে।

মাথা হেঁট করে আবার অভিবাদন জানাই। আমার মাথার উপর হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করেন। সদলবলে এগিয়ে যান। অফিসারটি আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলেন। তাঁর কাছে জানতে পারি, এই পাহাড়ের উপর দিয়ে বড় রাস্তা তৈরি হবে, তারই সার্ভে তিনি করছেন।

লামার দল পাহাড়ের উপর দিকে উঠে চলেন। আমরাও নীচে নদীর দিকে নামতে থাকি।

গিরমিকে বলি, তোমাদের দেশে যাবার আরও ভাল বড় রাস্তা হচ্ছে,—লামাও চলেছেন সেই ব্যাপারে নিশ্চয় ?

গিরমি গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে জানায়,—না। তখন তার কাছে যা খবর শুনি, অবাক হই। লামার সঙ্গীদের কাছেই সে এখনি শুনেছে।

কদিন আগে থিয়াংবোচির মনাস্টি থেকে কয়েকটা বাছা বাছা সুন্দর প্রাচীন মূর্তি চুরি হয়েছে। সেই সম্পর্কেই লামা কোনখানে চলেছেন।

হিমালয়ের সেই সুদূর দুর্গম অঞ্চল। তার উপর—মনাস্টি! সেখানেও চুরি! মানুষের লোভের কি অন্ত নেই!

স্থান-অস্থান বিচারও নেই!

মনে পড়ে, একবারের এক অভিজ্ঞতা।

বাংলার বাইরে এক তীর্থস্থানে একটা মঠে গিয়ে আছি। শহরের এক প্রান্তে পাঁচিল-ঘেরা এলাকা। তিন-চারখানা ছড়ানো একতলা বাড়ি। এক-পাশে মাথা তুলে বড় মন্দির। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো—চত্বর, সোপান, নাটমন্দির, গর্ভগৃহ। মণ্ডপে সন্ধ্যায় কীর্তন হয়। তারপর শয়ন-আরতি-শেষে গর্ভগৃহের দ্বারে প্রকাণ্ড তালা পড়ে। সন্ধ্যারতির সময় দর্শনে যাই। বিজলী বাতিতে চারিদিক ঝলমল করে। মানুষ-প্রমাণ বিগ্রহ। রঙীন রেশমী বেশভূষা। অঙ্গভরা সোনা-রূপার অলঙ্কার। আরতি পঞ্চপ্রদীপের প্রকম্পিত শিখায় জ্বলজ্বল করে। ঘরের ভিতর যেন বিদ্যুতের চমক লাগে। তাকিয়ে দেখি আর ভাবি, দেবতার দেহে অতো অলঙ্কারের জাঁকজমকের প্রয়োজন কি ?

পরের দিন ভোরবেলা। সবে শয্যা ছেড়ে উঠেছি। স্বামীজী দরজার কাছে এসে উৎকণ্ঠিত স্বরে ডাক দেন, উঠেছেন নাকি ? ওদিকে সর্বনাশ ঘটেছে। রাত্রে ঠাকুরের গায়ের সব গহনা চুরি হয়েছে!

তখনি দুজনে মন্দিরে যাই। গর্ভগৃহের দরজা খোলা। স্বামীজীই

রোজ ভোরে এসে খোলেন। প্রভাত-আরতি হয়।

সেদিন একটু আগে খুলে দেখেন, বিগ্রহ অলঙ্কার-বস্ত্র-হীন,—পাশের দেওয়ালের জানলার গরাদে ভাঙা।

আমিও সেই দৃশ্যই দেখি। গতকালের সেই সাজসজ্জায় জমকালো দেবতা, এখন সম্পূর্ণ নিরাভরণ। ঘরের মধ্যে বিরাট এক শূন্যতার হাহাকার যেন জমাট হয়ে থাকে।

ভাবি, মানুষের লিপ্সা—অপহরণ বৃত্তি এর কি সীমাহীন বিস্তৃতি, সর্বক্ষেত্রে অবাধ গতিবিধি!

তারপর, যথারীতি পুলিসে খবর দিতে হয়, পুলিসও আসে। স্বামীজীর কিন্তু কোন দুশ্চিন্তা দেখি না। কারণও জানতে পারি।

বলেন, দেখুন, আশ্চর্য ব্যাপার। ঠাকুরের হাতের রূপার বাঁশিটি ছাড়া আর সব গয়নাই গায়ে ছিল নকল,—গিল্টি-করা!

দুদিন আগেই হঠাৎ কি-এক দুঃস্বপ্ন দেখে মনে হ'লো, সোনার অলঙ্কার-গুলি তুলে রাখি, এইগুলো পরিয়েই বিগ্রহ সাজাই। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর!

কিন্তু দেবতা সব সময়েই যে নিজেকে বাঁচানই,—এমনও নয়, দেখি।

আর এক বারের ঘটনা। এক বন্ধু বদরীনাথ থেকে ফিরে এসে সংবাদটা শোনান। ঐ তীর্থ-পথেরই প্রাচীন এক মন্দির।

পঞ্চবদরীরই একটি। তবে, সেদিকে যাত্রী যায় অল্পই। বদরীনাথের পথের ঠিক উপরে নয় বলেই। একবার গিয়ে দর্শনও করে আসি। অতি মনোহর বিষ্ণুমূর্তি। নিকষ কালো পাথরের।

বন্ধু বলেন, আপনি দেখে এসেছেন তো? এবার কিন্তু গিয়ে কি দেখি জানেন? শূন্য মন্দির,—বিগ্রহ নেই। কদিন আগে চুরি গেছে!

শুনেই বুঝতে পারি, এ-চুরি মূল্যবান অলঙ্কারের লোভে নয়, ভাস্কর্য সৌন্দর্যের প্রলোভনে। তস্করের সৌন্দর্য-বোধ নয়,—বিদেশে চালান দিলে মূল্যপ্রাপ্তির লোভে।

বন্ধু বলেন, কিন্তু পাথরের মূর্তি,—ভারও আছে, আকারেও বড়। তাই চালান যাওয়ার পথে কোন এক জায়গায় চোর ধরা পড়ে যায়। বিগ্রহও ফেরত আসে। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করি, তা কই! মন্দিরে এনে রাখা হয় নি কেন? অমন সুন্দর বিগ্রহ, আবার দর্শন হতো। পূজারী বলেন, তা দেখতে চান, দেখতে হয়ত পাবেন,—কর্ণপ্রয়াগে গেলে;—সেখানে পুলিসের হেফাজতে জমা আছে,—চুরির মামলা শুরু হচ্ছে কিনা,—তাই আদালতে এক্জিবিট হবে।

দেবতার মূর্তি, আপাততঃ পূজার প্রতিমা নয়, মন্দির-আলো করে থাকা নয়—এখন চোরাই মাল, কোর্টের এক্জিবিট, পুলিস থানার মালগুদামে!

ভাবি দুর্ভোগ কার? মানুষের গড়া দেবতার? না, দেবতার গড়া মানুষের?

থিয়াংবোচি মঠের মূর্তি-অপহরণেও সেই একই উদ্দেশ্য। হয়ত ভারতের বাইরে কোথাও পাচার-করার প্রচেষ্টা। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, হিমালয়ের কোন্ দুর্গম অঞ্চল, অতি-নিভৃত মঠ,—সেখানকার মূর্তিগুলির সুলুক-সন্ধান এই সব লোক পায়ই বা কি করে, দেয়ই বা কে?

নেমে চলি পাহাড়ের ঢালু পথে আপন মনে। পিছনে শোনা যায়, গিরমিদের সেই পরস্পরে অনর্গল কথা বলা, থেকে থেকে হাসির উচ্ছ্বাস। নদীর উপত্যকার দিকে পথ যত নামে, দু'পাশের বড় বড় গাছের জটলা তত বাড়ে। সহসা সজোরে বাতাস ওঠে। গাছের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি তোলে। অরণ্যে জড়জগৎও যেন সচেতন হয়ে ওঠে।

জলের হুঙ্কার ধ্বনিও কানে আসে। বোঝা যায়, নদী নিকটেই। জলের ধারে নেমেও আসি।

দুধকোশি. দুধেরই মতো রঙ। সাদা ধবধবে। কে যেন পাহাড়-ঘেরা কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দেয়। টগ্‌বগ্ করে ফোটে। কড়াই কাত করে সেই ফুটন্ত দুধ ঢেলে দেয়। উদ্দাম বেগে বয়ে চলে দুগ্ধ-নদীর ধারা। সুন্দর লোহার ঝোলা পুল। সুইসদের নতুন তৈরি করে দেওয়া শুনি। নদীর অপর পারে পথ যায়। স্তব্ধ পাহাড়ে স্রোতের ভীষণ গর্জন প্রতিধ্বনি তোলে। পথ বাঁ দিকে বেঁকে নদীর ধার দিয়ে চলে। পথের পাশে বনের গাছগুলোর ডালপালা হঠাৎ সজোরে নড়ে ওঠে, শব্দ তোলে,—ডালে ডালে হুড়োহুড়ি পড়ে। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি। বানরের পাল। এ গাছ থেকে ও গাছে লাফায়। মুখ ঘুরিয়ে দেখে। এ যেন তাদেরই রাজত্ব,—আমিই যেন অনাহূত অবাঞ্ছিত জীব। পথও যেন থমকে গিয়ে নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে পালাতে চায়। শুরু হয় আবার চড়াই।

অথচ, শুনেছি, দুধকোশি নদী এসে গেলে একরকম এভারেস্ট-এলাকাতেই পৌঁছানো। কাঠমাণ্ডু থেকে এতদিন পূবমুখী পথ এসেছে, এইবার এই নদী ধরে এগিয়ে যাবে উত্তরমুখে। তাই বটেও। কিন্তু এ হিমালয়-রাজ্য। আজব দেশ। এখানকার ধ্যান-ধারণার মাপকাঠিও তাই স্বতন্ত্র। পথ এবার যাবে নদী ধরে, ঠিকই। কিন্তু, সব সময়েই যে নদীর তীর দিয়ে, এমন নয়। কখন পাশেই দশ হাত দূরে নদীর ধারা,—প্রচণ্ড তরঙ্গ-ভঙ্গে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস। আবার কখন বা নদীর কূল ছেড়ে পাহাড়ের উপর উঠে যাওয়া,—তখন বহু নীচে নদীর ক্ষীণ ধারা,—নীরব, নিশ্চল সাদা রঙের প্রলেপ আঁকা। তবুও যে উত্তর দিক থেকে নদী নেমে আসে, সব সময়ে সেই দিক লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়া যেন তরঙ্গসঙ্কুল পর্বত-সাগর ধ্রুবতারা দেখে তরণী বাওয়া। নদীর পাশে যখন নামি, মনে হয়, পথ যেন নদী-মায়ের আঁচল ধরে হাঁটে। অল্প পরেই কর্মব্যস্ত জননী যেন বলে ওঠেন, সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিস্ কেন? কাজে বিরক্ত করিস নে এখন। একটু বাইরে খেলতে যা দিকিনি!—অভিমান-ভরে পথও তখনি আঁচল ছাড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে দু-তিন হাজার ফুট

উঠে যায়। নদীও হয়ত তখন চোখের আড়ালে যায়।

সেই মত পাহাড়ের উপর একসময় পৌঁছে একটা গ্রাম পাই। থোরুকু নাম। গ্রাম ছাড়িয়ে চলি। খানিক দূরে যাবার পর জঙ্গল থেকে গিরমিদের কাঠ সংগ্রহ শুরু হয়। চারপাশে বোল্ডার-ছড়ানো একটু সমতল জায়গা। প্রকাণ্ড একটা পাথরের - rock face-এর পাশে মালপত্র নামায়। দুপুরের রান্নার তোড়জোড় করে। কিন্তু দুপুর কই? ঘড়িতে দেখি, সকাল আটটা চল্লিশ মাত্র! খাওয়া শেষ করে সওয়া দশটার মধ্যেই আবার রওনা।

বেশ বড় চড়াই। খাওয়া-দাওয়ার পর ওঠা, হয়ত তাই বেশি মনে হয়। পাহাড়ের মাথায় উঠে, আবার অপর দিকে নামা। দুধকোশি পাশের কোন পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়। অপর আর এক পাহাড়ী নদীর উপত্যকায় নেমে চলি। বোঝা যায়, এ-নদী দুধকোশিরই উপনদী। পথও পার হয়ে ঘুরে-ফিরে আবার দুধকোশির ধারেই যাবে। তবে আজ নয়। কেন না দেখা যায়, পাহাড়ের গা দিয়ে পথ এখন এঁকেবেঁকে চলে অনেক দূরে, নামতেও হবে অনেক নীচে ঐ সেই নদীর ধারে। সহজ পথ। ধীরে নামে। এ-পাহাড়গুলিতে বন-জঙ্গল নেই। নীচে গ্রামের বাড়ঘর। চায়ের ক্ষেতও। গিরমি বলে, ওই। খারিখোলা। আজ ঐখানে রাত কাটানো।

মনের আনন্দে এগিয়ে যাই।—এখনি তো পৌঁছে যাব ওখানে। সঙ্গীরা পিছনে পড়ে থাকে। দেখতে দেখতে দূরের লোকালয় নিকটে আসে। লোকজনও দেখা যায়। ক্রমে গ্রামও শুরু হয়। পথের দুপাশে পাথর-সাজানো পাঁচিল। কোথাও বাড়ি, কখন বা ক্ষেতের এলাকা ঘেরা। মাঝ দিয়ে পথ। নদীর ভ্যালি এখনও পাঁচ ছ'শ ফুট নীচে। সেখানেও ঘরবাড়ি। কিন্তু এখান থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাবি, এটা হয়ত ভিন্ন গ্রাম। নীচে নদীর উপর পুলও দেখা যায়। নদীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে এগিয়ে-যাওয়া পথের রেখাও। পুলের কাছে দূর ও নিকটের মেলামেশা। কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচের ডেরায় পৌঁছানোর আগ্রহে গতিবেগ বাড়াই। পিছনে দ্রুতগতি পদধ্বনি শুনে ফিরে তাকাই। দেখি, গিরমি আসে। দাঁড়াতে ইশারা করে। এগিয়ে এসে জানায়, যেখানে আজ রাত্রে থাকব, সে বাড়ি ছাড়িয়ে এসেছি, ফিরতে হবে।

জিজ্ঞাসা করি এখনও তো অনেকখানি নীচে নামা বাকি। ঐখানে নদীর ধারে বাড়িতে থাকলেই হয়। এগিয়েও থাকা হবে, কাল সকালে প্রথমেই চড়াই ওঠা সহজও হবে। বেলা তো মাত্র সওয়া একটা।

সে জানায়, খারিখোলা এটাও,—ওটাও। কিন্তু ওখানকার লোকজন সুবিধের নয়। জায়গা মিলবে না।

পরে জানতে পারি, নীচে স্থানীয় পাহাড়ী নেপালীদের বাস, উপরে এইখানে শেরপাদের বসতি। অতএব, গিরমির পক্ষে এইখানেই ব্যবস্থা করা সহজ।

ফিরিয়ে নিয়ে আসে ফেলে-আসা পথের ধারে একটা দোতলা বাড়িতে।

তখনি ভাবি, আরে! এই বাড়িতেই! কী আশ্চর্য!

অবাক হবার কারণ থাকে। একটু আগে এগিয়ে যাবার সময় এই বাড়িখানি দেখে মনে ধরে। দোতলা ছিমছাম চমৎকার বাড়ি। রাস্তা থেকে ঢুকে সামনে বাগান, পাথর-গাঁথা বসবার বেদী, তিব্বতী টোরটেন, লালনীল পতাকাও। চারিপাশ পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক করে। একতলায় সবুজ-রঙের কাঠের থাম-দেওয়া বারান্দা, সারি সারি সাজানো টবে ফোটা ফুল। পাহাড়ের গায়ে বাড়িটা যেন সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে একমনে তাকিয়ে দেখে সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য,—নেমে-যাওয়া নদীর উপত্যকা, ওপারে মাথা-উঁচু ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের সারি, দূরে বরফের চূড়া।

আমিও যাবার সময় বাড়ির রূপে মুগ্ধ হয়ে থমকে খানিক দাঁড়াই। মনে মনে বলি, ওগো, পাহাড়িয়া! দূরদেশী পথিক আমি। রাত কাটানোর আশ্রয় দেবে ঘরে?

কিন্তু তখনি আবার এগিয়ে যাই। সামনে পথের ডাক শুনি নীচে ঐ নদীর ধারে যে নামতে হবে। এখন দেখি, নামা নয়, ফিরেই আসতে হয়, আবার ঠিক সেই বাড়িতেই!

অবাক হয়ে ভাবি, কে যেন মনের গোপন ইচ্ছা পূর্ণ করতে এগিয়ে আসে। অদ্ভুত আনন্দ জাগে মনে।

তখন তো আর জানি না, স্বর্ণমৃগ দেখে আপন দুর্ভোগের পথেই পা বাড়াই!

গিরমিরা একতলার একপাশের ঘরে থাকবার জায়গা করে নেয়। সামনের একপাশ-খোলা ঢাকা বারান্দার এক ধারে আমার বিছানা পাতি। ক'হাত দূরেই ফুলে-ভরা বাগান। চোখ মেললেই দিগন্তবিসারী পাহাড়ের সারি। খুচরো জিনিসপত্র বিছানার পাশে সাজিয়ে রাখি। চলে যাই জলের সন্ধানে। সারাদিন সামনে পড়ে। আকাশ-ভরা রোদ। কাপড়, গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি সাবান দিয়ে কাচার এমন সুযোগ ছাড়তে আছে? কেচে রোদে শুকোতে দিই। নিজেও রোদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াই। শেরপা-মেয়েরা রঙীন ঘাগরা পরে ক্ষেতে কাজ করে, কারও বা পিঠে ঝকঝকে তামার কলসী, ঝরনা থেকে জল আনে। পুরুষরা কেউ রোদ পোহায়, গল্পগুজব করে, ঝলঝলে পোশাক পরে কেউ বা কোন কাজে চলে। যে যাই-ই করুক, বিদেশী দেখে সবাই তাকায়। চোখ কুঁচকে, মুখের উপর রেখা টেনে হাসে। একটি বছর ত্রিশের যুবক। সুশ্রী চেহারা। হাসিখুশী মুখ। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। এগিয়ে এসে কথা বলে। কেউ কারও ভাষা বুঝি না। তাই হাসির উত্তরে আমিও মুখে হাসি দেখাই। এতেই যেন কতো গভীর পরিচয় হলো,—এমনি ভাব নিয়ে সে আপন কাজে চলে যায়। আমিও একা একা ঘুরি। ক্রমে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। রোদের তেজ কমে। ডেরায় ফিরে শুকোতে-দেওয়া জামা-কাপড় তুলি। গিরমি আবার গরম চা এনে দেয়। বাগানে পাথরের বেদীর উপর পড়ন্ত রোদে বসে পান করি। মনে তৃপ্তি আনে।

উচ্ছলিত স্ফূর্তির প্রতিমূর্তি ধরে দুটি শেরপা যুবতী বাগানে ঢোকে। রঙীন বেশভূষা। গোলাপের মতো মুখের আভা। মুখে চোখে হাসির ঝলক। দেহ দুলিয়ে আসে যেন নাচের ভঙ্গিমায়। দুজনেরই মাথায় বাঁধা ফেটিতে পিঠের উপর ঝুলিয়ে আনা দুটি কাঠের কলসীর মতন। এগিয়ে এসে বারান্দার নীচে বাগানের ধারে বসে। কলসী মাটিতে সামনে রাখে। অমনি যেন মধুর লোভে মৌমাছির দল উড়ে আসে। শেরপা ছেলে, বুড়া ঘিরে জড় হয়। বাটি, গেলাস হাতে। তখন বুঝতে পারি, সুরাপানের মহোৎসব শুরু হয়। খিলখিল হাসি। অনর্গল কথা বলা। গায়ে গায়ে ঢলে পড়া। গেলাসের পর গেলাস কলসী থেকে ভরানো চলতেই থাকে। নেশাখোরদের দলও বাড়ে। নেশার ঘোরও জমে। মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলিও বাদ যায় না।

অস্বস্তি বোধ করি। সাধের শিলাসন ছেড়ে আবার পথে পথে ঘুরে বেড়াই

সূর্যদেব পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হন। রোদ উঠে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় ওঠে। এখানে বাড়িগুলির কাছে শুধু দিনের আলোটুকু রেখে যায়। দিনশেষের সে আলো মুমূর্ষু রোগীর মতো দেহের উত্তাপ হারায়। হিম-শীতল বাতাস আমারও অঙ্গে শিহরণ জাগায়। ফিরে আসি আপন আস্তানায়।

সুরা-রসের আড্ডায় তখন প্রায় ভাঙা হাট। মাত্র জনচারেক আছে। ভাবি, ওরাও এবার যাবে। বাঁচা গেল। নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় উঠে বিছানায় বসি। গায়ে কম্বল জড়িয়ে আরাম পাই। জানি না, আমিই পথ দেখালাম কিনা,—মাতালগুলিও বারান্দায় উঠে আসে। একটি মেয়ের কলসী তখনও শূন্য হয় নি। তাকেও টেনে আনে। আমার বিছানা থেকে হাত ছ-সাত দূরে—বারান্দার আর এক পাশে—তাকে ঘিরে আবার আড্ডা জমায়। মাতলামিও চলে। কোথায় যাই. কি করি, ভেবেই পাই না। ভাবতেও আর বেশি হয় না। তাদের মধ্যে একজনের জড়িত দৃষ্টি পড়ে দেখি আমারই উপর। চিনতে পারি, বিকেলে দেখা সেই সুশ্রী যুবকটি! তার শিথিল হাত কোনরকমে তুলে আমার দিকে ইশারা করে ডাকতে থাকে,—দলে যোগ দেবার জন্যে। তখনি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসি। কিন্তু, এ যেন উট-পাখির বালির মধ্যে মুখটুকু গুঁজে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা। ছোকরা উঠে আসে আমারই বিছানার পাশে। টলতে টলতে উবু হয়ে বসে। আমার পায়ের কাছে কেবলই ঢলে পড়ে মাথা ঠেকাতে চায়। জড়িত ভাষায় কি সব যেন বলতেও থাকে। বুঝতে পারি তার শুধু একটি কথা—'পরভু! পরভু! পরভু'! তারপর আরম্ভ হয়, হাত জোড় করে মুখ তুলে তাকানো, আবার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা, ভেউ ভেউ করে কান্না আর মুখে অনর্গল 'পরভু! পরভু!' ডাক।

ভাবি, মানুষের এ কী বিকট পরিবর্তন! বিকেলে-দেখা সেই বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু! এখন আরক্ত, আবিল। সাধারণ জীবিত মানুষের চোখই নয়। এ যেন পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছনীল জল,—হঠাৎ বর্ষার ঢল নেমে এখন কাদা-ভরা ঘোলাটে

স্রোতে ঘূর্ণিপাক খায়।

তার সঙ্গীরা ওদিকে বসে তাকায়। আর হাসে। মেয়েটাও হাসির দমকে ঢলেই পড়ে।

কি করব বুঝি না। মাতলামি দেখা, নতুন নয়। কিন্তু মাতালের এমন ভাবে খপ্পরে পড়ার দুরভিজ্ঞতা এই প্রথম। অসহায় ভাবে গিরমিকে চেঁচিয়ে ডাকি। সে তখনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটাকে কোনরকমে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে যেতেই চায় না। মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আবার কাছে আসার জন্য জোর করে, আর মুখে সেই এক বুলি, 'পরভু! পরভু!'

বারান্দা থেকে বাগানে নামিয়ে ছেড়ে দিতেই আবার আমার দিকে আসবার চেষ্টা করে।

গিরমি আর একজন কাকে ডেকে আনে। প্রৌঢ় শেরপা। দামী পোশাক গায়ে। রাশভারী চালচলন। মাতালটাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গেটের দিকে এগিয়ে যান। সে টলতে টলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে চায়, শিথিল হাতের আঙুল তুলে আমার পানে দেখায়,—জড়িত-কণ্ঠে কি সব বলে। ভদ্রলোক তার সঙ্গে আর একজন লোক দিয়ে বাড়ির এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দেন। তার সঙ্গীদের ও মেয়েটিকেও চলে যেতে বলেন। তারপর, এগিয়ে আসেন আমার দিকে। মুখভরা কৌতুকী হাসি। গিরমি পরিচয় করিয়ে দেয়,—ইনিই গ্রামের প্রধান। এটা পঞ্চায়েত-বাড়ি। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ভদ্রলোক বলেন, কিছু মনে করবেন না এ-সব দেখে। এখানকার এ সাধারণ ঘটনা। মদ খাওয়াটা আমাদের কাছে আপনাদের জল খাওয়ারই মতন। তবে ও-ছোকরাটি একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। কিন্তু, আপনি এখানে বারান্দায় রয়েছেন কেন? ভেতরের ঘরে বা দোতলায় গিয়ে থাকবেন, চলুন,—আরাম পাবেন।

ঘরের মধ্যে যাবার কথা ভাবব কি? এঁরও মুখে ভরভর করছে গন্ধ। হয়ত মুখের গেলাস নামিয়ে রেখে এসেছেন এখানে। তবে, হাবভাবে কথাবার্তায় জড়তা নেই। কিন্তু, আশংকা হয়, 'পরভু' ডাক ছাড়তেই বা কতক্ষণ!

অতএব, ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, এখানেও আরামে আছি। রাতটুকু তো কাটানো!

বিদায় নিয়ে তিনি ঘরের ভিতরে চলে যান। তাঁর আমন্ত্রণে ঘরের মধ্যে না গিয়ে যে আরও একটা ফাঁড়া কাটে, বুঝতে পারি একটু পরে।

গিরমি রুটি, সবজি এনে দেয়। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ি। চোখের উপর তখনও কেবলই ভেসে ওঠে সেই ছোকরাটির কাণ্ডকারখানা, তার 'পরভু পরভু' ডাক, আমার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া। যেন একটা দুঃস্বপ্ন। অথচ, বিকেলে তাকেই দেখে মন কেমন প্রসন্ন হয়েছিল। তার ঐ বিকারগ্রস্ত অবস্থা আমার মনেও কি পরিবর্তন ঘটায়। কি রকম এক ঘিনঘিনে ভাব। বিরক্তি, অস্বস্তি বোধ তো ছিলই। করুণারও হয়ত উদ্রেক হচ্ছিল। কিন্তু

কেমন একটা আতঙ্কও যে জাগছিল, সন্দেহ নেই। এখন ভাবতে হাসি পায়। হিমালয় পথের কত দুর্গম ভয়াবহ অঞ্চলেও যে মনের উপর কোন ভয়ের ছায়া পর্যন্ত পড়ে না, সেই মনেই সামান্য এক চৈতন্যহীন মানুষের বিকৃত আচরণ ভয় আনে কেন, ভেবে পাই না।

হঠাৎ মনে পড়ে, রোমাঁ রোঁলার অমর সাহিত্য-কীর্তি Jean Christophe-এর বাল্যকালের ছোট এক ঘটনার বর্ণনা।

মানুষের ভাল-মন্দের বিচারবোধ বালক Christophe-এর মনে তখনও জাগে নি। তার বাবা পাঁড়-মাতাল। মত্ত অবস্থায় প্রায়ই বাড়ি ফিরে ছেলের সঙ্গে মাতলামি করে নানারকম রঙ্গ করেন। সরল বালক আনন্দ পায়, ভাবে, বাবা তার সঙ্গে খেলা করেন, মজাদার মুখভঙ্গি দেখান, আজেবাজে কথা বলেন, ভালবেসে জাপটে ধরে আদর করেন। একদিন বাড়িতে তখন আর কেউ নেই। বাপ ফিরলেন টলতে টলতে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায়। কোনরকমে চেয়ে বে বসতেই ছেলে যথারীতি কাছে আসে। রক্তরাঙা চোখ, সেদিন সে-এক অদ্ভুত চাহনি—যেন তার বাপের চোখই নয়। চেহারাও ভীষণ। মুখ থেকে বেরোয়ও বিকট আওয়াজ। Christophe ভয় পেয়ে যায়। আতঙ্কে আঁতকে ওঠে, বাবা! ও-বাবা! অমন করো না বাবা! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—তাকিয়ো না অমন করে। শরবিদ্ধ হরিণশাবকের মতো অসহায় শিশু ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে। লুকিয়ে ঘর থেকে পালাতে চেষ্টা করে। পরে তার মা বাড়ি ফিরে সব কাণ্ড দেখেন, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। মা ও ছেলে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান, বাপের এই নেশার দুর্মতি যেন ঘোচে!

এইসব ছবি চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। কখন ঘুমিয়েও পড়ি জানি না। জানতে পারি, যখন লোকজনের কথাবার্তায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। মুদিত চোখের পাতার উপর প্রখর আলোর ঝলসানি বোধ করি। তাকিয়ে দেখি, বিছানার পাশে তিন-চারজন বিরাট মূর্তি। একজন ওভারকোট গায়ে, কান-ঢাকা টুপি মাথায়। হোমড়াচোমড়া লোক মনে হয়। সেই লোকটিই জোরাল টর্চের আলো ফেলে আমাকে ভাল করে দেখে। পাশে রাখা আমার জিনিসপত্রের উপরও একবার আলো বুলিয়ে নেয়। তখন দেখি, সেই প্রধানও সঙ্গে আছেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলছেন বুঝলাম যে কলকাতা থেকে আসছি, থিয়াংবোচি যাব। ভাবটা যেন, আমি লোকটা খারাপ নয়!

তারা আলো ফেলে কি দেখে নিল, জানি না—কথা বলতে বলতে তখনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। দোতলায় গিয়ে ওঠে, ওপরের কাঠের মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দে তাও বোঝা যায়। তারপর কিছুক্ষণ ধরেই চলে বারান্দা দিয়ে লোক যাতায়াত। আবছা অন্ধকার, মাঝে মাঝে টর্চের আলো, বড় বড় চেহারা—চলন্ত [illegible] ছায়ার মতো বাড়ির ভিতরে যায়, কেউ বা বাইরে আসে।

কিছু [illegible]রে আবার সব শান্ত হয়। শুধু উপর থেকে লোকজনের অস্পষ্ট

গলা শোনা যায়। ভাবি, এদের কি সারারাতই সুরাপানের মহোৎসব চলে?

গিরমির কাছে পরের দিন ব্যাপারটা শুনি। ওরা সব পুলিসের লোক। থিয়াংবোচি ছাড়িয়ে আর একটা ছোট গ্রাম আছে—পিয়াংবোচি। শেরপাদের বসতি। এভারেস্টের দিকে ঐটেই শেষ গ্রাম। সেখানে তিব্বতীয় বেশধারী এক চীনদেশীয় গুপ্তচর ধরা পড়ে। পুলিস তাকে নিয়ে কাঠমাণ্ডু চলেছে। কাল এখানে রাত কাটাল! তাই অত সতর্কতা!

ভুলেই গিয়েছিলাম এই সব রাজনৈতিক ব্যাপার। ভাবি, এখানেও সেই শনির দৃষ্টি! স্বস্তি কি কোথাও নেই!

৯ অক্টোবর। ভোরে উঠে তৈরী হই। গিরমি চা আনে। পোর্টাররা যে-যার মালপত্র গাঁটরি বেঁধে নেয়। বাইরে রাস্তার উপর তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। পৌনে ছটা। চারিদিক শান্ত নিঝুম। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। পশুপক্ষীরও নয়। ঘুমন্ত শিশুর মতো অসাড়ে পাহাড়গুলি ঘুমায়। জগজ্জননীই শুধু জেগে। অবিরাম নিখিল সংসার চালান। নিরন্তর জগৎ ঘোরে। পূর্বদিকে পাহাড়ের অন্তরালে সূর্য আঁখি মেলেন। উত্তরে তুষার-শিখর তারই আরক্ত আভায় স্বর্ণকান্তি ধরে। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। গভীর আনন্দে মন মুগ্ধ হয়।

গিরমিরা তৈরি হয়ে পথে নামে। জিজ্ঞাসা করি, সামনের ঐ বরফের পাহাড়ের নাম জান নাকি?

বলে, কাঙ্টে! ওরই তলায় তো আমাদের গ্রাম,—কুনডে। ঐখানেই তো চলেছি আমরা।

ঐখানে! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি। মনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে যায় গত রাত্রের অশেষ দুর্গতির কথা। প্রসন্ন অন্তরে নবীন উৎসাহের বন্যা নামে। চরণ-যুগল আপনা থেকেই এগিয়ে চলে। পথও অতি সহজ। ধীরে নেমে যায়। মিনিট কুড়ির মধ্যে উৎরাইও শেষ হয়। পাহাড়ী নদী। সেই কাল দূর-থেকে-দেখা ঘরবাড়ি। পাহাড়ী গ্রামের চিরন্তন অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। পার হয়ে এসেই নদীর উপর পুল। অপর পারে গিয়ে পথ বাঁ দিকে ঘোরে। নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। আবার চড়াই। ধীরে ধীরে উঠি। মনে মনে ভাবি, যেতে হবে সেই কাঙ্টের নীচে, উঠতেই তো হবে।

প্রায় আড়াই হাজার ফুট উঠে খারতে—Kharte গ্রাম। কয়েকটা মাত্র ঘর। পাশেই ঝরনা। গ্রাম ছাড়িয়ে আরও খানিক যাবার পর গিরমিরা থামে। আজও দেখি সাড়ে আটটায় দুপুরের আহার-পর্ব শেষ করার প্রস্তুতি। পাহাড়ে ঘেরা ঝরনার পাশে বিশ্রাম করার মতন স্থান। ক্ষণিক বিরাম চড়াই ওঠার ক্লান্তি দূর করে।

সাড়ে দশটায় আবার পথ ধরা। আরও চড়াই। হাজার খানেক ফুট উঠে

Puiyan pass। প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে। বিশ্রাম স্থল থেকে পৌঁছুতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। পাশ্-এর উপর গিরমিরা বসে। আমিও ক্ষণিক বিশ্রাম নিই। গিরমিদের ধূমপানের মজলিস জমে। তাকিয়ে দেখি, পাশ্-এর অপর দিকে এবার নামবার পালা। অযথা বসে কি হবে? একাই নেমে চলি। শ'পাঁচেক ফুট নেমে এসে বনের মধ্যে ঝরনা। কিছুদূরেই গ্রাম। দেখে স্বস্তি বোধ হয়। কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জি'র ছকে-দেওয়া পথ-চলার দৈনিক প্রোগ্রামমত, —ঐ পুঁইয়াগ্রামে আজ রাত কাটানোর কথা। তাই আজকের মত পথ হাঁটার ছুটি। এ যেন পাঠ সাঙ্গ করার তৃপ্তি। গিরমিদের আশায় পাথরের উপর নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করি। ভাবি, যাত্রাশেষের অত নিকটে পৌঁছেও ওখানে এত দেরি করে কেন? খানিক পরে আসে। তেমনি পরস্পরে কথা বলে, হাসির খই ফুটিয়ে। হনহন করে এগিয়ে চলে। ভাবটা এমন, যেন আমাকে চেনেই না। উঠে পিছু পিছু চলি। এই তো এইটুকু আর যাওয়া। কিন্তু এ কী! গ্রাম ছাড়িয়ে চলে কোথায়? জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হই, এই পুঁইয়াগ্রামেই আজ থাকার কথা নয়?

গিরমি বলে এখনও প্রচুর বেলা। সুরকে গ্রামে আজ পৌঁছে যাব।

তথাস্তু। আমারই বা হাঁটতে আপত্তি কি? চলতে থাকি। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, দিনের হাঁটন ক্ষান্ত হওয়ার প্রলোভন পায়ের যেন ভার বাড়ায়। স্বচ্ছন্দ গতির ছন্দ কাটে। কিন্তু তাও মাত্র ক্ষণিকের জন্যে। ঝরনা পার হয়ে আবার শুরু হয় রমণীয় অরণ্যপথ। বড় বড় গাছ মাঝে মাঝে ঝরনার ধারা। এঁকেবেঁকে পথ চলে। বনে ও পথে খেলা করে। পথ কখন পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে পালায়, সেখানে গাছপালা বিরল, আবার নেমে আসে বনের ভিতর। এতদিন পরে পথে একটা সাপ দেখি। তিন-চার হাত লম্বা। কালো রঙ। সরসর করে বনের লতাপাতার মধ্যে প্রবেশ করে। দেখে থমকে দাঁড়াই। ভাবি, হিমালয় পাহাড়। নিবিড় বন। সাপ থাকবে আশ্চর্য কি! তবু চমকে উঠি কেন?

পথও ভয় পেয়ে যেন আবার পাহাড়ের উপর দিকে ওঠে। আবার একটা পাশ্। এও হাজার দশেক ফুট উঁচু হবে! অদূরে তুষার-কিরীট কোন্ এক শিখর। নীচে দুধকোশির উপত্যকা। স্নিগ্ধ শ্যামশোভা!

গিরমিদের তেমনি হাসি ও গল্পর শব্দ শোনা যায়। এসে পৌঁছয়ও। এভারেস্টের খবর নিই। বলে, এখনও দেখা যাবে না।—

সামনে অল্প দূরে উপত্যকার ডান দিকে একটা উঁচু পাহাড় দেখিয়ে জানায়, ঐ পাহাড়ে লুকলা এয়ার স্ট্রীপ্।

এবার উৎরাই। হুড়হুড় করে নেমেই চলি। অনেকখানি এসে ছোট এক নদীর ধারে আবার গ্রাম। সুরকিয়া বা সুরক (Surkya বা Surke)। ৭,৫০০ ফুটে আবার নেমে আসা হয়েছে। বেলা চারটে। তিব্বতীদের এক ঘরে আশ্রয় নেওয়া হয়। একই ঘরে আজ গিরমিদের সঙ্গে থাকা। তবে অপেক্ষাকৃত বড় ঘর,—তারই এক কোণে আমার শয্যা বিছাই। নিকটেই পাহাড়ী

নদী। দিনের আলো এখনও প্রচুর। জলের ধারে পাথরের উপরে গিয়ে বসি। নদী আপন মনে গান গেয়ে বহে চলে। সে তরঙ্গ-সঙ্গীত আমাও অন্তরে আনন্দ-হিল্লোল তোলে। কোন্ অজানা লোকের অমৃত বাণী যেন কানে শুনি।

সময়ের স্রোতও বয়ে যায়। দিনের আলো মিলায়। আমিও ধীর পদে ঘরে ফিরি।

সন্ধ্যার মধ্যেই রাত্রের আহার সাঙ্গ। শয্যার আশ্রয় পথশ্রান্তদেহে আরাম আনে। শুয়ে-শুয়েও গিরমিদের গল্প ও হাসির উচ্ছ্বাস চলতেই থাকে। সারাক্ষণই দেখি, তাদের রঙ্গরসিকতার ধারা বয়,—পাহাড়ী ঐ নদীরই মত।

ঘরের আর এক কোণে নিভন্ত উনুনের কোল ঘেঁষে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে টামাং পোর্টার,—সঙ্গহীন, একাকী।

১০ অক্টোবর। ভোরে উঠে আবার তৈরি। ছড়ানো জিনিস থলিতে ভরা, কিট-ব্যাগে স্লিপিং-ব্যাগ ও কম্বল তুলে বেঁধে রাখা, পথ-চলার জামা-কাপড়, জুতো পরা,—যন্ত্রচালিতের মতই কাজগুলি হয়ে যায়। তবুও নিত্যনৈমিত্তিক এ-সব কাজের মধ্যেও প্রাণের সাড়া থাকে,—এ যেন নতুন পথে আরও এগিয়ে-যাওয়ার প্রস্তুতি। পৌনে ছটায় যাত্রা শুরু। পাহাড়, নদী, বন,—তারাও যেন সদা-ঘুমভাঙা চোখে পথের পথিককে আবাহন জানায়।

সুরকিয়া ছাড়িয়েই আবার অল্প চড়াই। পাহাড়ের উপর অংশ দিয়ে পথ হলেও এখন স্পষ্ট বোঝা যায়,—দুধকোশির উপত্যকা ধরেই চলেছি। পথের বাঁ দিকে নীচে নদীর সর্পিল ধারা প্রায়ই চোখে পড়ে। পথও পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে, যেন নদীরই অঙ্গুলিসংকেতে দেখানো দিক লক্ষ্য করে।

দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর সওয়া সাতটায় বড় গ্রাম আসে। গ্রামে ঢোকবার আগে পথের ডাইনে আর এক শাখা-পথ পাহাড়ের আরও উপর দিকে উঠে যায়। তীর-চিহ্ন আঁকা বোর্ডে লেখা,—সরাসরি Lukla Air strip-এ যাবার রাস্তা। আমরা চলি সমতল পথ ধরে গ্রামের দিকে। গ্রামের নাম চামরীথরকা বা চৌরীখরকা। নাম শুনেই মনে হয় বুঝি তিব্বতী অঞ্চলে এলাম। পাহাড়ের গায়ে, মাঠের উপর, পথের মাঝে কয়েকটা চামরীগাই ঘোরে, নামকরণের সার্থকতা প্রচার করে। প্রকাণ্ড লম্বা গ্রাম। পথের দুপাশে সারি সারি বাড়ি। পাঁচিলঘেরা এলাকা। মাঝে মাঝে পথের মাঝখানে ও আশেপাশে মণিপ্রাচীর ও ভাগোবা। গ্রামের ঘরবাড়ি শুরু হয়ে যেন শেষই হয় না, একটানা দুধারে চলতেই থাকে। ৮,৫০০ থেকে ৮,৭০০ ফুট উঁচুতে গ্রামখানি যেন প্রলম্ব দুই বাহু ছড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে সকালে রোদ পোহায়। গ্রামের চারিপাশে শুকনো খটখটে পাহাড়ের গা। তৃণশূন্য, রুক্ষ। রোদ পড়ে বালি, কাঁকর, পাথর ঝকমক করে। অথচ, উপরে পাহাড়ের মাথার দিকে ঘন গাছপালা।

চামরীথরকায় শেরপাদের বড় বসতি। গিরমির সঙ্গে অনেকেরই জানাশোনা দেখি। একটা বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গিরমি একটি শেরপা মেয়ের সঙ্গে

কথা বলে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসে। গিরমিদের আমন্ত্রণ করে তার বাড়িতে যেতে। প্রাঙ্গণে মাচা-ভরা স্কোয়াস্ দেখে গিরমিকে কিছু কিনতে বলি। এ আর 'ছুই-না'র গ্রাম নয়! এক টাকায় প্রচুর পাওয়া যায়। গ্রামের বেশ খানিকটা উপরে—দক্ষিণ-পূর্ব দিকে—পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতলভূমি। গিরমি তাই দেখিয়ে বলে, ঐ লুক্‌লা এয়ার-স্ট্রীপ।

তারই নিকটে লুক্‌লা গ্রামের কয়েকটা মাত্র ঘরও দেখা যায়। ৯,২০০ ফুট উঁচুতে। ভাবি, ঐখান থেকেই ফেরবার প্লেন ধরতে হবে। এখন ভাবতেও মনে দুঃখ জাগে।

গিরমিদের হাবভাব দেখে বোঝা যায়, এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। হঠাৎ আমার জুতোর দিকে নজর পড়ে। সেই স্টিকিং প্লাসটার লাগাবার পর ভুলেই গিয়েছিলাম তার ক্ষতদেহের বিষয়ে। এখন দেখি, আবার মুখ হাঁ হয়েছে। ক্লান্ত কুকুরের মত জিব বার করে লক্‌লক্ করে। আবার রুমাল বার করে জুতোর সে-অংশ সজোরে বেঁধে নিই। ভাবি, কালই তো নাম্‌চে পৌঁছানো। সেখানে গিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে। এ-দুদিন এইভাবেই কি চালানো যাবে না?

গিরমিকে জুতোর দুরবস্থা দেখাই। বলি, আমাকে আজ আস্তে আস্তে হাঁটতে হবে, এখানে আর বসব না,—পথ ধরে এগুচ্ছি।

জুতার শোচনীয় অবস্থা গিরমির মনে কোন দুর্ভাবনা বা সহানুভূতি জাগায়, এমন তার ভাব দেখি না। ভাবি, পায়ে জুতো রইল বা রইল না, পাহাড়ীরা তার প্রভেদ বোঝে না। তাদের কাছে জুতো ব্যবহার একটা সৌখিনতা, ধনীর প্রসাধন। আর আমাদের? অভ্যাসে স্বভাব নষ্ট। এ-সব পথে খালি পায়ে হাঁটার বিপদও থাকে। ধীরে ধীরে পা ফেলে কোন রকমে এ দু'দিন কাটানোই আমার কর্তব্য। কিন্তু দেখি, এ-দুশ্চিন্তা আমারই, গিরমির নয়।

পাছে সে ভুল করে ভাবে যে আমি পথ চলায় ক্লান্ত হয়েছি, তাই তাকে হেসে জিজ্ঞাসা করি, গিরমি, তোমার বয়স হলো কত?

সে বলে, বছর ছাব্বিশ।

শুনে বলি, আমার কত, জান? চৌষট্টি পেরিয়ে পঁয়ষট্টি-তে পড়ছি। তবু দেখ, তোমাদের সঙ্গে ঠিকমত হেঁটে চলেছি তো? গত দুদিনই তোমরা একদিনে দেড় দিনের পথ শেষ করেছ!

সে নির্বিকারভাবে মুখের দিকে তাকায়। ছাব্বিশ ও চৌষট্টি বছর বয়সের মধ্যে যে কোন তফাৎ,—এতে মানুষের চলবার ক্ষমতার কম-বেশির কথা উঠতে পারে,—তাও সে বোঝে না দেখি।

এরও কারণ কি, পরে জানতে পারি, শের্‌পাদের জীবনধারণের পদ্ধতি দেখে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। গ্রাম শেষ হবার মুখে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে

আসে বড় ঝরনা। তামার ঘড়ায় জল ভরে শেরপা মেয়েরা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। ঝরনার পাশে মেয়েদের জটলাও চলে। সেই খিল্‌খিল্ হাসি, অনর্গল কথা-বলাবলি। যেন, ঝরনার কলধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়। মেয়েগুলি দেখতেও সুশ্রী, বেশভূষাও রঙিন।

গ্রাম ছাড়িয়ে উন্মুক্ত ময়দান। চারিদিকে আবার বৌদ্ধস্তূপ, ডাগোবা। সেগুলি পার হয়ে প্রকাণ্ড শিলাস্তূপ। তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে গোলক-ধাঁধায় যেন পথ হারায়; একটু উপর দিকে উঠে একটা পাথরের উপর বসি। গিরমিদের জন্য অপেক্ষা করি। কি জানি, যদি ভুল পথেই চলে যাই! নীচে দূরে ছাড়িয়ে-আসা গ্রামের ঘরবাড়ি দেখা যায়। মাঠ দিয়ে টামাং পোর্টার ঐ তো আসছে। বোঝা পিঠে একমনে এগিয়ে আসে। অল্পক্ষণেই পৌঁছেও যায়। সেই খালি পা। স্টিকিং প্লাস্টারটা কালো হয়ে এখনও আটকে আছে। গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা। এই শীতেও কপালে ঘামের বিন্দু বিন্দু রেখা। কাছে এসে দাঁড়ায়। গিরমিদের খোঁজ নিই। ওরা সেই বাড়ির মধ্যেই ঢুকেছে। টামাং বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার হাঁটতে শুরু করে। এ-পথে একে কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ হয়। আপন মনে একাই চলে, পিঠের বোঝার ভার বয়ে। মনেরও নিশ্চয় এর কোন খোরাক নেই, পথ চলায়ও আনন্দবোধ নেই। পেট চালাবার মত রোজগারের প্রয়োজনেই তার এই অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রম। তবুও মুখে বিরক্তির প্রকাশ নেই। কারও বিরুদ্ধে আক্রোশ বা অভিযোগও নেই।

কেমন যেন মায়া জাগে লোকটির সাথীহীন নিঃস্ব অবস্থা দেখে।

সে-ও এ-পথে নতুন, তবু, এরা রাস্তা চেনবার সহজাত বুদ্ধি ধরে। ঘুরে-ফিরে দেখে বলে দেয়, কোন্ পথ ধরে যাব। সেইমত আবার চলতেও থাকি।

এদিক দিয়েও একটা পথ চলে যায় উপরে লুক্‌লা গ্রামে ও এয়ার স্ট্রীপ্-এ। নামচে থেকে ফেরবার সময় চামরীখরকা গ্রামে না নেমে লুক্‌লা যাবার সেইটেই সোজা পথ।

পাহাড়ের কোল বেয়ে অল্প নামবার পর দুধকোশি নদীর ধারে এসে পৌঁছুই। পার্বত্য নদী ও বিজন বনের রমণীয় শোভা। পথও চলে উপত্যকা ধরে প্রায় সমতলে। কখন নদীর ধারা অতি নিকটে আসে, আবার কখন বা পথ নদী জলের সঙ্গ ছেড়ে পাশের বনের বড় বড় গাছের আড়ালে লুকায়। সেখানেও হয়ত নৃত্যপরা ঝরনার ধারা। উপলময় অলঙ্কারের অঙ্গসজ্জা। আবার বন ছেড়ে পথ বাইরে আসে দুধকোশির সঙ্গ ধরে। যেন, শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখে। দুরন্ত চড়াই-উৎরাইও নেই। পাহাড়ী পথের অতি মামুলী ওঠা-নামা। প্রাণে অপার আনন্দ জাগে পথ চলতে। চরণও চলার আবেগে সজোরে চলতে চায়। শুধু ছেঁড়া জুতাই বাধা জাগায়। সন্তর্পণে ধীরপদে চলতেই হয়। তবুও, পাথর ছড়ানো পাহাড়ী পথে বিদীর্ণ পাদুকার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। পিছনে গিরমিদের হাস্যমুখর কথাবার্তা কানে আসে। অল্পক্ষণেই তারা এসেও পড়ে। হনহন্ করে পাশ

কাটিয়ে এগিয়ে চলে। গিরমিকে আবার জুতার শোচনীয় অবস্থা দেখাই। জিজ্ঞাসা করি, দুপুরের বিশ্রাম আজ কোন্‌খানে ?

বলে, আর বেশি দূর নেই, রাস্তাও সোজা। নদীর ধারে ঘাট-গ্রামে খাওয়া যাবে।

বলি, ঠিক আছে। তোমরা গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা কর,—আমাকে আজ এইভাবেই আস্তে যেতে হবে।

তারা আবার গল্প-হাসির সূত্র ধরে এগিয়ে যায়। টামাং-ও তাদের সঙ্গ নেয়। রান্নার সাজসরঞ্জাম তারই কাছে।

আমি আবার আপন মনে পথ চলি,—ধীরে ধীরে।

বনভূমি শেষ হয়। সুমুখে দেখি, পথ নেমে যায় একেবারে নদীর ধারে, তারপর সোজা চলে নদীর কূল ধরে,—সমান্তরাল রেখায়। অদূরে নদী-তীরে ঘাট-গ্রামের ঘরবাড়ি। নদীর উপর পুল। দূরে উপত্যকার প্রান্তে ঊর্ধ্বশির তুষারশিখর।

সামনের সরল সোজা পথ, পাশে দুধকোশির স্বচ্ছ প্রবাহ, ঐ দেখা যায়—গ্রামের বাঞ্ছিত আশ্রয়,—আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়গুলির করুণাঘন দৃষ্টি,—অয়স্কান্তমণির মত আকর্ষণ করে। অচিরে গ্রামের নিকটে পৌঁছেও যাই। বেলা মাত্র সোয়া ন'টা। মেঘশূন্য আকাশ। রূপালী রোদে চারিদিক ঝলমল করে। নদীর জলে চিকিমিকি আলোর খেলা চলে। ভাবি, আজ দুধকোশিতে অবগাহন স্নানের সুযোগ হবে।

পুলের মুখে আসি। এপারে খান দুই মাত্র ঘর। ওপারেই প্রকৃত গ্রাম। উপত্যকা হলেও ৮,৩০০ ফুট উঁচুতে। রাস্তা বাঁ দিকে বেঁকে পুলের উপর দিয়ে অপর পারে যায়। এপারেও নদীর তীর ধরে আর একটা পথ এগিয়ে চলে। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবি, কোন্ পথ ধরি? দু'পথেই লোক-চলাচলের পায়ের ছাপ। এদিক-ওদিক তাকাই, গিরমিদের যদি দেখতে পাই। না, তাদেরও কোন সাড়াশব্দ নেই, অন্য কোন লোকও নিকটে নেই। অপর পারে, গ্রামে দু'একজনকে দেখা যায়। এমনি সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পুলের মুখে পথের উপর সেই গতানুগতিক মণিপ্রাচীর ও ডাগোবার সারি। চোখে আঙুল দিয়ে তারা যেন দেখায়, দূরগামী প্রাচীন পথের এ-অঞ্চলে আমরাই তো প্রমাণ। দাঁড়িয়ে ভাব কি ?

মনে মনে হাসি। ভাবি, সত্যই তো! এতক্ষণ এটা নজর করি নি কেন ?

নিশ্চিন্ত হয়ে পুল পার হই। গ্রামে ঢুকি। গিরমিদের সন্ধান করি। কোথাও দেখতে পাই না। তখন মনে হয়, গ্রামের মধ্যে দিনের বেলায় ওরা বিশেষ তো বসে না, নিশ্চয় গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর ধারে গাছের ছায়ায় একান্তে কোথাও আস্তানা পেতেছে।

পথ ধরে এগুতে থাকি। এখানেও পথের মাঝে সেই মণিপ্রাচীরের সন্দেহাতীত চিহ্ন। তবুও, সুমুখে এক গ্রামবাসীকে দেখে প্রশ্ন করি, এ-পথ কি নামচে যায় ?

প্রশ্নের ভাষা না বুঝলেও অর্থ বোঝে। ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, নামচে—নামচে।

নিঃসন্দেহে আরও এগিয়ে চলি। নদীর তীরে দৃষ্টি রাখি। জলের ধারে বড় বড় পাথর, কোথাও বা একটুকরো খোলা জমি, গাছের ছায়া,—পথক্লান্ত পথিকের ক্ষণিক বিশ্রামের জন্যেই সযত্নে যেন আসন পাতা। প্রলুব্ধ নয়নে তাকাই। এই বুঝি গিরমিদের হাসিখুশি মুখগুলি দেখা যায়। ঐ তো ওদিকে গাছগুলির আড়ালে কারা যেন নড়েচড়ে। দুর্ভাবনা কাটে। উৎসাহবশে পথটুকু সবেগেই চলি। পায়ের ছেঁড়া জুতা আরও ছেঁড়ে। এগিয়ে গিয়ে নিরাশ হই। কোথায় গিরমির দলবল? অপরিচিত মুখ। জিজ্ঞাসা করি, পোর্টারদের যেতে দেখেছে কিনা।—ঘাড় নেড়ে বলে, না।—এইটেই নামচের পথ?—আবার জিজ্ঞাসা করি। জানায়, হাঁ।

তবে আবার কী! চল, আরও এগিয়ে। কিন্তু, ওদিকে বেলাও তো বাড়ে। ভাবি তাতেই বা ক্ষতি কি? পথ তো কমে।

তৈরি রান্না পাব, বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা যাবে। কাল নামচে পৌঁছানো,—জুতোর ব্যবস্থাও যা হোক হবে।

ঘড়ির কাঁটা ঘোরে। পায়ের পর পা-ও পড়ে। ঘাট-গ্রাম ছাড়িয়ে দূরেও আসি। তবু, গিরমিদের কাছে পাই না। গেল কোথায়? বললে—ঘাট গ্রামে বসা হবে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর তাদের দেখা যায়। হ্যাঁ,—ওরাই বটে। কোনই সন্দেহ নেই। ঐ তো গিরমি, ঐ তো দোরজে, ঐ ওখানে টামাং। সবই নির্ভুল। তবু, পথের উপর স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। হারানো সঙ্গীদের পাওয়ার আনন্দ নয়, দুর্ভাবনায় মন ভরে ওঠে। কী কাণ্ড! ওরা যে নদীর অপর পারে! মালপত্র পাশে রেখে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। পথ ছেড়ে এগিয়ে জলের ধারে দাঁড়াই। যথাশক্তি চিৎকার করি। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের নিষ্ফল প্রচেষ্টা। মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ হাতের ব্যবধান। কিন্তু, এ-দুরন্ত পার্বত্য ধারা পার হয়, সাধ্য কার! শুধু তাই নয়। নদীর একটানা প্রচণ্ড স্রোতের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠ সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখে। এ-যেন আমার স্বপ্নে চেঁচানো,—প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনই স্বর ফোটে না। অগত্যা পাগলের মত হাত নাড়ি, ছোট ছোট পাথর তুলে জলে ছুঁড়ি। মনে পড়ে, ক্ষুদ্রকায় লিলিপুটিয়ানদের ঘুমন্ত গ্যালিভারের ঘুম-ভাঙানোর প্রহসন।

আমার চেষ্টার ফল নয়, ভাগ্যক্রমেই গিরমির অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়ে এই-দিকে। আমাকে দেখা তো নয়, এ যেন মাথায় তার বাজ পড়ে। আর সবাইকে তখনি ডাকে। আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। কর্মব্যস্ত সচল লোকগুলো মুহূর্তের মধ্যে চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এপারে আমি। ওপারে ওরা। মাঝখানে দুধকোশির মায়ামমতাহীন দুস্তর প্রবাহ। যে-তরঙ্গিণী তার সৌন্দর্য-সম্ভার নিয়ে ক্ষণিক আগেও মনে আনন্দের দীপ জ্বালে, এখন মনে হয়, তার স্রোতের উচ্ছ্বাসে যেন খলখল

হাসির নিষ্ঠুর ধ্বনি!

ভাবি, প্রকৃতির রূপ-দর্শনে আনন্দ-উপভোগ, সে যেন দর্পণে-দেখা মানুষ-মনের ছায়া। মায়ারই এক খেলা।

মনে অদ্ভুত ভাব জাগে। ভাবনা তো আছেই। বিরক্তি ও রাগের কালো মুখও এই সুযোগে উঁকি মারতে চায়। দমিয়ে রাখি।

কৌতুকময় হাসিও পায়। ইশারা করে গিরমিকে দেখাই, নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে যাব নাকি?

ওরা ভয় পায়, তাই-ই বুঝি বা করি। সবাই একসঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে সতর্ক করে, হাত নেড়ে দেখায়,—না, না, না!

গিরমি ইশারা করে বোঝায়, আবার ঘাট-গ্রামে ফিরে গিয়ে পুল পার হয়ে তাদের কাছে যেন যাই।

ওভাবে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ক্ষুদ্র মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করে ঐ নদীর ধারারই মতন সময়ও নিস্পৃহভাবে বহে যায়। অতএব, যা করণীয়, তখনই মনস্থির করি।

ভাবি, ঘাট-গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক এগিয়ে এসেছি। আবার সেখানে ফিরে ওপারে আরও মাইল দেড়েক যাওয়া ওদের কাছে—অর্থাৎ তিন মাইল এখন আরও হাঁটা। ওখানে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার এই তিন মাইল ফিরে এসে নামচের এই পথই ধরা। বেলা দশটা বাজে। সময়ও অনেকক্ষণ যাবে, ছ'মাইল অতিরিক্ত হাঁটাও হয়ে। ছেঁড়া জুতার প্রতিবন্ধক তো রয়েছেই। থাক বরং আমার এ-বেলার খাওয়ার পাট। এগিয়ে যাই যেমন চলেছি ধীরে ধীরে এই পথে। ওরা গিয়ে বসল কেন ওপারে অতো দূরে গিয়ে? যখন হয় ওরাই জোরে হেঁটে এসে ধরে ফেলবে আমাকে।

হাতের ইশারা করে সেই সিদ্ধান্তেরই মর্ম গিরমিকে বোঝাই,—আমি এগিয়ে চলেছি এই পথ ধরেই, তোমরা খাওয়া সেরে চলে এস তাড়াতাড়ি।

পথে উঠে এসে দাঁড়াই। তাকিয়ে দেখি, তারা তখনও একদৃষ্টে আমাকে দেখে,—লাটাই হাতে ছেলেরা যেন কাটা-ঘুড়ি শূন্যে উড়ে যায়, নজর করে।

আমিও যেন বায়ুভরে,—ঐ নদীরই মত আপন ভাবে বিভোর হয়ে—পথ বেয়ে চলতে থাকি। নদীর ধারাই পথের নিশানা।

একা যেতে ভালই লাগে। নিঃসঙ্গতার শূন্যতা নয়। অসঙ্গতার নিবিড় আনন্দ।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে যেন সজাগ হই; নদীর তীর ছেড়ে পথ পাহাড়ের দুই বাহুর খাঁজের ভিতর ঘুরে প্রবেশ করে। পাহাড়পথে বিচিত্র নয়। বুঝতে পারি, পাহাড়ের বুক চিরে ঐ পাশে বড় ঝরনা নামে, তাই পথের এই ধনুক আকারে বেঁকে যাওয়া। ঠিক তাই-ই। চারিপাশে সেখানে বড় বড় গাছের জঙ্গল। পাহাড়ের উপর থেকে বিপুল জলধারা নেমে আসে। রাশি রাশি শিলা সোপানে নূপুরের কিঙ্কিনী তুলে রূপসী নির্ঝরিণী শান্ত বনভূমি মুখরিত করে। গাছেরা জটলা করে স্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকে।

এতে আশ্চর্য হবার নেই। এ-রাজ্যের এই শোভা। চমকে উঠি যে-কারণে, সেটা ঝরনার অপর পারে পেঁছে পথের আকস্মিক ঊর্ধ্বগতি। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে মাথা লক্ষ্য করে উঠে যায়। নীচে পড়ে থাকে দুধকোশি। তাই দেখেই ভাবনা জাগে। এমন কথা তো ছিল না। শুনেছি, আজ সারাদিনই নদীর তীর ধরে পথ। তবে কি অন্যমনস্কভাবে নামচের পথ কখন পাশে ফেলে রেখে ভিন্ন গ্রামের পথ ধরেছি! বনের মধ্যে অন্য কোন পথরেখাও দেখা যায় না। খানিক চড়াই উঠে থেমে যাই। এ-যে দেখি একটানা উঠেই চলি। চড়াই ভাঙতে আপত্তি নেই। কিন্তু ভুল পথে এসে থাকলে আবার তো এই পথেই ফিরে আসা। অযথা শরীরকে এখন এভাবে ক্লান্তি দেওয়া। সময়ের অপচয় তো আছেই। তাছাড়া গিরমিরা ঘুরে পিছন থেকে এসে সেই ফাঁকে হয়ত এগিয়ে যাবে। কাল নামচে পেঁছানোর আগে তাদের আর ধরবার সম্ভাবনা থাকবে না।

নীচে ঝরনার কাছে গাছপালার মধ্যে হঠাৎ শব্দ শুনি। কি যেন জানোয়ার নড়ে। বাঘ-ভাল্লুকের ভয় করি না। তবু ভাল করে তাকিয়ে দেখি ' দেখাও এবার যায়। কয়েকটা গরু চরে। কাছাকাছি তাহলে লোকও থাকবে নিশ্চয়? নীচে আবার নেমে আসি। ঠিকই তাই। দুটো পাহাড়ী ছোট ছেলে বনের মধ্যে ঘোরে। ইশারা করে ডাকি। কাছে আসতে ভয় পায়। পথ ছেড়ে নিজেই এগিয়ে যাই। একটা ছেলে দূরে পালায়। অপরটি সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই এক প্রশ্ন করি, 'নামচে বাট'?—বলে, হাঁ।—পাহাড়ের মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, গোমিলা—স্কুল—তারপর হাত ঘুরিয়ে দেখায়, রাস্তা চলে গেছে ওপর ঘুরে ওধার দিয়ে।—বুঝতে পারি, ওপরে গ্রাম পাব।

আবার চড়াই শুরু। শুরু করে না থামলে শেষও আসে। চড়াই শেষে খানকয়েক ঘর। স্কুলবাড়ি। বাইরে রোদের মধ্যে শিক্ষককে ঘিরে ছাত্ররা বসে। আমাকে দেখামাত্রই সবারই দৃষ্টি আমারই উপর বিঁধে রইল। এগিয়ে তাদের কাছে যাই। হাত তুলে অভিবাদন করি, নমস্তে,—গোমিলা স্কুল?

মাস্টারজী হিন্দী জানেন। আলাপের অসুবিধা হয় না। কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব, সঙ্গীদের সঙ্গে কি ভাবে ছাড়াছাড়ি,—সব তাঁকে বলি। নামচের পথ ধরেই তো চলেছি ঠিক? জিজ্ঞাসা করি।

তিনি বলেন, ঠিকই চলেছেন। এগিয়ে গিয়ে পথে আবার তাদের সঙ্গে মিলতে পারবেন। ঘাট-গ্রামে তাদের ফিরতে হবে না। নদীর ওপার দিয়েও আর একটা পথ আছে। সেদিকে ফাকডিং গ্রাম। মাইল দুই এগিয়ে এপারে আসার পুল আছে। শেরপা যখন, জানে নিশ্চয়।

ভাবি, তাহলে ভাববার কোন কারণ নেই। ঘাট-গ্রামের আগে কোন পথে যেতে হবে, সেটা বললেই পারত!

ছেলেদের নিকটে একটি পাহাড়ী ছোকরা দাঁড়িয়ে,—পিঠে রুকস্যাক। তার দিকে তাকিয়ে মাস্টারজী বলেন, এ হল ডাকপিয়ন, এও নামচে চলেছে।

এখনি রওনা হবে। আপনি এর সঙ্গে যেতে পারেন।

ভাবি, অলক্ষ্যে বসে কে খেলা করেন, কি জানি। সমস্যাও আসে, সমাধানও হয়। পিয়নের সঙ্গ নিই। মাস্টারজীকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাত্রা করি।

এবার নিশ্চিন্ত মনে পা ফেলে চলি। ছেঁড়া জুতোটা শুধু আপত্তি জানায়। আশ্চর্য মানুষের মন! সেই একই পথ। একটু আগে মনে ভাবনা তোলে। এখন ঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ আনে।

পিয়নের নাম গণেশ বাহাদুর। ভাবি, এখানেও কার্তিক-গণেশের প্রভাব! আর্য সভ্যতার কি সুদূর বিস্তার! কিন্তু গণেশের সঙ্গে আলাপ জমে না। অল্পই হিন্দী জানে। বছর পঁচিশ বয়স। জোয়ান ছেলে। নীচের গ্রামে ঘর। সুরকিয়া থেকে সেও আজ যাত্রা করেছে। আজই নামচে পৌঁছবে। বলে, চলুন, আপনিও পৌঁছে যাবেন। পথে, আবাব রাত কাটাবেন কেন?

জুতোর দুরবস্থা দেখাই। বলি, তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব হবে না। সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে তুমি বরং পরে জোরে হেঁটে এগিয়ে যেও।—সে খুশিমনেই রাজি হয়।

পথ আবার পাহাড় থেকে নামতে থাকে। মাইল দুই যাবার পর আবার একটা বড় ঝরনা। তাবই নিকটে পাহাড় ধসে পথ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। রাস্তা মেরামতের কাজ চলেছে। সেইখানে গণেশ বাহাদুর দাঁড়ায়। ডানদিকে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পাকদণ্ডী পথ নীচে নদীপানে নেমে যায়। দেখিয়ে বলে, এই পথ দিয়েই ওরা আসবে। এরই নীচে নদীর ওপর নতুন পুল তৈরী হচ্ছে। এখান থেকে দেখা যায় না।

ভাবি, ভাগ্যে সঙ্গে ছিলে! না-হলে এ জায়গা চিনতাম কি করে?—তখনি মনে হয়, গিরমিরা এবই মধ্যে যদি এগিয়ে গিয়ে থাকে?

গণেশ বাহাদুরকে বলতে হয় না। তার মনেও সেই একই প্রশ্ন ওঠে। যে শ্রমিকদল রাস্তা-মেরামতের কাজ করছিল, তাদের কাছে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে এসে জানায়, নাঃ! এখনও মোট নিয়ে কোন শেরপা এখান দিয়ে যায় নি। আমার মতে, এইখানে অপেক্ষা করাই ভাল। নিকটে জল। গাছের ছায়াও। রান্নার সুবিধা হবে।

তাই করা হয়। আধ ঘণ্টার উপর কেটেও যায়। তবুও, গিরমিদের দেখা নেই। ভাবি, এত দেরির কারণ কি? খাওয়া-দাওয়া সেরেই আসছে হয়ত। কিন্তু, গণেশ বাহাদুরকে আর আটকে রাখাও তো ঠিক হবে না, যাবে সেই নামচেতে! অথচ, গিরমিদের দেখা পাওয়ার আগে তাকে ছাড়াও কি ঠিক হবে?

তাই বলি, চল, আমরা এগুতে থাকি। আমার খাওয়া না-হয় এ-বেলা নাই হল। এ লোকগুলিকে বলে যাও, আমরা যে এগিয়ে গেছি তারা এলে যেন জানিয়ে দেয়।

গণেশ বাহাদুর বলে, ভাল কথাই। আরও খানিক এগিয়ে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। সেইখানে বসবেন। আর ইচ্ছা হয় তো আজ রাতও সেখানে

কাটাতে পারেন।

অতএব, আবার পথ চলা। তবে সোজা পথ। চলার কষ্ট নেই। গ্রামে পৌঁছাই। নাম শুনি, বেনকার। ৮,৯০০ ফুট। খান পাঁচ-ছয় মাত্র ঘর। পথ ছাড়িয়ে অল্পদূরে ক্ষেতের পাশে একটা বাড়িতে গণেশ নিয়ে যায়। এক শেরপা মহিলার সঙ্গে কথা বলে। আলু ছাড়া আর কোন কিছু খাদ্য ওঁর কাছে নেই। তাই আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারেন। বলি, চল, রাস্তার ধারে গিয়ে বসি,—আলুপোড়া খেতে গিয়ে ওদিকে গিরমিরা না এগিয়ে যায়।

পথের পাশে পাথরের পাঁচিলের উপরে বসি। ভাবি, পথে বসাই বটে। সেই ভোর সাড়ে পাঁচটায় এক গেলাস চা ও রাত্রের রাখা একখানা রুটি খাওয়া। তখন তো জানি, ন'টার মধ্যেই আবার অন্ন জুটবে। ঘাটে-তে সেইমত পৌঁছেও যাই। কিন্তু কোথায় কি ? এখন সাড়ে এগারোটা বাজে। কখন ওরা পৌঁছুবে, কখনই বা রাঁধবে ?

বসে বসে এই সব ভাবনাই জাগে। আবার মনকে নিজেই প্রবোধ দিই, যা হবার হবেই, মিথ্যে ভাবা কেন ? তোমার হেঁটে আসার কথা, তাই এসেছ। এখন ওদের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার, তাই করছ।

বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না। গিরমিরা এসে যায়। হনহন করে এগিয়ে চলে। পাশ দিয়েই। আমি যে পথের পাশে বসে,—অমন যে ছাড়াছাড়ি ঘটে গেল,—অকারণ সময়ের অপচয়ও হল,—এ সবে যেন তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। কেন যে এমন ঘটল তার কৈফিয়তেরও যেন প্রশ্ন নেই। যেমন অন্যদিনও হাসি-গল্পে মেতে পাশ কাটিয়ে চলে, আজও তেমনি যায়। অঘটন কিছুই যেন ঘটে নি। আমিও কথা না বলে পিছু নিই। কি হবে অযথা বাক্যব্যয়ে ? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু এ কী। এরা যে গ্রামও ছাড়িয়ে চলে ! আজ কি রান্নার পাট বন্ধ ? বাধ্য হয়ে এবার জিজ্ঞাসাই করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে গিরমি জানায়, একটু এগিয়ে নদীর ধারে ভাল জায়গা।

প্রকৃতই তাই। বিশ্রামস্থান নির্বাচনে গিরমি পাকা জহুরী। ক'হাত দূরে নদীর ধারা। চারিদিকে বড় বড় পাথর। তিন-চারটে বড় গাছ। স্নিগ্ধ ছায়া। আশপাশে ছোট চারাগাছের জঙ্গল। তারই মাঝখানে একটুকরো খালি জমি। যেন, চারাগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পথের নিকটে। অথচ, পথ থেকে দেখা যায় না। যেন, গোপন করে রাখা নিভৃতির প্রশান্তি। একটা ছোট ঝরনাই শুধু এই শান্ত সুন্দর স্থানটুকুর খবর পেয়ে পাশ দিয়ে দেখে যায়, অদূরে নদীর ধারায় মেশে। দেখেই মনপ্রাণ তৃপ্তিতে ভরে। সকালে পথ চলার বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে যায়। মানুষের ভয়, ভাবনা কতোই না তুচ্ছ, অলীক মনে হয়।

সেইখানে গাছের ছায়ায় একটা মসৃণ পাথরের উপর আরামে দেহ এলিয়ে দিই। গণেশ বাহাদুরকে ডেকে বলি, এখনি চলে যেও না যেন। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা যাক, তারপর তুমি এগিয়ে যেও। রান্না এখনি তৈরি হয়ে যাবে। কি বল গিরমি ?

গণেশ বলে, ঠিক আছে। গিরমিদের সঙ্গে সেও কাজে লেগে যায়। আমিই কেবল অলস শয়নে মনের আনন্দে তাকিয়ে থাকি নদীর স্রোতের দিকে। কানের কাছে মৃদুস্বরে গান শুনায় ঝরনার কুলকুল কলধ্বনি।

আধ ঘণ্টা পর। শিলাশয্যা ছেড়ে উঠি। পথ দিয়ে অল্প এগিয়ে নদীর জলের ধারে নামি। সম্মুখে নদীর উপর পুল। দেখি, পথ দুধকোশির অপর পাড়ে যায়। তারপর বাঁ দিক বেঁকে আবার নদীর তীর ধরে চলে। জলস্পর্শ করি। তুষার-শীতল ধারা। হবারই তো কথা। এভারেস্টের অঙ্গ-নিঃসৃত তরঙ্গিণী। চরণামৃতের মত পান করি, মাথায় ছিটাই।

বিশ্রামের পর দেহের উত্তাপ কমে। জলে নেমে অবগাহন স্নানের আগ্রহও হারাই। মুখ হাত ধুয়ে ফিরে আসি। আহারও প্রস্তুত। গণেশ বাহাদুরকে ডাকি। সঙ্গে এসেছি, একই সঙ্গে আহারেও বসা যাক। কিন্তু, কোথায় গণেশ বাহাদুর? গিরমি জানায়, আপনি যখন শুয়েছিলেন, সেই সময়ে দুজন সঙ্গী পাওয়ায় সে নামচের পথে এগিয়ে গেছে।

ভাবি, না জানিয়েই চলে গেল? মনটা খারাপ লাগে। খেয়ে তো গেলই না। ভেবেছিলাম, কিছু বকশিশ দেব, তারও সুযোগ দিল না। পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য কোনও প্রত্যাশাই রাখে না। যেমন হঠাৎ তাকে পাওয়া, তেমনি হঠাৎই হারানো। আকাশে ভেসে-যাওয়া একখণ্ড মেঘের মত। রৌদ্রতপ্ত দেহে ক্ষণিক ছায়া ফেলে আবার হঠাৎই মিলায়।

সওয়া একটা। আবার পথ চলা। গিরমিকে বলি, জুতোর অবস্থা দেখ। খুব ধীরে ধীরে যাব। তোমরাও একই সঙ্গে চল। আবার সকালের মত ছাড়াছাড়ি না হয়!—বলে হাসি।

সে বলে, ঠিক আছে। এখন মাইল দুই মাত্র যাওয়া। জোরশালা গ্রামে আজ রাত কাটানো। কাল সকালেই নামচে পৌঁছানো।

দু'মাইল!—রাঃ। তা হলে তো কিছুই নয়। পথও তেমনি সহজ, সুন্দর। এ-যেন বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে আসা। হয়ত হঠাৎ পাহাড়ের গা বেয়ে সামান্য চড়াই, আবার তখনি নেমে-আসা নদীর কিনারায়। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝরনা। কখনও বা বনের মধ্যে প্রবেশ। আবার অল্প যেতেই ক্ষেতের ভূমি, ছোট ছোট গ্রাম।

চলি মনের আনন্দে। জুতোর ছেঁড়া অংশ এই সুযোগে বাড়তেও থাকে। ভাবি, যা হবার হবে, ও-নিয়ে আর ভাবব না।

প্রায় দু'মাইল এসে যাই। দুধকোশির উপর পুল। অপর পারে জোরশালা গ্রামও দেখা যায়। পুল পার হয়ে রাস্তা ডান দিকে যায়। গ্রামের দিক থেকে একদল যাত্রী আসে। প্রথমেই এক বিদেশী। পিছনে এক নেপালী অফিসার। এক শেরপা গাইডও। গটমট করে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। আমি একটু এগিয়ে পিছন ফিরে তাকাই। দেখি, পুলের কাছে গিরমি সেই শেরপা গাইডের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলে। তাকে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে।

পরিচয় করিয়ে দেয়, এ আমাদের প্রসিদ্ধ শের্‌পা—সর্দার মিংমা সেরিং, অনেক বড় বড় অভিযানে গেছে। সাহেব হোলেন, হিলারী সাহেবের দেশের লোক,—নিউজিল্যান্ডের। ওঁর সঙ্গে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে চলেছেন।

আলাপ করে আমি গ্রামের দিকে এগিয়ে যাই, গিরমি গল্প জুড়ে দেয় মিংমার সঙ্গে। তা দিক। আস্তানায় তো পেঁছে গেছি।

জোরশালা। ৯,২০০ ফুট। নদীর উপরেই গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে যাই, গিরমিরা আসুক, কোন্‌ ঘরে আশ্রয় নেয়, কি জানি। নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করি। ভাবতেই পারি না, অলক্ষ্যে আবার অশান্তির মেঘ জমে।

গিরমিরা আসে। এসেই জানায়, এখন বেলা সওয়া দুটো মাত্র। আমরা আজই নাম্‌চে পেঁছে যাব। ঘণ্টা দুইও লাগবে না।—বলেই হন্‌হন্‌ করে চলতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে পিছু পিছু চলি। আপত্তি না জানিয়ে উপায় থাকে না। জুতোর অন্তিম দশা দেখাই। বলি, এ অবস্থায় আমার পক্ষে তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব নয়,—আর অতো হুড়োহুড়ি করে যাবার প্রয়োজনই বা কী? আজ তো নাম্‌চে পেঁছানোর কথাই ছিল না। গত তিনদিন ধরেই দেড়দিনের পথ একদিনে আসা গেছে। দিন-হিসেবে আমরা তো এগিয়েই আছি। কাল সকালে ধীরেসুস্থে যাওযা যাবে।

কথা শুনে গিরমিরা খুশী হয় না। না হওয়ার কারণও বুঝতে পারি, ঘরের এত কাছাকাছি পেঁছে, কেন আবার দোরগোড়ায় রাত-কাটানো? ঐ তো মিংমারা এখনি নাম্‌চে থেকেই নেমে এল।

তা হোক। আমি রাজি হই না। হয়ত ধীরে ধীরে পেঁছুতে আমার রাতই হয়ে যাবে।

অগত্যা এখানে রাত কাটানোর ব্যবস্থা তাদের করতেই হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে রাস্তার উপর কাঠ দিয়ে তৈরি একখানা লম্বা ঘর। তাই দেখিয়ে বলে, এইখানে তাহলে থাকতে হবে।

দেখি, ঘরের কোন দরজা নেই, সামনে রাস্তার দিকে খোলা। মেঝেতে পাতা তক্তাগুলি ও দেওয়ালের কাঠ ফাঁক-ফাঁক। নীচে থেকে ঠাণ্ডা ওঠে, পাশ দিয়ে হাওয়ার স্রোত বয়। স্পষ্ট বোঝা যায়, নতুন ঘর কেউ তোলে। কাজ এখনও শেষ হয় নি। ঘরের মধ্যেই একপাশে স্তূপাকার তক্তা জড় করা।

হেসে বলি, ঠিক আছে। আপত্তি কি?—ভাবি, গাছতলা হলেও ক্ষতি ছিল কি?

ঘরে ঢুকে একপাশে শয্যা পেতে গুছিয়ে বসি। আর একপাশে গিরমিরা মালপত্র নামিয়ে খুলতে থাকে। দুমদাম শব্দ করে জিনিসগুলো ফেলা, টেনে হিঁচড়ে বাঁধনগুলো খোলা, গম্ভীর মুখের হাবভাব,—তাদের মনের ঘোর আপত্তি ও গভীর বিরক্তি ঘোষণা করে। আমি বসে বসে দেখতে থাকি। নজর পড়ে, টামাং পোর্টারটির উপর। সে-ই শুধু সহজ স্বাভাবিক ভাবে তার ভারী

বোঝা একধারে নামায়। বোঝার গায়ে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। একটু দম নেয়। গিরমির দিকে তাকিযে দেখে। আমার পানেও মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। কি দেখে, কি ভাবে,—সে-ই জানে। তারপর, সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে যেন দেহের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। আপন মনে নিঃশব্দে তার দৈনন্দিন কাজ শুরু করে। বালতি নেয়। নদী থেকে জল আনতে চলে। খালি পা। ছেঁড়া জামা। দৈন্যের প্রতিমূর্তি। অথচ, হাবভাবে, চালচলনে অতি ধীর, অনুদ্বিগ্ন ভাব। আপন কাজ করতে আসা, তাই-ই নিয়ে থাকা। কারও সঙ্গে কথা বলার বা হাস্যপরিহাসের আমোদনের অপেক্ষাও রাখে না। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন বাতাস বয়, দিনের আলো নামে, রাতের আঁধার ঘনায়, কারও উপেক্ষা না রেখে,—এরও দেখি জীবনের ধারা চলে তেমনি নিস্পৃহভাবে।

টামাং-এর খালি পা আমার মনে সাহস জাগায। ভাবি, জুতো গেছে, যাক, আমিও খালি পাযে যাব।

চা তৈরি হয়। গিরমি দিয়ে যায। টামাংকে কাছে ডাকি। তাকেও চা দিতে বলি। বিস্কুট দিই। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে নেয়। কোন কথাবার্তা নয। নিঃশব্দে দুজনে বসে চা-খাওয়া। সে আড়চোখে তাকায়। তার মনের ভাব জানি না, আমার কিন্তু অন্তর তৃপ্তিতে ভরে থাকে।

গিরমি দূর থেকে দেখে দোরজের সঙ্গে কি আলোচনা করে। হঠাৎ উঠে এগিযে আসে। বিছানার পাশে খুলে-রাখা জুতোটা তুলে ভালো করে দেখে। হাতে করে নিয়ে যায়। ব্যাপার কি বুঝি না। ভাবি, ওদের মনোমত প্রোগ্রামে বাধা পড়ায় কি তার টনক নড়ল? কিন্তু, ওর করবার আছেই বা কী! বাবা-মুস্তাফার সন্ধান জানা থাকলে হয়ত হতো।

ঃ কি ব্যাপার? গিরমি ফিরে আসে অপর আর এক জোড়া বুট হাতে। বলে, দেখুন তো এটায় চলবে কি না দোরজের কাছে এটা ছিল, সে এখনও ব্যবহার করে নি। আমাদের সঙ্গে আসবার আগে সে এক সাহেবের সঙ্গে অভিযানে যায়, ফিরে এসে সাহেব ওকে এটা দেন। আপনার জুতোর সঙ্গে মেপে দেখলাম, একই মাপের।

হাতে নিয়ে দেখি। বাটার বুটেরই মতন। বিলাতী জুতো। সাহেবের ব্যবহার করা হলেও এখনও ভালই কাজ দেবে। পায়ে দিয়েও দেখি, ঠিকই হয়। ভাবি ভাগ্যের পরিহাস! যতক্ষণ ভয়-ভাবনায় মন উৎকণ্ঠিত, উদ্ধার মেলে না; যেই নিভয়ে খালি পায়ে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিই, অমনি জুতোর সহজ সমস্যা মেটে।

জিজ্ঞাসা করি, দাম কতো চায়? গিরমি বলে, যা খুশি দেবেন। দোরজে চোদ্দ টাকা বলছে।

দোরজে ও-পাশে বসে মিটিমিটি চায়। বেলুনের মতো গোল মুখে তোবড়ান হাসি। ঘাড় নেড়ে ইশারা করে, নিয়ে নাও,—নিয়ে নাও!—দেখে মনে হয়, অপরের আপদে সাহায্য করতে উন্মুখ, মুখেও তাই আনন্দের প্রকাশ।

জুতো-পায়ে গিরমিকে হেসে বলি, চল, এখনি আবার নামচে রওনা হতে পারি।—সেও হাসে।

কিন্তু নাটকের এইখানেই যবনিকা-পতন নয়। পরের অংকও থাকে।

খাওয়াদাওয়া সারি। শোবার জন্য প্রস্তুত হই। গিরমি এসে আর এক সংবাদ জানায়। চিনির ভাণ্ডার নিঃশেষ!

সে কী! আশ্চর্য হই। সঙ্গে গিরমির ও আমার অংশটা তো ছিলই, ডাক্তার বিশ্বাসদের তিনজনের ভাগেরও প্রায় সব চিনিই অতিরিক্ত এসেছিল। জোর করে তাঁরাই দিয়েছেন। অতো চিনি। এখনও যাত্রা শেষ হতে সপ্তাহখানেক বাকি। এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল?

ব্যাপারটা তখনি বুঝতে পারি। এ ক'দিন পথে দোরজেদেরও চায়ের যে পাট বসেছে হরদম,—আমারই চোখের সামনে,—এই চিনিই খরচ হয়েছে। যদিও তা হবার মোটেই কথা নয়।

ভাবি, কি হবে এখন এ-কথা তুলে? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন কেন আর মিথ্যা অশান্তি টেনে আনা? দোষটা তো আমারই। কখনও ও-সব দিকে নজরও রাখি নি, রাখার কথাও ভাবি নি। আপন মনে নিশ্চিন্ত ভাবে চলে এসেছি। সে আনন্দ-ভোগের দাম দিতে হবে তো! গিরমি দরাজ মনে সঙ্গীদের খাইয়েছে। খাইয়েছে, খাওয়াক। একটু হিসাব করে দান করলেই পারত। যাক, ও নিয়ে এখন আর অনুশোচনা নয়।

নিস্পৃহ ভাবেই বলি, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, গেছে। উপায় কি? বাকি ক'দিন চা-কফিতে চিনি খাব না। আমার তাতে কোনই অসুবিধে হবে না।

গিরমি দেখি তৈরি হয়েই এসেছে। উপায়ও তখনি বলে, দোরজের কাছে কিছু চিনি আছে। চার টাকা পেলেই দিতে রাজি! তাতেই বাকি ক'দিন চলে যাবে। তাই নেব কি?

বলব আর কি? বলি, নাও।—দোরজের দিকে তাকাই। সেই মিটমিটে চাহনি, খুশি-খুশি ভাব। এবার কিন্তু দেখে আমার মনে হয়, হাসিটা শয়তানী!

রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ক'হাত দূরেই গিরমিদের বিছানা। শুয়ে শুয়ে তাদের সেই অনর্গল গল্প, থেকে থেকে হাসি। কিছুক্ষণ সহ্য করি। তারপর বাধ্য হয়ে বলতে হয়, গিরমি, রাতটুকু ঘুমুতে দাও। কাল আবার দিনভোর হাসি-গল্প করো।

অন্ধকার ঘর নিঃশব্দ হয়। আমারও গভীর ঘুমে রাত পোহায়।

১১ই অক্টোবর। শেষরাতে চোখ মেলতেই দরজাশূন্য কাঠের ঘরের বাইরে দৃষ্টি পড়ে। তরল অন্ধকার। নির্মল আকাশে ম্লানমুখী তারার বিদায়-চাহনি। স্বচ্ছ সুনীল ঊষার আভা রেশমী উত্তরীয়ের মত কালো পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে। নেপথ্যে দুধকোশির ধারার বিরামবিহীন কলকল

গীতধ্বনি। হঠাৎ মনে পড়ে, বহুদিন আগেকার কথা। কলকাতা শহর। সারারাত জেগে সঙ্গীত-জলসায় গান শোনার আনন্দ। সিনেমার প্রকান্ড হল। চারিদিক বন্ধ। শহরের মধ্যে সে যেন এক ভিন্ন জগৎ। যেন সুখ-স্বপ্নঘোরে রাত কাটে। হঠাৎ কোথায় কে হল-এর একটা দরজা খোলে। তখনি চোখে পড়ে, বাইরে দিনের আলো ফোটে, ঘরের ভিতর তখনও চলে রাত্রিব্যাপী জলসার সর্বশেষ প্রভাতী সঙ্গীত,—পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের জলদগম্ভীর অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠে ভৈরোঁ রাগিণীতে শান্ত সুকরুণ সুরের খেলা। যেন অনাদিকাল থেকে অনন্তলোকের আলোকপানে চলতে থাকে সুরের পাখনা মেলে। ভাবি, আমার হিমালয়-বাস,—দুধকোশির ঐ সঙ্গীতধ্বনি,—এও যেন সেই আনন্দ-মজলিশেরই আর এক বৈঠক। একই অসীম সাগরের আর এক লহরী।

তখনি মনে আসে, আজই না পৌছুব নামচে বাজারে! সেই নামচে-থিয়াংবোচি! এভারেস্ট অভিযানের বই-এ পড়া অতিপরিচিত নামগুলি,—যেন, স্বপনালোকের মায়াপুরী। আজই দেখব আপন চোখে? চলে এলাম পথের শেষে?

শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। হাত ধুয়ে প্রস্তুত হই। গিরমিদের ডেকে তুলি। তারাও সোৎসাহে তৈরি হয়। চা-রুটি খেয়ে রওনা হই—পৌনে ছটায়।

দুধকোশির পাশ দিয়েই সোজা পথ। পথ ও নদী যেন হাত-ধরাধরি করে চলে। নদীর দুই কূলের গিরিশ্রেণীও যেন তাই দেখে ঈর্ষাভরে মিলতে চায়। দু'দিক থেকে ঝুঁকে আসে। নদীর প্রবাহ বাধা সৃষ্টি করে বহে চলে— সংকীর্ণ গিরিখাতে। দুধকোশির এই-ই বহুখ্যাত সুগভীর গিরিসঙ্কট পথ। মাথার উপর নীল ফিতার মত শুধু একটুকরো আকাশ দেখা যায়। দুহাত দিয়ে পাহাড় যেন পথিকের দু'চোখ চেপে দূরের দৃষ্টি বন্ধ রাখে, পাহাড়ের গা বেয়ে নদীর তীরে নেমে আসে দল বেঁধে দীর্ঘতনু ঋজু সরলদ্রুম—পাইনের সারি। পথ ও নদীকে অভয় আশ্রয় দেয়। নদীর বুকে ও আশেপাশে বিভিন্ন আকার ও বিচিত্র রঙের উপল রাশি। নিম্নগতি নদীর স্রোতে উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ। এপারের পথ সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে যেন নদীর কোলে ওঠে। সুন্দর নূতন সেতু। ওপারে খানিক গিয়ে আবার আর এক পুলে এপারে ফেরে। ওপার-এপার,—নদী ও পথ,—পাইনের সারি,—পাথরের মেলা,—প্রকৃতির সে-এক বিচিত্র খেলা। তাই দেখেই যেন পাহাড়ের রুদ্ধ দুয়ার ভেঙে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধেয়ে নামে নবীন আর এক নদী। দুধকোশির সঙ্গে মিলন ঘটে। নাম শুনি, ভোটেকোশি। মনে পড়ে, এই একই নামের অপর আর এক নদী পেয়েছি কিরানটিচাপ ছাড়িয়ে এসে। পাহাড়ী ভাষায় তিব্বতের নাম ভোট। মাইল পঁচিশ দূরে তিব্বত সীমান্তে নাংপা লা (Nangpa la) পাশ-এ এই নদীর উৎপত্তি। তাই হয়ত ভোটেকোশি নামকরণ। শেরপাদের থামি গ্রাম এই নদীর কিছু উপরে।

৯,৩০০ ফুট উঁচুতে দুধকোশি ও ভোটেকোশির সঙ্গম। সঙ্গমের কাছেই

খানিকটা সমতলভূমি। তাঁবু ফেলে থাকবার চমৎকার জায়গা। নিকটে দুই নদীরই উপর কাঠের পুল। গিরমি বলে, দু'বছর আগে—১৯৬৪ সালে—এ দুটো তৈরি। এডমুন্ড হিলারী সাহেবের করানো।

শেরপা তেনজিং-এর সঙ্গে সেই প্রথম এভারেস্ট-শৃঙ্গ-বিজয়ী হিলারী। আজই তো প্রথম এই পথ থেকে দেখা পাবার কথা—মাউন্ট এভারেস্ট। ঠিক তারই পূর্বে নদী পারাপারের সুবিধার জন্য হিলারীর করে-দেওয়া যেন স্বাগত-চিহ্ন। এ-যেন মন্দির-সিংহদ্বারে এসে পূজারীর নামের ফলক দেখা।

গিরমি জানায়, খুম্বু-অঞ্চল আরম্ভ এই দুই নদীর সংযোগ-স্থল থেকে। এইবারই প্রবেশ করা প্রকৃত শেরপাদের নিভৃততম রাজ্যে

মনে পড়ে, কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জি ম্যাপে দেখিয়েছিলেন, দুধকোশি ও ভোটে-কোশির বাহুবেষ্টনের মধ্যে যে ত্রিকোণ পার্বত্য হিমাঞ্চল তাই খুম্বু। এইখানেই পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু গিরিশিখর এভারেস্টের খাস দরবার, উপগিরির অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজদর্পে তাঁর শৈলসাম্রাজ্য চালান।

হিমালয়ের এই অংশের নাম মহালঙ্গুর-হিমল হয় কেন, কি জানি। দীর্ঘ-লাঙ্গুল হনুমানদেব বাসভূমি নাকি? তারাই কি একালের ইয়েতি তুষার-মানুষ?

নদীর ওপারে গিয়ে খাড়া চড়াই। হলোই বা তাই। চড়াই ওঠার অবসাদের আর অবকাশই নেই। পায়েও এখন মজবুত জুতো। মনের আনন্দে উঠতে থাকি। দু'পাশে পাইন--Kail-এর বন। পাইনের মধ্যে Tsuga ও পরে Fir (Abies spectabilis) ও দেখা দেয়। ভূর্জপত্র—birch (Betula utilis)-এর বনও আসে।

এ-যেন গিরিরাজ্যের ঊর্ধ্ব-এলাকার সব দূত,—সাদরে এগিয়ে এসে জানায়, আর কি, পৌঁছে গেলে আমাদের দেশে।

মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এভারেস্ট দেখার আগ্রহে। গিরমিকে বলি, যেই দেখা যাবে, বোলো যেন তখনি।

কিন্তু, কোথায় সেই তুষার-কিরীট গিরিরাজ? যে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠি, তারই বিশাল দেহ দৃষ্টির অবরোধ ঘটায়। ভাবি, গিরিখাতের নিম্নদেশ ছাড়িয়ে পাহাড়ের মাথার না পৌঁছুলে দেখাই বা সম্ভব কি করে?

প্রায় হাজারখানেক ফুট উঠে আসি। এক ঘণ্টা কাটে। পাহাড়ের মাথা এখনও বহু ঊর্ধ্বে। হঠাৎ গিরমি ডেকে বলে, এবার আসুন এই দিকে এভারেস্ট দেখাই।

পথ ছেড়ে ডান দিকে বনের মধ্যে নিয়ে চলে। সামান্য এগিয়ে যাবার পর এই পাহাড়ের একটা কাঁধের ধারে আসে।

সুমুখে পাহাড়ের অপর দিকের ঢালু গা নীচে নামে। দূরে ইমজাখোলার উপত্যকা। তারপরই তুষার-শিখরাবলীর দীর্ঘ প্রাকারের খানিক অংশ। সেই বিশাল গিরিপ্রাচীরের পিছন থেকে একটা চূড়া উঁকি মারে,—গিরমি তাই দেখিয়ে বলে, ঐ-ই এভারেস্ট!

প্রথম দর্শনে মনে পুলক জাগে, ঠিকই, কিন্তু, মন ভরে না। ভাবি, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর,—এত নিকটে এসেও ঐটুকু মাত্র দেখা! কোথায় দেখব, আকাশছোঁয়া বিরাট শিখর, আর এ-যেন জনতার মধ্যে কার মাথার খানিক অংশ দেখা।—থিয়াংবোচি পৌঁছে নিশ্চয় আরও ভাল দেখা যাবে। সেখান থেকে কাক-ওড়া-পথে মাত্র তো মাইল দশেক! নতুন আগ্রহ নিয়ে আবার পথে এসে চলতে থাকি। চড়াই শেষ হয়। পাহাড়ের গা দিয়ে সমতল পথ ঘুরে ঘুরে এগিয়ে যায়। গাছপালা কমে আসে। শুরু হয় নেড়া পাহাড়। রুক্ষ কর্কশ। যেন, ভস্মাবৃতদেহ নাগা সন্ন্যাসী। মাঝে মাঝে উপর থেকে নেমে-আসা ঝরনাধারা। যেন, কাঁধ বেয়ে নামে পিঙ্গল জটা।

ধারাগুলির উপর কাঠের পুল। একটা ঝরনার নিকটে জনকয়েক শেরপা মেয়ে, পিঠে ঘড়া। দেখেই ভাবি, কাছেই নামচে হবে। পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই দেখি, তাই-ই। সেই ছবিতে-দেখা নামচের কতকালের চেনা মুখ। কিন্তু এ কী! ফটোর মত সুন্দর তো নয়। সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে-যাওয়া পাহাড়ের গায়ে যেন খোপের মধ্যে থাকে-থাকে ঘর-বাড়ি। কেমন যেন শ্রীহীন। নীরস, শুকনো পাহাড়। সাদা সাদা ঘর। কোথাও কালো রঙ। যেন, ডিমভরা মৌমাছির চাক। শুধু সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দেয় পাহাড়ের পিছনে মাথা তুলে রৌদ্রদীপ্ত তুষারশিখর—কোয়াংডে,—(**Kwangde**—২০,৩০০ ফুট)। নামচে গ্রামের রূপ-মাধুরী দেখি না। শুধু নামেই প্রচার,—এভারেস্টের পথে নামচে। প্রচারের কারণও নামের সঙ্গেই জড়িত থাকে,—নামচে বাজার। শেরপাদের মুখের উচ্চারণে নাউঝে—**Nauje**। তাদের বসবাসের সাধারণ পল্লী নয়, -বাজার, ব্যবসার কেন্দ্র। কলকাতার যেমন বড়বাজার। শুনেই আসছি শেরপারা জাত-ব্যবসায়ী। তাদেরই ধনী-সম্প্রদায়ের এইখানে বড় ঘাঁটি। দোকানপাট, কারবারী বাড়িঘর। তাই, সৌন্দর্যের ধার ধারে না। পাহাড়ের এই জায়গায় ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে ওঠার হয়ত প্রধান কারণ, খুম্বু-অঞ্চলে-ছড়ানো শেরপা গ্রামগুলিতে যাতায়াতের যে তিনটি পথ,—এইখানেই তাদের সংযোগ। একটি পথ বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে থামি গ্রামে যায়। সেদিকে থামো, থামি, থামোট—তিনটি গ্রাম,—একত্র করে বলে,—থামিচক্। ও-পথের ওখানেই শেষ নয়। আরও উত্তরে উঠে চলে যায় নাংপা-পাশ্ পার হয়ে তিব্বতে। আর একটি পথ নামচে থেকে ডানদিকে নীচে নামে, দুধকোশির ধার দিয়ে এগিয়ে চলে এভারেস্টের নীচে। সে-পথে পড়ে থিয়াংবোচি, পাংবোচি, ডাংবোচি, ফোর্ট্সে (**Phortse**) গ্রামগুলি। তৃতীয় পথটি এই দুই পথের মাঝামাঝি দিক ধরে। নামচে ছাড়িয়েই পাহাড়ের গা দিয়ে আরও উপরে ওঠে। ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌঁছায় কুণ্ডে ও কুংজুং গ্রামে। সেদিক দিয়েও ঘুরে ঘুরে আর এক পথ থিয়াংবোচির রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়। সেই তৃতীয় পথ ধরেই আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর কথা।

নাম্‌চে গ্রামে ঢুকি। ১১,০০০ ফুট। বেলা সাড়ে সাতটা। এই পাহাড়ী শীতের দেশের অধিবাসীদের কাছে এখন সবে ভোরবেলা। শয্যা ছেড়ে ওঠবার সময়। গ্রামে ঢুকতেই ডান হাতে পুলিস-চৌকি,—পুলিস ও মিলিটারী চেক্‌-পোস্ট।

নেপালী অফিসার বাইরে রোদে বসে মুখ ধুতে ব্যস্ত। নিকটেই পথের পাশে একটা টেবিল-চেয়ার পাতা। ইঙ্গিতে সেখানে বসতে বলেন। এসে পারমিট্‌ দেখেন। তাতে ডাক্তার বিশ্বাসদেরও নাম দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা কোথায়? তারপর উত্তর শুনে বলেন, তাহলে আপনি এখন একাই?— কতদিন এ-অঞ্চলে কাটাব, কতদূর যাব ইত্যাদি প্রশ্ন করে পারমিটের উপর দস্তখত করে দেন, তাঁর খাতাপত্রেও লিখে নেন। চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। বলি ধন্যবাদ। এখানে আর দেরি করব না,—কুণ্ডে গ্রামে এখন চলেছি।

একথা জানিয়ে তখনি রওনা হই বটে, কিন্তু নাম্‌চেতে দেরিও হয়, চা ইত্যাদি খেতেও হয়।

গ্রামের মধ্যে একটু এগোতেই গিরমি দেখায়, ঐ বাড়িটা বেতার-কেন্দ্র— **Wireless Station**। ওখানে সব ভারতীয় অফিসার। চলুন না, দেখা করে যাবেন। খুব খুশী হবেন ওঁরা। আমিও তারই মধ্যে গ্রামে দু-একজনের সঙ্গে কাজ আছে, সেরে আসি।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠি। কয়েকজনই ভারতীয়। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, উত্তরপ্রদেশেরও দু-একজন। বাঙালী কাউকে দেখি না। হঠাৎ এই দুর্গম সুদূর প্রবাসে অপরিচিত আর এক ভারতবাসীকে পেয়ে তাঁদের মধ্যে আনন্দের উল্লাস ওঠে। যেন, কতো আপনজন, কতো দিনের পর দেখা। দু-একজন তখনও শয্যা ছাড়েন নি। তাঁদের ডেকে তোলেন; চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সাদরে বসতে বলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে আসছি? এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে কেন? আমাদের তো মনে হয়, এখানে নির্বাসন। থাকবেন কদ্দিন? দেশের ঠিক ভেতরের খবরগুলো শোনান্‌ দেখি। এলেনই যখন আমাদের সঙ্গেও নিশ্চয় কদিন কাটাতে হবে,—আজ তো ছাড়ছিই না,—ইত্যাদি।

তাঁদেব এই আন্তরিক আনন্দ উচ্ছ্বাস আমারও অন্তরে তৃপ্তির তরঙ্গ তোলে। ভাবি, স্বদেশ থেকে দূরে গেলে দেশের মায়া যেন আরও বাঁধে। অথচ, দেশের মধ্যে থাকতে বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষের কতোই না আত্মঘাতী অভিব্যক্তি!

সারা নেপাল-রাজ্যে তখনও রেডিও-স্টেশন ও মিলিটারি দপ্তরগুলি ভারতীয়দের সহায়তায় চালু ছিল।

অফিসারদের সাদর আমন্ত্রণ সত্ত্বেও নাম্‌চেতে থাকতে রাজি হই না। বলি, আজ এখনই কুণ্ডেতে যাই, সেইখানেই থাকব। কদিনের দীর্ঘ যাত্রা আজ শেষ হোক। ফেরবার পথে নিশ্চয় আবার দেখা হবে।

তাঁরা তবু পীড়াপীড়ি করেন। বলেন, আমাদের প্রাতরাশ প্রায় প্রস্তুত।

অন্ততঃ তাই খেয়ে যান। কুণ্ডে গ্রামে যেতে এখন হাজারখানেক ফুটের ওপর চড়াই উঠতে হবে।

গরম গরম ঘিয়ে-ভাজা পুরি (ডালডা সারা নেপালে নিষিদ্ধ),—আলুর সব্জি, চা, বিস্কুট আনেন। ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। গিরমিও তার কাজ সেরে ফেরে। বিদায় নিয়ে সাড়ে আটটায় আবার পথ চলা।

সুদূর বিদেশে ক্ষণিকের এই হঠাৎ-দেখা-পাওয়া স্বদেশবাসীদের প্রীতি-স্পর্শ অন্তর সুবাসিত করে তোলে। এ-যেন মহা-অরণ্যে পথ চলতে আচমকা অতি চেনা যুঁই-চামেলির সুগন্ধ ভেসে আসা।

কিন্তু বিরাট হিমালয়ের বিচিত্র প্রভাব। পথে নামতেই স্বদেশ-প্রীতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কোথায় যেন লুপ্ত হয়।

পথের নিকটে যথারীতি বৌদ্ধস্তূপ। কাঠমাণ্ডুর বোধনাথ, স্বয়ম্ভুনাথের মতন। তবে, ছোট আকার। কিন্তু, সেই রকমই চারিদিকে চোখ-আঁকা। যেন, সারা বিশ্বব্যাপী সদা-জাগ্রত প্রখর দৃষ্টি।

রেডিও-স্টেশনের কাছেই গ্রামের ছোট মনাস্টি। কাঠের খুঁটিতে পতাকা ওড়ে, তিব্বতী মন্ত্র লেখা কাগজের ঝালর ঝোলে, রঙীন কাপড়ের টুকরো দোলে,—গুন্‌গুন্‌ স্বরে যেন মন্ত্র জপে।

গ্রামের মায়া কাটিয়ে পথ ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। বাঁ দিকে অপর আর এক পথ সোজা এগিয়ে যায়। গিরমি বলে, ঐ চলে গেল থামি-চকের সড়ক। ভোটেকোশি নদী ধরে যাবে।

সে-পথ ছেড়ে আমরা উঠে চলি পাহাড় বেয়ে। দেখতে দেখতে অনেকখানি উঠেও আসি। বুঝতে পারি, নীচের দিকে তাকিয়ে,—ঐ দূরে কোথায় এখন সেই নামুচের ঘরবাড়ি! যেন, আকাশ-পথে উড়ে চলি, নীচে গ্রামের ছবি দেখি।

পাহাড়ের নিম্নদেশ থেকে উঠে আসার পুরস্কারও লাভ হয়। সমীপবর্তী গিরিশ্রেণীতে অবরুদ্ধ দৃষ্টি এইবার মুক্তির আনন্দ স্বাদ পায়। 'বহুশোভমানা উমা হৈমবতী' যেন তাঁর অক্ষয় স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেন।

চারিদিকের গগনস্পর্শী তুষারশিখরমালা আকাশের নীলকণ্ঠে দুলে ওঠে।

হিমালয়ের এ সাধারণ গিরিচূড়ার জটলা নয়। চোখ তুলে যেদিকে তাকাই বিস্ময়ে হৃদয় ভরে। কুড়ি হাজার ফুটের কম উঁচু কোন শিখরই নেই,—কাছে কোথাও! দাঁড়িয়েও আছি প্রায় বারো হাজার ফুট উপরে। এ-যেন চির-পরিচিত বাস্তব জগৎ থেকে অকস্মাৎ কোন্‌ যাদুবলে এসে পড়ি নৈসর্গিক এক স্বপ্নরাজ্যে। তুষারপ্রস্তরময় নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ড ভূধরশিখরের সমাবেশ নয়। এ-যেন উন্নতশির মহামৌনী মহর্ষিদের মিলনভূমি।

বিভূতি-বিভূষিত ললাট। শুভ্রকান্তি। জটাজূটধারী। ধ্যানস্তিমিত নেত্র। সুগম্ভীর, অথচ প্রশান্ত সুস্নিগ্ধ মহান্‌ দীপ্তি। চোখ-প্রাণ আনন্দে

ভরে যায়। ভক্তিভরে মাথা নত হয়। দু'নয়নে ধারা নামে। ভাবি, এই-ই বুঝি বা সেই কল্যাণতম মহান্ বিশ্বরূপেরই আভাস!

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

পথের ডানদিকে দুধকোশির অপর পারে Tamserku শিখর (২১,৭৩০ ফুট)। তার পাশেই Kangtega (২২,৩৪০ ফুট)। গিরমি বলে, দেখছেন, পাহাড়ের ওপরটা কেমন চেপটা মতন,—দুদিকে উঁচু, মাঝখানটা একটু খেবড়া। সেইজন্যেই তো ঐ নামকরণ। Kang মানে ঘোড়া, tega মানে জিন। ঠিক ঘোড়ার পিঠে জিনের মতন দেখায় না কি?

তাকিয়ে দেখি, ঠিক তাই-ই। যেন নীল আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আরোহী-বিহীন শ্বেত পক্ষিরাজ অশ্ব।

গিরমি জানায়, ঐ শিখরে ১৯৬৩ সালে হিলারী সাহেবের দলের Dave সাহেব প্রথম ওঠেন।

Kangtega ও Tamserku-র উত্তর-পূর্বে অপূর্ব সুন্দর আর এক গিরিচূড়া,—Ama Dablam (২২, ৪৯৪ ফুট)। গোমুখের পথে সেই সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ শিবলিঙ-শিখরের মতন আকার। হিলারীর ভাষায়,— **"the incomparable Ama Dablam soars skyward, one of the most breathtakin gly lovely of all mountains."**

তবুও, দুঃসাহসী মানুষের অদম্য আকাঙ্ক্ষার কাছে ঐ অপরূপ শৈলশিখরেরও নিস্তার নেই। ১৯৬১ সালে ওরই উপর হিলারীর দলের কয়েকজন ওঠেন।

পথের সুমুখে উত্তর দিকে Tawache চূড়া (২১, ৪৬৫ ফুট)। গিরমি বলে, ১৯৬৩ সালে হিলারী সাহেবের কয়েকজন সঙ্গী ঐ চূড়াতেও উঠতে যান, কিন্তু শিখরের শেষ অংশের দেড়শো-দুশো ফুট নীচ থেকেই তাঁদের ফিরে আসতে হয়,—ওটুকু নাকি যাওয়া অসম্ভব হয়েছিল।

Tawache-র আরও উত্তরে এভারেস্ট-লোৎসে-এর গিরিশ্রেণী।

অর্ধবলয়াকারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সব তুষারশিখর। বিস্ময়পুলকিত চিত্তে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

এই পাহাড়ের কাঁধের উপর পৌঁছুই। পথের পাশে বৌদ্ধ চোরটেন দেখে বোঝা যায়, এবার চড়াই শেষ। খানিকটা সমতলভূমি। তারপর নেমে চলা। পাহাড়ের গায়ে পাথর-বিছানো পথ। Fir ও Birch গাছের ছোট বনভূমি। মাঝে মাঝে জুনিপার। খর্বাকৃতি রোডোডেনড্রনও। ছড়ানো বড় বড় বোলডার্স্। কোথাও বা তারই মাঝে জলের ক্ষীণধারা। সেখানে পাথরগুলির অঙ্গে শৈবালের মখমল সজ্জা। আরও খানিক নামতেই বনের এলাকা শেষ হয়।

পাহাড়ের কয়েক শত ফুট নীচে দেখা যায় সমতল উপত্যকায়—সুমুখের পাহাড়ের কোলে গ্রামের ঘরবাড়ি।

গিরমি সোৎসাহে দেখায়, ঐ কুনডে! আমি এগিয়ে যাচ্ছি, থাকবার

ব্যবস্থা করতে। আপনি ধীরে ধীরে আসুন, দোরজেরা পিছনে আসছে ; সে বাড়ি চেনে, নিয়ে আসবে।—বলেই সবেগে নেমে যায় পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে।

এ-যে তার জন্মভূমি। আপন গ্রাম। তবুও, কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জির কাছে বলে এসেছে, নিজের বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করবে না। ছোট্ট একখানা ঘর। বুড়ী মা, একা সেখানে থাকেন। কোনরকমে দিন কাটান। আমার নাকি অসুবিধে হবে। তাই আমাকে রাখতে চায় তার বোনের বাড়িতে। তাদের ঘরও বড়, অবস্থাও ভাল। কিন্তু বোনকে তো আগে থেকে খবর পাঠানো সম্ভব হয় নি যে অতিথি নিয়ে আসছে,—তাই তার এখন এগিয়ে যাওয়া।

গিরমির ত্বরিত-গতিতে যাওয়ার আগ্রহ, আমারও স্তব্ধ হয়ে সৌন্দর্য-সুধা পানের অবকাশ লাভ। চারিদিকে শুভ্র উষ্ণীষ-শিরে গিরিপ্রহরী। তুষারে রৌদ্র প্রতিফলিত হয়ে দিগন্ত ঝলমল করে। নীচে সুপ্তিমগ্ন ক্ষুদ্র গ্রাম।

এ-যেন রূপকথার রাজকুমারী। রূপার পালঙ্কে নিদ্রাতুর।

কিন্তু তখনি মনে হয়, কাব্যকথা থাক। এই মমতাবিহীন উদাসীন পার্বত্য রাজ্যে মানুষের বসবাস সম্ভব হয় কি করে? অথচ, এই দেশই তো প্রকৃত শেরপাদের বাসভূমি। নদীমাতৃক শস্যশ্যামল সমতল বাংলা মায়ের কোল থেকে এসে এখানে অবাক হবারই কথা। চারিদিক-ঘেরা উত্তুঙ্গ গিরিশিখর। খাড়া পাহাড়ের গা। তারই মাঝে যেখানে সামান্য একটু সমতলভূমির আশ্রয়, সেইখানেই শেরপাদের ঘর পাতবার চেষ্টা। কিন্তু, হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চলে সে ধরনের সমতলভূমিই বা কতটুকু? মানুষের বসতিও তাই নগণ্য। এই সমগ্র খুম্বু অঞ্চলে কটাই বা গ্রাম. আর কতোগুলিই বা সেখানে ঘর? সেই থামি চকের তিনটে গ্রামে ১৯২টি ঘর, নামচেতে ৭৩টি, ফোরৎসেতে ৬৩, পাংবোচে ৫৮, খুমজুং-এ ৯৩ ঘর, আর ঐ কুনডে গ্রামে মাত্র ৪৫ ঘর লোকের বাস। এ-যেন প্রকৃতিদেবী ও মানুষের মধ্যে মায়ে-ছেলের খেলা। মা বলেন, এবার বসবি কোথায়? ছেলে বলে. এই তো তোমার কোলের কোণে এইখানে!—বলে হেসে চেপে বসে সেইখানে।

শেরপারাও তাই-ই করে এই পাহাড়ে। সাধারণতঃ পাহাড়গুলির পায়ের কাছে বা গায়ে তাক মতন, ব্যবহার-উপযোগী খানিকটা সমতল জায়গা পেলেই সেইখানে শেরপারা দখল জমায়। কিন্তু, মানুষ তো পাখি নয়, শুধু ঘর বেঁধেই জীবনধারণ চলে না। পেটের ক্ষুধা, তাও মেটানো চাই। ডানা নেই যে উড়ে গিয়ে আহার খোঁজে। ধরিত্রী তার অন্নদাত্রী। অতএব, পাহাড়ের গায়ে চাষের জমিও সংস্থান করতে হয়। নিকটে ঝরনা বা নদীও থাকা চাই। কাছাকাছি ছোট বনভূমিরও প্রয়োজন। নাহলে এই শীতের দেশে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা হয় কি করে?

গৃহ-রচনারও তো উপকরণ ঐ কাঠ ও পাথর। মনোমত জমিও হয়ত

খুঁজে কোনপ্রকারে বার হয়। কিন্তু, এ আজব দেশ,—বরফের রাজ্য। চাষ করলেই বা ফসল ফলে কতোটুকু? অল্প হয়ত যব, কিংবা সামান্য কিছু সবজি। এখন চালু হয়েছে আলু। হয়ও প্রচুর। তাই আলুই এখন এদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু চাষ-আবাদ শেরপাদের উপজীবিকা নয়। শেরপাদের প্রকৃত সম্পদ,—গোধন। গো অর্থে আমাদের সাধারণ গরুবলদ নয়। শেরপারা যেমন এককালে তিব্বতবাসী ছিল, এদের গবমহিষও হলো তেমনি তিব্বতী ঋষভ, ইয়ক, চমরী,—এই সব শ্রেণীর। বিশাল আকার। দীর্ঘ লোমশ তনু। ভালুকের মতন। কষ্টসহিষ্ণু। শীতে বরফে কাতর হয় না। বরং পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে এলে এদের গ্রীষ্মের ক্লেশবোধ। শেরপাদের যার যতো গোধন, সেই ততো বড়লোক। কিন্তু চমরী পালন করা কি সহজ কথা? তাদেরও খোরাক চাই। এই নীরস শুষ্ক দেশে ঘাস কোথায়? তাই আবার খোঁজ। সন্ধান করে আবিষ্কার করতে হয় চমরী-চারণভূমি। কোথায় ঝরনার ধারে পাহাড়ের মাথায় কোমল ঘাসে-ছাওয়া একফালি ময়দান। যেন, গিরিরাজের দ্বারদেশে একমুষ্টি ভিক্ষার দান। চল, চমরীর পাল নিয়ে সেইখানে চরাতে। কয়েক মাস এক পাহাড়ের গায়ে বা মাথায়, আবার সেখানকার ঘাস ফুরোলেই অন্যত্র আর কোথাও। একদিন দুদিনের ব্যাপার তো নয়। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। তাই সাধারণতঃ একই শেরপা-পরিবারের পাহাড়ের উপর ও নীচের অংশে দু-তিন জায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা থাকে। হয়ত অনেক দূরে-দূরেই। পাহাড়ের নীচের দিকে এই ধরনের আবাসস্থলগুলিকে বলে Gunsa settlement। এগুলি প্রায়ই নদীর কাছে হয়; তাই আলুর চাষও হয় সেখানে বেশি। আসলে গ্রামে চাষ হবার আগেই Gunsaর ফসল উৎপন্ন হয়ে যায়, সেদিক থেকেও সুবিধা থাকে। পাহাড়ের উপর দিকের অস্থায়ী বাসগুলির নাম—Yersa বা Phu settlement। সেখানে বেশি বরফ পড়লে বা ঘাসের অভাব হলে আবার নীচের দিকে Gunsa-তে নেমে আসা। গ্রামসুদ্ধ প্রায় সবাই এইভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বাসা বাঁধে। তবুও, আসল গ্রাম প্রত্যেকেরই একটাই। সেইখানেই তার ভাল পাকা বাড়ি, সাজানোগুছানো আসবাবপত্র। সেই সাময়িক ছেড়ে-আসা আসল আবাসগৃহ হয়ত তখন জনশূন্যই পড়ে থাকে। চুরি-চামারির ভয়? এ-সব দেশে তা নয়। স্বপ্নেরই অগোচর। একের জিনিস অপরে হরণ করা? অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভাবি, হায় রে আমাদের আধুনিক সভ্য দেশ! শুনি নাকি সভ্য জগতের সংস্পর্শে এসে শেরপাদের শান্তিময় জীবনেও এখন ঘুণ ধরতে শুরু হয়েছে। শুনে দুঃখ হয় মনে। থিয়াংবোচির মূর্তি অপহরণ তারই এক নিদর্শন।

চমরীর পাল প্রয়োজনমত চরিয়ে নিয়ে বেড়াবার এক শ্রেণীর লোকও শেরপাদের মধ্যে থাকে। রাখালদের মতন। তাই তাদের পেশা। কিন্তু আমাদের দেশের একটা সারাবেলার কাজ ত নয়। চমরীর দল নিয়ে তারা চলে পাহাড়ের কোন এক নিভৃত শ্যামল অঞ্চলে। যারা লোক রাখতে অসমর্থ,

নিজেরাই নিজেদের পশুদল নিয়ে চলে। থাকতে হয় কয়েক মাস। যতদিন সেখানে ঘাস থাকে। বাস করে অস্থায়ী পাথরের ঘরে বা পাহাড়ের গুহার আশ্রয়ে। ক'মাসের খাদ্য,—ছাতু ও আলু—যা সঙ্গে নেবার নিয়ে রাখে। গরুর দুধও প্রচুর পায়। তাজাও খায়, দই-মাখনও বানায়। ক্বচিৎ কখনো বন্য পশুর শিকার মিলে যায় তো কথাই নেই। কদিন প্রাণভরে ভুরিভোজ। সেই নির্জন পাহাড়ে নিঃসঙ্গ জীবন ঘটনাশূন্য হলেও রোমাঞ্চকর, অনাবিল আনন্দময়ও। একঘেয়ে? সে বোধই থাকে না তাদের। প্রকৃতির এই অপরূপ রাজ্যে বৈচিত্র্যশূন্যতারও মাধুর্য থাকে।

শেরপাদের গো-সম্পদ থাকলেও তাতে সারা বছর জীবনযাপনের সব প্রয়োজন মেটে না, সকলের সে ধন থাকা সম্ভবও নয়। তাই অন্য পেশাও অবলম্বন করে।

এই কারণেই হয়ত শেরপারা জাত-ব্যবসায়ী। হিমালয়ের এই দুর্গম অঞ্চল থেকে তারা চলে যায় আরও উত্তরে তিব্বতে ব্যবসা করতে। আবার কখনো নেমে আসে নেপালের নীচের অংশেও। এই ব্যবসা-লব্ধ অর্থেই এদের সচ্ছল অবস্থা। প্রাণ ধারণের প্রয়োজনেই পাহাড়ের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ানো এদের জাতিগত রীতি। তাহলেও শেরপারা যাযাবর নয়, আবার ঘরকুনোও নয়। সংসারের বাইরে দিন কাটিয়েও যেমন আনন্দ পায়, গ্রামে ফিরে স্বজন-পরিবারের সঙ্গ সুখেও তেমনি স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। অন্তরই এদের সদা আনন্দময়।

আশ্চর্য এই দেশ! অপরূপ এখানকার অধিবাসীরা। বিচিত্র এদের জীবনধারা। পার্বত্য-প্রকৃতি তার রুক্ষ-শুষ্ক-হিমশীতল আবহাওয়া দিয়ে এখানকার মানুষের স্বভাবকে গড়ে তোলে। মানুষও গ্রহণ করে তেমনি কঠিন কঠোর শ্রমবহুল জীবনব্রত। বাইরে যত বাধাবিঘ্ন আপদবিপদ প্রতিকূল পরিস্থিতি,—মানুষেরও তেমনি শৌর্য-বীর্য-বুদ্ধির বিকাশ। এমনি করেই গড়ে ওঠে এক একটা নবীন জাতি ও সভ্যতা। যেমন, মিশরের দুরন্ত বিশাল নীল নদকে সংযত ও সুসম্বদ্ধকরণের মধ্যেই এককালে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার জন্ম।

ভাবি, সেই আশ্চর্য শেরপা-দেশেই আজ কদিন কাটাতে এলাম।

দোরজেরা এসে পৌঁছায়। একসঙ্গে নেমে চলি কুনডে গ্রামের দিকে। ঠিক দশটায় পৌঁছে যাই। কুনডে সাড়ে বারো হাজার থেকে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের কোলে ছড়ানো গ্রামের বাড়ি। কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ দোতলা। লম্বা ধরনের। উপরে সারি সারি কাঠের জানলা। বাড়িগুলি অনেকটা একই রকমের দেখতে। পাথরের দেওয়াল। বাইরে পলেস্তারা ও চুনকাম করা। দুদিকে ঢালু ছাদের উপর পাতলা-শ্লেটের-মত-দেখতে কাঠের তক্তার ছাউনি, উপরে ভারি ভারি পাথর চাপানো, বাতাসে না উড়ে যায়। অধিকাংশ বাড়ির সামনে খানিকটা খোলা জমি। চাষের

ক্ষেত। বাড়ির এলাকা পাথর সাজিয়ে পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে দু-এক জায়গায় ধাপের মত, কোথাও বা অল্প ফাঁক,—প্রবেশপথ। গ্রামের মধ্যে পথ বলতে একটি-ই। তার মাঝখানে চোর্টেন, মণিপ্রাচীরও। চোর্টেনের মাথায় সেই বোধনাথ-স্বয়ম্ভুনাথের মত চারিদিকে চোখ আঁকা। কাঠের খুঁটির উপর রঙিন নিশান ওড়ে। রাস্তার ধারে সাজানো পাথরের গায়ে বৌদ্ধমন্ত্রাদি খোদাই করা। গ্রামে প্রবেশ করতেই সুস্পষ্ট বোঝা যায় গ্রামবাসীদের উপর ধর্মভাবের কী প্রবল প্রভাব।

দোরজের পিছু পিছু চলি। পথ ছেড়ে সে গ্রামের ভিতরে ঢোকে। রাস্তা বলতে আর কিছুই দেখি না। এর বাড়ির এলাকার ভিতর দিয়ে, ওর বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়া। গায়ে গায়ে লাগানো এলাকা, মাঝখানে রাস্তা নেই। ভাবি, এইভাবে আমাদের শিক্ষিত-সভ্য দেশে ঘরবাড়ি ও যাতায়াতের প্রথা থাকলে, বাদ-বিসংবাদ তো বাধতোই, মামলা-মোকদ্দমারও অন্ত থাকতো না।

পরের এলাকা দিয়ে এভাবে বেপরোয়া চলতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু, আশ্চর্য হয়ে দেখি, গৃহবাসীরা এই অবৈধ প্রবেশ শুধু যে সহজ ও সাধারণ ভাবেই নেন, তাই নয়, দোতলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সাগ্রহে হাসিমুখে যেন অভ্যর্থনাও জানান। বুঝতে পারি, দোরজেকে প্রশ্ন করেন, কে? কোথা থেকে আসছে? কার ঘরে থাকবে? ইত্যাদি। তাঁদের কারও ঘরে উঠলে তাঁরাও সানন্দে স্থান দেন, এমনি মনোভাবের স্বতঃপ্রকাশ।

ভেবে আনন্দ পাই, যেন সমগ্র গ্রামেরই অতিথি আমি!

গিরমির বোনের বাড়িতে পৌঁছাই। সামনে সেই চাষের জমি। এখন ফসল নেই অল্প উঁচু পাঁচিল ঘেরা। একপাশে দোতলা লম্বা বাড়ি। দোতলায় সুমুখ দিকে জানলা। সারি সারি তিনটি। বাড়ির প্রবেশপথে বড় দরজা। দরজা, জানলা, চৌকাঠে সূক্ষ্ম কারুকার্য। বাড়িতে ঢোকবার আগেই বাইরে জমির এককোণে আলাদা ছোট একটা ঘর। পরে জানতে পারি, সেটি শৌচাগার।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই প্রথমে অন্ধকার বোধ হয়। একটা অদ্ভুত বিকট গন্ধও পাই। সেই স্বল্পালোকে দৃষ্টি অভ্যস্ত হতেই দেখি, একতলার এই ঘরে স্তূপাকার পুরানো কাঠ, শুকনা ডালপালা,—চমরী গাইয়ের গোয়াল। ঘরের এককোণে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ি না বলে মই বলাই উচিত। উঁচু উঁচু ধাপ। পাশে রেলিঙও নেই। দোরজে বোঝা-পিঠে অনায়াসে দেহ বেঁকিয়ে উঠে যায়। সাবধানে পা ফেলে পিছু পিছু আমি উঠি। দোতলায় কাঠের মেঝের মধ্যে খানিকটা ফাঁক, সেইখান দিয়ে দেহ গলিয়ে উপরে পৌঁছানো। এ-যেন **Jack-in-the-box** পুতুলের মত হঠাৎ লাফিয়ে বার হওয়া। কোন রকমে উপরে পৌঁছেই দেহ হাঁফ ছাড়ে, চারদিকে তাকিয়ে মনও তৃপ্তিতে ভরে উঠে। প্রকাণ্ড হল্-এর মত লম্বা-চওড়া ঘর। মনে হয়, লম্বায় প্রায় চল্লিশ

ফুট হবে, চওড়াতেও ফুট কুড়ি-পঁচিশ। মাথার উপর কাঠের কড়ি বরগা। কাঠের চকচকে মেঝে, যেন সদ্য পালিশ করা। চারিদিক ঝকঝক করে,—সাজানো-গোছানো। সু-পরিচ্ছন্ন। চারপাশের দেওয়ালের গায়ে প্যানেলিং—কাঠের আবরণ। সারি সারি তাক। নানা আকারের বহু বাসনপত্র। বেশির ভাগ পিতল ও তামার। সোনার মত উজ্জ্বল দেখায়। কোথাও আবার কাঁচের কাপ-ডিস ইত্যাদি। পোরসেলিনেরই মনে হয়। কয়েকটি রুপারও। তবে, এ-সবই যে চীনদেশে তৈরি,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পাত্রগুলির গায়ে নানান রঙের ড্রাগন, চৈনিক মানুষের মূর্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির সুন্দর রঙিন চিত্রবিচিত্র কারুকার্য তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। কোথাও বা তিব্বতী টঙ্কা—সিল্কের উপর আঁকা লম্বা চিত্রপট দেওয়ালের শোভা বাড়ায়। ঘরের একপাশে কয়েকটি প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক। আর এক কোণে স্তরে স্তরে সাজানো বস্তা, গাঁটরি, মালপত্র। জানলার ধারে নীচু, লম্বা তক্তাপোশের মত চৌকি। বসাও চলে, আরামে শোওয়াও চলে। দামী তিব্বতী কার্পেট পাতা তারই উপর। সম্মুখে মানানসই নীচু লম্বা টেবিল। ওরই নিকটে ঘরের মেঝেতে প্রকাণ্ড উনুন। পরে দেখি, সারাক্ষণই তাতে গনগনে আগুন জ্বলে। তার উপর লোহার প্রকাণ্ড তেপায়া—tripod বসানো। সব সময় প্রকাণ্ড কেট্‌লি বা ডেকচি চাপানো। সেই উনুন ঘিরে লোকজন বসে। তারই পিছন দিকে ঘরের ঐ কোণে,—দেওয়ালের গায়ে তাকে-সাজানো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি চিত্র, ধূপ, দীপ, বাতি। যেন, সাজানো,ক্ষুদ্র মন্দিরগৃহ।

এক কথায়, সেই একই হল্‌-এর ভিতরে গার্হস্থ্য-আশ্রমের সব কিছু আয়োজন। যেন, বাসভবনের বিভিন্ন ঘরের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে,—বসবার, শোবার, ভাঁড়ার, রান্নার, খাওয়ার, পুজার আলাদা ঘরগুলি এক করে রাখা। এ-শুধু বাইরের বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ভেঙে মিশিয়ে দেওয়া নয়, মনের আগলও ভেঙে প্রাণ খুলে পরস্পরে মেলামেশাও। আত্ম-পরে বিভেদ নেই। পরদেশী অতিথিও যেন পরিবারবর্গেরই একজন। ঘরে উঠে দাঁড়াতেই সেই মধুর অনুভূতি মনে জাগে। সাড়া পড়ে যায় সারা ঘরে অচেনা আমারই আগমনে।

গিরমি হাসিমুখে এগিয়ে ভেতে আসেই। তার দিদি ও আরও দু-চারজন। গিরমির ভগিনী অপরূপা সুন্দরী। যাকে বলে, দুধে-আলতা রঙ। সুগোল মুখমণ্ডল। আয়ত লোচন। কিন্তু ভারি পাতায় ছোট দেখায়। পিঠে দোলে ফণি-সম দীর্ঘ বেণী। মাথায়, দু'কানে, হাতে, বুকে একরাশ গহনা। নানা রঙের পাথর,—শিলাগুটি—pebbles বসানো। পরনে দামী সিল্কের গাঢ় লাল রঙের গাউন। সুমুখপানে কোমর থেকে ঝোলে সূচীকর্ম-করা রঙিন বহির্বাস—apron। প্রফুল্লবদনে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে চলেন জানলার ধারে। সেখানে চৌকির উপর বিছানো কার্পেটে বসতে ইশারায় অনুরোধ জানান। তখনি কাপ ভর্তি গরম চা আসে। তিব্বতী প্রথায় তৈরি। দুধ চিনি দিয়ে নয়। মাখন ও লবণ মেশানো। অদ্ভুত স্বাদ। কৈলাস মানস সরোবরের পথে যেতে আগেও এ চা পান করার অভিজ্ঞতা আছে।

গিরমি আমার অস্বস্তি বোঝে। বলে, আপনার চা বার করে তৈরি করে দিই এখনি!

বলি, পরে সে চা খাব। এখন এতেই চলবে।

ভাবি, নাহলে ওর ভগিনীর মানরক্ষা করা হয় না। কোন রকমে কাপ শেষ করি। কিন্তু তাতেই আবার দুর্ভোগ ঘটে! শুনে পেয়ালা মহিলা তখনি আবার কেটলি থেকে চা ঢেলে ভরে দেন। দু কাপ খেয়েও নিষ্কৃতি মেলে না। তৃতীয় দফায় ভরতি হয়। আপত্তি শোনেন না। গিরমির কাছে তখন শুনি, এ দেশের আচার, কাপ খালি হলেই ভরে দেওয়া। অন্ততঃ তিন কাপ সকলেরই পান করা নিয়ম।

বলি, এখন যা হবার হয়েছে.—আর যেন জোর কোরো না, অসুখ হয়ে যেতে পারে।

গিরমির ভগিনীপতি আসেন। মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে মাথা নেড়ে অভিবাদন করেন। সাধু প্রকৃতির মানুষ। হাতে জপমালা। আঙুলের ফাঁকে অনলস ঘুরতে থাকে। মৃদু-হাওয়ায়-নড়া গাছের পাতার মতন ঠোঁট দুটিও অনবরত কাঁপে। অস্পষ্ট শব্দ ফোটে। সারাক্ষণই মন্ত্রোচ্চারণের গুঞ্জরণ ওঠে। কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। আপন মনে মালা ঘুরিয়ে জপই করতে থাকেন। ঘরের মধ্যে গল্প-হাস-মুখরিত প্রাণবন্ত চঞ্চলতা, তিনিই শুধু স্থির, ধীর, শান্ত, মৌনের প্রতিমূর্তি। এ যেন তরঙ্গ-উচ্ছলিত গিরিনদীর বুকে মাথা তুলে নিশ্চল, নির্বিকার এক শিলাখণ্ড।

গিরমি জানায়, তার ভগিনীপতি আজীবন ধর্মপরায়ণ। সন্তানাদিও নেই। পালিত এক পুত্র আছে।

চা-পর্ব শেষ হতেই মনে পড়ে, ভারবাহীদের এখনি টাকা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করতে হবে। টামাং পোর্টারের পক্ষে এই শীতের রাজ্যে রাত-কাটানো বিশেষ কষ্টকর। সে তাই অযথা বিলম্ব না করে ফিরতি-পথে এখনি যাত্রা করতে প্রস্তুত। আজ যতদূর পারে নেমে গিয়ে কোন গ্রামে থাকবে। শুনি, দিন সাতেকের মধ্যে সহজেই কাঠমাণ্ডু পৌঁছে যাবে, —বোঝাশূন্য-হয়ে-চলা হাওয়ায় উড়ে যাবার মতই চলবে।

হিসাব মত টাকা সে পায়; বকশিশও দেওয়া হয়। তবু ভাবি, যে অপরিসীম পরিশ্রম করে বোঝা বয়ে নিয়ে এল এবং যেরূপ তার নিঃস্ব অবস্থা, যা কিছুই দেওয়া যায় না কেন, কিছুই যেন দিলাম না মনে হয়।

অভিবাদন করে মুখে ম্লান হাসি নিয়ে সে ফিরে চলে। একাকী, সঙ্গীহীন,—সামনে সেই দীর্ঘ, দুর্গম পথ। চেয়ে থাকি তার অতি-পরিচিত নগ্ন-পা-ফেলে দেহ বেঁকিয়ে দ্রুতছন্দে-চলার ভঙ্গির প্রতি। ভাবি, কেই বা সে আমার? তবু, মন কেমন করে কেন?

শেরপা পোর্টার দুজনের হিসাব মেটাবার পথে বিঘ্ন আসে। হিসাবের টাকার অঙ্ক নিয়ে নয়। টাকার ভাঙানি নিয়ে। ধারণা ছিল, যখন দু ভাই একই সঙ্গে টাকা নেবে,—একশো টাকার নোটে। এখন দেখি, ওরা আলাদা আলাদা নিজের পাওনা টাকা চায় এবং দশ টাকার নোটের ভাঙানিতে। কিন্তু নোট ভাঙানো যাবে কোথায় এখানে? গিরমি বলে, চলুন, হিলারী সাহেবের কাছে। তিনি নিশ্চয় দিতে পারবেন।

হিলারী? তিনি কুনডেতে নাকি?

গিরমি বলে, হাঁ, এসেই আমি খবর পেয়েছি। এখানে তিনি হাসপাতালের বাড়ি করাচ্ছেন কিনা।

দুজনে তখনি বার হই। নিকটেই। গ্রামের বাড়িগুলি ছাড়িয়েই মাঠের মধ্যে রঙিন কয়েকটি তাঁবু ফেলা। পাথরের পাঁচিল দিয়ে এলাকা ঘেরা। তাঁবুর বাইরে প্যাকিং বাক্স ও বাড়ি তৈরীর নানান মালপত্র সাজিয়ে রাখা। একটা তাঁবু দেখিয়ে গিরমি বলে, ঐ যে হিলারী সাহেব ভেতরে চেয়ারে বসে আছেন।

সেদিকে এগিয়ে যাই। হিলারী দেখতে পেয়ে বেরিয়ে আসেন। কী দীর্ঘ দেহ! যাকে কথায় বলে, তালগাছের মতন লম্বা। লম্বা পা, লম্বা হাত, লম্বা গড়নের মুখও। কাছে দাঁড়াতে দেখি, তাঁর কাঁধের কাছে আমার মাথা। সাধারণ বাঙালীর গড়ন আমার। কেমন যেন মনে দীর্ঘ তনুর অভাববোধের গ্লানি জাগে। হাত বাড়িয়ে করমর্দন করি। তাঁর লম্বা আঙুলগুলোর ও হাতের প্রকাণ্ড চেটোর মাঝে আমার হাত যেন হারিয়ে যায়। হেসে বলি, আপনার সঙ্গে এই দ্বিতীয়বার শেক্-হ্যান্ড করার সুযোগ হলো।

তিনি আশ্চর্য হন, আপনার সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়েছিল তাহলে?

বলি ঘটনাটা আমার মনে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে, আপনার না থাকবারই কথা। তেরো বছর আগে—১৯৫৩ সালে সেই প্রথম-এভারেস্ট-বিজয়ের পর যখন কলকাতায় আসেন, 'হিমালয়ান ক্লাব' থেকে একটি সম্বর্ধনা হয়। সভাস্থলে আমরা সমিতির সভ্যরা সারি সারি দাঁড়াই, আপনি একে একে সকলের সঙ্গেই করমর্দন করে যান।

হিলারী তখনি বলেন, ঘটনাটা খুবই মনে আছে। 'সাটার ডে' ক্লাবে অধিবেশন হয়েছিল। আপনি তাহলে 'হিমালয়ান ক্লাব'-এর সভ্য? এখানে কবে এলেন? সঙ্গে আর কে আছেন?

বলি, এই একটু আগেই পৌঁছেচি। এসেছি একাই। গিরমি দোরজে আমার গাইড।

গিরমির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাকে বলেন, তুমি এসেছ সঙ্গে? ভালই।

নোট ভাঙাবার কাজের কথাটা তখনি পাড়ি। তাঁবুতে গিয়ে টাকা বার করে আনেন। বলেন, আরও ভাঙিয়ে নিতে চান, দিতে পারি। দিন তিনেক

পরেই তো কাঠমাণ্ডুতে আমি ফিরছি, আবার আসবার সময় ভাঙানো টাকা আনার আমার অসুবিধে নেই।

জানাই, আমারও কাছে এখন যা রইল, আর এখানে প্রয়োজন হবে না।

তিনি নিজে থেকেই আমন্ত্রণ জানান, হেঁটে তো এলেন এ-পথে। এবার প্লেনে ফিরতে চান তো চলুন আমার সঙ্গে। তিনদিন পরেই—১৪ই—আমার চার্টার্ড প্লেন আসছে। পরশুই লুকলা রওনা হব।

ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, আপনার সঙ্গ পাওয়া সম্ভব হবে না। ক'দিন এইখানেই কাটাব। থিয়াংবোচিও ঘুরে আসব এখান থেকে। তাছাড়া, ১৮ই তারিখে প্লেনে ফেরবার ব্যবস্থা জিমি রবার্টস্-এর সঙ্গে করে এসেছি।

তিনি বলেন, তাহলে অবশ্য এ প্রশ্নই ওঠে না। ওবেলা আসুন, আমাদের হাসপাতালের ঘর কেমন তৈরি হচ্ছে দেখবেন।

আবার আপন ডেরায় ফিরি।

গিরমির দিদি আগুনের নিকটে আমার থাকবার আয়োজন করেন। কিন্তু সেখানে সারাক্ষণই লোকজনের আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, সরগরম মজলিশ। তাই, আমারই অনুরোধে হলের একপ্রান্তে আমার বিছানা পাতা হয়। সামান্য যে-জিনিসপত্র সঙ্গে আছে,—নিত্যব্যবহার্য,—বিছানার পাশে কাঠের মেঝের উপর পলিথিন্ সীট্ বিছিয়ে সাজিয়ে রাখি। আহার্য-সামগ্রীর বোঝা গিরমির কাছে। ফিরে এসেই সে রান্না চড়িয়ে দেয়। তারই ফাঁকে আবার এক কাপ গরম চা খাওয়ায়। ঘরের ভিতর এমনি শীত যে গরম কাপ হাতে ধরে চুমুক দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভাবি, এই জন্যেই হয়ত পর-পর অন্ততঃ তিন কাপ পান করার প্রথা। পাশে-রাখা জিনিসগুলিও এরই মধ্যে দেখি, যেন বরফের টুকরা হয়ে গেছে। অব্যবহৃত জামাকাপড়ও যেন সদ্যসিক্ত। আবার তুলে রাখি থলির মধ্যে। এখন যেগুলি ব্যবহার হবে, বিছানা কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি। গিরমির কাছ থেকে গরম জল নিয়ে নীচে বাইরে যাই। সিঁড়ি ওঠা-নামার অভ্যাসটাও আয়ত্ত করা দরকার।

শৌচাগারের ব্যবস্থ এখানে মোটের উপর ভালই দেখি। কাঠের ঘরখানি নেহাৎ ছোট বা ঘুপসি নয়। বাইরের দুরন্ত ঠাণ্ডা থেকেও রক্ষা করে। ভিতরে মাটিতে প্রকাণ্ড গর্ত। তারই উপর কাঠের কয়েকটি তক্তা পাতা, মাঝে মাঝে ফাঁক। এদেশে সারের অভাব। তাই চাষের জমিতে এই সব সারই ব্যবহার হয়।

মনে পড়ে কাঠমাণ্ডুতে ব্যানার্জির কাছে শোনা তাঁর এক উদ্ভট অভিজ্ঞতা। হাসতে হাসতে বলেন, শেরপাদের দেশে চলেছেন, শুনুন আমার সেখানকার একদিনের ঘটনা। এই তো সেদিনের কথা। শেরপাদের এক ছোট্ট গ্রামে রাত কাটাচ্ছি। আমারও ভোরে উঠে বাইরে যাওয়া অভ্যেস। আগের দিন দেখে-রাখা একটা পতিত জায়গায় গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসি। চারপাশে পাথর, গ্রামের লোকের ফেলে দেওয়া ভাঙাচোরা জিনিস, আবর্জনা। তাই কারো

কোন আপত্তির কারণ না থাকে, এই ভেবেই এ জায়গা বাছা। মুখ হেঁট করে বসেছি, হঠাৎ দেখি, ঠিক সামনেই মাটির ওপর একজোড়া বিরাট পা। ভয়ে আস্তে আস্তে মাটি থেকে ওপর দিকে দৃষ্টি তুলি,—পা থেকে হাঁটু,—কোমর—বিশাল শরীর,—ওপরে মাথা পর্যন্ত মুখ তুলে তাকাই। সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ যমদূত,—ষণ্ডাগুণ্ডা এক শেরপা! তিব্বতী ঝলঝলে পোশাক, গম্ভীর মুখ, কোমরে গোঁজা খুকরি। ভয়ে আমার প্রাণ শুকোয়। ওরই জমিতে বসেছি নাকি? কথাবার্তা নেই, লোকটা হেঁট হয়ে খপ্ করে আমার হাত ধরে। হাতের টানে উঠে দাঁড়াই। লম্বা পা ফেলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে। কোথায় চলেছে, কি জানি! নিয়ে গিয়ে মারই দেবে কি না তাই বা কে বলতে পারে? দুরদুর করে বুকের ভেতর। অল্প দূরেই চাষের জমি। সেইখানে পোঁছে হাতের ঝাঁকানি দিয়ে আবার বসিয়ে দেয়। পিছন ফিরে তেমনি লম্বা পা ফেলে তখনি চলেও যায়। এতক্ষণে তার হাবভাবে বুঝতে পারি, রাগ নয়, বিরক্তি নয়,—মানুষের নিত্যকর্মের মূল্যবোধ শেখানো। পোড়ো জমিতে অযথা কেন অপচয় করা? ঐ তো পাশেই ক্ষেত—সার দাও, তোমারও কাজ সারা, জমিরও উপকার।

শেরপাদের বড় বড় গ্রামে তাই এখন শৌচাগারের ব্যবস্থাও।

ভেবেছিলাম, গরম জল দিয়ে মুখ-হাত-পা ভাল করে ধুয়ে নেব,—দুপুরে খেতে বসার আগেই। কিন্তু দেখি, জল নিচে আনতে আনতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নমো-নমো করে কোনরকমে হাতটা ধুই, দুবার কুলকুচা করি। পায়ের মোজা পায়েই থাকে। কান-ঢাকা টুপিও মাথায় তেমনি বিরাজ করে। বুঝতে পারি, এ-দেশে কেন মানুষের জলের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক।

গিরমি বেলা বারোটার মধ্যে যথারীতি খাইয়ে দেয়। খিচুড়ির চাল-ডাল একটু শক্ত থাকে। এখানকার জলে ভাল সিদ্ধ হয় না। বলে দিই, দুবেলা রুটি ও সবজি করাই ভাল।

ভাবি, খাওয়া-দাওয়া সেরে স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে আরামে শোয়া যাবে। কিন্তু শুয়ে স্বস্তি পাই না। দুপুরে ঘুমানো আমার কোনকালে অভ্যাস নেই। তার উপর খাওয়া-দাওয়ার পর শীতবোধ আরও বাড়ে। ঘরের ভিতরকার সব ঠাণ্ডা যেন ওদিকের উনানের আগুনের ভয়ে এই কোণে এসে জমায়েত হয়। জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যায়, কাংটেগার তুষারশিখর। নীল আকাশে মাথা তোলে। রৌদ্রদীপ্ত হয়ে ঝকমক্ করে। হিমশীতল গৃহকোণ ছেড়ে যেন বাইরে আসতে ডাকতে থাকে। শয্যা ফেলে বেরিয়ে পড়ি। রোদের স্নিগ্ধ পরশ প্রাণে সজীবতা আনে। গ্রামের মধ্যে ঘুরি। চলে আসি হিলারীদের এলাকায়।

তাঁবুর বাইরে রোদে প্যাকিং-বাক্স সাজিয়ে, চাদর পেতে টেবিল-চেয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিপ্রহরের ভোজ সাঙ্গ করে সাহেবরা সব উঠে দাঁড়িয়েছেন, হাতে ধূমায়মান মগ-ভরা কফি।

হিলারী এগিয়ে আসেন। সঙ্গীদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। সবাই তাঁর স্বদেশবাসী। সেই নিউজিল্যান্ড থেকে এসেছেন হিলারীর সাধু পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করতে। ম্যাকেঞ্জি, কিং, ডাক্তার পিউ ইত্যাদি নাম শুনি। সবারই ভিন্ন ভিন্ন পেশা, কিন্তু মাউন্টেনিয়ারিং-এর নেশা।

ডাক্তারের পরিচয় পেয়ে আমার ঘোড়া-দেখে-খোঁড়া-হওয়ার প্রবৃত্তি জাগে। বলি, হাসপাতাল খুলছেন, এক রোগের ওষুধ দিতে পারেন? আমার যে-স্বরটা শুনছেন, এটা স্বাভাবিক স্বর নয়। বসে গেছে। ঢোক গিলতে ও খেতে ব্যথা বোধ করি। হয়ত কখন ঠান্ডা লেগেছে। তবে এটা নতুনও নয়। কয়েক বছর থেকেই ইদানীং দেখছি, পাহাড়ের অত্যধিক শীতের রাজ্যে এলেই গলার ভিতর এই রকম বেদনা দেখা দেয়।

তিনি বলেন, এর ওষুধ সঙ্গে আছে, এখনি এনে দিচ্ছি। ঠান্ডা-লাগা এর কারণ নাও হতে পারে। পাহাড়ের অনেকখানি ওপর দিকে উঠে এলে এ-রকম অবস্থা অনেক সময় হয়ে থাকে। দেহের নিরুদন—dehydration-ই তার কারণ।

নতুন এক শিশি Redoxon ট্যাবলেট এনে দেন। বলেন, পুরো শিশিটাই কাছে রাখুন। কাজ দেবে।

সেদিন থেকে ব্যবহার করে উপকারও পাই, দেখি।

শিশিটা হাতে নিয়ে সংকুচিত হয়ে দামের কথা তুলি।

হিলারী হেসে বলেন, দাম কীসের? এ-সব জনসেবার জন্যেই। জানেন আমার এই হাসপাতাল পরিকল্পনার ইতিহাস?

বলি, পড়েছি তার কিছু কথা আপনার School house in the clouds বইখানিতে। পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

শুনে তিনিও খুশী হন। বলেন, পড়েন তাহলে ও-সব বই?

জানাই, আমার যে ঐ নেশা।

দুজনে এগিয়ে চলি। হাসপাতালের দিকে। মনে পড়ে, এ-সবের জন্মবৃত্তান্ত।

হিলারীর জন্মস্থান ও কর্মস্থল নিউজিল্যান্ডে। কিন্তু, এখন বলা যায়, হিমালয়ই তাঁর মাতৃভূমি। এই পার্বত্য প্রদেশ ও এখানকার দেশবাসীরা তাঁর কতো প্রিয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি সেই বইয়ে লেখেন, শেরপাদের দেশে যাই আমি, তাদের কাছ থেকে কতো সাহায্য উপকার ভালবাসা পাই, কিন্তু আমি তাদের দিতে পারি কতোটুকু! তাই তাদের প্রশ্ন করি, তোমাদের কী কাজে আমি লাগতে পারি, বল তো? অতি চমৎকার জবাব আসে কয়েকজনের মারফতে। তারা জানায়, আমাদের ছেলেমেয়েদের চোখ আছে, তবুও তারা দৃষ্টিবিহীন,—Our children have eyes but still they are blind! কী মর্মান্তিক সত্য কথা! এরা লেখাপড়া জানে না, রোগভোগে চিকিৎসা পায় না। এদের চাষের পর্যাপ্ত জমির অভাব, যেটুকু পায় তাতেও জলের অপ্রাচুর্য। এই ভেবেই তখনই স্থির করি, এদের কয়েকটা গ্রামে স্কুল খুলব,—আমাদের

গতানুগতিক লেখাপড়া শেখানো হয়, যে বিদ্যা এদেশে এদের জীবনপথে চলবার প্রকৃত সহায়ক হবে, সেই ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা। তাই প্রথমেই শুরু হয় শেরপাদের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা। ১৯৬১ সালে খুমজুং-এ। এই কুনডে গ্রাম থেকে মাত্র আধ মাইলটাক দূরে। দু'বছর পরে পাংবোচে ও থামিতে। কতো বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে সেই সব স্কুলবাড়িগুলি তুলতে হয়, তারই রোমাঞ্চময় কাহিনী ঐ **School house in the clouds**—মেঘালয়ে বিদ্যালয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকল্প, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

শেরপাদেশে এই প্রথম হাসপাতালের পত্তন এইখানেই কুনডে গ্রামে।

গ্রাম থেকে অল্প দূরে সমতলভূমির উপর দু-তিনখানা পাথরের লম্বা ঘর ওঠে দেখি। কাজ করে শেরপা মেয়েপুরুষ।

হিলারীর স্বদেশবাসী সঙ্গীরাও ইতিমধ্যে এসে যান। চারদিকে কর্মব্যস্ততা। ছেনি দিয়ে পাথর কাটা, পিঠে করে বড় বড় পাথব বয়ে আনা, পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে দেওয়াল তোলা,—পাহাড়ী নদীর স্রোতধারার মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজ চলে। কর্তব্যকরণের গুরুভারের গুরুগম্ভীব পরিবেশ নয়। কাজের মধ্যেও হাসিখুশী, গানের উচ্ছ্বাস। কর্মনিষ্ঠার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ। সাহেবরাও কাজ করেন নিজের হাতে। ফিতা দিয়ে মাপজোখ করেন, পাথরও তোলেন। শেরপাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজে মেতে থাকেন। কিং-এর পরিচয় পেয়েছি নিউজিল্যাণ্ডের নাম-করা চিত্রশিল্পী বলে। তিনিও দেখি ছেনি হাতে লেগে যান পাথর ভাঙতে। ডাক্তার পিউও আছেন। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, এখন হাতুড়ি পিটে কনট্রাকটারি করছি, পরে এখানেই ডাক্তারি করব,—তবে হাতুড়িয়া ডাক্তারি নয়।

নয়, তা জানি। মনে মনে শ্রদ্ধা জানাই। নিজের দেশ ছেড়ে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এ জলাঞ্জলি দিয়ে চলে আসেন কোন্ সুদূর দুর্গম এই হিমালয়ে,—সভ্য জগতের বহুবিধ সুখ-সুবিধা আরাম-বিলাস পিছনে হেলায় ফেলে রেখে—অজানা কোন্ কীসের টানে, কে জানে? এ-কি জনহিতৈষণা, অথবা, হিমালয়েরই অমোঘ আকর্ষণ?

পাথরের দেওয়ালের গাঁথনি দেখিয়ে হিলারী বলেন, দেখেছেন, কি সুন্দর কাজ এই শেরপাদের হাতের? পাথরে পাথরে কোন জোড় দেবার মালমশলাই এরা ব্যবহার করে না,—পাবেই বা কোথায়?

দেখি, ঠিক তাই-ই বটে। এ-যেন 'বিনিসুতোর মালা গাঁথা'। পাশাপাশি পাথর রেখে তার উপরে পাথর শুধু সাজিয়ে রাখা।

নিখুঁত ভাবে পাথরগুলো বাছা। দরকার মতো এ-পাশে ও-পাশে একটু হয়ত ছেনি দিয়ে কাটা। পাথরে-পাথরে কোথাও সামান্য একটু ফাঁক থাকলে ছোট ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে গোঁজা। পাথরগুলো সাজাবার পর দেওয়ালে কোথাও একটু ফাঁক বা ফুটা থাকে না। অদ্ভুত এদের পাথর বেছে নেবার

চোখ। পাহাড়ের চারদিকে ছড়ানো পাথরের রাশি। সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়, চকিতে তুলে আনে ঠিক যে-আকারের পাথরটি মানানসই। এ-যেন নিপুণ শিল্পীর চিত্র অঙ্কন। রঙের প্যালেট্ থেকে তুলি দিয়ে তুলে দেওয়া ঠিক যে-রঙটির প্রয়োজন।

ভাবি, গৃহরচনা জীবজাতির স্বভাবজাত গুণ। কী সুন্দর বাসা বাঁধে পাখিরাও। খড়কুটি দিয়ে বাবুই পাখির বাসা,—সে তো পাকা আর্টিস্টের গড়া শিল্পকলা।

শেরপাদেরও দেখি তাই।

হিলারীদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি। বলি, আবার দেখা হবে পরে।

হাসপাতালের বাড়ির একটু দূরে—মাঠের শেষে—পাশের পাহাড়ের পায়ের কাছে একটা ত্রিপলের ছাউনি। সেখানে কয়েকটি শেরপা ছেলেমেয়ের জটলা দেখে এগিয়ে যাই। ত্রিপলের নিচে পলিথিন্ সীট্ দিয়ে তৈরী প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা,—reservoir। পাহাড়ের উপরদেশে বরফ গলে ঝরনা নামে, সেই জলধারার মুখে সুদীর্ঘ Alkathene plastic পাইপ বসিয়ে দূরে থেকে এখানে জল সরবরাহ হয়। গ্রামের লোকের জলাভাব মেটে। গৃহপালিত পশুদেরও তৃষ্ণার জলের সংস্থান হয়। কিন্তু সেই একই চৌবাচ্চায় নয়। উপচে-পড়া জল একটু দূরে মাটিতে একটা বড় গর্তের ভিতর সঞ্চিত থাকে, সেইখানে কয়টা চমরী ও ইয়ক্ পান করে দেখি। পশুগুলো যেমন দেখতে কদাকার, স্থানটিও তেমনি কাদা-ভরা নোংরা। মাঝে মাঝে জানোয়ারগুলো মুখ তুলে ডাক ছাড়ে, চমকে উঠতে হয়,—বাঘের ডাকের মতন হুঙ্কার। শুনেছি জন্তুগুলো নিরীহ, তবুও কাছে যেতে ভরসা হয় না। এ-যেন বিষহীন সাপ জানলেও হাতে ধরতে সাহসে কুলোয় না।

চৌবাচ্চার জল নির্মল। ছেলেমেয়ের দল এসেছে জল নিতে। কাঠ, পিতল বা তামার বড় বড় ঘড়া,—পিঠে ঝুলিয়ে আনে। আমাকে দেখে আর জল নেওয়া হয় না। বেশভূষা পরিচ্ছন্ন। হয়ত হিলারীর শিক্ষাবিস্তারের ফল। লাল টক্‌টকে সুগোল আপেলের মতো গাল। গালে টোল খাইয়ে হাসে। চোখ পিটপিট করে দেখে। পরস্পর গায়ে গায়ে হেলাহেলি করে। অবোধ্য ভাষায় কি সব বলে। দুজন হঠাৎ 'নমস্তে' 'নমস্তে' বলে হাসিমুখে দু হাত জোড় করে। অমনি আর সবাইও তাই শুরু করে দেয়।

সবই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। মনে হয় আট-ন' বছর বয়স। কিন্তু ঘড়া বয় নিজেদের চেয়ে বোধ করি দ্বিগুণ ভারী। নিয়ে চলেও মাথা নুইয়ে পিঠে করে আক্লেশে। থপ্ থপ্ করে কাঁচা পা ফেলে।

কুন্‌ডেতে থাকা-কালে পরে দেখি, শেরপা ছেলেমেয়েদের আশ্চর্য শিক্ষা! যেন, হাঁটতে শেখার পর থেকেই তারা সংসারের কাজে লেগে যায়। বয়স বাড়ে, কাজেরও দায়িত্ব বাড়ে। একটা ছোট ছেলে যে-পরিমাণ ও যে-ধরনের

কাজের ভার নেয় আমাদের দেশের জোয়ান পুরুষও তা পারে কিনা সন্দেহ। গিরমির কাছে শুনি, এদের বাপ-মা পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকেই ওদের দিয়ে শুধু সংসারের নানান্ কাজই করায়, তা নয়, ব্যবসাও করাতে শেখায়। হাতে টাকা দেয়, হিসাব চায় না। বলে, চলে যা· এই দিয়ে জিনিস কিনে বিক্রী করে যা লাভ করতে পারবি, তা তোর থাকবে।—এইভাবেই এরা পাকা ব্যবসাদার হয়ে ওঠে।

শুধু ছোট ছেলেমেয়েই নয়। বৃদ্ধ, বৃদ্ধারাও—যতদিন তাদের দেহে সামর্থ্য থাকে, সব কাজকর্মই করে। নেহাৎ অথর্ব না হলে বার্ধক্যের অজুহাতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না,—সংসারের বা ব্যবসার কাজ করে যায়। এর কারণও হয়ত স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই কাজ করার স্বভাব গড়ে ওঠে। তার উপর, নিদারুণ শীত-প্রধান দেশ। কাজকর্মে নিরত থাকায় শীতবোধ কম হয়। ওদিকে আবার, দুর্গম পাহাড়-পর্বতে ঘোরা-ফেরার পরিশ্রমে ও দুরন্ত হিমাঞ্চলের আবহাওয়ায় সুগঠিত শরীর,—সাধারণতঃ অনেক বয়স পর্যন্তই দেহ কর্মঠ থাকে। অতএব, ছোট ছেলেরও যেমন, অতিবৃদ্ধেরও তেমনি কঠোর পরিশ্রম করাই এখানকার রীতি। এই দেখেই বুঝতে পারি, কাঠমাণ্ডু থেকে আসবার পথে গিরমিকে যখন একদিন সগর্বে বলি যে, কমবয়সী তোমার সঙ্গে দম বেখে বৃদ্ধ বয়সের এই আমিও দেখ কেমন চলি মাইলের পর মাইল,—সে তখন অবাক হয়ে তাকায়, ভাবে, এতে আর আশ্চর্য কী,—বয়সের কথা ওঠেই বা কেন?

বয়সের তারতম্যই এরা বোঝে না, মানেও না। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সবারই এক বৈঠকে মেলামেশা, হাসিঠাট্টা, গল্প। যেন, জন্মমৃত্যুর মাঝখানে সবাই সমবয়সী। গিরমির দিদির বাড়িতে থাকতে নজর করি, নেহাৎ কোলের শিশুকে বাদে, ছোট ছেলেমেয়েকে কেউ কোন আদর পর্যন্তও করে না। বাচ্চারাও সে-বিষয়ে এমনি সজাগ ও ভারিক্কে যে তারাও এসব চায় না।

মনে পড়ে যায়, ঋষি টলস্টয়ের School boys and art প্রবন্ধের কথা। রুশ কৃষক বালকবালিকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন: "Every one who knows anything of Russian peasant children knows that they are not accustomed to and cannot bear any caresses, affectionate words, kisses, hand-touchings, and so forth,··· Boys of five are already above such caresses—they are no longer babies."

ভাবি, এ-যেন অবিকল শেরপা ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেই লেখা। জানি না, একই রকম প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এই সাদৃশ্যের কারণ কিনা?

আবার হঠাৎ একটা অদ্ভুত মিলও একদিন কানে বাজে। গিরমির দিদি একমুখ হাসি নিয়ে একটা ডিসে কী এনে খেতে দেন। বলেন, সিরি—Siri।

বুঝতে পারি না দেখে পদার্থটা কী। গিরমিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি। শুনি, cheese—পনির। তখন মনে পড়ে, রুশ ভাষাতেও একে Sir—সির

বলে, কোথায় যেন পড়েছি।

সুদূর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জাতির ভাষার ও আচার-ব্যবহারের আকস্মিক সাদৃশ্য প্রকৃতই অতি রহস্যময়।

কদিন কাটে গিরমির দিদির আদর-যত্নের স্নিগ্ধ ছায়াতলে। আমি যে তাঁদের ঘরে অতিথি সে অনুভূতিই থাকে না। যেন, একান্ত আপনজন, ঘরেরই একজন। যদিও কথোপকথনের উপায় থাকে না। ভাষার অন্তরায়। শুধু হাসির আদান-প্রদান। কেবল তাঁরই সঙ্গে নয়। অপর আরও যাঁরা আসেন তাঁদের ঘরে, সবারই সঙ্গে। আসেনও এখানে অনেকেই। এ যেন উন্মুক্ত-দ্বার ক্লাব-হাউস। রাবণের চিতার মতো উনুনে আগুন জ্বলে। সারাক্ষণই চায়ের জল ফোটে। রাত্রে মেঝের উপর সারি সারি বিছানা পড়ে। গৃহবাসীরা গভীর নিদ্রা যান। বিশাল কক্ষও নীরব, নিস্তব্ধ হয়। শুধু সেই মাঝরাতের ঘণ্টা চার-পাঁচ অগ্নিদেবেরও বিরামের অবসর আসে। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে আর নিদ্রা জোটে না। মিট্‌মিট্ করে তাকাতে থাকেন। ভোরে আবার চোঙের মধ্যে দিয়ে গৃহিণীর মুখ-নিঃসৃত ফুৎকার পেতেই দপ্ করে জ্বলন্ত শিখা তোলেন। তখন আবার শুরু হয় টগবগ করে জল ফোটা। কাঠের চোঙের মধ্যে লম্বা হাতল বা ডাণ্ডা ঘুরিয়ে চায়ের জলের সঙ্গে মাখন ও লবণ ঘুলানো। সুন্দর নক্‌শা-তোলা রুপার কেট্‌লিতে সেইভাবে তৈরি চা ঢালা। চীনা পোর্সেলিনের ড্রাগন-মূর্তি-চিত্রিত রঙিন পেয়ালায় সেই পানীয় পরিবেশন। কাপের পর কাপ। সবাই পান করেই চলে। যে-কেউ আসে তার হাতে তখনি কাপের শোভা ফোটে। কিন্তু, অবাক হয়ে দেখি, পেয়ালার অতো চাকচিক্য, পরিচ্ছন্নতা, অথচ, পান করার প্রথা বিচিত্র। পরস্পরের হাতে হাতে পেয়ালাগুলি ঘোরে। একজন চুমুক দিয়ে খানিক খেয়ে অপরের হাতে তুলে দেয়, সে বাকিটুকু নিঃশেষ করে। দেখতেও আমার কেমন লাগে। এইভাবে চা-পান হরদমই চলে। কোন এক বইয়ে একসময়ে পড়ি, জগতে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে চা পান করে তিব্বতীরা। এক-একজন দিনে গড়পরতা ৬৫ কাপ! এদের দেখে মনে হয়, এরা তিব্বতীর বংশধরই বটে।

শুধু চা-ই পরিবেশন হয় না। নেশার Chang—ছাং-ও। শুনেছি, ওটা নাকি বিলাতী beer-এর মতন। অনুগ্র সুরা। ওতে নেশা জমে না। ভাত চোলাই করা মদ। তীব্র সুরা হোল Rakshi—রাখশি। তারও মাঝে মাঝে বিতরণ চলে, দেখে বুঝতে পারি কারও কারও বিজড়িত হাবভাব, আচরণে।

Tsampa—শম্পাও চলে। সেটা পানীয় নয়। খাদ্য। যব-চূর্ণ অর্থাৎ বার্লির ছাতু সিদ্ধ করে রান্না। চায়ের সঙ্গে মেখে খায়। শুনি, উপাদেয় খাদ্য। তবুও খেতে ভরসা হয় না। কি জানি, বঙ্গসন্তানের পেটে সহ্য হবে কিনা। তাছাড়া, মাংস-টাংস কিছু মেশায় কিনা তারই বা ঠিক কী!

তবে, নিরীহ এক খাদ্যও আছে। উনুনে পোড়ে আলুর পর আলু। যাকে বলে, ঝুড়ি ঝুড়ি। পাশেই লোহার চিমটে রাখা। তুলে নিয়ে আলু

সরিয়ে নাও। খোসা ছাড়াও। ঐ রয়েছে প্লেট-ভর্তি নুন-লঙ্কাগুঁড়ো। মাখাও আর খাও। সবাই অনবরত খেয়েই চলে! দেখে মনে হয় আলু খেয়েই ওদের পেট ভরে। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ীকে ঘুরতে দেখি—ঘরে মাঠে পথে—সর্বত্রই কোঁচড়-ভরা সিদ্ধ বা পোড়া আলু। বার করে খোসা ছাড়ায়, আর মুখে পোরে। সময় অসময় নেই, যেমন চায়ের, তেমনি আলুর। শুনি, আলুর ক্ষেত গ্রামের প্রায় সকলেরই আছে। খুম্বুর পাহাড়ী জমি বালুময়। তাই আলুর ফলনও প্রচুর। অথচ, এই আলুর চাষ মাত্র গত শতাব্দীতে এখানে প্রথম চালু হয়। সম্ভবতঃ দার্জিলিঙ-ফেরত শেরপারা সেখানকার চা-বাগানের প্লানটার সাহেবদের আলুর ক্ষেত দেখে এখানে এনে চাষ শুরু করে। তার আগে শেরপাদের এখানে প্রধান খাদ্য কি ছিল জানা নেই। সামান্য যা buck wheat জন্মাত, তাতেই হয়ত চালাত। তবে কেউ কেউ মনে করেন, সে-সময়ে খুম্বুতে লোকসংখ্যা ছিল অতি সামান্য। আলুর প্রচলন হবার পর লোকের বসতি বাড়তে থাকে। ১৮৩৬ সালে সারা খুম্বুতে ১৬৯ ঘর লোকের বাস ছিল, আর এখন পাঁচশোর উপর।

আলু যে কী পরিমাণে খায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন এক বিবৃতিতে পড়ি,—১৯৫৭ সালে সাতজন লোকের এক পরিবারে এক বছরে ছ হাজার পাউণ্ড আলুর ব্যবহার হয়।

শুনি, আয়ারল্যাণ্ডেও আলুই প্রধান খাদ্য, খুম্বু-অঞ্চলেও দেখি তাই।

আমি কিন্তু এ-সবেরই নির্বাক নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা। বিছানায় বসে বা শুয়ে শুয়ে দেখি। গিরমিকে আগে থাকতেই বলা আছে আমি আমার গতানুগতিক প্রথায় তৈরী চা, কফি খাব, ক্বচিৎ কখনও তোমাদের তিব্বতী চায়েরও ভাগ নেব। কিন্তু, আশ্চর্য মানুষের রসনা! দুদিন পরে সেই মাখন-লবণ মেশানো বিচিত্র চা মুখে আর বিস্বাদ লাগে না! গিরমির দিদি হাসতে হাসতে যখন-তখন দিয়ে যান। গরম গরম আলু পোড়াও। ডিস্-ভর্তি। তাঁদের লঙ্কালংকৃত লবণ নিই না। তিনিও কোন জোর করেন না। হেসে ফেরত নিয়ে যান। গিরমি আলাদা নুন আনে। আমার রান্নার বিষয়েও গিরমিকে সতর্ক করেছি, তোমাদের খাদ্য কোন কিছু চলবে না—ঐ এক আলু ছাড়া। পথে যেমন কদিন করে দিয়েছ, এখানেও সেইমতই হবে।

সে করে এনে দেয়ও তাই। চমৎকার সময় ও কর্তব্যজ্ঞান। অবশ্য যতক্ষণ জ্ঞান থাকে। কেন না, দেখছি, মাঝে মাঝে একটু বেহুঁশ হয়। জানি, তার এই সাময়িক অবনতির জন্য তার বিশেষ অপরাধ নেই। এখানকার সামাজিক প্রথার কবলে পড়েই ঘটে। দেশে ফিরেছে, বন্ধু-বান্ধবের ঘরে ঘরে যাবেই, রাখশি পানও চলবেই। তখন না-খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ, ঘোরতর অশিষ্টতা। একদিন তো সারাবেলা বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল সামনের মাঠে রোদের মধ্যে,—কম্বল মুড়ি দিয়ে। সেই ফিটফাট, কায়দা-দুরস্ত, সদা-কর্তব্যরত গিরমি কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে—যেন এক জড় পদার্থ। দিদি এসে নাড়া দিল

ডাকাডাকি করেন খেতে যাবার জন্যে। সাড়া দেবে কে? সে তখন ভিন্ন জগতে। দিদি হাসতে হাসতে ফিরে যান। আমার রান্নার ব্যবস্থাও সেদিন তিনিই করেন। তাঁর জানাই আছে, ভাই কিভাবে করে দেয়।

হল্‌-এর একপাশে বিছানায় বসে কম্বল গায়ে তাঁদের জমাট আসর দেখি। অনর্গল হাসি, রঙ্গব্যঙ্গ, গল্পের ঢেউ। অমন প্রাণখোলা অন্তরঙ্গ মেলামেশা, আনন্দ উচ্ছ্বাস আর কোথাও দেখি নি। শেরপা গার্হস্থ্য-জীবনের এই এক নিজস্ব সম্পদ। যেন পার্বত্য নদীর উচ্ছলিত তরঙ্গমালা। অথচ, কেউই অলস ভাবে সময়ের অপচয় করে না। গৃহস্থালির কাজকর্ম তো আছেই, ছেলেমেয়েদের ঘড়া-ভরা জল আনা, কাঠের বোঝা এনে রাখা, তাও চলেছে। আর লোম থেকে পশম বানানো,--এ তো মেয়েপুরুষ প্রায় সব সময়েই করে। পথ চলতে,--এমন কি ঘরে বসে কাজের ফাঁকে গল্প গুজব করতেও হাতে বোনার কাজ বন্ধ থাকে না। সুতো বা পশম থেকে কাপড়, কম্বল ইত্যাদি তৈরি করার তাঁত প্রায় ঘরে ঘরেই থাকে। মেয়েরাই তাঁতে বোনে। নিজেদের কাপড়চোপড় তো বটেই, বাড়তি মাল বিক্রীও করে। নানান্ বর্ণের সূচীশিল্পের কারুকার্যও তাতে থাকে।

একদিন দেখি, এক নবাগত শেরপা এসে ঘরের একধারে বসে একমনে কি যেন সেলাই করে। গিরমিকে প্রশ্ন করে জানি, লোকটির দরজিগিরি পেশা। এসেছে একটা বিশেষ সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতে। গিরমি তখনি আবার জানায়, এখানে দরজির ব্যবসায়ের তেমন প্রচলন নেই। নেহাৎ প্রয়োজন হলে এইভাবে লোক পাওয়া যায়।—তারপর বলে, শুধু দরজি কেন? খুম্বুর শেরপা সমাজে হাতের কারিগরির লোকের—craftsman-এর বেশি প্রচলন নেই। তার কারণ, আমাদের সে-সব কাজের জন্যে প্রযোজন থাকে কমই। যেটুকু হয়ও, নিজেরাই করে নিই। সেলাই, বোনা,—এসব কাজ তো আমাদের ঘরে ঘরে চলেছেই, দেখছেন। কাঠের কাজও আমরা নিজের হাতে করতে পারি। তবে, মিস্ত্রীও এখন পেশাদার কেউ কেউ হচ্ছে। বাড়ি তৈরির কাজে, বাক্স, আসবাবপত্র ইত্যাদি বানাতেও তাদের আজকাল ডাক পড়ছে। আগে এ-সব মোটেই ছিল না। মুচির কাজও তেমনি। এই ঠাণ্ডা দেশে জুতোর ব্যবহার এড়াবার উপায় থাকে না। চামড়ার জুতো তৈরি করবার জন্য এক শ্রেণীর লোক আছে বটে, কিন্তু আপনাদের দেশের চর্মকারের মতন তারা এখানে জাতে নিচু নয়। দরকার হলে জুতো তৈরি করে দেয়,—ঐ পর্যন্তই। সমাজে তাদের অন্যান্যের মতো একই স্থান। জুতো ছিঁড়ে গেল সেলাই করতে হবে, বা নতুন সুখতলা লাগনোর দরকার,—যার জুতো সে নিজেই বসে যায় করতে। যত ধনী বা মানী লোকই হোক না সে কেন,—এ কাজের মধ্যে কোন হীনতাবোধই থাকে না।

জিজ্ঞাসা করি, অনেকের পায়ে দড়ির বা নানা রঙে রঙিন কাপড় বা উলের এক ধরনের বুটের মত লম্বা শৌখিন জুতোও যে দেখি, সেগুলোও কি তোমরা

ঘরে তৈরি করো ?

গিরমি বলে, নাঃ—ওগুলো প্রায়ই আমদানি হয় তিব্বত থেকে।—কিন্তু যে কথাটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম,—আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মহৎ গুণ হলো,—এই সব শ্রেণীর কারিগরদের,—এমন কি মুচিদের পর্যন্ত আমরা সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলেই স্বীকার করে নিই, কাজের ধারা বিচার করে তাদের মধ্যে উঁচু-নিচুর প্রশ্ন তুলি না। যে-লোক মঠের দেওয়ালে বা পাথরের গায়ে 'ওঁ মণি পদ্মে হুঁ' মন্ত্র খোদাই করে, তার সঙ্গে মানুষ হিসাবে একটা চর্মকারেরও কোনও প্রভেদ নেই।

দেখি, ঠিক তাই-ই বটে। সেলাইয়ের কাজ শেষ হলে সেই দরজি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মেলে মেশে, একসঙ্গে বসে ছাং ও আলুপোড়া খায়। হাসি-ঠাট্টা চালায়—মেয়েদেরও সঙ্গে।

বেশ লাগে বসে বসে দেখতে। মনে হয়, সাজানো রঙ্গমঞ্চে অজানা বিদেশী ভাষায় নাট্যলীলা দেখি। পিছনে সুদৃশ্য তার পটভূমি, মানব-শিল্পীর হাতে আঁকা নিষ্প্রাণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণ নয়, জানলার ফ্রেমে ঘেরা বিশ্বস্রষ্টার হাতে গড়া সাক্ষাৎ তুষার-শৈলশিখর। রৌদ্রদীপ্ত, জ্যোতির্ময়।

বাইরে রোদ দেখলেই ঘর ছেড়ে বার হই। গ্রামের পথে পথে ঘুরি। লোকালয় ছাড়িয়ে পাহাড়ের কোলে নিভৃতে রোদে কোথাও বসি। কিন্তু বেশি-ক্ষণ বসা চলে না। সূর্যদেবের কিরণদানে কাপর্ণ্য প্রকাশ পায়। চারটে বাজবার আগেই সন্ধ্যার ছায়া নামে। হিমশীতল তীক্ষ্ন বায়ু যেন জামার আস্তরণ ভেদ করে গায়ে হুল ফোটায়। আবার গৃহগহ্বরে প্রবেশ করি। শয্যায় আশ্রয় নিই। কিন্তু তার অনেকক্ষণ পরে অর্ধ-অন্ধকার ঘরে হঠাৎ যেন রক্তিম আলোর আভা ফুটে ওঠে। জানলার ফাঁক দিয়ে তখন দেখা যায়, কাংচেগার বরফের চূড়ার উপর দিবাকরের দিনশেষের বিদায়-আয়োজন চলেছে। তাড়াতাড়ি নেমে বেরিয়ে আসি বাইরে। অবর্ণনীয় সে-দৃশ্য। শুধু কাংচেগার উপরেই নয়। দিকে দিকে তুষারগিরির চূড়ায় চূড়ায় কারা যেন থরে থরে রাঙা জবার ডালি সাজায়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। আকাশে যেন স্বর্গের স্বর্ণপ্রাসাদ, ইন্দ্রের নন্দনকানন দেখি। অচিরে ক্ষণিকের মায়াঘোর কাটে। রক্তিম আভা বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়। পাহাড়ের মাথায় সন্ধ্যার স্বচ্ছ নীলাভ আঁধার ঘনায়। যেন আকাশব্যাপী মানস সরোবরের তীরে পিঙ্গল-জটাজুট উন্নতশির ঋষিরা সব ধ্যানে বসেন।

প্রণাম করে ফিরে আসি আপন ঘরে।

রাত হলেই ঘরের ভিতর সব চুপচাপ। যে-যার শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই একই হল-ঘরে। কে কোথায় শোয় না-শোয় জানি না। জানি শুধু নিজের অসহ্য শীতের কাঁপুনি, আর মনে হয়, যেন অনন্ত-দীর্ঘ-রাত। গাঢ় ঘুম জমতেই চায় না। আরও ব্যাঘাত জাগায়, রোজই মাঝরাতে বাড়ির

বাইরে হৈ-হল্লা, হাসি-গান। ছেলেমেয়েদের অনর্গল উচ্ছল কলতান। অনেকক্ষণ চলতেই থাকে। এ-যেন শহরে রাতদুপুরে, একই সময়ে রোজ, থিয়েটার-সিনেমা দেখে স্ফূর্তিবাজ লোকজনের, নিস্তব্ধ পথে উল্লসিত শব্দ তুলে, দলে দলে ঘরে ফেরা। ভাবি এখানে তো সভ্য জগতের সে-সব প্রাণ-মাতানো আকর্ষণ নেই। এত রাত্রে অমন শীতে লোকগুলো রোজই করে কী? মাতলামির জড়িত কণ্ঠস্বর নয়,—খিলখিল হাসি, যেন আহ্লাদে আটখানা। ব্যাপার কী,—ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়েও পড়ি।

বাড়ির সামনেই এ-বাড়ির আলুর ক্ষেত। আলু এখন ঘরে তোলা হয়েছে। কাঁকর-বালিভরা খালি-মাঠ। তবুও দু-চারটে আলু এধারে-ওধারে পড়েও থাকে। সেই পাঁচিল-ঘেরা শুকনো মাঠে কম্বল বিছিয়ে কখনও ব রোদ পোয়াই। শীতের দেশে এও এক পরম উপভোগ্য বিলাস। এখানেও একদিন এক নাটকীয় কমেডি!

চোখ বুজে আরামে শুয়ে আছি। চারিদিকের বরফের পাহাড়ে রৌদ্র প্রতি-ফলিত হয়ে আমার অলস দেহে যেন তার তপ্ত-মধুর হাতের পরশ বুলায়। মন উড়ে গেছে কোন্‌খানে, কি জানি। হঠাৎ কার স্বর শুনে চমকে উঠি,—গুড মর্নিং ডক্টর!

কে বাবা? ডক্টর আবার কে?—তাকিয়ে দেখি। পাঁচিলের অপর দিক থেকে মাথা উঁচু করে সুশ্রী হাসিখুশি একটি মুখ। মাথায় টুপি,—বোলার ফেল্‌ট্‌ হ্যাট্‌। তড়াক করে পাঁচিল টপকিয়ে এপাশে নামে। স্পোর্টসম্যান প্রমাণ পাই। এগিয়ে আসতে আসতে বলে,—আবার দেখা হয়ে গেল, ডক্টর। হাউ-ডু-ইউ-ডু?

শেরপা যুবা। সাহেবী বেশভূষা। ফিটফাট। ইংরেজিতেই কথা বলে। কিন্তু লোকটি কে? ভাবতে থাকি, কোথাও দেখেছি নাকি আগে? দেখেছি নিশ্চয়। নাহলে ওই বা দেখেই চিনবে কেন? মনে মনে হাসি পায়। এ এক বয়সের পরিণতি আমার। চেনা লোকের আজকাল প্রায়ই নাম ভুলে যাই; কিন্তু মুখ তো এখনও ঠিকই মনে থাকে। এর সঙ্গে কোথায় আলাপ? 'ডক্টর'-ই বা বলে কেন?

যুবকটি আমার মুখের ভাবে মনের কথা বুঝতে পারে। নিজেই বলে, চিনতে পারছেন না? আমি থামি-স্কুলের টিচার। সেই সেবার আলাপ হলো থামিতে। ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? এলেন কবে এদিকে আবার?

হেসে বলি, শেরপাদের শিক্ষক যখন, আলাপে নিশ্চয় আনন্দ দেবে। কিন্তু ঠিক ভুল হচ্ছে কোথাও,—থামিতে আমি তো কখনও যাই নি। এখানেও আসা,—এই প্রথম।

সে অবাক হয়। আমার মুখের ও দেহের দিকে ভাল করে তাকায়। তারপর হেসে বলে, ভুল হবে আমার কেমন করে? পরিষ্কার চিনেছি আপনাকে। অস্বীকার করলে কি হবে? ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়। আপনি ডক্টর ব্যানার্জী।

এই তো মাস দুই আগে থামিতে দেখা।

তার ভ্রান্তি ভাঙি, আমি ব্যানার্জি নই, মুখার্জি। ডাক্তার ব্যানার্জি আমার বিশেষ বন্ধু বটে। আমরা কি দেখতে অনেকটা একই রকম? আর কারও মুখে এ-কথা শুনি নি তো?

সে আশ্চর্য হয়ে বলে, চেহারার কথা মনে নেই, বলতে পারি না। কিন্তু আপনার গায়ে এটা তো ডক্টর ব্যানার্জিরই সোয়েটার। এমন প্যাটার্নের রঙচঙে সোয়েটার আর কোথাও কারও গায়ে দেখি নি। এ কি একবার দেখলে কখনও ভোলা যায়?

তখন সানন্দে স্বীকার করি, ভুলের তোমার যথেষ্ট কারণ আছে। ঠিকই চিনেছ,—আমাকে নয়, সোয়েটারকে। এটা ব্যানার্জির ট্যুরের নিত্য-সাথী। আসার সময় জোর করেই আমার সঙ্গে দিলেন।

তখন দুজনেই প্রাণ খুলে হাসি।

ভাবি, মানুষের সঙ্গে ক্ষণিক পরিচয়, পরস্পরকে মনে-রাখা,—কতো নগণ্য সাময়িক নিদর্শনের সূত্রেও ঝোলে;—আকার গঠন, এমন কি, নাম পর্যন্তও হয়ত হারিয়ে যায়, তবুও স্মৃতির মাধুর্য কোথায় যেন অলক্ষ্যে লুকিয়ে থাকে।

আলাপ হয় যুবকটির সঙ্গে। ভ্রান্তি-বিলাসের মাঝে পরিচয়, তাই আলাপন সহজেই জমে। চমৎকার গল্পে মানুষ। বুদ্ধিমান। ভদ্র। শিক্ষিত। থামিরই বাসিন্দা। কাঠমাণ্ডুতে থেকে লেখাপড়া শেখা। হিলারীরই হাতে গড়া ছেলে। বলে, তাঁর আদর্শ,—শেরপা গ্রামে গ্রামে যে সব স্কুল খুলেছেন, স্থানীয় ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনিয়ে এ-সব অঞ্চলে ওদের শিক্ষকতার ব্রতে লাগিয়ে দেওয়া।

অনেক কিছুই গল্প হয় তার সঙ্গে। শেরপাদের জীবনযাপনের ধারা, তাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মমত ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছুই জানতে পারি তার কাছে।

বলে, জানেনই তো শেরপাদের পূর্বপুরুষ তিব্বতী। যতদূর জানি, ১৮৫৬ সালেও এই অঞ্চল তিব্বত বলে গণ্য হতো। সেই সময়ে কাঠমাণ্ডুর গুরখারা এসে এটা নেপাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আমরা অবশ্য যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম। ভাষায় ও ধর্মমতে সেই তিব্বতীয়। কোথায় সেই সুদূর নেপাল-রাজধানী কাঠমাণ্ডু, মাঝখানে মাথা তুলে হিমালয়ের দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণী,—না ছিল তখন যাতায়াতের সহজ পথ বা নেপাল-সরকারের সঙ্গে কোন যোগসূত্র, কিংবা, নেপালী সভ্যতার সঙ্গে কোন যোগাযোগ। নামেই শুধু হলাম নেপালবাসী। বছর ত্রিশ চল্লিশ আগে পর্যন্ত বিশেষ করে এই খুম্বু-অঞ্চলের শেরপাদের তেমনি একান্তে বিচ্ছিন্ন ভাবেই দিন কাটছিল। পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু যে পাহাড়—মাউন্ট এভারেস্ট,—তিব্বতী নামটা জানেন তো?—চোমোলুংমা—Chomolungma—যার অর্থ ইংরেজিতে দাঁড়ায়—Goddess Mother of the world—কী সুন্দর

মনে মনে অনুরণন ওঠে,—দেবী জগজ্জননী। বলি, সত্যিই অতি অপরূপ মধুর নাম। তিব্বতীদের কাব্যবোধ আছে। জগতের এই সর্বোচ্চ চুড়া, জানত নাকি তারা? নেপালীরা এখন শুনি নতুন নামকরণ করেছে—সাগরমাথা!

সে মুচকে হাসে। বলে, শুনুন। সেই বিশ্বজননীর কোলে আমাদের বাস। এটা আমাদের যেমন গর্বের কারণ, তেমনি আমাদের চরিত্রগঠনের সহায়কও। তিব্বতের সঙ্গে আমাদের জন্মগত সম্পর্ক। আমরা যে তিব্বতী আচার ও লামা-ধর্ম মানি ও তিব্বতী ভাষা ব্যবহার করি, আশ্চর্য কী? এই আমাদের চেহারাই দেখুন না। খাঁটি নেপালীদের মতনই নয়। মঙ্গোলীয়। আকারেও ঝাড়ালো গড়ন, লম্বা-চওড়া।

শুনে মন্তব্য করি, নেপালে এখন বহু জাতি ও বর্ণের সংমিশ্রণ হয়ে গেছে। ওখানকার আদিবাসীরা, শুনেছি, কারো কারো মতে, ছিল Negroid। তারপর ক্রমে-ক্রমে দ্রাবিড়, আর্য ও মঙ্গোলীয় জাতির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে। এখন নাকি প্রধানতঃ ইন্দো-নেপালী ও তিব্বতীয়-নেপালী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তাদের ভাষা এবং দেহের আকার—বিশেষতঃ চোখের গঠন দেখলে ধরতে পারা যায়। তোমরাও সেই অর্থে তিব্বতীয়-নেপালী।

সে বলে, কথাটা খানিক ঠিকও বটে, আবার ঠিকও নয়। কথাটা তুললেনই যখন, তখন খানিকটা বুঝিয়েই বলি। আমাদের পূর্বপুরুষরা তিব্বত থেকে, অর্থাৎ হিমালয়ের অপর দিক থেকে, নেমে এসে সোলু-খুম্বুতে বসবাস শুরু করে এবং শেরপা জাতি নামে পরিচিত হয়, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু, ঠিক কতো শত বৎসর আগে তাদের এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ এবং কোন্ পথ দিয়েই বা নেমে-আসা, তার নিশ্চয়তা নেই। সাধারণ ধারণা, তারা এভারেস্টের উত্তরে তিব্বতের Tingri জেলা-অঞ্চল থেকে নাংপা-পাস্ হয়ে এদিকে আসে। এবার একটা মজার কথা জানাই, এই যে তাদের নিয়ে এক নতুন জাতির উদ্ভব হল, তারা কিন্তু গত দু-এক পুরুষের মধ্যে যারা তিব্বত থেকে এ-অঞ্চলে চলে আসে, তাদের শেরপা নাম নিতে দেয় নি। তাদের বলা হয়, খাম্বা বা খাম্পা। জাতি-হিসাবে পৃথক করলেও তারা ক্রমে শেরপা-সমাজে প্রায় সমান স্থানই পেতে চলেছে। গণ্যমান্য পদও এখন দখল করে। শেরপাদের সঙ্গে বিবাহাদিও হচ্ছে। বাইরের লোকের চোখে তাদের সঙ্গে আসল শেরপাদের পার্থক্য ধরা পড়ে না—

বাধা দিয়ে বলি, আমি কিন্তু যতোটুকু দেখেছি, তিব্বতী বা খাম্বাদের তোমাদের চেয়েও দশাসই গড়ন, দেখতেও কি রকম কাটখোট্টা, বুনো-বুনো ধরনের,—ইংরেজিতে যাকে বলে fierce-looking,—বেশভূষা, হাবভাবও সেই রকমই জংলী।

সঙ্গী আমার হেসে ওঠে। বলে, দেখেছেন অনেকটা ঠিকই। আমরাও হয়ত প্রথম যখন এদিকে আসি ঐরকমই ছিলাম। তারপর কয় পুরুষের মধ্যে এখন অনেকটা নানান্ ব্যাপারে সভ্যভব্য হয়েছি। আমাদের মুখে তিব্বতী

ভাষাও গেছে বদলে, ওরা সব সময়ে সে-ভাষা বুঝতে পারে না। কিন্তু, এই হালে-আসা তিব্বতীরাও এখন অনেকেই সুসভ্য হয়েছেন, নিজগুণে পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। যেমন ধরুন,—শুনে চমকে উঠবেন না—বিশ্ববিখ্যাত মাউন্ট এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং। যাঁকে নিয়ে আমরা শের্‌পা-কুল-চূড়ামণি বলে গৌরব প্রকাশ করি এবং যাঁর জন্যেই সারাজগতে "শের্‌পা" নামের এমন বিপুল প্রচার,—তিনি নিজেই খাঁটি শের্‌পা নন। তাঁর মাতাপিতা তিব্বত থেকে এসে এই খুম্বুতে বাস শুরু করেন,—অতএব এঁরা প্রকৃতপক্ষে খাম্বা। আরও একটা উদাহরণ দিই। থিয়াংবোচি মঠের প্রসিদ্ধ প্রধান লামা—

আগ্রহের সঙ্গে তখনি জানাই, কাঠমাণ্ডু থেকে এখানে আসবার পথে সেই মহাপুরুষের দর্শন পেলাম যে,—

সঙ্গী বলে, মহাপুরুষ তো বটেই, কিন্তু তাঁর শরীর খাম্বা বংশের। থিয়াংবোচির প্রতিষ্ঠাতা—গুলু লামা যখন দেহরক্ষা করেন, তখন এঁরই দেহে পুনর্জন্ম নেন,—সে-সব কাহিনী, 'থিয়াংবোচি যখন' তো?—সেইখানে শুনবেন। এখন যা বলছিলাম, খাম্বা-বংশে এঁর জন্ম হলেও এখানকার এই সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে বাধা তো হয়ই নি, প্রভূত সম্মানের অধিকারীও হয়েছেন। এর প্রধান কারণ, শের্‌পা-সমাজে এই জাতিভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে আচার-ব্যবহারে তারতম্য প্রকাশ পায় না।

উৎসাহিত হয়ে বলি, সেদিন দেখেছি, মানুষের ব্যক্তিগত • পেশার অজুহাতেও তোমাদের সমাজে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদের বিষ ঢোকে নি। ছোটলোক বড়লোকের বিচ্ছেদও ঘটাও নি।

সে বলে, জাতিভেদ মোটেই নেই, এমন নয়। কিন্তু সে অতি সামান্য। যেমন ঐ খাম্বাদের কথা বলছিলাম, ওদের মধ্যে এক অতি নিম্নশ্রেণীর লোক আছে, তাদের খামেন্‌দিউ—Khamendeu বলা হয়। কথাটার অর্থ—অশুচি-মুখ—mouth-bad। শের্‌পাদের একটা প্রথা,—একই কাপে ভিন্ন ভিন্ন লোক পান করে—

বলি, এসেই ওটা আমি নজর করেছি। কিছু মনে করো না, আমাদের চোখে ওটা খারাপ লাগে—

সে স্বীকার করে, জানি, প্রথাটা অস্বাস্থ্যকর। তবুও ঐ-ই আমাদের সমাজে ঘরে-ঘরে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু খামেনদিউ-র সঙ্গে তা চলবে না। অথচ, না চললেও তাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করা, একসঙ্গে বসে খাওয়া, তাদের নিমন্ত্রণ করা, আবার তাদের ঘরে গিয়ে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করাতেও কোন বাধা বা দোষ নেই। শের্‌পাদের সামাজিক বিধি এমনি উদার।

প্রশ্ন করি, আচ্ছা, নেপালীরা দেখেছি, তিব্বত থেকে যারাই এসে নেপালে বাস করে, তাদের সবাইকে ভোট বা ভুটিয়া বলে। কারণও অবশ্য বোঝা যায়। নেপালী ভাষায় তিব্বতদেশের ভোট নামেই পরিচয়। সেদিক থেকে দেখলে শের্‌পা জাতি ভুটিয়া শ্রেণীরই সম্প্রদায়,—নয় কি?

সে বলে, তা বলতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ যাদের ঐ ভোট বা ভুটিয়া

বলা হয়, তাদের থেকে, ঐ জন্মগত সাদৃশ্যটুকু ছাড়া, আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনধারণের চালচলন, সামাজিক নিয়মকানুন—সব কিছুই আমাদের নিজস্ব, আমাদের ধ্যান-ধারণাও প্রয়োজনমত গড়ে তোলা। জানতে চান তো তার কিছু বলতে পারি।

আগ্রহ প্রকাশ করে বলি, নিশ্চয় শুনব। কিন্তু, তার আগে একটা কথা জানাই। কাঠমান্ডু থেকে এখানে আসবার পথে যেটুকু তোমাদের শেরপা-দেশ দেখবার সুযোগ হয়েছে এবং সামান্য যা লোকমুখে শুনে বা বই পড়ে জানতে পেরেছি, তাতে দেখি, তোমাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী আছে। বিভিন্ন স্থানে বসবাসের কারণেই হয়ত এটা ঘটেছে এবং তাদের জীবনধারার প্রণালীতেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নেপালের অন্যত্রও দু'একটা জায়গায়—যেমন মনে করো, গোসাঁইকুণ্ডের পথে হেলেম্বু বা হেলম্বু গ্রামে—ছোট ছোট শেরপা-বসতি বা পকেট্স্ আছে। তারা সম্ভবতঃ এই সোলু-খুম্বু থেকে কোন্ এক সময়ে ছিটকে বেরিয়ে গেছে, শেরপা নামটাও এখনও রেখেছে,—হয়ত তোমাদের সঙ্গে তাদের এখন বিবাহাদির আদান প্রদানও চলে। তাদের কথা বলছি না। সোলু-খুম্বুর শেরপাদের যা দেখেছি তাতে আমার এই ধারণা,—এভারেস্ট-এর ঠিক তলা থেকে শুরু করে পাহাড়ের তিনটে ভিন্ন স্তরে শেরপাদের বসবাসের তিনটে প্রধান কেন্দ্র। এ-যেন বলতে পার শহরের তিনতলা বাড়ির তিনটে তলায় তিন পরিবারের বাস। তাই তাদের সুখ-সুবিধা, থাকার ব্যবস্থাদিও নির্ভর করে আপন আপন তলায় সহজলভ্য উপাদানের উপর। তোমাদের এই শেরপা প্রদেশেও তাই। পাহাড়ের সব চেয়ে নিচে হলো সোলু,—তোমরা বল শার-রাং—Shar-rang। সেখানকার পাহাড়গুলো ঢালু। বিস্তীর্ণ উপত্যকা। চওড়া নদী,—নাম তারও সোলু। চারিপাশ থেকে নেমে আসে বহু উপনদীও। তাই সেখানে চাষবাসেরও প্রচুর সুযোগ-সুবিধা। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় রোডোডেনড্রন ও পাইনের বন। প্রকৃতির সেখানে সবুজ, শস্যশ্যামল স্নিগ্ধ রূপ। শেরপারাও সেখানকার অনেকেই ধনী। প্রাসাদের মতো ঘরবাড়িতে বাস। যেমন দেখে এসেছি থোসেতে।

সঙ্গী চুপ করে শোনে। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

আমিও সোৎসাহে বলে চলি, সোলুর উত্তর-পূর্ব অংশে—পাহাড়ের আরও উপর স্তরে উঠে এসে যে শেরপা-কেন্দ্র, তার নাম হলো ফারাক্। আট থেকে ন'হাজার ফুট উঁচুতে সাধারণতঃ এখানকার গ্রামগুলি। দক্ষিণের ঢালু পাহাড়ের মাথার ওপর কয়েকটা গ্রাম থাকলেও অধিকাংশ গ্রাম দুধকোশি নদীর নিকটে, কোথাও বা নিচে উপত্যকায়, কখনও বা নদীর দু'পাশের পাহাড়ের গায়ে। দুধকোশি ও ভোটেকোশির সঙ্গম থেকে নিচে খুবিংগ্রাম পর্যন্ত ফারাকের বিস্তার। এরই মধ্যে দিয়ে পার হয়ে আসি, খাপিখোলা, মেবীখরকা, ঘাটে প্রভৃতি গ্রাম। এ-অঞ্চলে পাহাড়ের রূপ-পরিবর্তন শুরু হয়েছে। গভীর জঙ্গল ও চাষবাসের স্নিগ্ধ পরিবেশ কোথাও কোথাও আছে বটে, কিন্তু শুষ্ক

নীরস রুক্ষ পাহাড়ী গ্রামও দেখা দিয়েছে। সোলুর মতো এখানেও গম, যব, buckwheat ভুট্টার চাষ হলেও ভূমির উর্বরতা কমে এসেছে, অতএব ফসল-ফলনও খানিক ব্যাহত হয়েছে। আলুর চাষ অবশ্য সবত্রই প্রচুর। তারপর আরম্ভ হলো শেরপাদের এই তৃতীয় কেন্দ্র খুম্বু। দুধকোশি-ভোটেকোশি-সঙ্গম থেকে দু'নদীর মাঝখানে যে বিশাল পাহাড় শ্রেণী,—একেবারে ঐ এভারেস্ট-লোটৎসের পা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, সেই তিনকোণা অত্যুচ্চ পার্বত্যপ্রদেশ,—সেই হলো খুম্বু (Khumbu), তোমার জননী জন্মভূমি। বারো হাজার থেকে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে ছড়ানো এখানকার গ্রামগুলি। এই যেমন এখন আমরা বসে রয়েছি কুনডেতে বা ঐ যেমন খুমজুং, কিংবা থামি,—তোমার স্কুল যে-গ্রামে। এ-সব অঞ্চলের শেরপাদের গ্রীষ্মকালে—তার মানে এইখানকার গরমের সময়—অর্থাৎ পাহাড়ের ঐ আরও ওপরদিকের বরফ যখন খানিক গলে যায়, তখন ষোল হাজার ফুটের ওপরেও তোমাদের সাময়িক বাসের আস্তানা থাকে,—তুষার-রাজ্যে বাস করাটাই যেন এ অঞ্চলের শেরপাদের স্বভাব। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে চাষ আবাদ একরকম অসম্ভব। বছরের মধ্যে ছ'মাস খুম্বুর ভূভাগ বরফে ঢাকা থাকে। বাকি কয় ... প্রচুর চাষ করো আলুর, হয়ও অজস্র, আর কিছু buckwheat, ... সামান্য ... -যব এবং সবজি ... একরকম সাদা মূলো white turnip ও এক ধরনের শাক, দেখতে ... পালঙের মতো spinachlike)। যদিও সোলু ফারাক ও খুম্বু এই তিন ভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকৃতির, তবুও এই তিন এলাকাকে একসঙ্গে মিশিয়ে বলা হয় সোলু খুম্বু।—থেমে গিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাই। বলি, আমিই যে দেখি, টিচারকে লেকচার শোনাচ্ছি?

সে একমনে এতক্ষণ কথাগুলি শুনছিল। এবার মৃদু হাসে। তারপরেই মাস্টারের মতই গম্ভীর হয়ে অভিমত জানায়, এ-অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণটা মোটামুটি ভালই দিলেন দেখছি। এবার আমাদের খুম্বুর শেরপাদের কথা,—তাদের ধরণধারণ, আচার-ব্যবহার, সামাজিক নিয়মকানুন, ধর্মজীবন ইত্যাদি বিষয়ে জানবার আগ্রহ থাকে তো আমি শোনাতে পারি।

বলি, নিশ্চয় শুনব এবং সেই আগ্রহের উত্তেজনায় এত কথা বললাম।

সে বলে, তাহলে প্রথম ... বলা ভাল,—এই খুম্বুর শেরপারাই হলো প্রকৃত খাঁটি শেরপা এবং খুম্বু অঞ্চলই হলো তাদের আদি জন্মভূমি। হবার কথাই। আমরা ... সত্যিকার তুষারদেশের মানুষ। এই বরফের রাজ্য ছেড়ে যাব কোথায়? বুঝে দেখুন, সেই বারো-তেরো হাজার ফুট থেকে পনেরো-ষোলো হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত—ঐ এভারেস্টের ছায়াতলে আমাদের সারা জীবন কাটে। ভাল কথা, শেরপা নামটার উৎপত্তি কোথা থেকে, জানেন নাকি?

স্বীকার করি, না। বলো শুনি।

সে হেসে বলে, ওটা এখনও একটা হেঁয়ালিই থেকে গেছে। কিম্বদন্তী

শব্দটা হলো শের্-পা—Shar-pa। তার অর্থ,—পূর্বাঞ্চল-বাসিন্দা—easterner। তিব্বতে শের্‌পা নামে কোথাও কোন জাতি নেই। আমাদের জন্যেই যদি ঐ নামের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে বর্ণনাটা অর্থহীন হয়। কেন না আমাদের বাস হলো তিব্বতের টিংরি জেলার—যেখান থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা আসেন—তার দক্ষিণে। তাহলে পূর্বাঞ্চলবাসী হয় কীসে? আবার নেপালের দিক থেকেও এ নামকরণের কারণ নেই। অন্যান্য অনেক ভুটিয়া সোলু-ফারাক খুম্বুর পূর্বদিকে বা পশ্চিমে ও নেপালের অন্যত্র বসবাস করে, তাদের 'শের্‌পা' বলা হয় না। তাই কেন ঐ শব্দটার প্রয়োগ হলো, জানা নেই। কিন্তু শের্‌পা কথাটা এখন এতো প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে তার ব্যুৎপত্তি বিচার করবারও আর প্রয়োজন নেই।

বাধা দিয়ে বলি, নেই বটে, তবে 'শের্‌পা' কথাটার অর্থ তোমাদের দেশের বাইরে এখন আরও সীমিত হয়ে যাচ্ছে—শের্‌পা বলতে এখন সাধারণ লোকে বোঝে, কোন বিশেষ জাতি নয়—একজন সুদক্ষ তুষারপর্বত-আরোহণকারী বলে।

মাস্টার বলে, হ্যাঁ,কথাটার প্রয়োগ এখন সেইরকমই দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলের খুম্বু নাম কেন, জানেন?

বলি, কোথায় যেন পড়েছি, কথাটার অর্থ, নিভৃত আশ্রম—sheltered sanctuary।

সে হেসে ওঠে।

বলে, ওটা রূপ-বর্ণনা বলতে পারেন, শব্দার্থ তা নয়। এই কুন্‌ডে গ্রামের পিছনেই ঐ যে উঁচু পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে—সেই দিকে আঙুল তুলে দেখায়, বলে,—ঐ—ঐটে—ওর নাম হচ্ছে Khumbila বা Khumlla Peak—খুম্‌লা চূড়া।—১৯,০০০ ফুটের ওপর উঁচু,—দেখতেই পাচ্ছেন, যেন একটা অখণ্ড ধূসর বিরাট granite শিলা—উনিই হলেন আমাদের—শের্‌পাদের দেবতা। ওঁরই উদ্দেশে নিয়মিত ঋম্বু বলি দিয়ে পূজা হয়। ঐ খুম্‌লা-দেবতারই রাজ্য এটা। তাই খুম্‌লু থেকে খুম্বু নাম হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছেন, এ-দেশে গাছপালা বিরল। চারিদিকেই পাহাড়-পর্বত, শিলা আর বরফ। আমাদের প্রকৃতিদেবী এখানকার ভীষণ কড়া। কামারে যেমন আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে লোহা গড়ে, এখানেও তেমনি জন্ম থেকেই মানুষ গড়ে তোলেন আমাদের ঐ খুম্‌লা দেবতা। এখানকার মানুষ শক্তসমর্থ কর্মক্ষম হবে না তো হবে কোথায়? পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা, তুষার-রাজ্যে ঘোরা তার কাছে তো ছেলেখেলা। ছোট বয়স থেকেই বাচ্চারা তৈরি হয়ে ওঠে খাঁটি জিনিস। সব কিছু কাজকর্মে পোক্ত।

বলি, ওটা নজর করছি কদিন থেকেই। তোমাদের পারিবারিক জীবন কি ভাবে গড়ে ওঠে বল তো?

সে বলে, ছোট ছেলেমেয়েরা—যেমন সর্বত্র, তেমনি এখানেও বাপ-মার কাছেই মানুষ হয়। রোদে বরফে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাদের দেহ শক্ত ও কষ্ট-

সহিষ্ণু হয়ে গড়ে ওঠে,— অবশ্য যে ক'জন বেঁচে থাকে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, তার মানে?

মাস্টার দরদভরা স্বরে জানায়, সে-কথা আর বলেন কেন? প্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে এ-যেন এক অভিসম্পাত—শিশু মৃত্যু,—Child mortality। শতকরা পঞ্চাশটি শিশুও কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছয় না। প্রসবকালীন মৃত্যুর হারও খুব বেশি। দেখা যাক, হিলারী সাহেবের হাসপাতাল চালু হলে এর প্রতিকার হয় কিনা। এখানে যক্ষ্মারোগেরও প্রাদুর্ভাব। আর জলে পর্যাপ্ত আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড আদি রোগও বেশ হয়, দেখে থাকবেন হয়ত। আমরা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছি এই হাসপাতাল খোলবার অপেক্ষায়। কী মহৎ কাজই না করেছেন হিলারী সাহেব। আমরা তাঁকে দেবতার মতো দেখি। যাক, যে-কথা বলছিলাম, ছেলেমেয়েরা হাঁটতে শেখার পর থেকেই—দেহে একটু শক্তি হলেই—যে-যেমন পারে সংসারের ছোটখাটো কাজে লেগে যায়। নিজেই যেন দেখে শেখে। ক্রমে ঝব্বু,চমরী চরাতে নিয়ে চলে, ঝরনা থেকে জল আনে, সন্ধান করে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে, আলুর ক্ষেতের কাজেও লাগে,—এমন কি সেই ছোট বয়স থেকেই ছোটখাটো ব্যবসাও শুরু করে দেয়। বাপ-মা, ছেলেমেয়ে কেউই বসে নেই,—যে-যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বাপ অবশ্য, বেশির ভাগই বাড়িতে থাকে না। ব্যবসার কাজে দূরদেশে যেতে হয়। পারিবারিক জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন! শেরপাদের সংসার খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। স্বামী স্ত্রী, অবিবাহিত ছেলেমেয়ে। অবিবাহিত বলার কারণ, মেয়েরা তো বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে চলে যায়ই, ছেলেরাও সাধারণতঃ বিয়ের পর, নয়ত নিজেদের সন্তান হলেই, আলাদা আপন সংসার পাততে চলে যায়, বাপ মার সংসারভুক্ত থাকে না। আপন আপন সাংসারিক দায়িত্ব নিজেরাই নেয়, অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের—তা তার যতো নিকট সম্পর্কেরই হোক না কেন,—তার নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

শুনে বলি, এ তো একেবারে সেই ইউরোপীয় প্রথা। আমাদের দেশেও আজকাল ঐ রকম চালু শুরু হয়েছে।

সঙ্গী বলে, তা হবে। তবে আমাদের এখানে এ-প্রথা আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। তার একটা কারণও বলছি। শেরপা যুবক-যুবতী নিজেরাই নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করে। কেবল সগোত্রে বা নিষিদ্ধ-সম্পর্কীয় বংশে,—তার তালিকা আছে,—পরস্পরে বিবাহ করা চলে না। বাপ-মা'রা সন্তানের ছোট বয়সে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে রাখেন না যে এমনও নয়। কিন্তু, সে-সম্বন্ধ ছেলে মেয়ে ইচ্ছা করলেই ভেঙে দিতে পারে, দেয়ও। বাপ-মা তাতে কিছু মনেও করেন না তাদের পদমর্যাদাহানির কোন প্রশ্নও ওঠে না। কেন না, বাল্যকাল থেকেই ছেলেমেয়ে গড়ে ওঠে স্বাধীন ভাবে। নিজেদের মধ্যে মেলামেশাও করে অবাধে। শেরপা-সমাজ যৌন-সম্বন্ধ ব্যাপারে কোন গুরুত্বই দেয় না। ছেলেমেয়েরাও তাই অনেকটা বেপরোয়া। অবিবাহিত যুবক-যুবতী পরস্পরে প্রকাশেই অন্তরঙ্গ মেলামেশা, রঙ্গব্যঙ্গ,—এমন কি ঢলাঢলিও

করে। প্রতি গ্রামে অনেক রাত পর্যন্ত তাদের হৈ-হল্লা-ফূর্তি চলে —

আমি আবার বাধা দিই, বলি, দাঁড়াও, দাঁড়াও,—এইবার তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। রোজই মাঝরাতে বাড়ির সামনে ছেলেমেয়েদের যে হাসি ও স্ফূর্তির হুল্লোড় শুনি,—ওদের তাহলে সেইটেই ঘরে ফেরবার সময় ? এখন মনে পড়ছে বটে, এক বিদেশী বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ হয়ত এদের এই সব লক্ষ্য করেই লিখেছিলেন, — "a peculiar kind of rather rough horseplay" !

সঙ্গী শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বলে, অনভ্যস্ত চোখে এটা হয়ত বিসদৃশ লাগে, কিন্তু শেরপাদের কাছে—এমন কি নিজেদের বাপ-মা'র মনেও এটা অন্যায়, বা শালীনতাবিহীন কিংবা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বলে ধারণা হয় না। আমাদের সমাজের এই এক বিশিষ্ট নীতি-দুর্নীতির মাত্রাবোধ। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য বিবাহিত পুরুষ-রমণীদের ব্যাভিচারঘটিত ব্যাপারের বিচার করা হয় ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। পরে সে-বিষয়ে শুনবেন। এখন বলি বিবাহের কথা। ছেলেমেয়েদের ঐ ভাবে অবাধ মেলামেশার ফলে পরস্পরে বিবাহের প্রস্তাব ওঠে, তারপর বিবাহও হয়,—বাপ-মা'ই উৎসাহ করে দেন।

বলি, এ-ধরনের খোলাখুলি মেলামেশা, ভাব করা, বোধ হয় আদিবাসীদের আদিম সংস্কার। ফ্রেজারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ - The Golden Bough-তে এর যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভারতের মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যেও দেখেছি এই ধরনের প্রথা।

সঙ্গী বলে, এখানে কিন্তু আরও কিছু বিশিষ্টতা আছে। ছেলে-মেয়েতে ভাব জমেছে, বিয়েও হবে, বাপ-মায়েরও মত রয়েছে,—তবুও বিয়ের আনুষ্ঠানিক ও ব্যয়বহুল এমনি কয়েকটি নিয়ম-আচার, যে বিয়ে সম্পূর্ণ হতে বছর তো ঘোরেই, কয়েক বছরও হয়ত কেটে যায়। ইতিমধ্যে প্রণয়নীর সন্তানাদি হওয়া বিচিত্র নয়। তাতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বা সমাজেও কোন লজ্জার কারণ ঘটে না। বিয়ের আগে যদি একটা বিশেষ নির্দিষ্ট আচার পালন করা হয়ে থাকে—অনেকটা সভ্য-সমাজে প্রচলিত পাকা-দেখা বা পাকা-কথা দেওয়ার মতন,—তাহলে সেই ছেলেমেয়েকে বৈধ সন্তান বলেই মেনে নেওয়া হয় এবং বিয়ের পরে নববধূ সেই বাচ্চাদের হাত ধরে বা কোলে নিয়ে স্বামীর ঘর করতে আসে।—এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণতা ঘটতে এই অস্বাভাবিক বিলম্বের আরও এক গূঢ় কারণ থাকে।

অবিবাহিতা কন্যারা বাপের সংসারে নানান্ কাজকর্মের ভার নেয়। ক্ষেতের বেশি-ভাগ কাজ মেয়েরাই করে, পুরুষরা কেবল হাতে টেনে লাঙল দিয়ে জমিটুকু তৈরি করে দেয়। বিবাহ পূর্ণ হলেই মেয়েরা যাবে চলে, বাপের সংসারে হবে কাজের লোকাভাব। তাই, পাত্রীর বাবার কেবলই চেষ্টা, যত পারো পিছিয়ে দাও বিয়ের কাজ ! সমাজই এ বিষয়ে তার হাতে ক্ষমতার লাগাম তুলে দিয়েছে। যদিও পাত্র-পাত্রীর আপন পছন্দমত বিয়ে ঠিক করার স্বাধীনতা, তবুও বিবাহের অনুষ্ঠানাদিতে তাদের বিশেষ অংশগ্রহণ করতে

হয় না, সে বিষয়ে বাপেদেরই আসল দায়। পাত্রের পিতাকে যেতে হয় পাত্রীর পিতার কাছে। একবার নয়। অন্ততঃ তিন খেপ তো বটেই। প্রতিবারই সেখানে তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে প্রীতিসম্মেলন। খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান। অঢেল মদের প্রবাহ,—সে তো থাকবেই। পুজোদিও কিছু হয়। খরচান্ত হতে হয় উভয় পক্ষকেই। বছরও গড়িয়ে যায়। সবারই পক্ষে এত ভার সওয়া সম্ভব নয়। তাই তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে বিয়ে সেরে নেবারও অতি সহজ এক কথার প্রচলন আছে। মাত্র ছটি টাকা পাত্রীর পিতাকে দিয়ে নববধূকে আপন ঘরে আনতে পারে। এটাও আইনসঙ্গত বিবাহ। কিন্তু সমাজে এই ধরনের বিয়েকে নেহাৎ গরিবী বিয়ে মনে করে।—আনুষ্ঠানিক বিবাহের একটা মস্ত ব্যয়,—কন্যাকে যৌতুক-দান। সাধারণতঃ পাত্রীর পিতা কন্যাকে সম্পত্তির কিছু অংশ এবং নানান্ জিনিসপত্র দেন, আত্মীয়স্বজনরাও লৌকিকতা দেয়। সেসব সম্পত্তি কন্যার স্ত্রীধনের মতো তারই থাকে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে তারই দখলে চলে আসে।

জিজ্ঞাসা করি, বিচ্ছেদেরও নিয়মকানুন বিয়ের মতন জটিল নাকি?

সে বলে, বলছি। তার আগে বিয়ের পর্বটা শেষ করি। আমাদের সমাজে এক স্বামীর এক স্ত্রীরই প্রচলন। কিন্তু কখনও কখনও এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী, বা এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীও হয়ে থাকে। তবে, সে প্রথা ক্রমশঃ উঠেই যাচ্ছে।—হ্যাঁ, বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে বলি। ওটা শেরপাদের কাছে খুবই সহজ ব্যাপার। স্ত্রীর বাবা-মা, ভাই বা নিকট-আত্মীয়কে ডেকে এনে ও একটা সুতো ছিঁড়ে দু' টুকরো করে, জানিয়ে দেওয়া যে তাদের মধ্যে আর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ রইল না। কোন কিছু কারণ দেখাবার প্রয়োজনও হয় না। স্ত্রীও সেই মতো বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এইবার, আগে যেটা উল্লেখমাত্র করেছি, এখন সেইটে একটু খুলে বলি। শেরপাদের অবাধ যৌন-সম্বন্ধ সম্পর্কে নীতিবোধ। অবিবাহিত নরনারীর মধ্যে ও ব্যাপারটা দোষণীয় না হলেও, বিবাহিতা মেয়েদের চরিত্রদোষ অধর্ম। কিন্তু সেখানেও এই অবাঞ্ছিত ঘটনা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি নেই। যে পরপুরুষ এর জন্যে দায়ী, তার সামান্য হয়ত জরিমানা হয়, কখনও বা শুধু এক বোতল মদ তার কাছ থেকে আদায় করলেই সব চুকে যায়। তারপরই আবার সেই অপরাধীর সঙ্গে সকলেরই যথাপূর্ব সহজ ব্যবহার, প্রীতির সম্পর্ক। অথচ, পরস্ত্রীগমনে সে যে ঘোরতর ধর্মবিরুদ্ধ দুষ্কর্ম করেছে, সে-ধারণা সবারই মনে বদ্ধমূল থাকে। এবং সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে অপরাধীর এ জন্মে বহু সৎকর্ম করতে হবে ও অনুশোচনা পেতে হবে। কিন্তু সেটা তার ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তার বিষয়, সামাজিক ব্যাপার নয়। ভগবানই তার বিচার করে যা শাস্তি দেবার দেবেনই, মানুষ কেন এই পাপের জন্যে তার সঙ্গে আর বিবাদ-বিসম্বাদ করে, তার প্রতি অসদ্ভাব রাখে?

শুনে বলি, শেরপাদের মনের উদারতার ও ক্ষমাশীলতার এ তো অতি প্রশংসনীয় বৃত্তি। মানুষের ক্ষণিক ভুলের কারণে বা স্বভাব-দৌর্বল্যজনিত

এই ধরনের সমস্যার সহজ সমাধান।

সঙ্গী বলে, আমাদের সমাজের এমনি দৃষ্টিভঙ্গি, শুধু এই ব্যাপারেই নয়, পরে অন্য দৃষ্টান্তও পাবেন। এর মূলে কারণ, শের্পাদের অটল ধর্মবিশ্বাস।

হেসে বলি, আমাদেরও ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।— কিন্তু ঐ সব কেলেঙ্কারি ঘটলে সেখানে দেশের লোক আর ভগবানের ওপর শাস্তির ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে না, উঠে-পড়ে লেগে যায় অপরাধীর পিছনে নিজেরাই লগুড় হাতে। কিন্ত যাক সে-সব কথা। তোমাদের বিয়ের পর কি হয়, এখন তাই বল। মেয়েরা তো স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। ছেলেরাও বাপ-মাকে ছেড়ে গিয়ে আলাদা সংসার পাততে বসল। তারপর বাপ-মা'র বৃদ্ধ বয়সে বা অসুখ-বিসুখের সময় দেখাশুনো করবার কেউই তো রইল না। এ-প্রশ্ন বিশেষ করে মনে উঠছে এইজন্যে,—এই সমস্যা নিয়ে অনেক সুসভ্য উন্নত দেশ এখন মাথা ঘামাচ্ছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির গুণে লোকেদের আয়ু এখন সুদীর্ঘ হয়েছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে দেশে দেশে। তাদের ছেলেমেয়ে থেকেও —নেই। বাপ মা'র সাহায্য করা তো দূরের কথা খোঁজ-খবরও হয়ত রাখে না। কোন কোন দেশে এখন রাজ্য সরকার থেকে এই ধরনের অসহায় বুড়োবুড়ীদের ভার নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তোমাদের এখানে যে প্রথা, তাতে বাপ-মায়ের আরও নিরবলম্ব হওয়ার আশঙ্কা। তাই ... বি ...

সঙ্গী বলে, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলেন, এ দেশে লোকজন খুব বেশি দীর্ঘায়ু হয় না। কমই অথব বুড়োবুড়ী দেখবেন। তাছাড়া আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ এখনও সবটা বলা হয়নি। নিয়ম হল, একমাত্র পুত্র হলে সে বাপের সংসারেই থেকে যাবে। আর একের বেশি ছেলে থাকলে সব চেয়ে ছোট ছেলেকে সব সময়ে তার বাপের কাছেই বাস করতে হবে। বাপের মৃত্যুকালে তাঁর যা কিছু সম্পত্তি থাকে সেই ছোট ছেলেই কাছে থাকে বলে পায়। বিশেষতঃ বসতবাড়ি। তবে, বাপের মৃত্যুর পর অন্য ছেলেরাও তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদির জন্যে যে যেমন খরচ বহন করে সেই অনুপাতে সম্পত্তির কিছু ভাগও পেতে পারে। এর থেকে যেন মনে করবেন না, ছোট ছেলে একমাত্র উত্তরাধিকারী, এবং অপর সন্তানেরা বঞ্চিত হয়। ছেলেদের একে একে পৃথক হবার সময় যার যা প্রাপ্য অংশ পিতা তাকে দিয়ে দেন। কন্যাও এক অংশ পায়,—বিবাহকালে যৌতুক হিসাবে। শের্পারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মানে। তাই সম্পত্তি কারও হাতে এলে তারই হয়। এমন কি ছোট ছেলে পর্যন্ত নিজে ব্যবসা করে টাকা জমালে তারই নিজস্ব থাকবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পুত্রহীন পিতার সম্পত্তি কে পাবে? মৃতের ভাইয়ের বংশে সে-সম্পত্তি যায়। কিন্তু সে রকম পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ সব ছোট যে মেয়ে তার বিয়ে দিয়ে ঘর-জামাই রাখারও প্রথা আছে। ছেলের মতনই জামাই থাকে। সম্পত্তিও তারাই পায়। এমন কি, মেয়ে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ

করে, ছেলেরই মতন সম্পত্তি জামাইয়েরই থাকবে। আবার, জামাই যদি ছেড়ে যায়, সম্পত্তি মেয়ের হবে। মেয়ে-জামাই কাছে থাকায় অপুত্রক বৃদ্ধ মাতাপিতার দেখাশুনার লোকের অভাব হয় না।

বলি, বাঃ! এ তো একরকম ভালই ব্যবস্থা মনে হয়। এখন বল, শুনি, এই নির্মম তুষার-রাজ্যে তোমরা কী খেয়ে জীবনধারণ করো? জমিতে কিছুই তো হয় না, দেখি। এক ঐ আলু ছাড়া। আর তা হয়ও প্রচুর। সবাই খাও-ও তো হরদম। কিন্তু, শুধু তাই খেয়ে তো আর দেহে শক্তি হয় না? অন্য শাকসবজি তো নেই বললেই হয়। অবশ্য, খাদ্য বলতে ঐ শম্পা—**Tsampa**-টা আছে; তাতেই বা কী হয়?

মাস্টার মৃদু হাসে। বলে, শাক-সবজি হলেও কি আর তাতে দেহে বল দিত? বল-বর্ধন পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের আছে বইকি। প্রথম ধরুন, দুধের তৈরি খাদ্যসামগ্রী। চমরী গাইয়ের দুধ পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। তবে, তাজা দুধ কমই লোকে এ দেশে পান করে। তৈরি হয় দই, ঘোল, মাখন, ঘি, পনির,—ঘরে ঘরে।

শুনে বলি, এ তাহলে আমাদের যেন মধু-বৃন্দাবন! সেই আমার গাড়োয়াল-হিমালয়ের অনসূয়া-মায়ের কথাও মনে পড়ে।

সঙ্গী আমার কথার মর্ম বোঝে না। অবাক হয়ে তাকায়। আমি বোঝাতেও চেষ্টা করি না। কিন্তু তাদের এই সাত্ত্বিক খাদ্যব্যবস্থার সংবাদ মনে আমার স্নিগ্ধ প্রসন্ন ভাব আনে। বলি, গিরমির দিদি পনির খাইয়েছেন আমাকে, হয়ত অনভ্যাসের কারণে একটু কেমন যেন গন্ধবোধ হয়েছিল। দুধ দিয়ে কফিও খেয়েছি,—ক্ষীরের মতো ঘন দুধ, ভালই লেগেছে। মাখন তো সারাক্ষণই চায়ে ব্যবহার হচ্ছে দেখছি। কিন্তু দই ও ঘোলের সন্ধান তো জানা ছিল না। দেশে থাকতে দই আমার নিত্যখাদ্য। কালই দুপুরে গিরমির দিদির কাছে চেয়ে নিয়ে চেখে দেখতে হবে।

সে বলে, দেখবেন নিশ্চয়। তবে দই-ঘোল এই শীতের দেশে আমরা কমই খাই। মাখনের চাহিদা অফুরান। শুকিয়ে জমাট করে রাখা থাকে তাল-তাল,—প্রতি ঘরে। এই নিত্য প্রচণ্ড-ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। সারা বছরই আমরা খাই। ঘরে ঘরে ঘিয়েরই প্রদীপ জ্বলে। দেবতার পূজাতেও ব্যবহার হয়। কেনা-বেচার বাজারে টাকা-পয়সার বদলে মাখন দিয়ে লেনদেনও চলে। এ দেশে মাখন লাভজনক ব্যবসার সামগ্রী। কিন্তু, ব্যবসার কথা এখন নয়। খাওয়াটা আগে শেষ করি,—বলে হেসে তাকায়।

তারপর আবার বলতে শুরু করে, ও-সব খাদ্যের কথা যা বললাম তা তো এক রকম পেট ভরাবার জন্যে। এ দেশের প্রকৃত পুষ্টিকর খাদ্য হলো মাংস। কিন্তু, এই মাংস-সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে কিছু কারচুপি করতে হয়েছে। প্রাণি-হত্যা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ। এক ঐ দেবতার কাছে বলির উপলক্ষ্য ছাড়া। তাই, আমরা নিজের হাতে জীবহত্যা করি না।

তবুও মাংসের যোগাড় হয় কি করে? অন্য লোকে মারলে আপত্তি ওঠে না।— বলে হেসে ওঠে।

কথাটা আমার কানে বাজে, প্রাণেও লাগে। এমন ধর্মভীরু হিমাঞ্চলবাসী প্রকৃতির-সরলমতি-সন্তান, এদেরও মনে ধর্মের বাধা-নিষেধ এড়াবার এমনি কূট অভিসন্ধি!

সে বলতে থাকে, মারবার জন্যে লোক পাওয়ার অভাবও হয় না। বছরের এক-একসময় তিব্বত থেকে এক শ্রেণীর কসাই আসে এইখানে। তাদের দিয়ে তখন মারিয়ে নেওয়া হয়। সে-সব ইয়াক্ ইত্যাদি অকেজো হয়ে পড়ে সেগুলির উদ্ধার তো তখন হয়ই, প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য সুস্থ পশুরও প্রাণনাশ হয়। উপায় বা কী? দেহধারণ করতে উদরপূরণও করতে হবে।—বলে আবার যেন নিষ্ঠুর হাসি হাসে।

তারপর সেই আমিষ খাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালী জানায়, মাংস আমরা মশলাদি দিয়ে রান্না করেও খাই, তবে বেশি প্রচলন, কাঁচা-মাংস ঘরের মধ্যে উনুনের কিছু ওপরে ঝুলিয়ে-রাখা। আগুনের তাতে শুকিয়ে যায়। সারা বছরের খাদ্যের সংস্থানও থাকে। আমাদের আর-এক উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য কি জানেন? জীবন্ত ইয়াক্-এর ঘাড়ের বা গলার ধমনী—যাকে বলে **jugular vein**—তাই চিরে রক্ত বার করে নিয়ে নুন মিশিয়ে জমিয়ে-রাখা। তারপর কাঁচা, অথবা মেটুলির মতো ভেজে খাওয়া। **Tsampa**র সঙ্গেও খেতে সে-যা চমৎকার লাগে কি বলব!

মনে মনে ভাবি, কী বীভৎস খাদ্য! এরা কি রাক্ষস? ভাগ্যি সেদিন গিরমির দিদির হাসিমুখে-এনে-দেওয়া **Tsampa**টা খাই নি। কি মেশানো ছিল তাতে, কে জানে!

মাস্টার বুদ্ধিমান্। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এ-সব শুনে কি ভাবছেন জানি না। খাদ্যের কথা থাক। শেরপাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে এবার বলি। এখানেও আমাদের এই বাসভূমির দুরধিগম্য অবস্থানই সাহায্য করে। কে জানে, আমাদের পূর্বপুরুষরা তিব্বত থেকে নেমে এসে হয়ত এই কারণেই এই স্থান নির্বাচন করেন। তাকিয়ে দেখুন, ঐ এভারেস্টের বিশাল গিরিশ্রেণী তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নেপালের এই অঞ্চল থেকে তিব্বতে যাওয়ার একমাত্র গিরিপথ—নাংপা-লা। নেপালের সঙ্গে তিব্বতের ব্যবসা চালানোর অতি-চালু ট্রেড্-রুট—বাণিজ্য-সরণি। এরই সিংহদ্বারে খুম্বু। খুম্বুর শেরপারা তাদের এই ভৌগোলিক অবস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ নিজেদের উন্নতির কাজে লাগাবে, আশ্চর্য কী! নিজেরা সরাসরি তিব্বতের সঙ্গে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য তো চালায়ই। আরও এক বুদ্ধির পরিচয় দিলে নেপাল-দরবারের কাছ থেকে এক পাকা আইনের প্রবর্তন করিয়ে। সরকারী বিধি হলো, পাহাড়ের নিচে ফারাক, সোলু অথবা আরও নেমে গিয়ে নেপালের যে-কোন অঞ্চলেরই বাসিন্দারা হোক না কেন, এইদিকের তিব্বতীদের সঙ্গে বেচা-কেনা, লেনদেন,

ব্যবসা করতে গেলে একমাত্র খুম্বুর শেরপাদের মাধ্যমেই করতে হবে, নিজেরা সোজাসুজি করতে পারবে না। অপর দিকে, তিব্বতীদেরও ব্যবসা করতে এলে শুধু এই খুম্বুর শেরপাদের মারফতেই চালাতে হবে। ফলে, এই অঞ্চলের ব্যবসা করার অধিকার চলে এল একমাত্র খুম্বুর শেরপাদের হাতে। যাকে বলে, 'মনোপলি'—একচেটিয়া। তিব্বতের লোকেরা আসতে পারে নামচে পর্যন্ত, নিচের শেরপা আর নেপালীরাও আসে ঐ পর্যন্ত। সেইখানে খুম্বুর শেরপারা লেনদেন করে মধ্যে বসে। তার দালালি তো লাভ করেই, আবার নিজেরাও এদের সঙ্গে ব্যবসা করে। এইভাবে উপার্জনও হয় প্রচুর। এই কারণেই এ অঞ্চলের শেরপাদের অবস্থা শুধু সচ্ছলই নয়, তারা প্রকৃতই ধনবান। কিন্তু তারা খরচও করতে জানে, করবার দরাজ মনও রাখে। তিব্বত থেকে দামী দামী কার্পেট, চীনদেশের সিল্ক ব্রোকেড্, পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপার ও মূল্যবান পাথর-বসানো অলঙ্কার, পোর্সেলিনের পেয়ালা-পিরিচ, সোনা-রূপার পাত্র,—কতো জমকাল আসবাবপত্র এনে ঘর সাজায়, ব্যবহারও করে। তিব্বতের ও চীনের অপরূপ শিল্পকলাদির বহু নিদর্শনও সংগ্রহ করে। এ-অঞ্চলে সাধারণ একজন শেরপার ঘরে ঢুকলেই মনে হয়, ধনবানের বাসভবন,—যেন কি বা শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠান। বিশিষ্ট এক কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিবেশ। গৃহবাসীদেরও উদার হৃদয়, প্রাণখোলা ব্যবহার। একটু থেমে বলে, আপনি যেন ভাববেন না, আমি বাড়িয়ে বানিয়ে নিজেদের প্রশংসা করছি—

আমি বাধা দিয়ে বলি, না, না,—এ তো আমার নিজের চোখে দেখা। অবাক হয়ে দেখি আর ভাবি, কোথায় হিমালয়ের এই দুর্গম নিভৃত অঞ্চল, হয়তো তোমরা মাত্র দু-তিন হাজার অধিবাসী, তবুও তোমাদের জীবনযাত্রার মান,—যাকে বলে standard of living,—কতো উঁচু! এখানকার ভগবদ্‌দত্ত প্রকৃতির মহান্ শান্তি চিরস্থায়ী। কিন্তু তোমাদের মনের গভীর শান্তি ও সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় কি করে, তাই জানবার কৌতূহল হয়।

মাস্টার মুচকে হাসে। বলে, বাইরে থেকে দুদিনের জন্যে এসে যেটুকু দেখা যায়, তাই কি সব ... এই প্রশান্ত প্রকৃতির কথা বলছেন, আসতেন যদি শীতকালে তখন দেখতেন এর নির্মম অনুদার উদাসীন রূপ। কেবলই বরফ আর বরফ, সাদার পর সাদা। যেন, নরকঙ্কালের বিকট মাথার খুলি! তবুও তারই মধ্যে আমাদের দিন কাটাতে হয়। জীবনের সে-সব দুর্দিনও আমাদের হাসিমুখে সহা। তাই আর-সব সময়েও আমরা সহজেই হাসতে জানি, পারিও। সম-সুখ-দুঃখে আমাদের পরস্পরের জীবন বাঁধা। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার মূলও সেইখানে। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি বুঝেসুঝেই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মকানুন নিজেদেরই গড়ে তোলা। ব্যবসার সামগ্রীরও সেইমতই কেনা-বেচা। তিব্বতে যা নেই, তারা তাই নেয়; আমাদের যা নেই, আমরা নিই। তিব্বত থেকে

নিচে চালান আসে সোহাগা। প্রচুর পরিমাণে সেখানকার ভেড়ার লোম—উল। খুম্বুতে ভেড়া নেই বললেই হয়। আর আসে পাহাড়ী নুন। এককালে এই পথ দিয়ে চালান এসে সারা নেপালে সে-নুন সরবরাহ হতো। এখন ভারত থেকে নেপালে নুন আসে। তার দামও কম। কাজেই তিব্বতী পাহাড়ী নুন এখনও পাহাড়ের উপর অংশে তিব্বতের কাছাকাছি অঞ্চলেই শুধু চলে। আর তিব্বতীরা নেপাল থেকে প্রধানতঃ নেয়, খাদ্যদ্রব্য,—চাল, ভুট্টা, জোয়ার। তাছাড়া, মৃত-পশুচর্ম, নেপালী কাগজ, রঙ, ভারত-থেকে-আমদানি চিনি, সুতির কাপড়চোপড়ও। আর এক ব্যবসা,—মাখনের। সে কথা আগেই বলেছি। সে কারবার চলে খুম্বুর শেরপাদের সঙ্গেই বেশি। কিন্তু, খুম্বুর শেরপাদের মস্ত লাভজনক ও নিজস্ব ব্যবসা হলো,—পশু, বলতে আপনারা চমরী-ঋষভ বা ইয়ক্ বলে থাকেন। সাধারণ চোখে এ-সব জানোয়ারের বিশেষত্ব ধরতে পারেন না। কিন্তু বিভিন্ন জাতের গৃহপালিত পশুর মধ্যে বর্ণসংকর প্রজনন cross-breeding করিয়ে নানান্ শ্রেণীর এই ধরনের পশুর উৎপাদন হয়েছে। তাদের আলাদা আলাদা নাম। শক্তি-সামর্থ্যেরও তেমনি তারতম্য। খুম্বু অঞ্চলের আবহাওয়া ও পরিবেশেই এদের প্রজনন ও প্রতিপালন সব চেয়ে ভাল হয়। তিব্বতেও যেমন এ-সব পশুর চাহিদা, নিচের দিকে সোলুতেও তেমনি এদের বিক্রির ভাল বাজার। ইয়ক্-এর লোমেরও দাম আছে। তাও ব্যবসার সামগ্রী। মোটা কম্বল, গরম কাপড় জামা ইত্যাদি তৈরি হয়। চামড়া দিয়ে জুতোও করে। ব্যাগ, থলি ইত্যাদিও বানায়।

হেসে বলি, আবার ওদেরই দুধ, রক্ত, মাংসও—কিছুই বাদ দাও না।

মনে মনে ভাবি, আমাদের দেশে যেমন —কলাগাছ,—ফুল খাই, ফল খাই—কাঁচা, পাকা। গাছ কেটে থোড় খাই। আবার পাতারও ব্যবহার বাদ যায় না!

সঙ্গী বলে চলে, ইয়ক্-এর প্রধান প্রয়োজনীয়তা দেখেছেন নিশ্চয়, এই পাহাড় ও বরফের দেশে মাল-বওয়া। তিব্বত ও এই সব অঞ্চলে ঐ হলো একমাত্র বাহন ও বাহক—transport কতো ভার বইতে পারে জানেন? সাধারণতঃ একটা জানোয়ার পিঠের দুদিকে ঝুলিয়ে মোট ১০০ থেকে ১২০ পাউণ্ড ওজন নিয়ে চলে,—এই চড়াই উঠে, সেই বরফের উপর দিয়ে। বুঝে দেখুন, কী অসীম শক্তিশালী!

বলি, জানোয়ারগুলো দেখতে অমন ভীষণ, কিন্তু নাকি শান্তপ্রকৃতি?

মাস্টার বলে, তাই-ই তো। দুজন মাত্র লোক দশ-বারোটা জানোয়ারকে সহজেই সামলে নিয়ে যায়।

নেপাল থেকে ফিরে এসে একটা বই এ উদাহরণ পাই, এই পশু-বিক্রীর ব্যবসা কতো লাভজনক। ১৯৫৬ সালে নামচের এক শেরপা-ব্যবসায়ী সোলু থেকে ১৪০টা ইয়ক্ কিনে নিয়ে তিব্বতে বিক্রি করতে যায়। ক'মাসের

মধ্যেই নগদ ষোলো হাজার টাকা ও তাছাড়া দামী তিব্বতী জিনিসপত্র কিনে সঙ্গে নিয়ে ফেরে।

মাস্টার বলে, দেখুন, এই যে এখানে এতো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, এ-সব চালাতে দলিলপত্র, খাতা-লেখালেখির প্রয়োজন হয় না। পরস্পরের উপর গভীর আস্থা। কেউ কাউকে ফাঁকি দেবে, এ-সন্দেহই মনে ওঠে না। মানুষে-মানুষে এই অটুট বিশ্বাস ও সততার সংরক্ষণ শেরপাদের স্বভাবগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে। নৈতিক চরিত্রবল সুদৃঢ় করে তোলে। এই ব্যবসাসূত্রেই আবার দুর্গম দুঃসাধ্য তুষার-পর্বত অনায়াসে অতিক্রম করতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অসীম সাহস ও শক্তির অধিকারীও হয়। এই সব গুণেরই জোরে এখন শেরপা ছেলে-মেয়েরা—বিশেষ করে যারা অন্য রোজগারের পথ পায় না—পর্বত অভিযানে পোর্টারের কাজে অনেকেই যোগ দেয়। নগদ টাকাও ভাল উপার্জন করে। ঘরে ফিরে কেউ কেউ সে-টাকা ব্যবসাতেও খাটায়। কিন্তু এই হঠাৎ-ধনী যুবক-যুবতীরা শেরপা-সমাজে এক নতুন সম্প্রদায়ের পত্তন করছে। বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনধারাও ভিন্ন পথে ঘুরে চলেছে। এদিকে আবার কালের গতিতে রাজনৈতিক বিদ্বেষের কারণে আজ কয়েক বছর থেকে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসার এই স্বর্ণসিংহদ্বার প্রায় বন্ধ হবার মতো। শেরপারা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে, কবে আবার মানুষে মানুষে সহজ সরল অহিংস আচরণ আসে, সবাই আনন্দে জীবনযাপন করে, অপরকেও সেইমতো থাকতে দেয়।—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে চমকে উঠে তাকায়, বলে, করেছি কি আমি? আপনাকে এ কী লেকচার শোনাচ্ছি?

হেসে বলি, আমি তো শুনতেই চাই তোমার মুখে তোমাদেরই নিজের কথা। তোমার আর কোথাও কাজ না থাকে তো এইবার তোমাদের সামাজিক ও পৌর-ব্যবস্থাদির বিধিনিয়মগুলি শোনাও দেখি।

সে বলে, সময় আমার এখন যথেষ্ট আছে। যে-কাজে এসেছিলাম, এসেই প্রথমে শেষ করে এদিকে ঘুরছিলাম, তারপর কি অদ্ভুতভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল! আমি আর যতটুকু জানি আমাদের এই দেশের সম্পর্কে, বলছি শুনুন। খুম্বুর পৌরব্যবস্থাও শেরপাদের স্বকীয়। নেপালরাজ্যের অন্তর্গত গ্রাম। অতএব, নেপাল সরকারের প্রবর্তিত আইনকানুন এখানেও প্রযোজ্য হবার কথা। কিন্তু সেটা শুধু নামেই। গ্রামের প্রকৃত বিধি-ব্যবস্থা, নাগরিক জীবনযাপনের নিয়ম-কানুন, অন্যায়ের প্রতিকার, দুষ্টের দমন, গ্রামের শান্তিরক্ষা,—এ সবই গ্রামবাসীরা নিজেদের নির্দিষ্ট মত অনুযায়ী চালিয়ে যায় এবং ভাল ভাবেই চালায়। নেপাল সরকারের কোন রাজপ্রতিনিধি এখানে নেই। এখন ঐ চেকপোস্ট আর বেতারকেন্দ্র খোলা হয়েছে। কোথায় সেই কাঠমাণ্ডু আর কোথায় এই দুর্গম পাহাড়ের দুরন্ত হিমাঞ্চলে শেরপা দেশ—খুম্বু! যাতায়াতের পথ, দেখেই

তো এলেন, যেমন দীর্ঘ, তেমনি দুর্গম। রাজ্য-কেন্দ্রের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ, —এ কি সম্ভব? নেপাল-সরকারের সঙ্গে আমাদের কেবল কর আদায়-দাখিলের সম্পর্ক। সে-কাজের জন্যেও বেতনভোগী রাজকর্মচারী এখানে কেউ নেই। নির্ধারিত করের টাকা গ্রামেরই কোন প্রতিনিধির ওপর আদায় করার ভার থাকে! এ-জেলার সরকারী কোষাগার সেই ওখালধুংগায়—সে-পথ দিয়ে আপনি আসেন নি। এখান থেকে অনেক নিচে—প্রায় এক সপ্তাহের হাঁটাপথ। আদায়-করা করের টাকা বছরে একসঙ্গে সেইখানে জমা পড়ে। জেলাশাসকের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতও সেই ওখালধুংগায়। এই হলো রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বাঁধন। আর আছে নামচে গ্রামের সেই পুলিস চৌকি। কিন্তু সারা বছরে হয়ত কোন ফৌজদারী মামলাই খুম্বু শেরপার পক্ষে বা বিপক্ষে থানাতেও আসে না, জেলাশাসকের আদালতেও দাখিল হয় না। এর মানে এমন নয় যে, মানুষ আছে, গ্রাম আছে অথচ বিবাদ-বিসম্বাদ, অন্যায় আচরণ একেবারে ঘটেই না। ঘটে—কিন্তু সে-সব এমনি সামান্য যে নিজেরা নিজেদের মতো নিষ্পত্তি করে নেয়, দোষীকে শাস্তি দেয়। কি সুশৃঙ্খলভাবে এ কাজ হয়, জানলে আশ্চর্য হবেন? জানেনই তো এখানকার শেরপারা বছরের মধ্যে প্রায় ছমাস নিজেদের আসল গ্রামে থাকে না। ব্যবসাসূত্রে বা পশুচালনে বাইরে বাইরে তাদের ঘুরতে হয়। তবুও, আপন গ্রামের কল্যাণ সম্পর্কে প্রত্যেকেই যথেষ্ট সজাগ। পৌরপ্রতিষ্ঠানের শান্তি, সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা,—সকলেই মনে করে নিজেদেরই দায়িত্ব, প্রয়োজন তো বটেই। সবাইকে নিয়ে তবেই তো গ্রাম। প্রত্যেকেরই থাকা অপর সকলেরই জন্য—

তার দিকে তাকিয়ে বলি, Victor Hugo-র Three Musketeers পড়েছ? তাতেই আছে সেই চমৎকার কথাটি—All for one and one for all!

মাস্টার বলে, শেরপাজীবনের ঐ হলো মর্মকথা। গ্রামের সবাই যে আপন জন, সে-জ্ঞান তাদের যথেষ্টই থাকে। সেই কারণেই আমাদের গ্রামীণ জীবনের এমন আনন্দ, সুখসুবিধা, সুব্যবস্থাও। আমাদের ভালভাবেই জানা, এই সব স্বল্পপরিসর গ্রামের সুখ-শান্তি নির্ভর করে প্রধানতঃ তিনটি ভিত্তির ওপর। প্রথমতঃ, প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া অমূল্য দান,—জমির উর্বরতা, গৃহপালিত পশুর চারণভূমি ও জঙ্গলের কাঠ,—এগুলির সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও তার যথাযথ সুব্যবহার। সকলেই যাতে সমভাবে এ সব ভোগ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা। সকলেই যাতে নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে মনে বসবাস করতে পারে। তৃতীয়তঃ,—আমাদের ধর্মানুযায়ী পূজাপর্ব উৎসবাদির নিয়মিত পালন। যাতে সবারই অন্তরে ধর্মবোধের নির্মল আনন্দ ও পরিতৃপ্তি থাকে।

বলি, বিষয়গুলি তো শুনতে সহজ। কিন্তু, এর সমাধান করা তো সোজা কথা নয়। করা হয় কি করে?

সে জানায়, ঐ যে বলেছি, গ্রামবাসীদের সমষ্টি ও ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে

দায়িত্ববোধ এবং সবাইকে এই দায়িত্ব-পালনের সুযোগ দান। কি ভাবে সেটা সম্ভব হয়, তাও বলি। প্রতি বছর মে মাসের প্রথম দিকে গ্রামে গ্রামে ও-সো—Osho পর্বানুষ্ঠান হয়। তখন সবে ফসলের চারা মাথা তুলতে শুরু করে। গ্রামবাসীরা সবাই সেখানে উপস্থিত থাকে। এ উৎসবে গ্রামের এলাকা ও চাষের জমিগুলি মন্ত্রপূত গণ্ডীরেখা এঁকে ঘিরে দেওয়া হয়,—যাতে অপদেবতারা এই সব এলাকায় যার ঢুকতে না পারে।—মাস্টার কথা বলা থামায়। আমার দিকে তাকায়। বলে, ভাবছেন, এটা একটা superstition—অন্ধ সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমারও আজকাল তাই-ই মনে হয় বটে, কিন্তু এক-একবার এও ভাবি, আমাদের এই ক্ষমাহীন দুর্জয় তুষাররাজ্যে এই ধরনের ধারণাই—অলীক হলেও—পরস্পরকে কাছে টানে, এক ধরনের বাঁধনে বাঁধে।

বলি, ও-সব বিচার এখন থাক্। যা বলছিলে তাই বল।

সে বলে, সেই উৎসবের আগে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে নিজেদের কয়েকজন প্রতিনিধি মনোনয়ন করে। তাদের বলে,—নউয়া—naua। এক নউয়ার ওপর ভার দেওয়া হয়, গ্রামের ও আশেপাশের জমি, ক্ষেত গ্রামবাসীরা কি ভাবে ব্যবহার করবে চাষ-আবাদ বা চারণ-ভূমির কাজে লাগাবে, কোন এলাকায় কি ভাবে পশু রাখবে পশুপালন ও উৎপাদনের কাজই বা কি ভাবে চালাবে ইত্যাদি বিষয়ে দেখাশুনো করা। সাধারণ নিয়মগুলি গ্রামবাসীরাই বেঁধে দেয় কাগজে লেখে, নাউয়াকেই সেই কাগজ দেয়। তার তখন কাজ হলো, সেই নিয়ম মানা হয় কিনা তারই ওপর নজর রাখা এবং লোকেদের মানতে বাধ্য করানো, নিয়মভঙ্গ হলে জরিমানা আদায় করা বা মাপ করা। জরিমানাও অদ্ভুত। অপরাধ সামান্য হলে খানিকটা মদ আদায় করা এবং নিজেই তার সদ্ব্যবহার করা। গুরু অপরাধে অর্থদণ্ড ও সে টাকা ব্যয় হয় গ্রামের কোন মন্দিরের কোন কাজে। নউয়ার বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপিল নেই। তারই উপর পূর্ণ বিশ্বাস, সম্পূর্ণ ক্ষমতাভার। যদি জনসাধারণের মনে হয়, নউয়া অবিচার করেছে, তার প্রতিকারের একমাত্র অস্ত্র, সেই লোককে আর নউয়া না করা। সেই কারণেই, নউয়ার নিয়োগ মাত্র প্রতি বছর চাষ আবাদের কয়েক মাসের জন্যে। বছর বছর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গ্রামের অনেককেই এই কাজের ভার দেওয়া হয়। নতুন দায়িত্ব পেয়ে নতুন লোকের কাজের উৎসাহও থাকে, গ্রামের যে-কেউই গ্রামশাসনের এই ভার পেতে পারেন—সেই সাধারণ প্রত্যাশাও বিধিমতো নিয়মপালনে সহায়তা করে। আর এক ধরনের নউয়াকে ভার দেওয়া হয়, গ্রামের মধ্যে ও নিকটের জঙ্গলের গাছপালা সংরক্ষণের কাজ। এ-সব অঞ্চলে দেখেছেনই গাছপালা বিরল। গ্রামের কাছে যে বন, তাও এমন বড় নয়। তাই গাছ কাটার কড়া নিয়ম। গ্রামের বাইরে গোচারণ সম্বন্ধেও তেমনি কড়াকড়ি। যাতে সব ঘাস ফুরিয়ে না যায়। কে, কি কারণে, কতোখানি, কোথা থেকে কাঠ সংগ্রহ করবে, জঙ্গল যাতে লোপ না পায়,—তারই ওপর ঐ নউয়ার সতর্ক দৃষ্টি থাকে। গ্রামবিশেষে প্রয়োজনমতো এই

ধরনের একাধিক নউয়ারও নির্বাচন হয়। এদের কার্যকাল, পূর্ণ এক বছর। তারপর তাদের কার্যাকার্যের উপর পুনর্নির্বাচন নির্ভর করবে। এই সব ব্যাপারে অপরাধীদের বিচার ও জরিমানা আদায় হয় বছরের শেষে,—ও-সো উৎসবের পরেই। সাধারণ সভার যে দোষী সাব্যস্ত হয়, সে তার গত বছরের আইন-ভঙ্গের কারণে এক বোতল মদ দিয়ে দোষ স্বীকার করে। গুরুতর অপরাধে এখানেও অর্থদণ্ড হয়। সেই আদায়-করা মদ তখন সেই সভায় পরিবেশন করা হয় এবং গাম্ভীর্য পূর্ণ বিচারকক্ষের পরিবেশ তখন ঘরোয়া মজলিশের রূপ নেয়।

সঙ্গী এতক্ষণ একটানা কথা বলে যেন একটু দম নেয়। তার পরে ধীরে ধীরে বলে, দেখুন, এতক্ষণ যা বললাম সবই হলো আমাদের দেহধারণের প্রয়োজনে নিয়মকানুন বানানো এবং তার প্রয়োগবিধি। তারই ভিত্তিতে এখনকার পৌরব্যবস্থা ও সামাজিক আচার-ব্যবহার গড়ে ওঠে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই সব প্রথাগুলি যে কার্যকরী হয়েছে তার মূল হেতু,—আমাদের ধর্মবোধ। শেরপাদের ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের কথা পরে বলছি, আগে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন পর্বটা শেষ করি। নিশ্চয় নজর করেছেন, আমাদের আসল গ্রামে বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী মঠ বা মন্দির থাকে। বসত-বাড়ি থেকে এর পার্থক্য দেখলেই ধরা যায়। মঠ-বাড়ির মাথার ওপর পিতলের চূড়া বা কলস থাকে। বাড়ির প্রাচীরের গায়ে ও ভিতরের দেওয়ালে নানান্ রঙের চিত্র আঁকা, মন্ত্রাদিও লেখা। পতাকাদি তো থাকেই।

বলি, এখানকার মঠে এখনও ঢুকি নি। অন্য দেখেছি। সবই প্রায় এক-ধরনের—কোনটা বড়, কোনটা ছোট।

মাস্টার বলে, ছোট-বড় আকার যেমনি হোক, সর্বত্রই আমাদের ধর্মে বিশ্বাস ও ধর্মপালনে নিষ্ঠা প্রায় সমানই। এই সকল মন্দির গ্রামবাসীদের মিলনক্ষেত্র। সেখানকার প্রধান পুরোহিত থাকেন,—একজন লামা। কিন্তু তার দুজন সহকারী কর্মী থাকেন, তাঁরা গ্রামের জনসাধারণের নির্বাচিত। মন্দিরগুলের রক্ষণাবেক্ষণ, তার জন্য খরচাদি করা,—এসব কাজও যেমন তাঁদের করতে হয়, তেমনি যে-সকল পূজা পার্বণ, অনুষ্ঠান উৎসবাদি পালন করা নিয়ম, তারও যথোচিত ব্যবস্থার ও পরিচালনার ভার থাকে তাঁদেরই ওপর। এই বাবদে তাঁরা নিজেরাও খরচার অংশ দেন, সাধারণের নিকটও চাঁদা আদায় করেন। আবশ্যক অনুযায়ী অন্য লোকের মধ্যেও কাজ ভাগ করে দেন। ভাল ভাবে ও শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুষ্ঠানগুলি যাতে পালিত হয় তাই এই প্রতিনিধিদের ওপর প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া থাকে। এখানেও সেই একই নিয়ম। পালাক্রমে গ্রামের বাসিন্দারা একে একে এই কাজের ভার পান। ফলে, সকলের উৎসাহ ও প্রেরণা সজীব থাকে। এইবার রাজস্ব আদায়ের জন্যে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির কথা বলি। তার নাম পেম্বু—Pembu। এখানে করধার্যকরণের সরকারী এক বিচিত্র প্রথা আছে। অবশ্য, বলতে পারেন, জমির উপর কর-নির্ধারণের সেটা কোন পদ্ধতিই নয়। তার কারণও সহজেই

বোঝা যায়। সরকারী দপ্তর থেকে আমরা এমনি দূরদূরান্তরে থাকি যে কে এখানে এসে আর জমির মাপজোখ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি করে। অতএব, জমির পরিমাপের ওপর করধার্য হয় না। এক-একজন পেমবু মোট কতো টাকা আমানত করবেন, গভর্ণমেণ্ট শুধু তারই নির্দেশ দেয়। পেমবু তাঁর অধীনস্থ অধিবাসীদের মধ্যে বিচার করে ঠিক করে দেন, কার কতো টাকা দিতে হবে। পেমবুর অধীনস্থ করদাতা যদি সে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে গিয়েও বসবাস করে, তাহলেও তার টাকা দেওয়ার দায়িত্ব থেকে যায়। এই কারণে কোন কোন পেমবুর অধীনস্থ করদাতা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও ছড়িয়ে থাকে। এদিক থেকে দেখলে পেমবুকে একটা বিশেষ গ্রামের মাতব্বর বা 'মুখিয়া' বলা চলে না। সে তা নয়ও। তবুও, তার আরও কয়েকটি বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকে। এই যেমন, গ্রামের মধ্যে জমির হস্তান্তর হলে বা নতুন জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে, পেমবুর সহায়তা গ্রহণ করা প্রথা।

বলি, তা হলে পেমবুকেই সরকারের একরকম প্রতিনিধি বা কর্মচারী বলা যেতে পারে।

মাস্টার এখনি আপত্তি জানায় মোটেই না। গভর্ণমেণ্টের কর আদায়ের দায়িত্ব সে নেয়,—সরকারী কর্মচারী ভাবে নয়—গ্রামেরই মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে। মনে রাখবেন, এই যে সব গ্রাম-প্রতিনিধির কথা বললাম, এরা কেউই মাইনে পায় না। উলটে বরং তাদের নিজেদের কর্তব্যপালনে খরচ হয়ে যায়। তা এরা স্বেচ্ছায় সানন্দে করে। কেন না তারা, এরা বা গ্রামের কল্যাণে—অর্থাৎ নিজেদের কাজে—ব্যাপৃত হয়। তবে সব দেশের মতো এখানেও মানুষ মাত্রেই থাকে এবং ক্ষমতার প্রয়োগ একটা আনন্দ বোধ করে। পেমবু যে গ্রামবাসীদেরই প্রতিনিধি, তাঁর নিয়োগে তার অধীনস্থ করদাতাদের সঙ্গে কী ধরনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তারই দু-একটা উদাহরণ দিই। এই ধরুন, বিবাহ দেবার সময় কারও হয়ত বাবা-কাকার মতন কর্তা নেই। অথচ অনুষ্ঠানাদি পালন করা চাই। কোন তাতে অসুবিধে নেই। পেমবুকে জানাও। তিনি-ই তখনি হবেন অভিভাবক বা কন্যাকর্তা। বিবাহের খরচ দেবার সংস্থান নেই? তারও বা ভাবনা কী? পেমবু রয়েছেন। তিনিই হাসিমুখে সাহায্য করবেন। এ তো গ্রামেরই দায়িত্ব, তাই তাঁরও কর্তব্য। আবার অপর দিকে, গ্রামের কেউ মারা গেল উত্তরাধিকারী না রেখে। তাতেই বা কী? মৃতের শ্রাদ্ধ? পেমবুই করবেন। সম্পত্তি তাও তিনিই পাবেন।

বলি, পেমবুই দেখছি তোমাদের গ্রামের অভিভাবক,—গ্রামের এবং নেতা তো বটেই।

সে বলে, তা ঠিক নয়,—কয়েকটা ব্যাপারে মাত্র। যেমন দেখুন, সামাজিক কোন অন্যায় আচরণ বা কোন বিবাদ বিসম্বাদে পেমবুকেই যে মধ্যস্থ করা হয়ই, তা নয়। সেটা অনেক সময়ে নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। তাঁর পদমর্যাদায় নয়। তেমনি, পেমবুই যে সব সময়ে গ্রামের নেতা হবেই, তাও বলা যায় না। গ্রামের অন্য অর্থবান্ ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকতে পারেন।

তিনিই কাজ-কর্মে নেতৃত্বের ভার নেন—নিজেরই প্রতিপত্তি ও প্রতিভাবলে। তিনি হয়ত কোনো পদের জন্যে কখনো প্রার্থী হন না।

বলি, পেম্‌বু মারা গেলে আবার কে পেম্‌বু হয়?

সে বলে, তার ছেলে বা কোন আত্মীয়কে সে-পদে নির্বাচন করা হবে কিনা, নির্ভর করে সেই ব্যক্তির কর্মক্ষমতার উপর। সাধারণতঃ ছেলেকেই করা হয়।

প্রশ্ন করি, তোমাদের সারা খুম্বুর সব গ্রামগুলিতেই এই সব প্রথার প্রচলন বললে, কিন্তু নতুন যারা এসে এই অঞ্চলে বসবাস করছে, তারাও কি এই সব বিধিনিয়ম মানে?

সে বলে, তিব্বত-থেকে-আসা খাম্বাদের কথাই নিশ্চয় ভাবছেন। তারাও এ-নিয়মগুলো নিজেদের স্বার্থে মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাদের নিজেদের কোন আচার-বিধির ব্যবস্থাও নেই, আর এসেছেও এখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে, মিলে-মিশে থাকতে। তাই ওদিক থেকে কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। এইবার শের্‌পাদের ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের বিষয়ে বলছি শুনুন। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে আমাদের ধর্মাচরণের অঙ্গাঙ্গ সম্বন্ধ। এ-যেন দুই নদীর স্রোতের সঙ্গম, এক হয়ে এগিয়ে চলে। শের্‌পারা তিব্বতী মহাযান বৌদ্ধ। 'ঙ্মাপা' – Ningmapa সম্প্রদায়ের। দালাইলামা আমাদের প্রধান গুরু। শের্‌পাদের পূর্বপুরুষেরা যখন এদেশে আসেন ধর্মগ্রন্থ তো সঙ্গে আসেই, তিব্বতে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, ধর্মচর্যা ও উপাসনার বিবিধ পদ্ধতিও এই নতুন দেশে শিকড় গাড়ে। গ্রামে গ্রামে, পথে-ঘাটে, পাহাড়ের গায়ে, পাথরের দেওয়ালে সব মন্ত্র ফুটে ওঠে—'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—সর্বত্র আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে ডাগোবা, চোর্টেন, মণিপ্রাচীর। ঝরনার স্রোতে পাকচক্কিতে ঘোরে ধর্মচক্র।

উৎসাহিত হয়ে জানাই, সে তো শের্‌পা-দেশে ঢোকবার পর থেকেই দেখে এলাম। এ পথের ঐ যেন নিত্যসাথী। পথে পথে যেন—আমাদের ভাষায় বলা যায়—'হরির লুট' ছড়িয়ে দিয়েছে।

সঙ্গী বলে, এটা তো বাইরে-ছড়ানো ধর্মাচরণের চিহ্নগুলি দেখলেন। অন্তরেও আমরা ধর্মে পূর্ণ-বিশ্বাসী। দৈনন্দিন জীবনে ধর্মমতানুযায়ী আনুষ্ঠানিক আচার-নিয়ম তো মেনে চলিই, এমন কি লোকেদের সঙ্গেও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করি না। সাধারণ গৃহস্থের ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি নিষ্ঠাও। অন্যায় কর্ম সহজে কেউ করে না, করার কথা ভাবেও না।

আমি বলি, এই কারণেই অনেক বই-এ শের্‌পাদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখা যায়,—তারা দৃঢ়চরিত্র, সদাচারী, ধর্মনিষ্ঠ, সদালাপী।

সে বলে, ওগুলি এখন আমাদের সহজাত সংস্কার হয়ে গেছে বলতে পারেন,—শের্‌পাদের জাতিগত ঐতিহ্য—tradition। কি করে গড়ে ওঠে তাও বলি। আমাদের ধর্মবিশ্বাস এমনি প্রগাঢ় যে গৃহস্থঘরের অনেক ছেলেই সাধুজীবন গ্রহণ করে। কেউ কেউ পূর্ণ সন্ন্যাস নেয়, নিভৃত গুহায় কঠোর জীবন কাটায়। কেউ ব্রহ্মচারী বা লামা হয়ে মঠে-মন্দিরে থাকে। কেউ বা মঠে থেকে, ধর্মশিক্ষা নিয়ে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে আসে। আমাদের তো অন্য

কোন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। আবার, কয়েকজন লামা হয়ে গ্রামে ফিরে পূজারী বা পুরোহিতের পেশা নেন। গ্রামে গ্রামে এই ধরনের পুরোহিতের যথেষ্ট চাহিদা। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত শেরপারা নিজেরা ঘরে ধর্মগ্রন্থ তো রাখেনই, নিয়মিত পাঠও করেন। ঘরে ঘরে নিত্যপূজার বিধিও থাকে। কিন্তু পূজা-পার্বণে বা সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানে গৃহস্থবাড়িতে পূজারীদের প্রায়ই ডাক পড়ে। এইভাবে একটা ধর্মময় পরিবেষ্টনে আমাদের দিন কাটে। কিন্তু ধর্মের সূক্ষ্ম মূল তত্ত্ব নিয়ে জীবনযাপন করেন উচ্চকোটির সাধু বা লামারা। তাঁরা আর সংখ্যায় কয়জনই বা? সাধারণ গৃহস্থরা সে-সব গূঢ় তত্ত্ব না বুঝলেও ধর্মবুদ্ধিহীন নয়। আমরা নিত্যকর্মের পাপপুণ্যে মানি, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি। আমাদের ধর্মমতে, প্রতি মানুষকে আদর্শ মানুষ হতে হবে— ভগবান বুদ্ধদেবের মতন। আচার বা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করা পাপ। পাপের ফল অনুযায়ী পরজন্মে দুঃখভোগ থাকে, জন্ম থেকে জন্মান্তরের চাকা ঘুরেই চলে। এই জীবনে পুণ্যপ্রদ সুকর্ম করে যাও, পরজন্মে তার সুফলও পাবে। শেরপাদের ধারণায় সদাচার কি তাও বলি: নিয়মিত ধর্ম অনুষ্ঠান কর। ধর্মগ্রন্থ পাঠ কর। নিজে না পার, অপরকে দিয়ে করাও। মন্দির, চোর্টেন, মানিপ্রাচীর ইত্যাদি তৈরি করাও। ঐ সব পুণ্যকাজে অর্থব্যয় কর। মন্দিরে দীপ ধূপ জ্বালাও। পূজা, ভোগ চড়াও। উৎসবের বাদ্য বাজাও। মানুষে মানুষে সদ্ভাব রাখ। সবারই সঙ্গে সদাচরণ কর। তাদের সেবায় ও উপকারে আত্মনিয়োগ কর। দীনদরিদ্রে দান কর। শীতবস্ত্র দাও। লামাদের ও ক্ষুধার্তকে ভিক্ষা দাও। জনসাধারণের উপকার-উদ্দেশ্যে পথঘাট, সেতু, পান্থশালা নির্মাণ কর। মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটলে মধ্যবর্তী হয়ে মিটিয়ে দাও। সর্বজীবে দয়া কর। ইত্যাদি। শেরপাদের নিকটে এ সব নিছক আদর্শ নীতিবাক্যই নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলি মেনে চলার ও ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। ঠিক তেমনি এ-সবের বিপরীত কাজগুলি পাপ বলে পরিগণিত হয়। তারও কিছু উদাহরণ দিই। প্রত্যেক মানুষের মান মর্যাদা সম্ভ্রম বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য শেরপারা মানে। তার প্রতিকূল কোন আচরণ অতীব অন্যায়, আমাদের মতে মূলে বিশ্বাস। বিবাদ বাধানো, চুরি করা, ঠকানো— বিশেষতঃ ব্যবসাক্ষেত্রে,— কারও পিছনে তার নিন্দা করা, প্রাণিহত্যা, পরস্ত্রীগমন, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা বা তাদের মনে ব্যথা দেওয়া, কোন প্রাণীকে আঘাত করা, বনে আগুন লাগানো কিংবা অযথা গাছ কাটা, এমন কি ফুল পাড়াও, ইত্যাদি অতি গর্হিত কর্ম। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রতি মানুষের আপন মতে কাজ করার যে স্বাধীনতা এমনভাবে স্বীকার করা হয়, যে অপরাধীর আইনতঃ শাস্তি হলেও অন্যায়কারীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে কোন আক্রোশ বা বিরুদ্ধভাব পোষণ করা হয় না। সকলেই সহজে মেনে নেয়, পূর্বজন্মের কর্মফলেই তার এই দুষ্কৃতি, এবং এই পাপের ফলও যথাসময়ে সে ভোগ করবে, পরজন্ম তো আছেই —আমরা এই অপকর্মের জন্য তার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার কে,

এবং করে আমাদের লাভই বা কী ?

শুনে ভাবি, কী উদার মহান্ মনোভাব ! জগতের কোন্ এক অতি নগণ্য উপজাতি। অগম্য তুষার-অঞ্চলে এদের বাস। আধুনিই সভ্যজগতের আইন-কানুন বিধিনিয়মের জালে এখনও ধরা পড়ে নি। সুসভ্য-জগতের চোখে এরা অশিক্ষিত, অ-সভ্য। তবুও, কেমন এদের সহজাত ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ। প্রকৃতির এরাই হলো স্বাধীন সুখী সন্তান। মনে পড়ে যায়, John Dryden-এর কয়টি পঙ্‌ক্তি ঃ

"I am as free as nature first made man,
Ere the base laws of servitude began,
While wild in woods the noble savage ran."

এরা এখনও সেই noble savage-এরই জাত।

মাস্টার বলে, আর নয়,—এইবার আমাকে যেতে হবে। যাবার আগে একটা কথা জানিয়ে যাই। শেরপাদের সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ যদি মিটাতে চান, পড়বেন, নৃতত্ত্ববিদ্ Christoph Von Furer-Haimendorf-এর বইখানি ° The Sherpas of Nepal। তাতেই এ-সব কথা পাবেন।

বলি, সে-বই আমার জানা আছে। তবুও, এখানে বসে একজন শেরপার মুখে সেই সব কথা শোনারও আনন্দ অনেক। সে জানায়, আবার যদি আমাদের দেখা হওয়ার সুযোগ আসে, দুজনেই দুজনকে চিনতে পারব নিশ্চয়। এবার আর ভুলের অবকাশ থাকবে না।

হাসিমুখে করমর্দন করে। পাঁচিল ডিঙিয়ে আবার অদৃশ্য হয়।

আমি চেয়ে থাকি খুমলা পাহাড়ের চূড়ার দিকে। রোদে পাথরগুলি ঝক্‌মক্ করে। যেন, সহস্র নয়নে প্রসন্ন হাস্যের মধুর দীপ্তি নিয়ে শের্‌পা-দেবতা বলেন, এবার চিনলে আমার সন্তানদের ভাল করে ?

দুদিন পরে গিরমির দিদির বাড়িতে একটা পুজার অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়। আগের দিন সকালে এক লামা আসেন। তাঁকে ঘিরে সবাই বসে। কি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। গিরমির ভগিনীপতিই কেবল একপাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। হাতে জপের মালা ঘোরে, তবে কান থাকে আলোচনার দিকেই। মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক ঘাড়ও নাড়েন। লামা কি-সব নির্দেশ দিয়ে চলে যান।

তারপর ঘরের মধ্যে কাজের ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় থালা পাত্র, জিনিসপত্র তাক থেকে নামে, সিন্দুক থেকে বার হয়। ঘষা-মোছা চলতে থাকে। জিনিসগুলি আরও উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে। ঘরের একধারে সাজিয়ে রাখা হয়। জানলার ধারে সেই বসবার চৌকির উপরকার কার্পেট-আদি সরিয়ে খালি করা হয়। ধুলো ঝেড়ে সুপরিচ্ছন্ন করে। দেখায় যেন পালিশ করা প্রকাণ্ড এক কাঠের বেদি। দুপুরে লামা আবার আসেন। সাজানো জিনিসপত্র দেখেন। আরও দু-একটা বাসন বার হয়। বেদির

উপর কার্পেটের আসন পড়ে। লামা গায়ের জোব্বাজুব্বা খুলে রাখে বসেন। গিরমির দিদি প্রকাণ্ড একটা থালা ও আরও কয়েকটি পাত্র এনে লামার সামনে রাখেন। তারপর বার করে আনা হয়—প্রকাণ্ড একতাল মাখন ও আরও কি সব পদার্থ। বারকোশের মতো সেই থালায় মাখনের বিরাট পিণ্ড রেখে লামা অল্প ঠেসতে থাকেন। মনে পড়ে যায়, সেই আমাদের আগেকার দিনের যজ্ঞিবাড়ির কথা। রসুইকর বামুনের বারকোশের উপর তাল তাল ময়দা ঠাসা। কিন্তু, এখানে এত মাখন দিয়ে হবে কী? লেচি তো পাকায় না। দু'হাতের মধ্যে মাখনের টুকরো-ডেলা নিয়ে কি সব গড়তে থাকেন। বাঃ! চমৎকার হাতের কারিগরি তো! সাজিয়ে থালার উপর ও বিবিধ পাত্রে রাখেন। নানান্ রঙও তাতে লাগান। দেখতে হয়, অনেকটা আমাদের দেশের পুজো বা বিবাহাদি শুভকার্যের উপলক্ষে রঙিন-পিঠালি দিয়ে গড়া চূড়াকার মাঙ্গলিক শ্রী—বা চলতি ভাষায় 'ছিরির' মতনই। অনেক রকম জীবজন্তু, মানুষের আকারে পুতুলও গড়া হয়। তারপর সেই চৌকির উপর আর এক ছোট কাঠের চৌকি রেখে তাতে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন। যেমন, আমাদের লক্ষ্মীপুজোর সময় দেবীর বেদি পাতা হয়। সারাদিন কেটে যায় এই সব করতে ও সাজাতে। ওদিকে গিরমির দিদি ও তাঁর আরও কয়েকটি সঙ্গিনী উনুনে কী সব রান্নাবান্নায় ব্যস্ত।

পরের দিন। আজ ভোরেই ঘরে সাড়া জাগে। গিরমির দিদির আজ বিশেষ সাজসজ্জা। মুখেও একটা উদ্বেগ, চাঞ্চল্য, অথচ স্নিগ্ধমধুর গাম্ভীর্যের প্রকাশ। বৃহৎ ক্রিয়াকর্মের দিনে বাড়ির গৃহিণীর চোখেমুখে যেমন ফুটে ওঠে দায়িত্বের গুরুভার, গভীর আত্মবিশ্বাস, কর্ত্রীর সহজ শান্ত প্রসন্নতা। লামা আসেন। তাঁরও আজ জমকালো ঝলমলে বেশভূষা। মাথায় চূড়াওলা টুপি। আসনে বসে পুজো শুরু করেন। সুর করে মন্ত্র পড়েন। ধূপ-দীপ জ্বালান। দীপাধার হাতে আরতির মতন বেদির সামনে বরণও করেন। পুরোহিতের মতোই বাঁ হাতে ঘণ্টাও বাজাতে থাকেন। আসনে বসেই। ঘরের একধারে একটা দামামা। কেউ গিয়ে কাঠি দিয়ে বাজান। কেউ বা একটা লম্বা শিঙা ফুঁকেন। কারও হাতে পিতলের বিশাল খঞ্জনি, একটানা ঝম্‌ঝম্ শব্দ তোলেন। লামা মাঝে মাঝে একটা শাঁক দু'হাতে ধরে ফুঁ দিয়ে বাজানও। বাড়ির সকলে তো আছেনই, বাইরের লোকজনও এসেছেন কয়েকজন। সবারই সাজগোজ, আনন্দ, উন্মাদনা। গিরমির ভগিনীপতিরই কেবল বেশভূষার কোনো পরিবর্তন নেই, হাবভাবেও কোন উত্তেজনা নেই। এ-যেন চারপাশে ঝোড়ো-হাওয়ায়-মাতা গাছপালা, তিনিই শুধু নিথর নিস্পন্দ, গায়ে বাতাসই লাগে না। সকাল থেকে বেদির নিচে মেঝেতে আসন পেতে বসেন। এক মনে কি এক গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন। আরতি শেষ হয়। এবার সকলেই বেদির নিচে বসেন। লামা ঝোলা থেকে পুঁথি বার করেন। সুর করে পাঠ সুরু হয়। ভক্তিভরে সকলে শোনে। ভাবি এ তো আমাদের সত্যনারায়ণ পুজোর পাঠেরই মতন। সারা সকাল

কেটে যায় এইভাবে পূজা-অনুষ্ঠানে। দুপুরও খানিক গড়িয়ে চলে। পূজাপর্বও সাঙ্গ হয়। তখন পিঠে-পুলির মতো কি সব প্রসাদ বিতরণ চলে। আমাকেও অতি স্বল্প তার কণিকামাত্র গ্রহণ করতেই হয়, মনে হয় ছাতু, মাখন গুড় দিয়ে কোন পাক হবে। এরপর চায়ের পাট, সুরারও অঢেল পরিবেশন।

বসে বসে দেখি আর ভাবি, মাস্টার-বন্ধু এ সময়ে কাছে থাকলে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেত। দেখাই যাচ্ছে, আমাদের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে এদেরও পূজাবিধি-আচারের সাদৃশ্য কিছু কিছু আছেই। কে কার কাছ থেকে কতখানি নিয়েছে, অথবা একই তান্ত্রিক-ধর্ম-প্রভাবে উভয়েব বিকাশ কিনা, কে জানে? কিংবা হয়ত দেশ-কাল নির্বিশেষে মানুষের ভয়-ভাবনা, সংস্কৃতি-চিন্তাধারা খানিক একই ছাঁচের রূপ নেয়, সমভাবেই গড়ে ওঠে। এই প্রবাসে দুর্গম দূর-দেশে, ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে বসে, এই সুস্পষ্ট যোগসূত্র মনের মধ্যে মানুষে মানুষে একাত্মতাবোধের প্রশান্ত আনন্দ আনে।

ভাবি বঙ্গোপসাগরের বক্ষ থেকে উঠে আসা শঙ্খই কি আজ ধ্বনি তোলে হিমালয়ের গিরিশিখরে? আবার, তিব্বতের চমরীপুচ্ছের চামর দুলিয়ে ব্যজন করা হয় ভারতের মন্দিরে মন্দিরে।

এরই মধ্যে কুনডে থেকে একদিন চলি থিয়াংবোচি দেখতে।

সকালে চা খেয়ে যাত্রা শুরু। সাড়ে সাতটায়। রাত কাটবে থিয়াংবোচিতে। পরদিন বিকেলে আমার এখানে ফেরা। থিয়াংবোচি প্রায় তেরো হাজার ফুট। ভাবি, এমন কিছুই নয়। এর চেয়ে আরও ছয় হাজার ফুটেরও উপর রাত কেটেছে বরফের মধ্যেও। তাই, পোশাক ও শয্যা তেমন বেশি কিছু সঙ্গে বাঁধি না। এক রাত্রির তো ব্যাপার। খাবার ব্যবস্থাও সেই মতো চলে। গিন্নি তো মাল বইবে না। তাই পোর্টারও একজন আসে। দেখি, 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে মুখটি বাড়ায়ে' সেই যণ্ডামার্কা গুণ্ডা আও দোরজে। গিন্নিকে বলি, ও কী, ও বাড়ি যায় নি?—দোরজে বোধ হয় বোঝে, মুখ টিপে হাসে। গিন্নি বলে ঘর থেকে ঘুরে এসেছে,—পাংবোচেতে তো বাড়ি —ঐ থিয়াংবোচি ছাড়িয়েই। কতোক্ষণই বা লাগে যেতে-আসতে? শুনে ভাবি, তাই-ই তো। পথের দূরত্ব ও দুর্গমতা নির্ভর করে যে যায় তারই উপর। আমার কাছে যেটা অ্যাডভেঞ্চার, ওর কাছে সেটা পাড়া-বেড়ান!

কুনডে ছাড়িয়ে সোজা পথ। পাহাড়গুলির আবেষ্টনে বিস্তীর্ণ ময়দান। ধীরে ধীরে নিম্নমুখী পথ নেমে চলে। কুনডে গ্রাম খুমলো গিরিচূড়ার পাদদেশে। এখানে সেই পাহাড়ের কোল বেয়ে নামা। অদূরে ঐ আমা ডাবলাম-এর সূচ্যগ্র শিখর। বাহু বিস্তার করে স্থির, ধ্যানমগ্ন। আর একপাশে কাংটেগা,—সেই ঘোড়ার জিনের আকার। সকালের রোদ পড়ায় তুষারচূড়াগুলির রজতদীপ্তি। ঐ শিখরগুলির ও এ-পাশের গ্রামের মাঝখানে দুধকোশি নদীর উপত্যকার ব্যবধান।

কুনডে থেকে এগিয়ে আসতে পথের উপর ছোট ঝরনা। তারপরই মাঠের শেষে খুমজুং গ্রাম। কুনডে থেকে মাত্র আধ মাইলটাক দূর। মিনিট দশও লাগে না পৌঁছুতে। কুনডের চেয়ে বড়। কুনডেতে ৪৫ ঘর লোকের বাস, এখানে ৯৩ ঘর। বাড়িগুলি দেখতে সেই একই ধরনের। অধিকাংশই দোতলা। পাথরের গাঁথনি। কাঠের কারুকার্যময় দরজা-জানলা। ঢালু ছাদ। তেমনি পাঁচিল-ঘেরা। তেমনি আলুর চাষের জমি। প্রাকৃতিক দৃশ্যও একই রকম। যেন, একই মায়ের মুখশ্রীর আদল-পাওয়া পিঠাপিঠি দুই বোন,—বয়সেই শুধু ছোট-বড়। রাস্তার বাঁদিকে গ্রাম। ডানদিকে দুটো পাহাড়ের খাঁজে একফালি লম্বা মাঠ। তারই একধারে চমৎকার একটা বাংলো। করোগেট ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। রূপোর মতো চকচক করে লম্বা বাড়ি। একতলা। সুমুখদিকে টানা বারান্দা। সারি সারি কাঁচ-বসানো জানলা। ঐটিই হিলারীর করে-দেওয়া খুমজুং স্কুল-ঘর। এগিয়ে দেখতে চলি। এতো সকালে স্কুল বসে নি। দরজা বন্ধ। কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে কিছু দেখা যায়। ঝকঝকে চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বই,—দেওয়ালে টাঙানো ছবি, মানচিত্র। দেখে ছোট বয়সে ফিরে গিয়ে ছাত্র হতে ইচ্ছা জাগে।

কিন্তু, এখন মন টানে থিয়াংবোচি। উৎসাহভরে সেই পথে এগিয়ে চলি। গ্রাম ছাড়বার অল্প পরেই মাঠ শেষ হয়। দুদিকের পাহাড় বাহু মেলে ঘিরে আসে। মাঝখানে পাহাড়ী ঝরনা অন্তরাল ঘটায়। কলকল শব্দে শিলাবহুল সোপানপথে নেমে চলে নিচের দিকে। জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। জলের সন্ধান ও দু'পাহাড়ের ছায়ার সুযোগ পেয়ে সবুজ গাছপালা জটলা করে ঝরনার আশপাশে ঝুঁকে পড়ে। বনের ঝোপজঙ্গল শুরু হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে পথও ত্বরিৎগতিতে ঝরনার তালে তাল রেখে নিচে নেমে চলে দুধকোশির উপকূলে।

হুড়হুড় করে নামা। তবে, পথ সুগম। হাঁটার কষ্ট নেই। প্রাণে আনন্দই জাগে। চারিদিকের প্রাকৃতিক রূপস্পর্শ মন মুগ্ধ করে রাখে।

সওয়া নটায় দুধকোশির তীরে পৌঁছাই। ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট লাগল। বুঝতেই পারি নি কোথা দিয়ে সময় কেটেছে।

নামচে থেকে সরাসরি থিয়াংবোচি যাবার পথ এইখানেই এসে মেশে। অল্প গিয়েই দুধকোশি ও ইমজাখোলার সঙ্গম। আরও সব পাহাড়ী ঝরনা নেমে আসে। জায়গার নাম ফুনগুটিংগা—**Phungutinga**। ১০,৮০০ ফুট উঁচুতে। শুনে, গিরমিকে বলি, তাহলে তো প্রায় দু'হাজার ফুট নেমে এলাম।

গিরমি হেসে দেখায়, ঐ সামনেই পাহাড়ের গা বেয়ে আবার পথ গেছে উঠে, আবার প্রায় দু-হাজার ফুট ওঠা। ঐ পাহাড়েরই মাথায় থিয়াংবোচি।

বলি, বেশ তো। তাই-ই ওঠা যাবে।

গিরমি জানায়, তার আগে দুপুরের খাওয়া এখানেই চুকিয়ে নেওয়া যাক।

নদীর উপর ছোট পুল। ভাঙা পুলটা মেরামত করে কাজ চালানো। ওপারে পাথরের আড়ালে জলের ধারেই রান্নার ব্যবস্থা হয়। পাশেই একটা

ঝরনার বুকে জেগে-ওঠা প্রকাণ্ড একটা পাথর,—ওপরটা সমতল। জল ডিঙিয়ে সেইখানে যাই। পা ছড়িয়ে বসি। জলের ছোট ছোট ঢেউগুলি সেই পাথরের চারিদিক ঘিরে যেন কলহাস্যে করতালি দেয়। আকাশ থেকে স্নিগ্ধ রোদ নেমে আসে তার তপ্তমধুর পরশ নিয়ে। পুলকভরা মনে বিশ্রাম নিই। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি নদীর কাকচক্ষু নির্মল নীল জলের দিকে।

হঠাৎ স্মরণে আসে, শেরপাদের এক বীভৎস বিচিত্র প্রথা। মৃতদেহের সৎকার এরা করে। কিন্তু, বসন্ত রোগে মৃত্যু ঘটলে শবদেহ পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেয়—নদীগর্ভে। হিমালয়ের তুষারনিঃসৃত স্ফটিকস্বচ্ছ ঐ নদীধারা।

কেউ কি কখনো সন্দেহও করতে পারে, সেই নদীরই উপরদেশে কোন পাথরে হয়ত আটকে আছে বিষাক্ত গলিত শবদেহ ?

শেরপারা অতো পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিমান, বিবেচক। তবুও এই তিব্বতীয় প্রাচীন প্রথা এখনও কেন মেনে চলে, বুঝি না।

বেল এগারটা চল্লিশ। আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত। গিরমিরা বাসনপত্র মেজে গুছিয়ে বাঁধে। আমি এগিয়ে চলি। বলি, এস তোমার পথ তো এই একটাই ?

চড়াই তো চড়াই-ই। উঠেই চলি। তবে নাক-সোজা ওঠা নয়। ডান দিকে নদী। তারই সঙ্গ ছেড়ে, পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে, ক্রমে ক্রমে উপরদিকে ওঠা। নদীও ক্রমশঃ নীচে দূরে সরে যায়। কদিন হয়ত কুনডের আবহাওয়ায় বাস করা ও ঘোরফোরার ফলে এই চড়াই-পথ ধাত-সহ ও সহজই মনে হয়। পথের অপরূপ রমণীয়তাও মন ভুলিয়ে রাখে। দুপাশে Fir ও Birch-এর বন। পথের উপর ঠিক-দুপুরের রোদ। তারই ওপরে গাছের ডাল-পাতার ডোরা-কাটা ছায়া। কে যেন ফুল-তোলা রেশমী চাদর বিছায় পাথর-ছড়ানো পথের গায়ে। মৃদু বাতাসে ডালপালা দোলে। মাটিতে ছায়াময় রেখাগুলি কাঁপে। দুধের ছেলে যেন কাঁথা গায়ে মিটমিট করে দেখে। আমিও তাকাই বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টি নিয়ে। গাছের ফাঁক দিয়ে, সুমুখে পথের দিকে, যেদিকে তাকাই—সেই শান্ত স্থির মহান্ তুষারশিখর। মনে হয়, যেন হঠাৎ-ই চলে এসেছি তাহাদেরই অতি নিকটে। মনে নবীন উন্মাদনা জাগে। কে যেন কাছে এসে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে।

ভাবতে থাকি, একটু পরেই পৌঁছে যাব—থিয়াংবোচি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরি-শিখরের পাদদেশে সেই আমার কতো-কালের স্বপন-মাধুরী-মাখা স্থান। কৈলাস-বাসিনী শিব-সীমন্তিনীর আলতা-রাঙা চরণ দুটির স্পর্শ নিয়ে, ছোট্ট আমার প্রণামটুকুই রেখে আসা,—সেই তো আমার আকাঙ্ক্ষা। সত্যই কি আজ চলি সেইখানে ? দুরুদুরু বুক কাঁপে আনন্দের ভারে, যেন এসেই গেলাম এতদিনে মায়ের মন্দিরদ্বারে।

'এভারেস্ট-বিজয়-অভিযান' ? নগণ্য ক্ষুদ্র-শক্তি আমার সে নয়। শুধু

অসামর্থ্যের কথাই নয়, রুচিতেও আমার বাধে। যাঁকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, হৃদয় ভরে ভালবাসি, দেবতা বলে মানি,—সেই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়-গৌরব ঘোষণা,—সে যে আমার অতি ঘোর দুঃস্বপ্নেরও অতীত। কেবল একটু-নিকটে-যাওয়া, নয়ন-ভরে চেয়ে দেখা, ছায়াতলে একটুখানি বসা,—এই আশাতেই বুক বেঁধে মোর আসা। সেই মুকুলিত আশা আজ ফলবতী হয়ে ওঠে।

থিয়াংবোচি,—নামটির সঙ্গে জগতের দীর্ঘদিনের পরিচয় নয়। কালের দীর্ঘতা দিয়েই সব সময়ে পরিচয়ের গভীরতার পরিমাপও চলে না। এভারেস্ট—নাম,—সেও তো হালফিলের। কিন্তু, হিমালয়ের গুণগরিমা কীর্তিত হয়েছে প্রাচীন ঋষি ও মহাকবিদের মুখে। সেকালে সুপ্রসিদ্ধ শিখরের নাম শোনা যেত,—গৌরীশংকর, শ্রীকৈলাস আদি। সে-নামের শিখর এখনও আছে। পরন্তু, আধুনিক কালে নিরূপিত হয়েছে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর ওগুলির কোনটিই নয়। ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যকালে হিমালয়ের পার্বত্যদেশে জরিপের মাপজোখ চলে। ১৮৪৯ সালে যে শিখরটি Peak XV—১৫ নং চূড়া চিহ্নিত হয়ে সার্ভের নথিভুক্ত হয়, কেউই তখন জানে না ভাগ্যবিধাতা তারই ললাটে জগৎ-জোড়া খ্যাতির উজ্জ্বল তিলক এঁকে রেখেছেন। এই গুপ্ত গৌরব প্রকাশিত হয় তিন বছর পরে। ১৮৫২ সাল। জরিপ-করে-আনা মাপজোখের অঙ্কের যথারীতি হিসাবাদি করেন সার্ভে দপ্তরের দেরাদুনের হেড অফিসে সেখানকার কম্পিউটাররা। প্রকাশ পায়, শিখর ১৫ নং-এর উচ্চতা—২৯,০০২ ফুট। প্রমাণিত হয়, এই-ই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর।* প্রায় একশ' বছর পরে পুনর্গণনায় দেখা যায় ঐ শিখরের উচ্চতা—২৯,০২৮ ফুট। জগতের শীর্ষদেশ,—নামও তো তার একটা চাই। ১৮৫৬ সালে তাই ১৫ নং শিখরের নাম দেওয়া হয়,—মাউন্ট এভারেস্ট। সার্ জর্জ এভারেস্ট ১৮২৩ সাল থেকে ১৮৪৩ পর্যন্ত ভারতীয় জরিপ দপ্তরের সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার সর্বপ্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁরই স্মৃতিরক্ষাকল্পে। সেই নামেই এখনও এর জগতে পরিচয়। এই শিখরের উত্তর অংশ তিব্বতের অন্তর্গত। দক্ষিণ ভাগ,—নেপাল রাজ্যভুক্ত। এভারেস্টের নামকরণ যখন হয় সে সময়ে নিশ্চয়ই জানা ছিল না, তিব্বতীদের কাছে এই সু-উচ্চ-চূড়া শুধু প্রসিদ্ধই নয়, তিব্বতী ভাষায় অতি মধুময় এক নামও তার আছে—প্রাচীন কাল থেকেই। Chomolungma—চোমোলুংমা—Goddess Mother of the world—দেবী জগজ্জননী। নাম দেখে এখন সন্দেহ জাগে মনে, প্রাচীন তিব্বতীরা কি জানত, পৃথিবীর এই-ই সর্বোচ্চ শিখর?

তিব্বতীদের দেওয়া, এই শিখরের, আরও একটি পুরানো নাম সম্প্রতি

---

* মনীষী রাধানাথ শিকদার সে সময়ে সার্ভের চীফ্ কম্পিউটারের পদে কলকাতার দপ্তরে অধিষ্ঠিত। এই কারণে, পরবর্তী কালে তাঁর নাম এভারেস্ট-আবিষ্কার প্রসঙ্গে কেউ কেউ সংযুক্ত করেন।

জানতে পাই। ন'শো বছরেরও আগের কথা। প্রখ্যাত তিব্বতী মহাযোগী মিলারেপা জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্টীয় ১০৫২ সালে। তিনি শুধু কঠোর তপস্বীই নয়, অসাধারণ কবিত্বশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। তিব্বতে আজও তাঁর রচিত গানের জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচার আছে। এই পর্বতচূড়ার—আধুনিক মাউন্ট এভারেস্টের, উত্তর অঞ্চলে চুবাব গুহায় দীর্ঘকাল তিনি তপস্যা করেন। জগতের ঐ সর্বোচ্চ শিখরের উদ্দেশ্যে এক বন্দনাগীতিও রচনা করেন। মিলারেপার সেই কবিতায় এভারেস্ট তুষার-চূড়ার অপর এক তিব্বতী নাম পাওয়া যায়,—গঙ-স্, মু-থান, মু-খিঙ্, গাল্-মো। বাঙলায় তার অর্থ,— "মহাতুষারের নীলরানী"। স্থানীয় তিব্বতীদের বিশ্বাস, নীল-পাথর হিমগিরির সুদীর্ঘকালব্যাপী পুঞ্জীভূত তুষারেরই এক অশরীভূত রূপান্তর। তাই এই নামকরণও।

[তিব্বতী ভাষাবিদ্ অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক মূল তিব্বতী থেকে কবিতাটির বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁরই সৌজন্যে এই নূতন সংবাদটি পাওয়া।]

অধুনা, নেপালী ভাষাতেও এই শিখরের এক নামকরণ হয়েছে,—সাগরমাথা।—সসাগরা পৃথিবীর শিরোভূমি।

আকাশের কোলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভূভাগ। ঊর্ধ্বলোকে জগতের সীমা। পাশ্চাত্য জগদ্বাসীর কানে সে-সংবাদ পৌঁছয়। দুঃসাহসী মানুষের প্রাণে সাড়া তোলে। কল্পনাবিলাসী স্বপ্ন দেখে। অজানাকে জানা, দুষ্প্রাপ্যকে পাওয়া, দুর্জয়কে জয় করা,—মানবদেহীর জন্মগত সাধনা। সেই অপূর্ব অপরিচিত ভয়ংকর দেশ প্রবল ভাবে টানতে থাকে অসীম সাহসী মানুষের মনকে। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখাপানে যেন তারা ছুটে যায় পতঙ্গের দল। সেই সুদূর দুর্গমের রহস্যভেদের অভিযান শুরু হয়। উচ্চাভিলাষের বেদিমূলে প্রাণও হারায়। দীর্ঘ ষাট বৎসর ব্যাপী সেই স্বপ্নময় সংকল্পেরও অবশেষে জাজ্বল্যমান সাফল্যের রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

যতোদূর জানা যায়, ১৮৯৩ সালে প্রথম এভারেস্ট অভিযানের প্রচেষ্টা। চার্লস ব্রুস্ ছিলেন উদ্যোক্তা। কিন্তু যাত্রারম্ভই সম্ভব হয় না। নেপাল ও তিব্বত—দুই রাজ্যেই তখন বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ। ১৯০৭ সালে লংস্টাফ্ ও মম্-এর সহযোগিতায় আবার ব্রুস যাত্রার আয়োজনের চেষ্টা করেন। সেই একই রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক বাধার সৃষ্টি করে। বিশ্বযুদ্ধ বাধে। থামেও। আবার আশার প্রদীপ জ্বলে অভিযাত্রীদের মনের কোণে। তিব্বত-সরকারের অনুমতিও মেলে এতকাল পরে। আরম্ভ হয় অভিযানের পর অভিযান। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। দুর্গম পথহীন পথে বিভীষিকাময় তুষার-রাজ্যে দুঃসাহসী মানুষ প্রাণ হারায়, তবুও অভিযানের উৎসাহ শিথিল হয় না। জগতের শীর্ষদেশ স্পর্শ করার পণ করেছে মানুষ।

এভারেস্ট-আরোহণের এ-সকল চেষ্টাই হয় শিখরের উত্তর দিক থেকে

তিব্বতের মধ্যে দিয়ে। তিব্বতের মালভূমির সুদীর্ঘ চার শত মাইল অতিক্রম করে তবে পৌঁছতে হতো এভারেস্ট গিরিশ্রেণীর পাদমূলে। এর প্রায় সব অভিযানই ব্রিটিশদের আয়োজিত। তাদেরই তখন ভারতে প্রভুত্ব ও জগতে প্রতিপত্তি। তাই যেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে প্রথম পদক্ষেপ করার তাদেরই দাবী।

এইকালের এভারেস্ট-অভিযানের তালিকা ও ফলাফল দেখলে বিস্ময় জাগে।

১৯২১ সাল। প্রথম অভিযান। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা। সম্ভাব্য পথের সন্ধান করা,—**Reconnaissance**। নেতা,— চার্লস হাওয়ার্ড বেরি। **East Rongbuk Glacier** ও প্রসিদ্ধ **North Col**-এর (২২, ৯৯০ ফুট) প্রথম আবিষ্কার। **Base camp**-এর পথে ডাক্তার কেলাস্ (**Kellas**)-এর মৃত্যু ঘটে।

১৯২২ সাল। নেতা,—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চালর্স ব্রুস্। ২৭,৩০০ ফুট্ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়। সাতজন শেরপা হিমানী-সম্প্রপাতে— **avalanche**-এ প্রাণ হারায়।

১৯২৪ সাল। জেনারেল ব্রুস এবারও নেতা মনোনীত হন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার কারণে ই. এফ. নর্টনকে নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে হয়। এবার ২৮,১০০ ফুট্ পর্যন্ত উঠে অভিযান শেষ হয়। দুজন পোর্টারের প্রাণনাশ ঘটে। কিন্তু আর এক কারণে এই অভিযান স্মরণীয় হয়ে থাকে। ম্যালোরি ও আর্ভিন্ ৬নং শেষ তাঁবু থেকে শিখর উদ্দেশে যাত্রা করেন। চূড়ার পথে তাঁদের দেখাও যায়। তারপর আচম্বিতে মেঘজালে সব কিছু ঢেকে ফেলে। তাঁরাও চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হন। তাঁরা কতোদূর পৌঁছান, তাঁদের মৃত্যুর কারণই বা কী,—কিছুই জানা সম্ভব হয় না। জীবনের পটভূমি থেকে এভারেস্টের শিখরদেশে তাঁদের এই আকস্মিক অন্তর্ধান অভিযান-ইতিহাসে সকরুণ গৌরবোজ্জ্বল রেখা এঁকে যায়। নয় বছর পরে—১৯৩৩ সালে—এঁদেরই একজনের হাতের তুষার-কুঠার—**ice-axe**—প্রায় ২৭,৭০০ ফুট উঁচুতে দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৩৩ সালে হিউ রাট্লেজের নেতৃত্বে অভিযান। এবারও পূর্বের মতনই বিফল হয়। ২৮,১০০ ফুট্ পর্যন্তই ওঠা।

ইতিমধ্যে মানুষের অদম্য চেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলে আকাশে যাতায়াতের পথ খোলে। বিমানরথে শূন্যপথে মানুষ চলে উড়ে। ভাবতে থাকে, নাই-যদি-বা উঠতে পারি দুর্জয় ঐ গিরিচূড়ায় পায়ের চিহ্ন এঁকে, যাই না কেন, আকাশ-পথে উড়ে! বিহঙ্গের দৃষ্টি দিয়ে, উপর থেকেই দেখে আসি, কি আছে ঐ অদেখা তুষার-শিখর-দেশে।

সেই বছরই—১৯৩৩ সালে—এভারেস্টের ঊর্ধ্ব থেকে উড্ডীন সেই অভিযান—**Houston Mount Everest Expedition**। ফিরে এসে অভিযানের যে বিবরণীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার নাম দেওয়া হয়—**First over Everest (1933)**। বিমানপোত থেকে তুলে-আনা এভারেস্টের আলোকচিত্রগুলি

যেমনি অভিনব, তেমনি পরবর্তী অভিযাত্রীদের নিকট বহু মূল্যবানও।

১৯৩৪ সাল আসে। এক একক অসীম দুঃসাহসিক ইংরেজ—মরিস উইলসন— সংগোপনে যাত্রা করেন দার্জিলিঙ থেকে তিব্বত-অভিমুখে। ছদ্ম-বেশ ধরেন তিব্বতীয়। সঙ্গে নেন তিনটি মাত্র শেরপাকে। পৌঁছেও যান এভারেস্টের নীচে। ৩নং তাঁবু পর্যন্ত ওঠেনও। তারপর একাই উঠতে থাকেন পাহাড়ের আরও উপরে। এই হঠকারিতার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলে। অভিমন্যুর ব্যূহভেদের দুর্দশা ঘটে। পরের বছর সেই তাঁবুর নিকটে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর হাতে-লেখা ডায়েরি থেকে এই নিঃসঙ্গ মরণ-পণ অভিযানের এক কাহিনীও সঙ্কলিত হয়।

১৯৩৫ সালে দালাইলামার অনুমতিপত্র আসতে বিলম্ব হয়। তাই, এভারেস্ট অঞ্চলে কেবলমাত্র reconnaissance-এর অভিযান চলে। এরিক শিপটন্-এর নেতৃত্বাধীনে। এই অভিযানেই সর্বপ্রথম তেনজিংকে পোর্টার দলের মধ্যে দেখা যায়।

১৯৩৬ সাল। আবার হিউ রাটলেজকে নেতা করে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাধার সৃষ্টি করে। পাহাড়ের উপরে বিশেষ দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

১৯৩৮ সাল। এবারের নেতা,—এইচ ডবলিউ টিলম্যান। ২৭,২০০ ফুটের কিছু উপর পর্যন্ত উঠে অভিযান ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এর পর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অভিযানও বন্ধ থাকে।

তবুও, ১৯৪২ সালে রবার্ট স্কট্ নামে এক আমেরিকান, ১৯৫৫ সালে এণ্ড্রুজ নামীয় এক নিউজিল্যাণ্ডার, এবং ১৯৬৭ সালে কেনেথ্ নালি নামে এক ইংরেজ পাইলট,—সকলেই প্লেনে চড়ে আকাশপথে এভারেস্টের উপরে ঘুরে আসেন।

শোনা যায়, ১৯৪২ সালে রাশিয়ান এক অভিযাত্রী দলও এভারেস্ট আরোহণের উদ্দেশে যাত্রা করেন। North Col ছাড়িয়ে প্রায় ২৭,০০০ ফুট্ উঁচুতে দলের সাতজনের মৃত্যু ঘটে, অভিযানও ব্যর্থ হয়।

১৯৪৭ সালে আর্ল ডেনম্যান নামে এক কেনেডিয়ান-এর তিব্বতী বেশ ধরে, দুজন শেরপা সঙ্গী নিয়ে, তিব্বতের দিক থেকে North Col অভিমুখে একক অভিযানের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনীও প্রকাশ পায়।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। আবার নূতন অভিযানের সুযোগও আসে। ভাগ্যদেবতা এতকাল পরে যেন করুণা করে হেসে, এভারেস্ট-অভিযানের আর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন-পথের দিকে ইঙ্গিত করেন। অভিযাত্রী দলের দৃষ্টি পড়ে সেই অভিমুখে।

এই সুদীর্ঘকাল নেপাল রাজ্যসীমায় বিদেশীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্বচিৎ কখনও দু-চারজন যাঁরা বিশেষ অনুমতি লাভ করে সেখানে কিছু ঘোরার সুযোগ পান, পর্বতারোহণের উদ্দেশ্য তাঁদের কারও ছিল না। তবুও, তখনও অজ্ঞাত-পরিচয় নেপাল রাজ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা

দু-চারখানা বই লিখে যান। যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতও স্বাধীনতা পায়। নেপাল সরকারও বিদেশীর জন্যে রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে। এভারেস্টের দক্ষিণ দিক থেকে শিখরে উঠবার নতুন আশা অভিযাত্রীদের মনে জাগে।

১৯৫০ সালে এইচ ডবলিউ টিলম্যান আমেরিকান ক্ষুদ্র এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সেই প্রথম নেপালের মধ্য দিয়ে এভারেস্টের দিকে চলেন। এই খুম্বু অঞ্চলে পৌঁছান। Khumbu Glacier-এর উপর দিয়ে অগ্রসরও হন। পাহাড়ের এই ধার বেয়ে শিখর উঠবার সম্ভাব্য পথের তখনও কোন নিশানা পান না। কিন্তু এই নামচেবাজার ও থিয়াংবোচির প্রতি জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই নতুন পথের সংবাদ পেয়ে এক ডেনিশ (Dane)—Klaus Becker Larsen একাই এক অভিযানে যাত্রা করেন। সঙ্গে নেন চারজন শেরপা। দার্জিলিঙ থেকে রওনা হয়ে আসেন নামচেবাজার। তারপর খুম্বু হিমবাহে পৌঁছান, কিন্তু বেশিদূর যেতে না পেরে ফিরে আসেন। তবুও আশা ছাড়েন না। ভোটেকোশি নদী ধরে চলেন নাংপা-লা। পাশ পার হয়ে বিনা অনুমতিতেই তিব্বতে প্রবেশ করেন North Col পর্যন্ত যাওয়া হয় না। আবার দার্জিলিঙে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে—সেই ১৯৫১ সালেই ইংলন্ডে Alpine Club ও Royal Geographical Societyর যৌথ প্রচেষ্টায় নেপালের দিক থেকে এভারেস্ট-শিখরে উঠবার জল্পনা-কল্পনা এগিয়ে চলে। Réconnaissance অভিযানেরও আয়োজন হয়। দলনেতা হন, এরিক সিপ্টন্। এই দলেই নিউজিল্যান্ডবাসী এডমণ্ড হিলারীকে প্রথম দেখা যায়। এই অভিযানই প্রথম এভারেস্টের দক্ষিণ দিক দিয়ে চূড়ায় উঠবার সম্ভাবনার সুসংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। সিপ্টনের অভিযান সম্পর্কে বিবরণ তুষারবর্তো এক গভীর রহস্যময় প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। সেই চাঞ্চল্যকর এখনও-অজানা জীব ইয়েতি Yetiর পদচিহ্ন তিনি তুষারে দেখেন, তার আলোকচিত্রও প্রকাশ করেন। Yetiর তথ্য এখনও রহস্যাবৃতই থেকে গেছে। ভালুক না হনুমান Ape, অথবা আদিম মানুষ, কি অতিমানুষ, কিংবা অপর কোন অজ্ঞাত-জাতীয় জীব—এ রহস্যের আজও সমাধান হয় নি। এখনও কেউ স্বচক্ষে দেখেছে এমন বিশ্বস্ত লোকের সন্ধানও মেলে নি। কেউ কেউ বলে, তার ভয়ঙ্কর ডাক শুনেছে গভীর রাতে। সবই লোকের-মুখে-শোনা কথা। তবুও দেখা যায় মাঝে মাঝে তুষারবুকে কাদের পদরেখা। Yeti-র রোমাঞ্চকর রহস্য ঘনীভূত করার চেষ্টাও চলে। প্যাংবোচির মনাস্ট্রিতে সযত্নে রাখা লোম-ঢাকা এক প্রকাণ্ড মাথার খুলি—scalp—ইয়েতির বলে প্রচারিত হয়। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দেন, সেটা একটা বিরাট ভালুকের! তাতে সেই sclap-ই মর্যাদা হারায়, ইয়েতির অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না।

ইয়েতির রহস্য এখনও দুর্ভেদ্য থাকলেও এভারেস্ট শিখরের সুদুর্গম

গোপন অবস্থিতি এতদিনে ভাঙবার লক্ষণ দেখা দেয়।

১৯৫২ সাল। নেপাল সরকারের কাছ থেকে এ-বছর সুইসরা আগেভাগেই এভারেস্ট-অভিযানের অনুমতি নিয়ে রাখে। ব্রিটিশ দলের তাই নিরস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। দূরদূর বুকে তাকিয়ে থাকে, এতদিনের এত পরিশ্রমের এত প্রচেষ্টার, এমন প্রাণ-মাতানো আকাঙ্ক্ষিত ফল বুঝি বা হাতের মুঠো থেকেই অপরে হরণ করে নেয়! সুইস অভিযাত্রী দল আসে। বছরের প্রথম দিকে নেতা থাকেন—Edouard Wyss Duaint। দ্বিতীয়বারে হন,—G. Chevalley। দলের শেরপাদের অধিনায়ক হয়ে চলেন,—সর্দার তেনজিং নোরগে। বিজয়লক্ষ্মী জয়মাল্য হাতে প্রসন্নবদনে এগিয়ে আসেন। কিন্তু নিকটে এসে সহসা মুখ ফিরিয়ে চলে যান। শিখরদেশের মাত্র আটশ ফুট নিচে পৌঁছে অভিযান ব্যর্থ হয়। এ অভিযানের উচ্চতম সীমা—প্রায় ২৮,২০০ ফুটে তেনজিং ও Raymond Lambert পৌঁছান। সেই বছর শেরপা সিংমা দোরজে avalanche-এ প্রাণ হারান।

পরের বছর। ১৯৫৩ সাল। স্বয়ম্ভব সভার জয়মাল্য শোভা পায় ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের কণ্ঠে। দলপতি – কর্নেল জন্ হান্ট। ২৯শে মে, ১৯৫৩। হিলারী ও তেনজিং জগতের শীর্ষদেশে—এভারেস্ট গিরিশিখরে—সর্বপ্রথম মানুষের পদচিহ্ন রাখেন। চোমোলুংমা -Goddess Mother of the World--দেবী জগজ্জননীর উদ্দেশে বৌদ্ধ তেনজিং চকোলেট, বিস্কুট ও মিষ্টান্নের নৈবেদ্যও উৎসর্গ করেন।

এর পর একে একে বড়ো বিজয়ী দল দেশ-দেশান্তর থেকে আসে। এভারেস্ট-শিখরে সদর্পে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালে সুইসরা। ১৯৬৩ সালে আমেরিকানরা। ১৯৬৫-তে ভারতীয় দল।

চীনদেশও দাবী করে, ১৯৬০ সালে তিব্বতের দিক থেকে তাদেরও নাকি এক অভিযান শিখরে উঠতে সমর্থ হয়।

জড়জগতে মানুষের চোখে এভারেস্ট শৃঙ্গ বিজিত হয়, ঠিকই। কিন্তু প্রকৃতই কি হিমালয়ের পবিত্রভাব মহান্ গৌরব কিছুমাত্র তাতে খর্ব হয়? নির্লিপ্ত, সমাহিত, শান্ত, সুন্দর তুষারশিখর তেমনি সমভাবে ধ্যানসমাসীন থাকেন। মন্দির ভাঙে। দেবতা চিরবিরাজ করেন।

এই-সব কথাই মনে ওঠে থিয়াংবোচির পথে উঠতে।

১৯৫০ সাল থেকে প্রতি অভিযান-বিবরণীতে এই থিয়াংবোচির কথা। এভারেস্টের ঐ যেন তোরণদ্বার। সেই থিয়াংবোচিতেই আমিও আজ চলেছি! - 'চলেছি' তো নয়। বাঁক ঘুরতেই সামনে দেখি, এ কী! এসে গেছি!—এই তো পথের শেষ। ১টা ১০ মিনিট। নদীতীর থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টা চলা। পাহাড়ের সমতল মাথা। কয়েক শত হাত দূরেই থিয়াংবোচি মনাস্ট্রি! কতো ছবি তার দেখেছি মুগ্ধ তৃষিত নয়নে। আজ ছায়াময় স্বপ্ন নয়, অলীক কল্পনাও নয়। প্রকৃতির পটভূমিতে সেই মনাস্ট্রি জীবন্ত সত্যরূপে চোখের সামনে বিরাজ করে। সেই চতুষ্কোণ দ্বিতল মঠমণ্ডল। সেই পাথর-গাঁথা

গৈরিকবরণ গৃহপ্রাচীর। কারুকার্যময় কাষ্ঠগবাক্ষ। ঢালু ছাদে চেরা-পাইন-কাঠের আচ্ছাদন। তারই ওপর চারকোণা চূড়ার গড়ানে ছোট ছাউনি। ঝক্‌ঝক্‌ করে মাথার ওপরে পিতলের কলস-চূড়া মুকুটখানি। যে-পাশ থেকেই ঘুরে ঘুরে মন্দিরটিকে দেখা যায়, মনাস্ট্রির পিছনে অদূরে ফুটে ওঠে আকাশ-জোড়া সাদা ধবধরে বরফ-শিখর। মনে হয় এত নিকটে, যেন মাথার উপরই ঝোলে। পূর্বদিকে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তুলে তীক্ষ্ন তীরের ফলার মতন Ama Dablam (২২,৪৯৪ ফুট)। দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে Tamserku (২১,৭৩০ ফুট) ও তারই পাশে Kangtega (২২,৩৪০ ফুট)। দেখে ভাবি, আকাশে তো নয়, এ যেন একেবারে পাশে এসেই দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বুঝি বা ছোঁওয়াই যায়। থিয়াংবোচির সব চেয়ে নিকটে। তাই, দেখায়ও সব চেয়ে বিরাট। দক্ষিণ-পশ্চিমে Kwangde শিখর (২০,৩০০ ফুট)। উত্তর দিকে Tawache-এর তুষার-চূড়ার বিশাল বিস্তার (২১,৪৬৫ ফুট)। Tawache ও Ama Dablam-এর মধ্যবর্তী দিগন্তও তুষার-আবৃত। সেখানে দূরে Lhotse (২৭,৮৯০ ফুট) ও Nuptse-এর (২৫,৮৫০ ফুট। প্রাচীর বেষ্টনীর অন্তরালে এভারেস্ট শিখরের উর্ধ্বাংশও দেখা যায় (২৯,০২৮ ফুট)। এ যেন চারিপাশে তুষারমৌলি শুভ্রবেশ দেবর্ষিদের সমাবেশ। তারই মাঝখানে নৈবেদ্য ও ফুলের ডালি মাথায় এই থিয়াংবোচির শ্যামল-কচি গিরিশিশু। মনাস্ট্রির চূড়া,—ঐ সাজির উপর সাজানো স্বর্ণচাঁপা।

স্তব্ধ হয় দেখি। এ কী স্বপ্নলোক! নৈসর্গিক সৌন্দর্য এতো সুমহান হতে পারে,—এ যে কল্পনারও অতীত।

ভ্রাম্যমাণের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যে ভাষাতীত-সুন্দর স্থানগুলি আমার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়,—থিয়াংবোচির পারিপার্শ্বিক দৃশ্য তারই মধ্যমণি,—নিঃসন্দেহ।

মনে পড়ে, এভারেস্টের প্রথম বিজয়ী অভিযানের নেতা John Hunt-এর মন্তব্য—Thyangboche "provides a grandstand beyond comparison for the finest mountain scenery that I have ever seen, whether in the Himalaya or elsewhere."

ভাবি, জগতের সেই শ্রেষ্ঠ মঞ্চ থেকে হিমালয়ের এই শোভা দেখবার আজ আমারও সৌভাগ্য হয়।

নিচে পথ থেকে গিরমিদের স্বর শোনা যায়। সেই হাসি, সেই গল্প। দেখতে দেখতে পথের বাঁক ঘুরে দুজনে হাজির হয়। এগিয়ে নিয়ে চলে মঠের দিকে। গ্রামের মুখে পথের উপর ডাগোবা। গ্রাম ঠিক নয়। মঠ ও মন্দির ঘিরে কাঠের ও পাথরের খানকয়েক ঘরবাড়ি! সেদিকে যাবার আগে ডানপাশে প্রকাণ্ড লম্বা ময়দান। ফুটবল খেলার বড় মাঠের মতন। একধারে মঠ, অপর পাশে জঙ্গলের ধারে নতুন-তৈরি একটা লম্বা ঘর। তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। গিরমি বলে, ওটা স্কুলবাড়ি হচ্ছে। মিস্টার দয়াল সরকারী বড়

অফিসার ছিলেন, একবার ঘুরতে যান সেই যেখানে এভারেস্ট অভিযানের মূল-শিবির—'বেস ক্যাম্প' পড়ে—বরফের ওপর,—সেইখানে। হঠাৎ সেইখানেই মারাও যান। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে ঐ ঘর তৈরি হচ্ছে।

মঠের শেষপ্রান্তে আর একটা লম্বা রঙচঙে কাঠের বাড়ি—Timber hut। সেও নতুন। ঝকঝক করে। কাঁচ-বসানো দেওয়াল। রোদ পড়ে আলো ঠিকরে আসে। যেন, শীতের দেশে উষ্ণ-মধুর-পরশ-ভরা সাদর আহ্বান জানায়। গিরমির কাছে শুনি, এ-ও নতুন তৈরি। মঠের অতিথিসদন। বিভিন্ন এভারেস্ট অভিযাত্রীদলের অর্থদান থেকে প্রধান লামা তৈরি করিয়েছেন। সেইদিকেই প্রথমে এগিয়ে চলি। ভাবি, এই বাড়িতেই আজ রাত কাটাব। যেমন সুন্দর দেখতে ঘরখানি, তেমনি তার অবস্থান। বাড়ির অপর দিকে পাহাড়ের ঢালু গা নেমে যায়। প্রায় হাজারখানেক ফুট নিচে ইমজাখোলার উপত্যকা। দুপাশের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গভীর খাদ কেটে ক্ষীণকায়া নদীর ধারা সোজা নেমে আসে। ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপে রেশমী ফিতার মতো। সেই উপত্যকার শেষপ্রান্তে অদূরে বিশাল তুষারপ্রাচীর। ডানদিকে Lhotse চূড়া (২৭,৮৯০ ফুট) বাঁ দিকে Nuptse (২৫,৮৫০ ফুট), তারও বাঁদিকে Cho-Oyn (২৬,৭৫০ ফুট)। লোটসে ও নাপটসের মাঝখানে মাউণ্ট এভারেস্ট শিখর (২৯,০২৮ ফুট)। এই বাড়ি থেকে কাক-ওড়া পথে মাত্র মাইল দশেক, শুনি। দাঁড়িয়ে দেখি। ঐ সেই জগতের সর্বোচ্চ শিখর! এতো কাছে! তবু মনে হয়, কতো দূর। তার কারণ, নাপটসের স্কন্ধদেশ থেকে নেমে আসে এক দীর্ঘ প্রলম্বিত বাহু—তুষারাবৃত arete। লোটস-এর অভিমুখে প্রসারিত হয়ে সংযুক্ত থাকে। ফলে, এভারেস্টের মতো অতো উঁচু পাহাড়ও অনেকখানি অন্তরালে থাকে, সেই গিরিশৃঙ্গের বোধ করি হাজার দেড়েক ফুট অংশ মাত্র দেখা যায়। এ যেন ভক্তবৃন্দে-ঘিরে-রাখা এক মহাপুরুষ। কাছে এসেও বেষ্টনীর বাহির থেকে একটুখানি দেখা। তবুও, নয়ন ভরে দেখি। শিখরের মাথায় এপাশে তুষার কম। নাপটসে-লোটস-এর অঙ্গভরা তুষার-সজ্জা। কিন্তু মসৃণ নয়। বরফের উপর থেকে নিচে যেন ধারালো ছুরি চালিয়ে পাশাপাশি খাঁজ কেটে দেওয়া। দুই পাহাড়ের মধ্যিখানে এভারেস্টের গম্বুজ-আকার শিখর,—দেখেই মনে পড়ে তিব্বতে ডিরিফুগুম্ফা-থেকে-দেখা শ্রীকৈলাসের সেই অপূর্ব রূপমহিমার কথা। এখানেও তেমনি সমুখের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উন্নতশির,—কিন্তু কৈলাসের মতো ঠিক শিবলিঙ্গাকৃতি নয়, অনেকটা পিরামিড আকার।

গিরমি চমক ভাঙায়। বলে, চলুন এখন মনাস্ট্রি দেখতে,—আবার পরে এখানে আসবেন, যতক্ষণ খুশি এভারেস্ট দেখবেন। সারাদিনই তো এখন পড়ে। সবার আগে প্রধান লামার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করাও দরকার।

সেইমত যাওয়াও হয়।

মনাস্ট্রির প্রবেশদ্বারের সমুখে রাস্তার উলটা দিকে সারি সারি কয়টা কাঠের ঘর। তারই একটার সামনে গিয়ে গিরমি দাঁড়ায়। বন্ধ কাঠের দরজায়

টোকা মেরে মৃদু শব্দ করে। এক লামা বেরিয়ে আসেন। কথা বলার ভাবে বোঝা যায় গিরমির সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয়। তিনি ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসেন, আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান।

ছোট ঘর। আসবাবপত্রে ভরা। তবু সাজানো-গোছানো। তিব্বতী দামী কার্পেট বিছানো। দেওয়াল-ভরতি তিব্বতী দেবদেবীর ছবি, টঙ্কা ঝোলানো। একটা ছোট পুরু-গদিওয়ালা চৌকি। তারই উপর কার্পেট পাতা,—সেইখানে বেশ আরামে পা মুড়ে বসে এক তিব্বতী ভদ্রব্যক্তি। গায়ে মোটা পশমী দামী কোট। মাথায় কান-ঢাকা পশমী টুপী। শুধু মুখটুকু দেখা যায়। ফরসা রঙ। কিন্তু কেমন যেন ফ্যাকাসে। চৌকির পাশেই একটা লোহার আঙটা। তাতে গনগনে আগুন জ্বলে। তারই রক্তিম আভা মুখের উপর পড়ে। পাংশু বর্ণ আরও বিবর্ণ দেখায়। বসা চোখ-মুখ। দু চোখের নিচে কালো রেখা সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। পরস্পরে অভিবাদন করি। হিন্দী জানেন, ইংরেজিও বোঝেন, অল্পস্বল্প বলতেও পারেন।

থিয়াংবোচির প্রধান লামার ভাই। অসুস্থ দেহ, দেখেই বোঝা যায়। থেকে থেকে কাশছেন। হাতের পাশেই পিকদানি! শ্লেষ্মা উঠলেই ফেলছেন। নিজেই জানান, চিকিৎসার জন্যে কিছুকাল দার্জিলিঙ-এ ছিলেন। রোগের কিছু উপশম হলেও সারেনি। দেখে ভাবি, এমন রুগ্ন দেহে এতো শীতের দেশে আছেনই বা কেন? তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। তিনি ছাড়েন না। অনুরোধ করেন, বসুন, কতো দূর থেকে এসেছেন আমাদের এই দুর্গম দেশে। চা খেয়ে চলুন, আপনাকে মনাস্ট্রি দেখিয়ে নিয়ে আসি। প্রধান লামা এখন এখানে নেই।

বিব্রত বোধ করি। বলি, জানি। পথে আসতে তাঁর দর্শন পেয়েছি। আপনি কষ্ট করবেন না, বিশ্রাম নিন। গিরমি রয়েছে, লামাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে সব ঘুরে দেখে নেব।

তিনি মানতে চান না। বলেন, আমার অসুখের কথা ভাবছেন? ও আমার এখন নিত্যসঙ্গী। ওর জন্যে আর ভাবনা করি না—কথা বলতে বলতে কাশি আসে। শ্লেষ্মা ফেলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছেন। হাঁফাতে থাকেন।

তবু আমাকে ছাড়েন না। বলেন, উঠবেন না এখনি। আমিও যাব আপনার সঙ্গে মনাস্ট্রিতে। ঘোরাফেরা আমি করি,—এ কাশি আমার ঘুরে বেড়ালেও হবে শুয়ে থাকলেও থাকবে।—বলে উজ্জ্বল নয়নে তাকান। পাণ্ডুর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে ওঠে। যেন বর্ষার মেঘ-ভরা আকাশে একটু রোদের আভা দেখা দেয়। অনুকম্পায় মন আমার ভরে ওঠে।

ভাবি, কী বিচিত্র এই জগৎ! ঘরের বাইরে প্রকৃতির ঐ নয়নভুলানো শান্ত শোভা,—দেহ-মন সুস্নিগ্ধ করে। আর, ক' হাত দূরেই এই ঘরের মধ্যে মানুষের সেই চিরন্তন রোগভোগ,—দেহধারণের অনির্বাণ জ্বালাযন্ত্রণা। নিঃসঙ্গ রোগশয্যার পাশে ক্ষণিক সঙ্গলাভের কামনা।

স্থির হয়ে বসি। কাপে চা আসে। নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করি। মঠের প্রসঙ্গ

তুলি। দেখি, উৎসাহ পান। সোজা হয়ে বসেন। বলেন, খুম্বুতে মঠ তৈরীর ইতিহাস জানেন? বিশেষ করে থ্যাংবোচি মনাস্ট্রির? —আবার কাশি দেখা দেয়।

দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বলি, আপনার বেশি কথা বলা ঠিক হবে না।

তিনি দম নিয়ে বলেন, ভাববেন না এর জন্যে। ও আমার সয়ে গেছে, কথা বলতে বলতে ও-রকম একটু হবে,—তা হোক। শুনুন মনাস্ট্রি গড়ার ইতিহাসটা বলি। খুম্বু-অঞ্চলের প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা হয় পাংবোচিতে। বাইরে মাঠের শেষে যে নতুন অতিথিশালার ঘর হয়েছে, সেখান থেকে এভারেস্টের দিকে তাকালে সামনে দেখবেন ইমজাখোলা নদী,—তারই ধারে সেই পাংবোচির গ্রামও দেখা যায়।

বলি, এইমাত্র সেখান থেকে এভারেস্ট দেখে এলাম, ইমজাখোলার পাশে বনের ধারে পাহাড়ের গায়ে খানকয়েক ঘর দেখা যাচ্ছিল বটে।

তিনি বলেন, ঐ পাংবোচি। ঐখানেই খুম্বুর প্রথম মঠ, কয়েক শ বছর আগে, লামা সঙ্ঘ দোরজে প্রতিষ্ঠা করেন। খুম্বুতে এঁকে Patron Saint বলে মানা হয়। এঁর সম্বন্ধে নানান রকম অলৌকিক কাহিনীর প্রচার আছে। তিনিই শেরপাদের [illegible] পারেন [illegible] সেই মঠ-প্রতিষ্ঠার অনেক পরে খুম্বুর অন্যান্য গ্রামে [illegible] মধ্যে এই থিয়াংবোচির মঠ এখন সুপ্রসিদ্ধ। অথচ, এখানে মন্দির [illegible] হয়,—মাত্র ১৯২৩ সালে। তার কাহিনী বলছি।

আবার কাশেন। শ্লেষ্মা ফেলেন, দম নেন। পরে ধীরে আরম্ভ করেন, এর প্রতিষ্ঠা করেন গুলু লামা। কুনজে থেকে এখানে আসার সময় যে খুমজুং গ্রাম পেলেন, তিনি ছিলেন সেখানকার বাসিন্দা। ধনী শেরপা বংশে তাঁর জন্ম। যদিও আশৈশব তাঁর ধর্মমুখী মন, তবুও বাপ-মায়ের ইচ্ছানুসারে তাঁকে সংসারী হতে হয়। সন্তান সন্ততিও জন্মায়। সংসারে থেকেই ধর্মানুচরণ করেন। তারপরে স্ত্রীবিয়োগ হতে পূর্ণ ধর্মজীবন অবলম্বন করেন। চলে গেলেন তিব্বতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের উদ্দেশে। নিজ গ্রামে—খুমজুং-এ আবার যখন ফিরে এলেন তখন আচারনিষ্ঠ কঠোরব্রতী লামা। গ্রামে থাকেন না। পাহাড়ের ওপরে গুহার মধ্যে একান্তে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি রটে, অনেক শিষ্যভক্তও হয়। কিছুকাল পরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ মনাস্ট্রি—রোংফু (**Rongphu**)—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?—তিনি থেমে আবার একটু কাশেন। আমিও তাঁকে অল্প বিরাম দেবার উদ্দেশ্যে বলি, হ্যাঁ, জানি বই কি ও-নাম। তবে অনেক বইয়ে নামটা রোংবুক (**Rongbuk**) বলে দেখি,—হয়ত উচ্চারণটা ইংরেজিতে লিখতে গেলে ঐ ধরনের হয়ে যায়। আগে যখন সব এভারেস্ট-অভিযান যেত তিব্বতের মধ্যে দিয়ে এভারেস্টের উত্তর দিক থেকে,—সেইখানে এভারেস্টের ঠিক নিচেই ঐ মনাস্ট্রি। ওদিকের সব অভিযানই শুরু হতো সেখানকার প্রধান লামার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে। তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়েছি সেই সব অভিযান-কাহিনীতে।

একটু সুস্থ হয়ে লামার ভাই বলেন, হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। সেই রোংফু গুম্ফার প্রধান লামাই গুলুলামাকে উৎসাহ দেন এই অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠা করতে। গুলুলামা খুমজুং থেকে এসে এই থিয়াংবোচিতে স্থান মনোনয়ন করেন। দেখছেনই তো কী মনোরম জায়গা! দুধকোশি থেকে উঠে পাহাড়ের মাথায় এমন সমতল-ভূমি, চারিদিকে তুষারশিখর। ভক্তদের জানিয়ে দেন, এইখানে মঠস্থাপনা হবে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে শেরপারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। শ্রমদান করে। অর্থেরও অভাব হয় না। দেখতে দেখতে মঠও গড়ে ওঠে। গুলুলামা তাঁর ভাইপো ও তিনজন খুমজুং-এর বাসিন্দাদের নিয়ে আশ্রম চালানো শুরু করেন। দশ বছরের মধ্যেই সাধুসংখ্যা হয় ২৫। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই মঠের ধর্মীয় জীবনধারার খ্যাতি। শেরপাদের এ-অঞ্চলের প্রধান ধর্মকেন্দ্র বলে স্বীকৃতিও পায়। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা। ১৯৩৪ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেই মূল মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যায়। গুলুলামার তখন বয়স ৮৫ বছর। এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সেই মহাতাপস লামার মনেও গভীর আঘাত হানে। কয়েকদিন পরেই তাঁরও দেহাবসান হয়। সেই ভগ্নস্তূপের মাঝে যেখানে মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠ ছিল, সেইখানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়।

লামার ভাই আবার একটু বিশ্রাম নিয়ে বলেন, গুলুলামার সেই প্রসিদ্ধ মঠ গেল, তাঁর শরীরও গেল, কিন্তু শেরপারা হতাশ হয়ে বসে রইল না, মিথ্যা শোকের আশ্রয়ও নিল না। শিষ্যভক্তরা নতুন উন্মাদনায় জেগে উঠল। খুম্বুর গ্রামবাসীরাও সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল। লোকবল, অর্থবল কোন কিছুরই অভাব হলো না। নামকরা সুদক্ষ শিল্পীরাও এলেন। নতুন-গড়া মঠ আগের চেয়ে শুধু আরও বড়ই হলো না, প্রাচীরচিত্রাবলীতে অলঙ্কৃত হয়ে আরও মনোহর সুন্দর রূপ ধরে পুনর্জন্ম নিল। সেই মঠই এখন দেখছেন, এই অপরূপ প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে। সেই মঠের নব-কলেবর ধারণের কথা বললাম, এটা নেহাৎ একটা রূপক অর্থালঙ্কার মনে করবেন না। আমাদের ধর্মমতে আমরা পুনর্জন্মতত্ত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। তাই শেরপারা স্থির-নিশ্চয় থাকে, ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির তো আবার উঠবেই, গুলুলামাও দেহান্তরগ্রহণ করে তাঁর আরব্ধ মঙ্গলময় কার্যের সূত্রও আবার অবশ্যই ধরবেন। গ্রামে গ্রামে খোঁজ চলে কোন্‌ ভাগ্যবানের গৃহে তিনি অবতীর্ণ হলেন। তিন বছর পর। লোকে জানতে পারে—নামচেবাজারে—লামার ভাই চুপ করেন। আবার কাশেন। কিন্তু বুঝতে পারি, এবার কাশির কারণেই থামা নয়, একটা সঙ্কোচের বাধা যেন জাগে।

আমি হেসে বলি, জানি, নামচেবাজারে আপনাদের গৃহেই সেই ভাগ্যবান শিশু দেখা দিলেন।

লামার ভাইয়ের সেই রোগপাণ্ডুর মুখের উপর যেন গর্বোজ্জ্বল আনন্দের রেখা প্রকাশ পায়। গলার স্বর মৃদুতর করে বলেন, হ্যাঁ, তাই। তবে একটা

কথা জানেন কিনা জানি না, আমরা ঠিক খাঁটি শেরপা বংশ যাকে বলে তা নই। আমরা তিব্বত থেকে হাল-আমলে-আসা খাম্পা পরিবার। তবু আমাদের ঘরেই সেই মহান পুরুষ জন্ম নিলেন। আশ্চর্য শিশু! মুখে তাঁর সারাক্ষণই থিয়াংবোচির বর্ণনা,—সেইখানেই নাকি তাঁর ঘর, ফেলে-রেখে-আসা জিনিসপত্র। খবর পেয়ে থিয়াংবোচি মঠের লামারা ও শেরপারা চলে আসেন। গুলুলামার ব্যবহৃত জিনিসও সঙ্গে আনেন। অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সেগুলি মিশিয়ে শিশুর পরীক্ষা শুরু হয়। তিনি দেখামাত্রই আপন দ্রব্যগুলি ঠিক চিনে বার করে নেন। লোকে নিঃসন্দেহ হয়। সাড়ম্বরে তাঁকে নিয়ে চলে তখন থিয়াংবোচিতে। তিনিই এখন প্রধান লামা।

শুনে বলি, এই ধরনের প্রথা ও পরীক্ষামত তিব্বতে দালাইলামার পুনরবতারকেও তো খুঁজে বার করা হয়?

তিনি বলেন, হ্যাঁ, ঐ একই প্রথায় তিব্বতে সব প্রধান লামাদের যাঁদের অবতার বলে মানা হয়— সন্ধান করে নিতে হয়। কিন্তু জানবেন, এ সব মহাত্মা সিদ্ধপুরুষরা এইভাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের এই অবতীর্ণ-দেহে তাঁরা আরও বেশি শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র হয়ে ওঠেন। তার কারণও বলছি। উচ্চকোটি শুদ্ধচেতা মহাপুরুষরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলে তাঁদের পুনর্জন্মের দুর্ভোগ থাকে না, মোক্ষলাভ করেন। তবুও, ক্বচিৎ কখনও মোক্ষাধিকারী দু-একজন মহাত্মা আপন অর্জিত সুফল স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন, শুধু জনহিত-করণের মহদুদ্দেশ্য নিয়েই আবার প্রাণীদেহ পরিগ্রহ করেন। জগতের কল্যাণে এত বড় ত্যাগ স্বীকার এ কী কম কথা! তাই আদি সিদ্ধপুরুষের চেয়েও তাঁর অবতারের মাহাত্ম্যের প্রচার বেশি।

আমি স্বীকার করি, সেই কারণেই বোধ হয় গুলুলামার নাম কেউ না জানলেও, এখনকার প্রধান লামার কথা অনেকেই শুনেছেন। জ্ঞানী ও যোগী পুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি বইয়েতেও প্রচারিত হয়েছে।

লামার ভাই বলেন, শুধু এই শেরপাদের কাছেই নয়। তিব্বতেও এঁর যশোদীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। দেশবিদেশে এঁর এখন বহু ভক্ত।

দুঃখ জানিয়ে বলি, পথে তাঁর ক্ষণিক দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু এখানে একান্তে ভালভাবে তাঁকে সান্নিধ্যে পেলাম না, মনে আক্ষেপ রইলো।

আবার গরম চা আসে। খেতেও হয়।

লামার ভাই বলেন, চলুন এবার মনাস্ট্রি দেখতে।

নিষেধ শোনেন না। সঙ্গে নিয়ে চলেন। রাস্তা থেকে কয়েকটা ধাপ উঠে মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার। ভিতরে ঢুকে বড় হল। কাঠের দেওয়াল, থাম, ছাদ,—সর্বত্রই কারুকার্য ভরা। বহুবর্ণের চাকচিক্য। প্রাচীর-চিত্র, মূর্তি, টঙ্কা—বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, ঝকঝকে পুজোর সামগ্রী,—সারা ঘর যেন আলোকিত করে রাখে। ধূপ-দীপ জ্বলে।

মন্দিরগৃহ সুগন্ধে আমোদিত। শান্ত নীরব পরিবেশ। মনে স্নিগ্ধ ভাব জাগায়। একতলার ঘরে গুরুলামার প্রতিমূর্তিও দেখি। দ্বিতলেও নিয়ে চলেন। সেখানে বোধিসত্ত্বের বিগ্রহ। দেওয়ালের গায়ে উপর দিকে সারি সারি খোপে সযত্নে সাজানো প্রাচীন পুঁথিপত্র। প্রত্যেকটি মোটা রঙিন সিল্কের কাপড়ে জড়ানো। দুদিকের দেওয়ালে বসানো লম্বালম্বি আলমারি—'সো-কেশ'-এর মত। ভিতরে সাজানো নানান্ আকারের বহুবিধ তামার ও পিতলের মূর্তি। বৌদ্ধ দেবদেবীর সুন্দর বিগ্রহ। সেইখানে নজর করি, তাকের উপর মাঝে মাঝে ফাঁক।

বুঝতে পারি, এইখান থেকেই মূর্তি কয়েকটি চুরি গেছে। কাঠমাণ্ডু থেকে আসার পথে সে-সংবাদ শুনেছিলাম। সেই শূন্যস্থানগুলি দেখে মনে হয় যেন অশেষ রূপবান্ পুরুষের দৃষ্টিশূন্য চক্ষুকোটর। সেদিকে চোখ পড়তেই মনে বেদনা জাগে।

লামাজির ভাই-ও ম্লান মুখে সেদিকে তাকান। মুখ ঘুরিয়ে তখনি ঘরের অন্য প্রান্তে চলেন। অস্ফুটে বলেন, শুনেছেন কিনা জানি না, এইখান থেকেই—তারা প্রভৃতি দেবদেবীর কয়েকটি অতি সুন্দর মূর্তি কিছুদিন আগে কারা সরিয়ে নিয়েছে। কয়েক হাজার টাকা দাম হবে তার। কিন্তু টাকার ক্ষতিটা এখানে কিছুই নয়, এর আগের মন্দির তো সম্পূর্ণ ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিলো। থিয়াংবোচের মতো এমন নিভৃত অঞ্চল,—এখানেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে, সেইটেই সকলকে গভীর ভাবে আঘাত করেছে। এ যে আমাদের এদেশে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কথাগুলি শুনে আমারও মাথা হেঁট হয়। ভাবি সত্যই তো, অর্থের ক্ষতিই তো নয়, এ যে মানবচরিত্রের অসীম দুর্বলতা ও বিচ্যুতিরই ক্ষতচিহ্ন। কি জানি, চারিদিকে এত ঘন ঘন অভিযানের হিড়িক ও আধুনিক সভ্যজগতের লোকের সঙ্গে শেরপাদের অবাধ সংযোগের সুযোগ-সুবিধাই এই বিষময় ফলের কারণ ঘটালো কিনা।

একতলায় নেমে আসা হয়। মন্দিরের এলাকার মধ্যেই মনাস্ট্রির গায়ে একপাশে পাথর-বাঁধানো প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ মুক্ত অঙ্গন। মাঝখানে কাঠের স্তম্ভ। তাতে রঙিন পতাকা ঝোলে। একধারে স্তরে স্তরে কয়েকটি ধাপ,—গ্যালারির মতন। আর একদিকে মনাস্ট্রির কাঠের ঢাকা বারান্দা। প্রাঙ্গণ যেন রঙ্গমঞ্চ, চারপাশ ঘিরে দর্শকদের বসবার স্থান।

লামার ভাই বলেন, এইখানেই লামাদের উৎসব-নৃত্য হয়। আসতেন যদি সে-সময়ে, এখানকার আবহাওয়াই তখন ভিন্নরকম দেখতেন। সে কী প্রচণ্ড উন্মাদনা! গান, বাজনা, নাচ,—কতো রকম মুখোশ, সাজসজ্জা, বেশভূষা, বাদ্যযন্ত্র। লোকে লোকারণ্য।

বলি, বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন এসে ভিড় জমায় নিশ্চয়? এখানে তো শুধু মঠের আশ্রমিকরাই থাকেন?

তিনি বলেন, এখানকার বাসিন্দা তো কজন মাত্র লামা আর ব্রহ্মচারী।

মঠবাসের নিয়মও সুন্দর। থাকবার, খাওয়ার বন্দোবস্তের দায়িত্ব মঠ নেয় না। আশ্রমবাসীদের আপন আপন ব্যবস্থা করতে হয়। তাই সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন শেরপা-ঘরের ছেলেরাই এখানে যোগ দেয়। তবে, কারও যদি আত্মীয়স্বজন এখানে আগে থেকে থাকেন এবং তিনি নবাগতের ভার নিতে রাজি হন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকা চলে। শেরপা ছেলেরাই বেশি যোগ দেয়।

পরে Furer-Haimendorf-এর বইয়ে পাই, ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৯১ জন এই মঠে যোগ দেন। আটজনের মঠেই দেহান্ত হয়। একজন নিজে আর এক স্বতন্ত্র মঠ স্থাপনা করতে অন্যত্র চলে যান। ৪৪ জন মঠ ত্যাগ করেন বা গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরে যান। বাকি ৩৮ জন ১৯৫৭ সালে এখনও মঠের আশ্রমিক। সে সময়ে তাঁদের গড়পড়তা বয়স ৩৫ বছরের বেশি হবে না।

লামার ভাইয়ের কাশির ঘন ঘন প্রকোপ দেখা দেয়। বলি, আপনি আর বেশি ঘোরাঘুরি করবেন না। চলুন কাল সকালে আবার এসে এখানে অনেকক্ষণ কাটাব।

তিনি বলেন, চলুন, আপনার থাকার ব্যবস্থাও ঠিক করে দিই। আমার ঘরের পাশের বাড়িতেই থাকবেন,—অসুবিধে হবে না।

তাঁকে মনের বাসনা জানাই, ঠিক করেছি, মাঠের ধারে সেই অতিথি-ভবনে রাত কাটাব। সামনেই এভারেস্ট। চমৎকার দৃশ্য।

তিনি দুশ্চিন্তিত হয়ে বলেন, সে কী! ঐখানে থাকবেন কি করে প্রচণ্ড শীত আর বাতাস! না না, সে পারবেন না তা'ছাড়া আপনার সঙ্গীদের কেউই ওখানে থাকতে চাইবে না।

বলি, সেটা ভাবনার কথা নয়। একা থাকা— পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে— আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। ঠাণ্ডা তো হবেই—তেসে যোগ করি, এভারেস্টের চোখের নিচে—শীত তো থাকবেই। স্লিপিং ব্যাগ, কম্বল রয়েছে — চারদিক ঢাকা, ঘরের মধ্যে রাত কাটাব, তাতে শীতের ভাবনা কী?

কথা শুনে কিন্তু তাঁর ভাবনা কাটে না। গম্ভীরই থাকেন। বলেন এটা ঠিক হচ্ছে না। অযথা কষ্ট পাবেন। এখানে ঘরের মধ্যে আরামে থাকতে পারবেন। এদিকটায় বাতাস অনেক কম ঘরের চারদিক এমন ভাবে বন্ধ, কোথাও হাওয়া ঢোকবার উপায় নেই। তাছাড়া ভেতরে আংটা তো জ্বলবেই ঘর সারারাত গরম থাকবে।

মনে মনে ভাবি, তা তো জানিই। এবং জানি বলেই সেখানে থাকতে চাই না। বন্ধ ঘরে অমন ভাবে রাত কাটাতে কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে আসে আর, এল মই এত দূরে —এভারেস্টের এত নিকটে,—চাঁদনি রাত,—দেহের আরামের লোভে সারারাত দরজা জানলা বন্ধ করে চোখ বুজে ঘুমোব,— জীবনের এমন দিনেও? সে কি কখনও সম্ভব?

তাই তাঁকে আশ্বস্ত করি, আপনি ভাববেন না, কোনই অসুবিধা হবে না আমার। ঐখানেই রাত কাটাব। একা হলেও ভয়ের কারণ দেখি না।

তিনি শুনে খুশী হন না। বলেন, ভুল করছেন।

গিরমিরাও ও-বাড়িতে থাকার নানান্ অসুবিধার কথা তোলে। আমি আলোচনায় প্রবেশ করি না। তাদের জানিয়ে দিই, তোমরা এইদিকেই থেকো। শুধু সন্ধ্যার আগে আমার রুটি সবজিটা ওখানে পৌঁছে দিয়ে এস।

তারা নিশ্চিন্ত হয়। লামাজির ভাইয়েরই কেবল দেখি, দুর্ভাবনা থাকে।

সে দুর্ভাবনার কারণ যে কতোখানি, তা নিজেই পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি সারারাত সেই অতিথি-নিবাসে কাটিয়ে।

বিকাল থেকেই সে-বাড়িতে গিয়ে থাকি। বাইরে আশপাশে বনের ধারে ঘুরেও বেড়াই। একা একা আপন মনে। সম্পূর্ণ কাঠের বাড়ি। কাঠের মেঝে। কাঠের দেওয়াল। কাঠের ছাদ। চারিপাশে কাঁচের শার্সি। বিলাতী ছবির মতো দেখতে। মাঝখানে হলঘর। দু-পাশে ছোট ঢাকা বারান্দা। ছোট ঘরই বলা চলে। হলঘরের দেওয়ালে টাঙানো অনেকগুলি বড় বড় ফটো। হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের দৃশ্য। ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানেরও। কোহলি-অভিযাত্রীদেরও নাম লেখা। এভারেস্টের বড় মানচিত্রও। বাড়ির একদিকে মাঠ। অপরদিকে অল্প বাগান মতো। বড় বড় কয়েকটা গাছ। Fir ও birch। তারপর গাছে-ছাওয়া পাহাড়ের গা নিচের দিকে গড়িয়ে যায়। ইমজাখোলার উপত্যকা। নদীর নীলাভ জল-ধারার সরল রেখা। অদূরে পাংবোচি গ্রাম। উপত্যকার শেষ মাথা তুলে দুদিকে লোটসে ও নাপটসে,—মধ্যে এভারেস্ট। বাগানে বসেও যেমন এভারেস্টের দৃশ্য দেখা যায় তেমনি বাংলোর সেইদিকের ছোট ঘরখানি থেকেও।

বাইরে বেঞ্চে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি।

এভারেস্টের শীর্ষদেশে প্রবল-বাতাসে-উড়ে যাওয়া তুষারপুঞ্জের শুচিশুভ্র পতাকা। যেন, মন্দিরচূড়ালম্বিত ধ্বজা। বেগবান্ পবন। তারই প্রবাহে অবিরাম বহমান তুষারের কণা। আকাশের বুকে উড়ে গিয়ে ক্ষণিকে মিলায়। একটানা উড়তেই থাকে। তাই, দেখায় যেন স্থির-নিশ্চল। শিখর-স্পর্শ-মুগ্ধ একখণ্ড সাদা মেঘ।

ঊর্ধ্বে ওখানে,—বাতাসের খেলা। নিম্নে এখানে, নির্বাত নিষ্কম্প। দিনশেষের নিবিড় স্তব্ধতা। ধ্যানমৌনী বনানী। যেন দিনমণির মহাপ্রয়াণের শয্যাপ্রান্তে শোকাতুর ভক্তবৃন্দ। স্তব্ধীভূত, নিস্পন্দ। সংবৃত দীর্ঘশ্বাস। মনে গুঞ্জরিত হয় অমর কবি কীটস্-এর সেই কবিতা: I stood tiptoe upon a little hill—

"A noiseless noise among the leaves
Born of the very sigh that silence heaves."

এক গভীর প্রশান্তি-সাগরে মন ডুবে থাকে। কী যে দেখি, কেমনই বা দেখি, কীই বা ভাবি,—সব কিছুর বোধই হারাই।

কতোক্ষণ এভাবে কাটে তাও জানি না। হঠাৎ বাতাস ওঠে। যেন শিখরের তুষারদেশের দূত আসে। গাছের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি তোলে। হিমস্পর্শ দেহে শিহরণ জাগায়। দেখি, ধীরপদে সন্ধ্যার ছায়া নামে বনতলে।

নিঃশব্দে ফিরে চলি ঘরের অন্তরালে।

সেখানেও চেয়ার টেনে কাঁচের শার্সির আড়ালে বসি। আবার প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুধা-পানে মন মাতে। সেই একই শিখররাজি। কাঁচ-বসানো ফ্রেমে-বাঁধানো আলোকচিত্রেরই মতো। তবুও সজীব প্রাণবন্ত। সেখানে এখন পুঞ্জীভূত মেঘের আসর জমে। দিনান্তের ম্রিয়মাণ আলোকের আভা ক্ষণে ক্ষণে,—সুদূর আকাশের নীলিমায়, অদূর তুষারের শুভ্রতায়, শিলাময় পর্বতের ধূসরতায়, নিকটের তরুলতার শ্যামলিমায়,—নব নব বর্ণচ্ছটার প্রলেপ লাগায়। বিচিত্র এক রূপের খেলা চলে।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনি। গিরমি আসে খাবার নিয়ে। আহারে আর মন বসে না। তাড়াতাড়ি কোনরকমে সেরে নিয়ে তাকে বিদায় দিই। মোমবাতি রেখে যায় জ্বালাতে। হেসে, ফেলে রাখি টেবিলে। আজ এ-আলোর প্রয়োজন নেই। মনের তুলসীমঞ্চে আজ আমার প্রদীপ জ্বালা। আবার একা গিয়ে বসি সেই কাঁচের শার্সির ধারে। এভারেস্ট শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে। আত্ম-প্রয়োজনে ক্ষণিকের জন্য আসন ছেড়ে উঠে যাওয়ায় মনে লজ্জা জাগে।

দিনের শেষ আলো চাঁদের জ্যোৎস্নায় কোন্ সময়ে অলক্ষ্যে মিশে যায়। চন্দ্রলোক ফুটে ওঠে। চারিদিকের তুষারশিখরগুলি রূপালী অলঙ্কারে দেহ সাজিয়ে ঝলমল করে। নিচের সবুজ অরণ্যঅঞ্চল আঁধারের বুকে মুখ লুকায়।

বিমুগ্ধ নয়নে আমিও তাকিয়ে থাকি।

হৃদয় ভরে অনুভব করি, মহাকালের অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গদোলায় ভেসে চলি যুগ থেকে যুগান্তরে কোন্ সেই অসীমের পানে।

কতক্ষণ সময় কাটে? জানি না। জানবার আগ্রহও থাকে না। আপন অস্তিত্বের চেতনা আসে যখন মনে হয়, কোন্ এক দানব যেন টেনে এই দেহকে ধরিত্রীর কঠিন্ কূলের উপর আছড়ে ফেলে। চমকে উঠে দেখি। এ কী! আবার অকরুণ হিমস্পর্শের নিদারুণ অনুভূতি!

দেওয়ালের তক্তাগুলির ফাঁক দিয়ে হু-হু করে কন্‌কনে বাতাস ঢোকে। কাঠের ছাদ, কাঠের মেঝে, চারিদিক থেকেই হাওয়ার স্রোত বয়। সারা শরীরে কাঁপুনি জাগায়। তক্তার জোড়গুলির ঐ সামান্য ফাঁক দিয়ে যে এত প্রচন্ড বাতাস ঢোকে, শার্সির কাঁচগুলি যে বরফের মতো এমনি ঠান্ডা কন্‌কনে হয়ে ওঠে,—সারা বাড়িখানি এইভাবে বিরাট হিম-ঘরে রূপান্তরিত হয়,—তা কল্পনার অতীত ছিল। প্যান্ট, কোট, সোয়েটার, মোজা, টুপি,—যা কিছু

পরিধেয় এখানে সঙ্গে আনা,—সবই গায়ে পরা। তবুও, এই অসহনীয় অনুভূতি। শয্যা পাতি সেই ছোট ঘরেরই কাঠের মেঝের উপর। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকি। ক্ষণিকের জন্য শীতবোধ কমে। তারপর, আবার কম্পন। প্রচণ্ড সুতীক্ষ্ণ বাতাস ছুঁচের মতো দেহের প্রতি লোমকূপে বেঁধে। উঠে মাঝের হলে বৃথাই আশ্রয় নিই। অপর দিকে ছোট ঘরেও চলি। কোথাও নিস্তার পাই না। এ-যেন, সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যু। চারিদিক থেকেই মর্মভেদী বাণ হানে। এর চেয়েও শীতের দেশে,—বরফরাজ্যেও রাত কেটেছে, —দারুণ শীতভোগও ভাগ্যে ঘটেছে,—কিন্তু এইভাবে এমন দুর্দান্ত হিমশীতল বাতাসের কবলে পড়ার অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। এর যথার্থ কারণও বুঝতে পারি। যে-ধরনের ও যে-পরিমাণ শীত-সজ্জাব আয়োজন সে-রাত্রে সেখানে সঙ্গে ছিল, ওখানকার আবেষ্টনের অনুপাতে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে তখন আপন মনেই হাসি। শীতের প্রকোপে ঘুমের কথা আর মনেই ওঠে না। সেই ছোট ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ সজোরে পায়চারি করি। রক্ত-চলাচলে দেহে অল্প উত্তাপ ফিরে আসে। স্লিপিং ব্যাগ জড়িয়ে চেয়ারে বসি। জড়পিণ্ডের মতো। চন্দ্রকিরণ-ধৌত নীলাভ-ধবল শিখর-গুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি।

তেমনি নির্বিকার, নিস্পন্দ,—কতো নিকটে।

আবার নিমেষে দেখায়,—মেঘযানে যেন দ্রুতগতি, দূর-দূরান্তে সরে যায়। মনে আসে,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

ভাবি, এ কি সেই অরূপের রূপেরই আভাস হেরি!

পলকে অদৃশ্য হয় দেহের সেই অপরিসীম অস্বস্তি। অন্তরের গোপন পুরে জেগে ওঠে সত্য শিব সুন্দরের অনুপম মূর্তি। প্রস্ফুটিত হয় আমার মানস সরোবরের সোনার কমল!

অজানিতেই রাত্রি কখন বিদায় নেয়। মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে দিনের আলো ফুটতে থাকে। অলক্ষ্যে অন্তরীক্ষে কোথায় সূর্য ওঠে। গিরিরাজের তুষার-কিরীট সিঞ্চিত হয় গৈরিক স্বর্ণে।

দেবাদিদেব মহাদেবের প্রলম্ব পিঙ্গল জটাজাল দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। মহামৌনী মহেশ্বর যোগাসনে ধ্যানে বসেন। ভক্তিবিগলিত নয়নে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাই।

হিমালয়-পরিভ্রমণের বিচিত্র লীলা। যাত্রাশেষে, ফিরে এসে, আজ লিখতে বসে দেখি, থিয়াংবোচির সেই অবিস্মরণীয় রাত্রিবাসের অপরিসীম ক্লেশ বিস্মৃতির অতলতলে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু, যে পরমানন্দের জ্যোতির্শিখা সেদিন অন্তর-প্রদীপে দীপ্ত হয়ে ওঠে,—সেই অখণ্ড জ্যোতি লেশমাত্রও ম্লান

হয় না। পরিতৃপ্ত হৃদয় নিত্য-আলোকিত থাকে।

তারপর?

সে কাহিনীরও কি আর প্রয়োজন? শোনবার আগ্রহ থাকে তো সংক্ষেপে শোনাই।

আবার কুনডে গ্রামে ফিরি। দুদিন কাটাই। ১৮ই অক্টোবর লুকলায় প্লেন ধরবার কথা। ১৭ই তারিখে সেখানে পৌঁছই। পা চালিয়ে আগে, মন পড়ে থাকে পিছনে। যাত্রা সার্থক ও সম্পূর্ণ হওয়ায় বিপুল তৃপ্তি। স্বর্গরাজ্য থেকে চিরবিদায়ের বিচ্ছেদ-বেদনা।

লুকলায় হিলারীর সঙ্গে দেখা।—"এ কি! এরই মধ্যে আবার কাঠমান্ডু থেকে ফিরে এলেন?"

মুচকে হাসেন। "গেলে,—তবে তো ফেরা? সেই থেকেই প্লেনের অপেক্ষায় এখানে বসে থাকা।"

"কি হলো? আসছে না কেন? বেতারে খবর নেননি?"

"বেতার-যন্ত্র এখানে থাকলে তো!"

"প্লেন নামবার এয়ার-স্ট্রীপ,—তবুও বেতারের কোন যোগাযোগ নেই? বিকট দুর্গম পাহাড়রাজ্য,—কখন কোথায় কি রকম আবহাওয়া—কাঠমান্ডু ও এখানকার—দু'তরফেই তো জানা দরকার প্লেন চলাচলের আগে? তাছাড়া, হঠাৎ প্রয়োজনও তো হয়,—এই যেমন কদিন আটকে রয়েছেন এখানে—প্লেন আসার কথা, আসছে না। কেন আসছে না, কবেই বা আসবে,—কিছুই জানবার উপায় নেই? অবাক কান্ড!"

হিলারী নির্বিকার ভাবে হাসেন।—"যা বললেন, সবই বাস্তব কথা। ঠিকই। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন. This is Nepal—এটা নেপাল!"

অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। এয়ার-স্ট্রীপ-এর জন্মকথাটা বলেন, এ পরিকল্পনাটা আমারই মাথায় খেলে। খুম্বুতে স্কুল, হাসপাতাল তৈরি করবার জন্যে জিনিসপত্র লোকজন আনানো যায় কি করে? তাই এই পাহাড়টার মাথায় খানিক সমতল জায়গা দেখে, পাহাড়ের কোন কোন অংশ কাটিয়ে সমান করিয়ে, কাজ চলার মতো ছোট প্লেন নামাবার জন্যে এটা তৈরি করিয়ে নিলাম। এই তো বছর তিনও হয়নি। বাড়িগুলি তৈরি করার কাজও তাই তাড়াতাড়ি শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। এয়ার-স্ট্রীপ তৈরি হলে বেতারযন্ত্র এনে লাগাবার অনুমতি চাই নেপাল সরকারের কাছে। কিন্তু তারা দিতে রাজি হন না। তবুও আমার কাজ কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছি। তারপর নেপাল গভর্ণমেণ্টকে জানালাম, এ এয়ার-স্ট্রীপ গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে দিতে আমি রাজি আছি তাঁরা নিয়েও নিলেন। তাই এটা এখন সরকারী সম্পত্তি।

একটু থেমে আপন মনে হেসে মন্তব্য করেন, কিন্তু মজা কি জানেন? গভর্ণমেণ্টের হলেও এর maintenance—এটাকে চালু রাখার খরচ এখনও আমাকেই বইতে হচ্ছে,—কেন না, গরজটা এখনও আমারই। এ-সব এখানে মনে করলে কাজ করা চলে না। এই তো পাঁচদিন এখানে কেটে গেল—এ দেশে

ওটা গা-সহা হয়ে গেছে।

উৎসাহভরে জানাই, নামচের বেতারকেন্দ্রের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ হলো। অফিসারটিও ভদ্র। জিজ্ঞাসা করছিলেন, কোন কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা। একটা চিঠি লিখে জানাব, কাঠমাণ্ডু থেকে প্লেনের সংবাদটা আনিয়ে দেবেন? আপনিও এখানে আটকে আছেন, তাও জানিয়ে দেব।

হিলারীর হাবভাবে এ-প্রস্তাবে কোন পরিবর্তনই দেখি না। কোন উৎসাহের লক্ষণও নয়। তেমনি নির্বিকার ভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি লিখতে চান, লিখতে পারেন। আমার নাম উল্লেখ করবেন না। কেন না, এই অপেক্ষা করার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন নই। যেদিন যখন প্লেন আসবে, যাব, এবং যখন আসবার ঠিক আসবেই। খবর পাঠালেও সেই সময়ে আসবে, না পাঠালেও তাই। এসব পরিস্থিতি এ-দেশে মেনে নিতে হয়েছে। বললাম না, This is Nepal!

আশ্চর্য ধীর স্থির শান্ত মন। এই প্লেন-না-আসায় অনিশ্চিত অবস্থা মনে কোন চাঞ্চল্যই জাগায় না। এ-যেন, হিমালয়ের মতনই উদাসীন। ভাবি, হিমালয়ের তুষার-গিরিরাজের বরপুত্রই বটে! এ কি সেই পিতৃদত্ত শিক্ষা, তাই এই চরিত্রের বিকাশ!

হিলারী আরও বলেন, দেখুন, জীবনে কোন ঘটনা বা কোন কিছুই ব্যর্থ যায় না। ঠিক ভাবে নিতে পারলে সব ঘটনার মধ্যে থেকে সুফল পাওয়া যেতে পারে। এই যেমন, এখানে এসে যখন দেখি প্লেন আসছে না, তখন ভাবি, এই যে অযাচিত সময়টা হঠাৎ এখানে হাতে এসে গেল, এটা কাজে লাগানো যায় কি ভাবে? তখনি মনে পড়ে, প্লেন নামবার মাঠটা লম্বায় আরও একটু বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা কিছুকাল থেকেই অনুভব করা যাচ্ছে। করবও ভাবি, কিন্তু করা হচ্ছে না। এবার কি সেই সুযোগই হাতে এল? তখনি গ্রামে খবর পাঠাই, লোক যোগাড় করি, কাজও শুরু করিয়ে দিই। আর দুদিনে শেষও হয়ে যাবে। চলুন না, দেখবেন, আমি এখন চলেছি তাদেরই সঙ্গে কাজ করতে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, পাহাড়ের মাথার সেইদিকে পাথর মাটি বোঝাই হয়ে সমতলভূমির বিস্তার অনেকখানি বাড়ানো হয়। লোকজন উৎসাহ নিয়ে খাটে। হিলারীও তাদের সঙ্গে যোগ দেন।

আমি ফিরে চলি। অল্পদূরে লুক্‌লার ছোট্ট গ্রাম। একখানা মাত্র দোতলা বাড়ি। ওপরের ঘরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে গিয়েছি। খালি ঘর। দুঃস্থ সাধারণ গ্রামবাসী। ভাবি, ক'রাত এখানে কাটাতে হয় হিলারীর মতো, কে জানে?

পরদিন ভোরে উঠে বিছানাপত্র বেঁধে মালপত্র নিয়ে প্লেন-ঘাটির কাছে পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করতে হয়। কোন্ সময়ে প্লেন এসে নামবে, কেউ জানে না। শুনেছি আধ ঘণ্টাও থাকে না, তখনি ফিরে যায় কাঠমাণ্ডুতে মালপত্র আনতে যাচ্ছি বললেও অপেক্ষা করবে না।

হিলারী মজুরদের নিয়ে আপন কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে দুজনে দেখা হয়। হেসে বলেন, ব্যস্ত হবেন না। প্লেন আসার কিছু আগে থেকেই শব্দ শোনা যাবে। সারাদিনে না এলেও আশ্চর্য হবেন না। খাওয়াদাওয়ার আয়োজন কিছু আছে তো? চলুন এখন, কফি এক কাপ খেয়ে আসবেন আমার টেণ্টে।

সুন্দর রঙিন ছোট তাঁবু। নিকটে তাঁর অনুচর শের্‌পার জন্য পৃথক আর একটা। এ দুটো তাঁবু এখানে খাটানোই থাকে। হিলারীর কখন এখান দিয়ে যাতায়াত করতে হয় স্থিরতা নেই।

প্লেনের আশায় অন্য যাত্রীরাও হাজির হয়। শেরপাও কিছু আসে। বিদেশী সাহেব-মেমের দলও দুটো রয়েছে। তীর্থের কাকের মতো সবাই অপেক্ষায় থাকে। দিন কেটে যায়। রাত আসে। ঘরের মধ্যে রাত কাটিয়ে আবার পরদিন মালপত্র বেঁধে মাঠের ধারে প্লেনের পথ চেয়ে বসে থাকা। বিদেশী যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করি। কি আর করা যাবে? দুদিন এই-ভাবেই কাটে। ভাবি, খাসা হেঁটে স্বাধীন ইচ্ছামতো কেমন আসা গিয়েছিল, এমন সভ্যতার যান-ব্যবস্থার কবলে পড়ে এ এক অশান্তি। শান্তিও বটে। সারাদিন উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকা—ঐ বুঝি প্লেন আসার শব্দ শোনা যায়।—মনে অস্বস্তির উচাটন ভাব,—টেন্‌সন্‌।

তৃতীয় দিন বিকেলবেলা। হিলারী যথারীতি কর্মব্যস্ত। আজ তাঁর এয়ার-স্ট্রীপ-এর কাজ শেষ হলো। মাঠের মধ্যে টেবিল চেয়ার পেতে মজুরদের পাওনা মেটাচ্ছেন। সবাই টাকা রোজগার করে খুশী। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখান, কেমন মাঠ আরও প্রশস্ত হলো। কাজটা এবার শেষ হলো,—তাঁরও মনভরা তৃপ্তি। সেই কথাই বলেন। হঠাৎ কথা বলার মাঝে থেমে যান। কান খাড়া করে কি যেন শোনেন। মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। উৎসাহিত হয়ে বলেন, প্লেনের আওয়াজ! শুনতে পাচ্ছেন না? ওয়ানডারফুল! আমারও কাজ সারা, প্লেনও হাজির!

কান পেতে শুনি। ভ্রমরের গুনগুনানির মতো শব্দ আকাশপথে এগিয়ে আসে। চারিদিকে যাত্রীদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায়,—প্লেন! প্লেন!—ছুটোছুটি লাগে। পরিত্রাণের আশায় আমারও আনন্দে মন নাচে।

শব্দ সুস্পষ্ট হয়। হিলারীর মুখের হাসি মেলায়। বলেন, এ-শব্দ আমাদের প্লেনের তো নয়। আরও ছোট প্লেন।—মাথা তুলে আকাশপানে দেখেন।

দু পাহাড়ের মাথার ফাঁকে প্লেন দেখা দেয়। হিলারী বলেন, ঠিক তাই। এ তো সুইস্‌ রেডক্রশ-এর Pilatus Porter Aircraft। বোধ হয় কোন যাত্রীদল নিয়ে এল। দেখি ওতেই যদি কোন রকমে লিফ্‌ট পাওয়া যায়।—বলতে বলতে মাঠের অপর দিকে যেখানে চক্ষের পলকে প্লেন ঘুরে এসে নামতে থাকে,—প্রকাণ্ড লম্বা পা সজোরে চালিয়ে এগিয়ে যান। ভেসে-ওঠা ডুবন্ত-মানুষের আবার তলিয়ে যাবার অসহায় ভাব নিয়ে বলে উঠি, আমার কথাটাও

মনে রাখবেন একটু।

প্লেন ঘিরে ভিড় জমে। সে-ব্যূহ ভেদ করে হিলারীর এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হয় না। সবাই তাঁকে চেনে, খাতির করে। দূর থেকে দেখি, পাইলটও এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন। প্লেন থেকে জন ছয় বিদেশী যাত্রী নামে।

আমার মন আশা-নিরাশায় দুলতে থাকে। পাইলটের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হিলারী আমার দিকে আঙুল তুলে দেখান, আমাকে ডাকেনও।

যাক, ব্যবস্থা হয়ে গেল নাকি! কি নিশ্চিন্ত ভাব জাগে মনে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। হিলারী জানান, এটা জিরি থেকে এল যাত্রী নিয়ে। এখনি ফিরে যাবে জিরিতে, সেখান থেকে তখনি কাঠমাণ্ডুতে। সাতজন বসবার জায়গা এই প্লেনে। জিরিতে ছ'জন যাত্রী এতে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে,—এখান থেকে একজন মাত্রকে কাঠমাণ্ডুতে নিয়ে যেতে পারে। তা আমি কি এখন স্বার্থপর হতে পারি ?

হতাশ হই শুনে। তবুও, নিঃসঙ্কোচে তখনি জানাই, স্বার্থপরতার প্রশ্নই ওঠে না। আপনারই তো আগে যাওয়ার দাবী। অপেক্ষা করছেন আমার চেয়ে বেশি দিন,—কাজেরও ক্ষতি হচ্ছে। উঠে পড়ুন এখনি। কাঠমাণ্ডু পৌঁছে পারেন তো আমার প্লেনের একটু তাগাদা দেবেন—তা হলেই আমি খুশি।

তিনি সখেদ বিদায় জানিয়ে উঠে পড়েন। বলেন, আমার শেরপাকে বলে দিলাম, আজ থেকে আপনি আমারই তাঁবুতে থাকবেন,—এতে অন্ততঃ খানিকটা সুবিধে হবে।

ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, খানিক নয়, অনেকখানি। ওখানে থাকলে প্লেন আরও দু-চারদিন দেরি করে এলেও আনন্দেই কাটবে।

কিন্তু দু-চারদিন থাকতে হয় না। ঠিক দুদিন পরেই প্লেন এসে যায়। ততদিনে যাত্রী জমে গেছে অনেকগুলি। সবাইকে এক প্লেনে ধরা সম্ভব নয়। মনে এবার আশঙ্কা জাগে, এই ভিড় ঠেলে জায়গা করি কি করে ? মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিজের দাবী নিয়ে দাঁড়াতে আমার আজন্ম সঙ্কোচ।

বেশি ভাবতে হয় না। পাইলটু প্লেন থেকে নেমে হাতের কাগজ দেখে চেঁচিয়ে ঘোষণা করেন, কাদের আসন সংরক্ষিত আছে কাঠমাণ্ডু থেকেই। তারা আগে জায়গা নিলে অন্য যাত্রী যে-কজন যেতে পারে, নেওয়া হবে। প্রথম নামই জানান, মিঃ মুখার্জি—দুখানা সীট।

কানে যেন মধু বরিষণ করে, প্রাণে যেন স্বস্তির প্রলেপ লাগায়।

প্লেন ছাড়ে। আকাশপথে উড়ে চলে। বেশি উপরে ওঠে না।

একপাশের কাঁচের জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি। নীচে মাথা-উঁচু সেই সব পাহাড়! এখন দেখায় যেন চেপ্টা মাথা, বড় বড় উইয়ের ঢিবি। কে

যেন তাদের গরিমা হরণ করে নেয়। গভীর জঙ্গল, যেন গাঢ় সবুজ কম্বলের আস্তরণ। দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী নদীর উপত্যকা,—যেন ধরিত্রীর বুক চিরে ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ বিদীর্ণতা। তারই গোপন অন্তরালে সঞ্চারিণী সেই-সব উন্মাদিনী তরঙ্গিনীর এখন শাংশুশীর্ণ ক্ষীণধারার শুভ্ররেখা। তাকিয়ে দেখি দুঃস্বপ্নের মতন। প্রাণের মধ্যে কী যেন হারিয়ে-যাওয়ার গভীর বেদনা গুমরে ওঠে। কোথায় গেল সেই উন্নতশির বিশালকায় শৈলশ্রেণী? সেই আদিম গহণ অরণ্যানী? সেই নৃত্যপরা তরঙ্গোচ্ছল নির্ঝরিণী? সেই ক্ষীণকায়া ভীতচকিতা নিভৃত-পথের সর্পিল রেখা? সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত বিমুগ্ধ পথিকের ধীর মন্থর সানন্দ চরণ ফেলা?— হারিয়ে যায় নিমেষে কোথায়,—সব কিছুই চোখের উপর থেকে!

মুখ ঘুরিয়ে অপর দিকে তাকাই।—ঐ! ঐ! ঐ তো! সেই তুষারমৌলি হিমালয়ের সারি সারি মহান শিখরশ্রেণী। সেই এভারেস্ট, লোট্‌সে, নাপট্‌সে, চোয়ু, আমা ডাবলাম,—ওদিকে মানসলু,—অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি পর্যন্ত! জানা, না-জানা কতো বরফের চূড়া। সুনীল সীমাহীন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি স্তব্ধ-শুভ্র-তরঙ্গ-শিরে তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তেমনি উদাসীন ধ্যানমগ্ন শান্ত সুন্দর। ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকি। মন ছুটে চলে তারই চরণপ্রান্তে।

এ কি মায়ার খেলা? হারিয়ে যায় আবার সবই। চমক ভাঙে দেখে প্লেন ঘুরে ঘুরে নামে কাঠমাণ্ডুর এরোড্রোমে। মাত্র এক ঘণ্টার বিমানযাত্রা।

যে পথ নিয়েছিল চোদ্দদিন পায়ে হেঁটে যেতে,—প্রতি পদক্ষেপে অন্তর-সরোবরে স্বর্ণকমল ফুটিয়ে তোলার আনন্দ লুটে,—এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মধুর দূরত্ব সভ্যতার বায়ুযান যেন নিঃশেষে লেহন করে নেয়।

প্লেন ছেড়ে নামি। পা কাঁপে। যে-চরণযুগলের অবলম্বনে হেঁটে গিয়েছিলাম ধরণীর এই বিচিত্র পথ,—আকাশপথে উড়ে এসে ধরার বুকে এখন আবার সেই পা ফেলতে যেন কুণ্ঠা বোধ করি।

মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধান! এই তো ছিলাম প্রকৃতির হাতে-গড়া এভারেস্টের পাদদেশে। আর,—এখন এই মানুষের হাতে তৈরি শহর-সভ্যতার মাঝখানে!

মনে হয়, এ-যেন এক সুখস্বপ্ন আচম্বিতে ভেঙে যায়।

আবার তখনি মনে হয়, স্বপ্ন দেখি বোধ হয় এখনই। গত কয়দিনই ছিল আমার সত্য জাগরণ। সেইখানেই কাটে মোর প্রকৃত শাশ্বত জীবন।

আবার শেরপাদের দেশে

॥ ১ ॥

জগতের সর্বোচ্চ গিরিচূড়া—নেপাল রাজ্যে মাউণ্ট এভারেস্ট। তারই পাদমূলে শেরপাদের দেশ,—নামচেবাজার, কুনডে, খুমজুং, থিয়াংবোচি। আবার যে সেখানে যাব, কল্পনাও করিনি।

যাওয়ার কথা, চিরপরিচিত গাড়োয়ালে। ট্রেনের টিকিটও কাটা,—হরিদ্বারের। নিয়ম অনুযায়ী কলেরার ইনজেকশন নিয়ে প্রমাণ-পত্রও সংগ্রহ করেছি। এমনি সময়ে একদিন সরোজ এসে হাজির। কলকাতার উপকণ্ঠে বিদেশী এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পদস্থ অফিসার। মাঝে মাঝে ইউরোপ-আমেরিকাতেও তাকে যেতে হয়। আবার কখনও কখনও বনে-জঙ্গলে শিকারের লোভেও ঘোরে। কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি।

সেদিন এসে বলে, গাড়োয়ালে তো যানই, আবার যাবেনও। এবার চলুন আর একবার আপনার সেই শেরপাদের দেশে,—কুনডেতে। আমারও তা হলে যাওয়া হয়।

শুনে আশ্চর্য হই,—কুনডেতে! তুমি যাবে?

আসল ব্যাপারটা তখন শুনি। প্রতি বছর ছুটিতে সে ভ্রমণে বার হয়। অর্থাৎ,—যেতেই হয়,—অফিসের এমনি ধরা-বাঁধা নিয়ম ও আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থাও। অথচ অফিসের কাজের বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘোরা নয়। আপন খেয়াল খুশি অনুযায়ী যেখানে হয় বাইরে কোথাও যাওয়া। প্রতি বছর তাই যায়ও। মোটরে, ট্রেনে অথবা প্লেনে। এবারেও যাবে। তবে সহজ, সাধারণ, শৌখিন কোন স্থানে নয়,—নেপালে সেই শেরপাদের দেশে যাবার আগ্রহ। কুনডে এখন আর দুর্গম স্থান নয়। তারই নিকটে জাপানীরা সম্প্রতি পাঁচ-তারা—'ফাইভ স্টার'—হোটেল খুলেছে! পাশেই প্লেন নামার ব্যবস্থা,—জায়গাটার নতুন নাম হয়েছে সিয়াংবোচি,—হয়ত অনতিদূরস্থ থিয়াংবোচি মঠের নামের সঙ্গে মিল রেখে। কাঠমাণ্ডু থেকে ঘণ্টাখানেকও লাগে না প্লেনে সেখানে পৌঁছুতে।

কুনডেতেই বা তার যাবার এত আগ্রহ কেন, তার কারণও বলে,—"ন বছর আগে ও-অঞ্চলে আপনি যখন যান, এডমণ্ড হিলারী কুনডেতে শেরপাদের জন্যে হাসপাতাল তৈরি করছিলেন দেখে এসেছেন। ক'বছর হোল সে-হাসপাতাল চালু হয়েছে। সেখানকার এখন যিনি ডাক্তার,—তিনিও হিলারীর স্বদেশবাসী,—নিউজিল্যাণ্ডের। নাম,—পল সিলভেস্টার। আমার বিশেষ বন্ধু। যখন সস্ত্রীক কুনডেতে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, কলকাতায় আমারই আতিথ্যে ক'দিন ছিলেন। তারপর কুনডেতে পৌঁছে প্রতি পত্রে সাগ্রহ

আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, 'আমাদের দেশ—নিউজিল্যাণ্ড-এর প্রাকৃতিক শোভার জগৎজোড়া খ্যাতি। কিন্তু এভারেস্টের এই অঞ্চলে এসে দেখছি,—নিউজিল্যাণ্ডের সেই সৌন্দর্য এখানকার তুলনায় কিছুই নয়। অতো দূর দেশ থেকে আমরা এলাম এখানে, আর আপনি ভারতবাসী,—নেপালের প্রতিবেশী,—তবুও এ-দেশ দেখতে আসেন না? আশ্চর্য! অতি অবশ্যই এবার ছুটিতে চলে আসুন। আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কোনও অসুবিধে হবে না। এখানে ঘোরবার, দেখবার যা কিছু আছে,—যেখানে যেতে চান,—এমন কি কোন পাহাড়ের শিখরে যদি ওঠারও আকাঙ্ক্ষা থাকে, সব কিছুর আয়োজন হয়ে যাবে। আসছে বছর হয়ত অন্যত্র চলে যেতে পারি। এ বছরই আসবার ব্যবস্থা করুন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বর্ষা কেটে যাবে মনে হয়, এ-দিকে প্লেন চলাচলেরও ততোটা অনিশ্চয়তা থাকবে না। কবে পৌঁছচ্ছেন খবর দিন অবিলম্বে। আসা এবার চাই-ই।"

সরোজ বলে, 'এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া যায় কংনো? অথচ ঐ পাণ্ডব-বর্জিত পাহাড়-পর্বত অঞ্চলে যাওয়া, হিমালয়ে ঐভাবে ঘোরাঘুরি করা,—একা যেতে কেমন যেন ভরসা হয় না। চলুন আপনি সঙ্গে,—যেখানে ব্যবস্থা করতে বলেন, আমি ছোটাছুটি করে করব,—আপনি শুধু সঙ্গে থাকলেই হোল। আপনি না গেলে আমার কিন্তু যাওয়াই হবে না।'

আমি উৎসাহ দিই, সত্যিই তো, এমন সুযোগ সুবিধে,—নিশ্চয়ই যাবে। একা পারবে নাই বা কেন? কোন ভয় নেই। আমিও তো একাই গিয়েছিলাম, তা আবার হাঁটাপথে। আর, তুমি যাবে, আসবে আকাশপথে। তার ওপর, তোমার বন্ধু যখন সেখানে রয়েছেন, যেতেও লিখছেন অতো করে,—থাকবার ব্যবস্থাও ভালই হবে। ভাবনা কী?

সরোজ রাজি হয় না। বলে, যাই তো আপনাকে সঙ্গে নিয়েই যাব। কাঠমাণ্ডু থেকে সোজা সিয়াংবোচিতে প্লেনে গিয়ে নামব,—কুনডে তো তারপর মাইলখানেক মাত্র দূর! কলকাতা থেকেও প্লেনে কাঠমাণ্ডু যাব,—দুদিনেই কুনডে পৌঁছনো যাবে।

হেসে বলি, ও-সব প্ল্যান কলকাতায় চেয়ারে বসে মনোজগতে করা সহজ। কিন্তু মনের গতির সঙ্গে বাস্তবের তাল রেখে চলতে গেলে অনেক জায়গায় পা পিছলে পিছিয়ে পড়তে হয়। কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে দেখবে, হিমালয়ের মধ্যে প্লেন-যাতায়াতের কত অনিশ্চয়তা। তা'ছাড়া যাবার সময় সিয়াংবোচি পর্যন্ত প্লেনে যাওয়া কখনই উচিত হবে না। অল্প সময়ে অনায়াসে পৌঁছানোর যেটা সুবিধা মনে হয়, সেইটেই হয়ে পড়ে সব চেয়ে অসুবিধার কারণ। আজকাল হিমালয়ের অন্দর মহলে পাহাড়ের অনেক উঁচু জায়গায় মোটর যাবার, প্লেন নামবার ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই,—আধুনিক যুগে হওয়াও স্বাভাবিক। যাত্রীরা এ-সব দেখে ভাবে, খুব সুবিধে হয়ে গেল,—মোটরে বসে বা প্লেনে উড়ে, খাসা আরামে সেই সব এককালের দুর্গম অঞ্চলে কেমন চোখের পলকে চলে যাব, দেখেশুনে আবার দুদিনেই ফিরে আসব! ভাবটা যেন, জীবনে আরামটাই

বড় কথা, আনন্দটা নয়। হিমালয়ের পথে হাঁটার পরিশ্রম,—কায়িক ক্লেশ এতে কমেছে, নিঃসন্দেহ,—কিন্তু পথ চলার সেই অসীম আনন্দ ও দিনের পর দিন চলার মাঝে নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এতে হারাতে হয়েছে। আরও এক কথা,—সমতলভূমি থেকে অতি অল্পকালের মধ্যে বারো-তেরো হাজার ফুট উঁচুতে, বরফের পাহাড়ের অতো নিকটে হঠাৎ পৌঁছে সেখানে থাকা,—যাঁরা অভ্যস্ত নন, তাঁদের গুরুতর অসুখ হয়ে যাবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। তুমি যাওয়ার সময় প্লেনে গিয়াংবোচি (১৩,০০০ ফুট) যেও না,—লুকলা পর্যন্ত যেও,—সেখানকার উচ্চতা ন' হাজার ফুট। কিন্তু পথ তার পরেই নেমে যায় প্রায় আরও হাজারখানেক ফুট নীচে। লুকলা থেকে হেঁটে গিয়ে দ্বিতীয় দিনে কুনডে পৌঁছে যাবে। চাও তো ধীরে ধীরে চলে, পথে আরও একদিন কাটিয়ে তিন দিনে পোঁছোও। পথেব চমৎকাব দৃশ্য। হিমালয়ে পথ চলার আনন্দ তো পাবেই, চলতে চলতে শরীরও ঐ আবহাওয়ায় ক্রমে ধাতসহ—যাকে বলে অ্যাক্লামাটাইজ্‌ড্ হয়ে আসবে।

সরোজ বলে, সে-কথা সিল্‌ভেস্টারও জানিয়েছেন। অবস্থা বুঝে সেই-মত করাও যাবে। কিন্তু আপনি না গেলে আমার যাওয়াই হবে না। চলুন। আপনার সব ভার আমি নেবো।

ভাবি জগতে কে কার ভার বইতে পারে, জানি না। তবুও শুনেও মন খুশি হয়। যেতেও পরিশেষে সম্মত হই।

॥ ২ ॥

প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। ১লা অক্টোবর, ১৯৭৫,—কাঠমাণ্ডুতে দুজনে এসে পৌঁছুই। ১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে ইদানীংকালে কয়েকবারই নেপালে আসার সুযোগ হয়েছে। সেই রাণাদের আমল থেকে আধুনিককালের নেপাল রাজ্যের নানাবিধ আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। এবার বিমানঘাঁটিতে নেমে আরও একটি নতুন নিয়মের প্রবর্তন দেখলাম।

সাময়িক বা স্থায়ীভাবে এটি চালু হোল কিনা জানা নেই। তবুও যাত্রীদের জেনে রাখা ভাল। যাত্রীদের সকলকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলেরা ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে। বদরীনাথের অশেষ কৃপা, এ-বছর তাঁর দর্শনে না গিয়ে এ-পথে চলে এলেও, ইন্‌জেক্‌শনের সার্টিফিকেটটি ব্যাগে থাকায় সহজেই মুক্তি পেয়ে গেলাম। সরোজেরও নেওয়া ছিল।

বিমানঘাঁটি থেকে বাইরে এসে দেখি, চারিদিকে নিশান, রঙ্গীন কাগজ, ফুলের মালা ইত্যাদি টাঙানো। পথের দুধারে আল্‌পনা-আঁকা সারি সারি মঙ্গল কলস। সশস্ত্র প্রহরীদল। পথ যাত্রীশূন্য। ব্যাপার কী? কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না। একজন প্রহরী এসে জানায়, অবিলম্বে ট্যাক্‌সি নিয়ে যেন চলে যাই। এখনি স্পেশাল প্লেনে নেপালরাজ বীরেন্দ্র তাঁর মহিষী শ্রীমতী ঐশ্বর্যকে নিয়ে ভারত থেকে এখানে ফিরবেন,—পথে যান-চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে।

অতএব তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠে হোটেলমুখী হই।

কাঠমাণ্ডুতে প্রধান কাজ হোল লুকলা যাবার প্লেনের খবর নেওয়া।

লুকলাতে প্লেন নামবার জন্যে পাহাড়ের মাথা সমতল করে 'ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড'—অবতরণভূমি—তৈরি করেন এডমন্ড হিলারী। কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। শেরপাদের সেবাব্রত গ্রহণ করে তাদের গ্রামে গ্রামে শিক্ষায়তন ও হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে মালপত্র নিয়ে যাবার সুবিধার জন্যেই তাঁর এই ব্যবস্থা করা। সে-কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেলে নেপাল সরকারকে তিনি সেই ভূমি দান করে দেন।

ন'বছর আগে লুকলা থেকে কাঠমাণ্ডু ফেরবার সময় প্লেনে আমাকে আসতে হয়েছিল। তখন তার ব্যবস্থা করেছিলেন লেঃ কর্নেল জিমি রবার্টস্। রবার্টস্ আগে সেনাবিভাগে ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর কাঠমাণ্ডুতে স্থায়ী-ভাবে বাস করছেন। 'মাউন টেন ট্রাভেল' নামে এক ভ্রমণ সংস্থা গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজেও এককালের নামকরা পর্বতারোহী। রবার্টস্ সরকারী প্লেন ভাড়া—'চার্টার'—করে মাঝে মাঝে 'টুরিস্ট' দল লুকলাতে পৌঁছে দেন, আবার ফিরতি পথে নিয়েও আসেন। প্রধানতঃ বিদেশী পর্যটকদের নিয়ে তাঁর এই ব্যবসা। এবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগে ডাঃ সিলভেস্টারের চিঠি-মত মিস্ হাউলির সঙ্গে সরোজ যোগাযোগ করে। সেই মহিলা ডাঃ সিলভেস্টারের কাঠমাণ্ডুর কাজকর্মে সাহায্য করেন। তিনি তখনি শেরপা ডাওয়া নোরবুর সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেন।

নোরবুও এখন লুকলা ও সিয়াংবোচি যাবার প্লেনের ব্যবস্থাদি করে থাকে।

নোরবু জানায়, কদিন আগে বৃটিশ এভারেস্ট অভিযাত্রীদল শিখর জয় করেছেন। এখন তাঁরা ফেরবার পথে। তাঁদের আনতে ৬ই অক্টোবর প্লেন যাবে। তাতে আমাদের জন্য জায়গা রাখবে।

সরোজ বলে, তাহলে চারদিন এখন কাঠমাণ্ডুতে পড়ে থাকা?

নোরবু বলে, উপায় নেই। কদিন আবহাওয়া ভাল যাচ্ছে না, প্লেনও পাহাড়ের ও-অঞ্চলে নামতে পারছে না। বিদেশী ট্যুরিস্টরাও কদিন হোল কাঠমাণ্ডুতে আটকে রয়েছে। তবে ৪ঠা অক্টোবর যদি প্লেন দুবার যায়, দ্বিতীয় প্লেনে আমাদের পাঠাবার চেষ্টা করবে,—কিন্তু আশা অতি ক্ষীণ।

অগত্যা দুদিন কাঠমাণ্ডুতে ঘোরাঘুরি করে কাটে। সরোজ বলে, কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন রণবাহাদুর থাপা। একসময়ে তিনি এখানকার পুলিস দপ্তরের আই. জি. পি. ছিলেন। কলকাতায় আমার সঙ্গে তাঁর আলাপের সুযোগ হয়। নেপালে আমায় নিমন্ত্রণও তিনি করেন। চলুন না, টেলিফোনে খবর নিয়ে তাঁর সঙ্গেও দেখা করে আসি।

তাই করা হয়। ভদ্রলোক এখন অবসর নিয়ে শহরের একটু বাইরে শ্যাম-কুশিতে নতুন বাড়ি তৈরি করে সবে গুছিয়ে বসছেন। তাঁর বাড়ির এলাকার

সন্ধান নিতে গিয়ে দেখা যায়, অবসর নিলেও এদেশে তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি এখনও অটুট রয়েছে।

তিনি সাদরে আমাদের আপ্যায়ন করেন। নিজে থেকেই সেই শের্পা-সংস্থায় টেলিফোনযোগে বলে দেন, আমাদের যাবার ব্যবস্থা যেন ত্বরান্বিত হয়।

নেপালে এখন ভারতীয়দের অবাধ যাতায়াতের কোন বাধানিষেধ না থাকলেও রণবাহাদুর বলেন, এখানকার পুলিস অধীক্ষকের স্বাক্ষরিত একটা খোলা চিঠি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, পথে সরকারী দপ্তরের অফিসাররা যাতে আমাদের যাত্রার সাফল্যে যথাসম্ভব সহায়তা করে।

কিন্তু মানুষের চেষ্টা ও আয়োজন সত্ত্বেও প্রকৃতিদেবীর কৃপাকণার প্রয়োজন থাকে। তার ব্যবস্থা করবে কে?

ডাওয়া নোরবুর নির্দেশমত ৬টা সকালে —সাড়ে সাতটায়—মালপত্র নিয়ে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে যাই। প্লেন যদি একাধিকবার যাতায়াত করতে সক্ষম হয়, টিকিট হয়ত পেয়ে যেতে পারি। অপেক্ষমাণ যাত্রীদের ভিড়ে বিমানঘাঁটি সরগরম। বেশির ভাগই বিদেশী।

কাঠমাণ্ডুতে আকাশ পরিষ্কার। যাত্রীদেরও উৎফুল্ল মন। আর একটু বেলা হলেই প্লেন ছাড়বে। ছাড়েও তাই। আশা নিয়ে বসে থাকি,—দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফ্লাইটে যদি জায়গা পেয়ে যাই। সরোজ শের্পা নোরবুর কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে, হাসিমুখে আলাপ জমাবার চেষ্টায় থাকে। দূরে বেঞ্চে বসে দেখি। ভাবি, নোরবুই বা করবে কী? কতো যাত্রী আমাদের আগে থেকে আরও কদিন অপেক্ষা করছে। তাদেরই তো দাবী বেশি। কিন্তু শের্পার সেই দুরূহ সমস্যা সমাধানের গুরুভার সহজেই নামিয়ে দেন প্রকৃতিদেবী। যাত্রীসমেত প্লেন ফিরে আসে। এখানে আবহাওয়া ভাল থাকলেও পাহাড়ের মাথায় লুকলা এখনও ঘন কুয়াশায় ঢাকা,—কিছুই দেখা যায় না, প্লেন নামা অসম্ভব। আজ আর প্লেন যাবে না।

সরোজ মন্তব্য করে, যাত্রীগুলি তবুও খানিক ভাগ্যবান। বিনা খরচায় কেমন একটা চক্কর দিয়ে এল। এই টিকিটেই আবার পরের দিন এরা যাবে।

ডাওয়া নোরবু জানায়, আগামী কাল আমার বন্ধু মোহন রাই-এর চাটার্ড প্লেন আছে। তাকে বলে দিচ্ছি, যদি কোন রকমে আপনাদের জায়গা করে দিতে পারে।

অগত্যা মালপত্র নিয়ে আবার হোটেলে ফিরে আসা। পরদিন পুনরায় বিমানঘাঁটিতে হাজিরা দেওয়া।

সরোজকে বলি, দেখ তোমাদের যান্ত্রিক যুগের অনিশ্চয়তা,—এইভাবে লোকের পিছনে ঘোরাঘুরি। হাঁটাপথে এ-ধরনের বাধা, ভাবনা বা হাঙ্গামা থাকে না,—পায়ে হেঁটে চলার কতো অবাধ স্বাধীনতা!

আজ এখানে আকাশ কালকের মত পরিষ্কার নয়। ঘোলাটে ভাব। মন তবুও আশায় দোলে। কিছু পরে যাত্রীদের নিয়ে একটা প্লেনও ছাড়ে।

সরোজ নোরবু ও মোহন রাই-এর সঙ্গ ছাড়েনা। কি বলে তাদের তোয়াজ করে জানি না। অদূরে বেঞ্চে বসে, তীর্থের কাকের মত, আমি অপেক্ষা করি, আর দেখি। ভাবতে থাকি, গতবারের কথা। এই চারদিনে কতোদূর হেঁটে চলে যেতাম! সেই নির্জন পাহাড়-পর্বত, গহন অরণ্য। আপন মনে ধীরে ধীরে পথ চলা। আর কোথায় এখানে বিমানঘাঁটির বেঞ্চে বসে অনিশ্চতার মধ্যে যাত্রীদের ভিড় ও হইহল্লা দেখা!

যত সময় যায় মনেও তত আশার দানা বাঁধে। ঘণ্টা দুই পরে প্লেন ফিরে আসার শব্দ ভেসে আসে। সবাই উদ্‌গ্রীব। ঊর্ধ্বমুখে আকাশপানে চায়। যেন দেখতে পাবে,—যাত্রীদের লুকলায় নামাতে পেরেছে কিনা!

প্লেন নামতেই সাড়া পড়ে যায়,—লুকলায় ল্যান্ডিং হয়েছে। দ্বিতীয় ফ্লাইট্ এখুনি যাবে। যাত্রীমহলে ধরাধরি ছোটাছুটি চলে। সরোজ হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, শীগ্‌গীর! শীগ্‌গীর! চলুন,—আমরা এতেই যাচ্ছি!

বাতাসে ঝরাপাতা উড়ে যাবার মতন হাল্কা মনে প্লেনের দিকে ত্বরিৎপদে এগিয়ে যাই। প্লেনে উঠে আসন দখল করি।

॥ ৩ ॥

ছোট প্লেন;—টুইন্ ওটাস। বেশি ভার বইতে পারে না। অথচ যাত্রীদের মালপত্রও এইসঙ্গে চলেছে। মাথাপিছু দশ কিলোর বেশি নিতে দেয় নি। আমাদের বাকি মাল হোটেলে রেখে এসেছি।

ক'টাই বা 'সীট্'? সবই ভরতি। ডাওয়া নোরবুও লুকলা চলেছে, আবার এই প্লেনেই ফিরবে।

অপর যাত্রীরা সবাই বিদেশী, তাঁরা সংখ্যায় ছয়জন।

প্লেন তখুনি যাত্রা করে। ভূমি ছেড়ে সশব্দে আকাশে ভেসে চলে।

হিমালয়ের সুবিস্তীর্ণ গিরিশ্রেণীর ঊর্ধ্বলোকে আকাশে উঠে ঐটুকু প্লেনের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে একসঙ্গে বন্দী হয়ে যাত্রীদের মনে দেশাত্মবোধের ভেদাভেদ থাকে না। পরস্পরে বাক্যালাপ শুরু হয়। আকাশপথ থেকে হিমালয়ের তুষারশিখরগুলির অপরূপ শোভা দেখবার আগ্রহ সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। সকলে কাঁচের জানলার মধ্যে দিয়ে এদিকে ওদিকে উঠে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। জিজ্ঞাসু হয়ে প্রশ্ন করে। এক কেবল ডাওয়া নোরবু নির্বিকার নিরুৎসুক। স্থির, শান্ত হয়ে বসে। চিরচেনা দৃশ্যে তার কোন কৌতূহল নেই। প্লেনের মধ্যে যাত্রীদের আপন আসন ছেড়ে উঠতে নিষেধ করে। পাইলটও সাবধান করায়। হঠাৎ এক দিক থেকে অপর দিকে ভার পড়লে ছোট নৌকার মত এ প্লেন হেলে পড়ে।

আকাশে মেঘ থাকায় শিখরগুলির অধিকাংশ অদৃশ্য। তবুও হঠাৎ কোথাও মেঘের পর্দা ছেঁড়ে, দু-একটা তুষারধবল গিরিচূড়া উঁকি মারে। ডাওয়া নোরবু গম্ভীরভাবে তখনই শিখরগুলির নাম বলে দেয়।

একটি যুগল শিখর আমারও সুপরিচিত,—গৌরীশঙ্কর। একবার

দেখলেই আর তাকে ভোলা যায় না। ঘন সন্নিবিষ্ট তুষারাবৃত দুটি, শৃঙ্গ,—প্রকৃতই যেন শুভ্রবসনা দেবী গৌরী ও দেবাদিদেব শঙ্কর পর্বতশীর্ষে ধ্যানমগ্ন, যোগাসীন।

হিমালয়ের দৃশ্য দেখার কৌতূহল যাত্রীদের একগ্রন্থিতে সংযুক্ত রাখলেও প্রত্যেকেরই কিন্তু মনের ভাব-ভাবনা স্বতন্ত্র। তাঁদের পরিচয়ে তারই প্রমাণ পাই। এঁরা সকলেই এভারেস্ট-অভিযানের সঙ্গে বিজড়িত।

১৯৫৩ সালে হিলারী ও তেনজিং-এর এভারেস্ট-শিখর জয়ের পর আরও কয়েকটি এভারেস্ট অভিযান সফল হয়েছে। কিন্তু এ বছরের বৃটিশ-অভিযান দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে এই প্রথম চূড়ায় উঠতে সমর্থ হোল। এইটেই এই অভিযানের প্রধান কৃতিত্ব ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তা' ছাড়া কোন খাস বৃটিশ এর পূর্বে এভারেস্ট শিখর পদার্পণ করেনি। এবারকার সেই শিখর-বিজয়ীদের মধ্যে আছেন ডগ্‌লাস স্কট্। আর আমাদের প্লেনের সহযাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন স্কটের স্ত্রী ও তাঁদের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র,—মাইকেল। তাঁরা সরাসরি ইংলন্ড থেকে আসছেন, স্কটের সঙ্গে মিলিত হতে। তাঁদের এইভাবে আসার ইতিহাসটুকু শুনি।

এবারকার অভিযানের নিজস্ব সংবাদ প্রচারের স্বত্ব কিনে নেন—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র,—'সান্‌ডে টাইমস্'। সেখানকার অপর এক বিখ্যাত পত্রিকা—'ডেলি মেল'-ও নতুন কিছু সংবাদ-পরিবেশনের সুযোগ খুঁজছিলেন। অভিযান সাফল্যের পর বিজয়-যশস্বী স্কটের স্ত্রী ও পুত্রকে তাঁরাই বিলাত থেকে নিজস্ব সংবাদদাতার সঙ্গে এখানে পাঠিয়েছেন;—এই পারিবারিক মিলনের বিবরণধারা সেই পত্রিকায় প্রচার করার উদ্দেশ্যে। পত্রিকার সেই সংবাদদাতা ও এক ফটোগ্রাফারও আমাদের প্লেনের সহযাত্রী।

প্লেনের মধ্যে বালক মাইকেলের উৎসাহ ও কুতূহল সব চেয়ে প্রকট ও উচ্ছ্বসিত। পিতা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন,—তাঁকে আনতে চলেছে—সেই বিলেত থেকে এসে,—পিতৃগর্বে উৎফুল্ল বালকের আরক্তিম আনন। কেবলি চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করে,—কই! কোন্‌টা এভারেস্ট? এতো ফগ্‌-এ ঢাকা কেন সব? বাবা উঠেছিলেন কোথায়, দেখতে চাই আমি।

কিন্তু এভারেস্ট আজ এখনো দেখা দেন না।

এ ছাড়া প্লেনে আরও এক বিদেশী দম্পতি চলেছেন। এবারের অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেছে বিখ্যাত বার্কলে ব্যাঙ্ক ইন্‌টারন্যাশনাল। এক লক্ষ পাউন্ড খরচার ভার নিয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার অ্যালেন ব্রিটন সস্ত্রীক বিলাত থেকে এসেছেন অভিযাত্রীদলকে সম্বর্ধনা করে আনতে।

এঁদের সকলেরই এই প্রথম এ অঞ্চলে আসা। অতএব কৌতূহলও যেমন অপরিসীম, আপন আপন মনোভাবেও তেমনি বিভোর ও বিচলিত।

আমার মন ও দৃষ্টি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। প্লেন বেশী উঁচু দিয়ে যায় না। মাঝে মাঝে ভেসে-যাওয়া মেঘের ফাঁকে নীচে পাহাড়, নদী, ঘন বন, চকিতে দু-একটা গ্রাম, কচিৎ কোথাও পথের ক্ষীণ রেখা,—দেখতে পাই।

চিনতে চেষ্টা করি, কোন্ দিক দিয়ে গতবার হেঁটে গিয়েছিলাম। মনে হয়, ঐ ওটা বোধ হয় রিসিংগো? ঐ বুঝি কিরানটিচাপ? ওখানে ঐ কী ইয়রসা? হু হু করে নীচে যেন পাহাড়ের পর পাহাড়ের তরঙ্গ তুলে স্রোত বয়ে যায়, আমি যেন মেঘলোকে বসে নিশ্চল, নিথর। দেখি আর ভাবি, আজও যেন আমি সেই নীচে পাহাড়পথে আপন মনে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি, সেখান থেকে শব্দ শুনে চমকে উঠে মাথা তুলে দেখছি পাহাড়ের উপর দিয়ে এই প্লেন উড়ে যায়,—সেবারও যেমন একদিন বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম!

কিন্তু বেশীক্ষণ এই স্মৃতি-বিলাস চলে না। কোথা দিয়ে চোখের পলকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে যায়। লুকলায় প্লেন নামে।

এই কী সেই লুকলা? এমন কর্মচঞ্চলতা? এতো লোকজন? একপাশে দু-তিনটে তাঁবু।

স্তূপাকার মালপত্র,—সম্ভবতঃ এভারেস্ট অভিযানের। ওদিকে একটা লম্বা পাথরের ঘর।

রুকস্যাক্ পিঠে কয়েকটি বিদেশী পর্যটক ঘোরাঘুরি করে। শেরপা পোর্টারদেরও ছোটাছুটি চলে। কোথায় সেই পাহাড়ের মাথায় ন'হাজার ফুট-এ একটুকরা সমতলক্ষেত্র,—জনহীন, নীরব, নিস্তব্ধ লুকলার ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড, —অবরোহ-প্রান্তর? দেখে চিনতেই পারি না। কিন্তু বিদেশী যাত্রীদলের মধ্যে হংসমধ্যে বকের মতন আমরা দুজন। আমাদের দেখেই চিনতে পারে স্মার্ট এক শেরপা যুবক। এগিয়ে এসে পরিচয় দেয়, সিলভেস্টার সাহাব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে। এই বুঝি আপনাদের মাল? একটা পোর্টারেই চলে যাবে। এখনি লোক ঠিক করে আনছি। আপনারা বরং চলুন ঐ হোটেলে, চা খেয়ে নেবেন। আর বলেন তো এখনি কিছু রান্নাও করে দিতে পারি। মেমসাহেব সঙ্গে সব জিনিসপত্র দিয়েছেন।

সরোজ বলে, এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আসছি এখনি।—এগিয়ে গিয়ে ডাওয়া নোরবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসে আমাদের আজই পৌঁছে দেবার জন্যে।

পাথর-গাঁথা সেই লম্বা ঘরটাই হোল হোটেল। শেরপা পরিচালিত। ঘরের ভিতর বেঞ্চ ও টেবিল পাতা।

আমি বলি, রান্নার পাট এবেলা থাক। সাড়ে এগারোটা বাজে। হাঁটা শুরু করতে দেরি করা উচিত হবে না। এখনি কি তৈরি পাওয়া যায় দেখা যাক না? সামান্য কিছু পেলেই হবে। খালি পেটে পাহাড়ে হাঁটা যেমন অস্বাস্থ্যকর, আবার ভরা পেটে হাঁটাও অস্বস্তিকর। পেটে কিছু পড়লেই হোল।

ডাক্তারের পাঠানো শেরপা তরুণটি দেখি বেশ করিতকর্মা, বুদ্ধিমান। ভদ্র কথাবার্তাও। আবার, হাসিখুশিও—যেমন শেরপা মাত্রেই হয়ে থাকে। নাম তার নিমা ওয়াংচু। বয়স মাত্র উনিশ। কিন্তু এরি মধ্যে পূর্ণ জোয়ান।

কুনডের পাশের গ্রাম খুমজুং। সেইখানে হিলারীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশুনা করেছে। এখন কুনডের হাসপাতালে সিলভেসটারের সহায়ক—অ্যাসিসটাণ্ট। ইংরেজি জানে, তাই আমাদের কথাবার্তা চালানোর কোনই অসুবিধা হয় না। বলে, হাসপাতালের কাজ চালাই ঐ আমরা দুজনে—অবশ্য মিসেস্ সিলভেসটারও আছেন, যাহাযোর দরকার হলেই করেন।

হোটেলকর্ত্রী শেরপানী। তখুনি ক'খানা গরম গরম রুটি সেঁকে দেন। আলুসিদ্ধ দিয়ে তাই দুখানা করে খেয়ে চা পান করা হয়।

নিমা পোর্টার ঠিক করে আনে। বেঁটেখাটো একটা শেরপা ছেলে। নাম বলে ফুরবা। টকটকে আপেলের মত রাঙা ফোলাফোলা গাল। তাতে টোল খাইয়ে, চোখ কুঁচকে, ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসে। অনায়াসে আমাদের মাল পিঠে দাঁড় দিয়ে ঝুলিয়ে নেয়। সরোজের পিঠে ঝোলে বিলাতী ভাল রুকস্যাক, তাতে আমাদের টুকিটাকি কয়েকটা খুচরা জিনিসপত্র। বলে, কবে সেই সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনা! এতদিনে ব্যবহার করার সুযোগ এল!

বলি, তা হোক, কিন্তু অভ্যাস না থাকলে পাহাড়ে ঐটুকু মালও বইতে তোমার কষ্ট হবে, দেখবে।

নিমা বুঝতে পারে। সরোজকে বইতে দেয় না। রুকস্যাকটা তার নিজের মালের সঙ্গে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নেয়। হেসে বলে, আমাদের আবার উলটো অভ্যেস। খালি পিঠে চলতে অসুবিধা বোধ হয়।

সরোজের হাতে আর যা আছে, তাও সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনা। একটা স্কীয়িং—বা সিয়িং স্টীক্। বরফের ওপর দৌড়ঝাঁপ করার লাঠি। নীচের মুখ লোহা দিয়ে বাঁধানো তো বটেই, সেখানে একটা লৌহচক্রও বসানো। লাঠির ওপর দিকে হাতে ধরবার কাছে চামড়ার 'স্লিং'। চমৎকার দেখতে।

সরোজ বলে, 'হিল্ স্টীক'-এর বদলে এইটে ব্যবহার করব বলে নিয়ে এলাম—বরফ নাই বা পেলাম, তাতে কী!

তার বেশভূষা পর্বতারোহীদের উপযুক্ত,—ভাল নাইলনের পার্কা (Perka) কোট, মাথায় ফেল্ট হ্যাট্। এই বিদেশী টুরিস্টদের জগতে তাকে সুন্দর মানিয়েছে। মনে হয়, পাহাড়ে পাহাড়ে কতোই যেন ঘুরেছে।

নিমা বলে, আজ ফাকডিং-এর রাত কাটানো যাবে। ডকটার বলে দিয়েছেন, ধীরেসুস্থে নিয়ে যেতে।

যাত্রা শুরু হবে এমনি সময়ে সুট্-পরা শ্যামবর্ণের এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বিলাতী প্রথায় হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে আপন পরিচয় দেন, আমি গুপ্ত। বি-বি-সি-র টেলিভিশান কর্মী। নামচেবাজারে চলেছি এভারেস্ট-অভিযাত্রীদের ছবি তুলতে। আপনারা কোথা থেকে?

চেহারা দেখে ভাবি, তিনি ভারতীয়,—গুপ্ত হয়ত বাঙালীই হবেন।

সরোজ বলে, কলকাতা থেকে আসছি। দুজনের নামও জানায়।

তখন জানা যায়, তিনি নেপালী, নেপালের তরাই অঞ্চলের বাসিন্দা—

অর্থাৎ বিহারের কাছাকাছি।

তাঁর সঙ্গে আর বেশীক্ষণ সময় কাটাই না। আবার পথে দেখা হবে বলে হাঁটা শুরু হয়।

আজ পথের দুর্গমতা নেই। পাহাড়ের ন'হাজার দুশ' ফুট ওপর থেকে ধীরে ধীরে পথ নেমে যায় দুধকোশী নদীর তীরে—প্রায় হাজারখানেক ফুট নীচে, তারপর সেই নদী ধরে চলা। মামুলী পাহাড়-পথের সামান্য চড়াই উৎরাই। দেহে তাই ক্লান্তিবোধ নেই, মনে হিমালয়ের পথ চলার অপার আনন্দ।

মাঝে মাঝে বিদেশী ট্যুরিস্টদের সঙ্গে দেখা হয়,—পুরুষ ও মহিলা। কেউ একা, কেউ বা দোসর সহ, কোথাও বা দলবদ্ধ। সবারই পিঠে রুক্স্যাক্। লম্বা লম্বা পা ফেলে সহজ পথে তাঁরা যেন ছুটেই চলে যান। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মৃদু হেসে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানান। অধিকাংশই থিয়াং-বোচির যাত্রী। সবারই মুখে চোখে আনন্দের প্রকাশ, কেউ বা ইংরেজিতে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন,—ওয়াণ্ডারফুল কান্ট্রি—অপূর্ব দেশ!

আমার মন কিন্তু ডুবে আছে বিগত দিনের সুখস্মৃতির নীল সায়রে। চোখ দুটি দিয়ে কেবল সে খুঁজতে থাকে ন'বছর আগেকার মনে-গাঁথা কতো বিচিত্র মধুর স্মৃতিচিহ্ন!

লুকলা ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামার পথে নীচে দেখা দেয় চমরী-খরকা গ্রামের ঘরবাড়ি। তারই মধ্যে দিয়ে ঐ এসেছে সেই হাঁটাপথ—যে-পথ ধরে সেবার এসেছিলাম। ঐখানেই কোন্ এক বাড়ির সুমুখে আমার সেবারের সঙ্গী-গাইড্, শেরপা গিরমি, দাঁড়িয়ে গেল পরিচিতা এক শেরপানীর হঠাৎ দেখা পেয়ে। দুজনের সে কী হাসি ও আনন্দ! আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম, পথে পরে সে আমাকে ধরে ফেলবে জানতাম।—এই তো সেদিনের কথা। আজও হাঁটতে হাঁটতে চোখের ওপর সে দৃশ্য যেন ভাসে। গিরমি এখনও কি সেই ভাবে আর কোথাও গল্পে মেতে আছে? শেরপাদের সেই থেকে থেকে উচ্ছ্বসিত হাস্য পরিহাস, পরস্পরে ব্যঙ্গকৌতুক! না, এ-জগতে গিরমির সেই প্রাণখোলা হাসিগল্প ফুরিয়ে গেছে। কর্নেল রবার্টস-এর কাছে সে চাকরি করত। গিরমি সংবাদ নিতে গিয়ে শুনি, ক'বছর আগে জাপানী অন্নপূর্ণা-অভিযানে এক দুর্ঘটনায় গিরমি প্রাণ হারিয়েছে। হিমালয়ের সন্তান হিমালয়েই মিলিয়ে গেছে!

হঠাৎ জলকল্লোল ধ্বনিতে আমার চমক ভাঙে। পথের ওপর এক বড় ঝরণা। পাহাড়ের মাথা থেকে কলকল শব্দে নেমে আসে। ওঃ! তোমাকেও তো চিনেছি। গ্রামের প্রান্তের তুমি সেই ঝরনা না? তোমার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-নৃত্য তো এখনো তেমনি চলেছে? কই, আজ সেই রঙচঙে, ঝলমলে পোশাক পরা সুশ্রী শেরপা রমণীরা হাসি ও গানের লহরা তুলে, তামার গাগরী ভরে, জল নিতে আসেনি?

বুঝতে পেরেছি। আমারই আজ অসময়ে আসা। জল নিয়ে তারা যে যার ঘরে ফিরছে।

এগিয়ে চলি। সরোজকে দেখাই, সেবার কোথায় কি ঘটেছিল।

কিছু পরে সুমুখে নীচে দেখা যায় দুধকোশীর উপত্যকা। দু'পাশের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে সোজা নেমে আসে পার্বত্য নদী, শুভ্র ফেনাপুঞ্জের উজ্জ্বলতায় দুধের মতনই তার জলের রঙ্। নদীর কূল ধরে সোজা আমাদের যাবার পথ,—উপর থেকে মনে হয় যেন জলের কিনারা দিয়ে সমান্তরালে দীর্ঘ এক রেখা আঁকা। বহুদূরে নদীর তীরে ঘাটগ্রামের ঘরবাড়ি খেলাঘরের মত দেখায়। মনের আনন্দে চলতে চলতে একসময়ে সেখানে পৌঁছেও যাই।

নদীর ওপারে গ্রাম। এপারেও দু-একটা ঘর। মাঝে কাঠের পুল। পুলের মুখে পথের মাঝখানে বৌদ্ধ মণিপ্রাচীর ও চোরটেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পার্বতীয় অধিবাসীদের গ্রামাঞ্চলে যেমন থাকে। গতবারও এগুলি চোখে পড়েছিল। নতুনের মধ্যে দেখি এপারে একটা ঘরে শেরপার দোকান ও হোটেল। যাত্রী দেখে শেরপানী হোটেলওয়ালী হাসিভরা মুখে আমাদের ডাকে।

সরোজ বলে, চলুন না, একটানা অনেকখানি হাঁটা হয়েছে, একটু চা খেলে হয়।

হোটেলে ঢুকে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সরোজ নিমা ও ফুরবাকেও ভিতরে ডাকে। নিমা চায়ের কথা শুনে হাসে। বলে, চা? আপনারা তাই খাবেন, খান। আমরা দুজন 'ছাং' পান করব।

'ছাং' এদেশে নাকি বিলাতী 'বিয়ার'-এর মত। অনুগ্র সুরা। যখন-তখন পাহাড়ীরা পান করে। অতএব তারা দুজনে তাই খায়।

হোটেলের ঘরে বসে পুলের পানে তাকিয়ে দেখি। সরোজকে বলি, গতবার এইখানে একা পৌঁছে আমি ওপারে গ্রাম দেখে পুল পার হয়ে ওদিক দিয়ে চলে গিয়েছিলাম; জানতাম না, নদীর এ-পার দিয়ে যাবার আর একটা পথ আছে। গাইড্ গিরমি পোর্টারদের নিয়ে এই ধারের পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিল, ফলে আমার সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি ঘটে যায়। সারাবেলা অভুক্ত থেকে বহু পরে আমার সঙ্গে তাদের পুনর্মিলন ঘটল—যখন নদীর ওপর আবার আর একটা পুল পাওয়া গেল!

এবার আর সে সম্ভাবনা নেই,—একই সঙ্গে সবাই চলেছি।

ক্ষণিক বিশ্রাম অন্তে আবার হাঁটা শুরু। নদীর সঙ্গ ছেড়ে পথ কোথাও বনের মধ্যে প্রবেশ করে, কখনো বা পাহাড়ের গা বেয়ে উপর থেকে ঝরনার ধারা নামে, পথের উপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলে; জলের বুকে মাথা তুলে ছোট বড় শিলাখণ্ড;—তারই উপর পা রেখে পার হওয়া। ক্বচিৎ দু-একটা গ্রামও আসে।

মাইল দুই গিয়ে নদীর উপর লোহার পুল। অপর পারে গিয়ে নদীর তীর ছেড়ে অল্প খানিক ওঠা। সেখানে পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। কয়েকটা পাথরের ঘর। তাঁবুও পড়েছে দু'তিনটে। নিমা বলে, এই জায়গাটাই ফাক্‌ডিং। সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু। এইখানে

আজ আমরা রাত কাটাব। দেখি, হোটেলে ব্যবস্থা করে আসি।

আমি চারদিকপানে তাকাই। ন'বছর আগে এখানে এসব কিছুই ছিল না। ছিল খালি মাঠ; ঝোপঝাড়, বড় বড় পাথর, চারপাশে আকাশচুম্বী গিরিশ্রেণী, অদূরে নীচে ঐ দুধকোশী। এরই নিকটে কোথাও একটা ঝরনার পাশে পাহাড় ধসে সেবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল। মজুররা নতুন পথ তৈরির কাজে নিযুক্ত দেখেছিলাম।

আজ এখন কিছুই চিনতে পারি না। বহু ট্যুরিস্ট দলের আসা-যাওয়ার ফলে ফাক্‌ডিং-এ এখন তাঁবু ফেলে রাত কাটানোর আস্তানা হয়েছে। শেরপারাও পাথরের কয়েকটা ঘর তুলেছে, হোটেল খুলেছে। তারই একটাতে আমাদের থাকবার আয়োজন চলে।

॥ ৪ ॥

হোটেল অর্থে শ্লেটপাথরের ও কাঠের ছাদ দেওয়া একটা ঘর,—মাঝখানে কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত। প্রবেশপথ কিন্তু একটিমাত্র দুয়ার দিয়ে। ঢুকেই যে অংশ, সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট--গুদাম ঘর। সেইখানে দেওয়ালের গায়ে লাগানো কাঠের লম্বা বেঞ্চ মত—যেন নিচু একটা তাক, তার উপর বস্তাবন্দী ও কয়েক ঝুড়ি দোকানের মাল। সেইগুলো একপাশে সরিয়ে, কতক বা মাটিতে নামিয়ে এককোণে জড় করে রেখে,—সেই বেঞ্চের ওপর একজনের শোওয়ার জায়গা হয়। অপরজন? কেন? এই তো বেঞ্চ ও মালের স্তূপের মাঝখানে মাটিতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে আর একজনের।

সরোজ বলে, আপনার জন্যে উচ্চাসন, আমার ভূমিশয্যা।

আমার কাছে এ ধরনের রাত্রিবাস নতুন কিছুই নয়। হেসে বলি, ঠিক আছে, শুধু পাশ ফিরতে গিয়ে বেঞ্চ থেকে তোমার ওপর মাটিতে না পড়লেই হোল! কিন্তু আসল বিপত্তিটা কোথায়, সেটা দেখেছ? যেখানে তুমি শোবে তারই পাশ দিয়ে দোকানের, অর্থাৎ হোটেলের, খাস ঘরে যাবার ঐ একটি মাত্র পথ,—লোক যাতায়াত করবে হয়ত হরদম—তোমার গায়ের ওপর দিয়ে!

সরোজ বলে, রাত্রে সবাই শুয়ে পড়লে যাওয়া-আসা করবে আর কে? দরজাটা বন্ধ করে দেবো।

যাই হোক, আপাততঃ মালপত্র খুলে তখনি আমাদের জায়গাটুকুর দখল নিয়ে টুকিটাকি জিনিসপত্র সাজিয়ে ফেলা হয়। এয়ার-ম্যাট্রেস ও বালিশ ফুলিয়ে স্লিপিং ব্যাগ পেতে শয্যাও প্রস্তুত।

উঁকি মেরে সরোজ পাশের ঘরটি দেখে। বলে, ঘরের ভেতরটা ওখানে বোধ হয় আরামপ্রদ, উনুন জ্বলছে, হোটেলে রান্না চড়েছে, চা-ও হচ্ছে। এর মধ্যে খদ্দেরও জুটেছে। একপাশে ও-ঘরে কম্বল জড়ো করা,—দোকানের লোকজন ঐ ঘরেই শোয় নিশ্চয়।

নিমা এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, ঐ ঘরে আমিও রান্না এখনি চাপাব? মিসেস্ সিল্‌ভেস্‌টার ভেজিটেব্‌ল স্যুপ, আলু, বীন, চাল, ডাল আর

প্রভৃতি সঙ্গে দিয়েছেন। টিনের মাংস ও ডিমও আছে। কি খাবেন বলুন।

সরোজ জানায়, এক যাত্রায় পৃথক আয়োজন নয়। নিরামিষই তোমার খুশীমত যা হয় কিছু করো।

নিমা সেইমতই রাঁধতে চলে যায়।

এখনও দিনের প্রচুর আলো। শীতও তেমন বেশী কিছু নয়। সরোজ বাইরে বেরিয়ে খানিক ঘোরে, নদীর নিকটে একটা চেটালো পাথরের ওপর জাঁকিয়ে বসে। বিদেশী ট্যুরিস্ট কয়েকজন এসে তার সঙ্গে গল্প জোড়ে। তাঁদের তাঁবু থেকে চা-কফি আসে। আসর জমে ওঠে।

আমিও ডেরা ছেড়ে বাইরে আসি। পুরানো দিনের মধুর স্মৃতির মায়াবন্ধনে বাঁধা মন। হারিয়ে যাওয়া কী যেন সুখের সন্ধান করে। সরোজের আহ্বানে তাঁদের আসরে দাঁড়িয়ে থেকে খানিক যোগ দিতে হয়। বি-বি-সি-র টেলিভিশনের কর্মী গুপ্তও এসে দাঁড়ান; তিনি এখান থেকেই কাঠমাণ্ডুতে ফিরে যাচ্ছেন,—নামচেবাজার যাবেন না। খবর পেয়েছেন, অভিযাত্রী দলের কাঠমাণ্ডুতে ফেরবার দিন এখনো অনিশ্চিত,—কয়েকটা দিন আরও দেরি হতে পারে।

মিসেস্ স্কটদের তাঁবুও নিকটে পড়েছে। তিনিও এসে মজলিসে যোগ দিয়েছেন: স্বামীর বিজয়ে খুবই খুশী। সরোজের প্রশ্নের উত্তরে জানান, দুর্গম অভিযানে যাওয়া স্কটের তো এখন একটা বার্ষিক কর্মসূচী হয়েছে। তবুও স্ত্রীর মন সব সময়ে যে একেবারে নির্ভাবনায় থাকে এমন নয়, নিরাপদে ঘরে ফিরলে তবে মনের দুশ্চিন্তা কাটে। এবার অবশ্য এভারেস্ট শিখর আরোহণের সাফল্যের সংবাদ তাঁর মনে যে অসীম আনন্দ দিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তাঁদের কথোপকথন শুনি, চারপাশে তাকিয়েও দেখি। আশপাশে ট্যুরিস্টদের আরো কয়েকটি তাঁবু খাটানো হচ্ছে। তাঁরাও কেউ কেউ এগিয়ে এদিকে আসেন। নবাগতদের মধ্যে কম লোকই ইংরেজি জানেন। বেশির ভাগই জার্মান। বড় দলগুলির ভ্রমণসূচী, আহার, তাঁবু, মাল বহা ইত্যাদির আয়োজন করেছে কাঠমাণ্ডুরই কোন-না-কোন ভ্রমণ-সংস্থা—ট্রাভেল এজেন্সি। বিদেশী ট্যুরিস্টদের নেপাল ভ্রমণের ও এভারেস্ট-অঞ্চল দর্শনের যে প্রচণ্ড উৎসাহের বন্যা নেমেছে, নেপালী ভ্রমণ-সংস্থাগুলি সেই সুযোগে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। বাজার-মূল্যের অনুপাতে কল্পনাতীত উচ্চহারে ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে, তাঁরাও যেন মুক্তহস্তে ব্যয় করতে প্রস্তুত।

কিন্তু এই ট্যুরিস্টদের দলে দলে আসা-যাওয়া এবং পর্বত-শিখর-অভিযানের সংখ্যা ও আয়তন দিন দিন যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে হিমালয়ের নিভৃত ও শান্ত পরিবেশ ছিন্নভিন্ন তো হয়েছেই, এমন কি প্রকৃতির অমলিন রূপমাধুর্যও কলুষিত হয়ে উঠেছে। চোখের সামনেই এখানে দেখতে পাই, চারিদিকে ছড়ানো ও স্তূপাকারে জমে-থাকা মানুষের ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত বস্তুর অবশিষ্ট অংশ—ছেঁড়া কাগজ, কাপড়, কাগজের খালি বাক্স, টিনের

কৌটা, আধপোড়া কাঠ ইত্যাদি আবর্জনা। বাতাসে ছাই ওড়ে, কোথা থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসে। নদীর তটে ফুলের রাজ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে রঙ্গীন প্রজাপতির দল ওড়ে না,—বিস্কুট, চকোলেট, সিগারেটের ফেলে-দেওয়া শূন্য প্যাকেটের কাগজ ফড়ফড় শব্দ তুলে ওড়ে!

মন ভারী হয়ে ওঠে এসব দেখে। এ যেন দেবতার মন্দিরকক্ষে অপরিচ্ছন্ন আবর্জনার স্তূপ।

খানিকক্ষণ এধার ওধার একাকী ঘুরে ঘরে ফিরে আসি। বাইরে ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়া নামে।

সরোজও মজলিস ভেঙে ভিতরে আসে। নিমা এসে জানায়, ভোজন প্রস্তুত। বাতি জেবলে যে যার শয্যায় বসে আহার শেষ করি।

মাত্র সাতটা বেজেছে। তা' হোক,—তখনি স্লিপিং ব্যাগে আশ্রয় নেওয়া হয়। সারাদিন দেহের উপর ধকল গেছে, সহজ পথ হলেও এক বছর পরে অনভ্যস্ত চরণে প্রথম দিনের হাঁটাও শ্রান্তি জাগায়।

সরোজ বলে, জানেন? সাহেব-মেমদের সবারই কৌতূহল আপনার সম্বন্ধে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, আমাকে নিয়ে? কী ব্যাপার?

বলে, আপনাকে মানে—আপনার বয়স নিয়ে। তিয়াত্তর বছর শুনে সবাই থ'। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে হিমালয়ে ঘুরেছেন—বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে, আমরা কেউই তখন জন্মাইনি, আমাদের বাবা-মায়েরও হয়ত সবে জন্ম হয়েছে,—এখনও উনি এইভাবে ঘুরছেন!

হেসে বলি, বললে না কেন? উনি কি আর স্বেচ্ছায় আসেন, হিমালয়ই ওঁকে টেনে নিয়ে আসে, এবার অবশ্য এখানে নিয়ে এসেছ তুমি!—কিন্তু আর গল্প নয়, এবার ঘুমোও। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে,—জাগিয়ে দেব,—ঐ সব দলবল রওনা হবার আগেই বেরিয়ে পড়া চাই। ভোরে নির্জন পথে পাহাড়ে চলার আনন্দ অনেক। অতএব এখন—গুড নাইট।

কিন্তু ঘুমাব বললেই কি ঘুম আনানো সম্ভব? যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেই রন্ধ্রপথেই শনি ঢোকে। ঘরের ঐ একমাত্র প্রবেশপথের দরজা দিয়ে অনবরত লোক-চলাচল হতে থাকে। বলবার কিছুই নেই, সবে কলির সন্ধ্যা—হোটেলে খদ্দের আসার এই তো সময় শুরু। কেবলি দরজা খোলা ও ভেজিয়ে দেওয়ার শব্দ, দলে দলে মেয়ে-পুরুষের চলাচল, বিভিন্ন ট্যুরিস্ট দলের পোর্টাররাই বেশী। দিনের শেষে এই তো তাদের বিনোদনের অবসর। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন বিদেশী ট্যুরিস্টও দেখি সেই সঙ্গে ঘরে ঢোকে। কাঠের পার্টিশনের ওপাশে ঘর। উচ্ছ্বসিত হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজব রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে। বোঝা যায়, ছাঙ্-এর আসর জমজমাট হয়ে উঠেছে। সমবেত কণ্ঠে গানও শুরু হয়। একই গান সারাক্ষণ চলে—গানের একটা কলি ঘুরে-ফিরে গায়—রাখুশি লেমায়েও জল্লাই-ই, রাখুশি লেমায়েও জল্লাই-ই!

সরোজকে জিজ্ঞাসা করি, কী রকম ঘুম হচ্ছে?

বলে, ঘুমের দফারফা! এই হইহুল্লোড়ে কি ঘুম আসে? আর দেখছেনই

তো, অনবরত লোক আসছে যাচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে। গানের মাঝে কেবলি রাক্ষস-রাক্ষস ওটা বলছে কী?

বলি, রাক্ষস-খোক্কস নয়—রাখ্শি! ওটা হোল এ দেশের তীব্র সুরা—ঘরে ঘরে এর প্রচলন। তাই নিয়েই বোধ হয় গান রচনাও।

সরোজ বলে, নিশ্চয় খুব একটা চালু গান—সবাই গাইছে। আমাদের দেশে আজকাল পথেঘাটে যেমন সিনেমার গান—এটাও হয়ত সেই ধরনের কিছু। নিমার কাছে কাল জানতে হবে।

আপাততঃ দু'জনে চোখ মটকে পড়ে থাকি। ছোট্ট বেঞ্চ, এ-পাশ ও-পাশ করারও উপায় নেই। একভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকা,— যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা ইজিপ্টের পিরামিডের মামমী! অবশেষে একসময়ে মজলিস ভাঙে। মেয়ে-পুরুষ দরজা দিয়ে বার হয়ে যায়,— কেউ কেউ স্খলিত পদে চলে, স্খলিত কণ্ঠে কী সব যেন বলে,—খিলখিল করে হাসে।

হোটেলের একজন লোক এইবার ভেতর থেকে দরজায় খিল দেয়।

সরোজ বলে, যাক, "বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ"...
"দশ-কজন মুদিল নয়ন, সভা হোল নিস্তব্ধ॥"

শুনছিলাম ক'জন বার হোল ঐটুকু ঘর থেকে,—দশজন পুরুষ, ছ'টা মেয়ে! ক'টা বাজল দেখুন তো?

টর্চ জেবলে ঘড়ি দেখে বলি, রাত বারোটা দশ। তবুও ঘণ্টা চারেক ঘুমানোর সময় এখনও রয়েছে।

এই অবসরে বলে রাখি, পরে নিমার কাছে সরোজ সেই গানটি লিখে নেয়, ইংরেজিতে অর্থও জানে। সরোজের কৌতূহল ও আগ্রহ দেখে নিমা তো হেসেই খুন। শেরপাদের এটা একটা লোকসঙ্গীত। গানের ভাষা শোনায় অনেকটা এই ধরনের ঃ

রাখ্শি লেমায়েও / রাখ্শি লেমায়েও / —জল্লাই-ই!
আকাশই বারুহি / নওলেকো তারা / একতারা জুনসীতা—
রাখ্শি লেমায়েও / রাখ্শি লেমায়েও / জল্লাই-ই!
লায়েকো মায়া / গোয়েহালো কাঞ্চী / লাও মায়া কুনসিতা
রাখ্শি লেমায়েও / রাখ্শি লেমায়েও / জল্লাই-ই!

রাখ্শি আন / রাখ্শি আন / বেহেড আমি মাতাল হই!
আকাশভরা / লক্ষ তারা / চাঁদের সাথী একটি ওই!
রাখ্শি আন / রাখ্শি আন / বেহেড আমি মাতাল হই!
ভালো তুমি / বাসতে প্রিয়ে / চাঁদের ঐ তারার মতো
আমায় ফেলে / চললে এখন? / আর প্রিয়া মোর রইল কই!
রাখ্শি আন / রাখ্শি আন / বেহেড আমি মাতাল হই!

পরদিন অতি ভোরে যাত্রা করতে নিমা নিষেধ করে। বলে, সামনে বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কখন-সখন জানোয়ার দেখা যায়,—আর একটু বেলা করে বেরোনোই ভাল। সাহেবদের তৈরি হয়ে রওনা হতে আরও অনেক দেরি হবে।

তাই করা হয়। পৌনে সাতটায় চা, বিস্কুট, টোস্ট খেয়ে যাত্রা শুরু করি। ট্যুরিস্টরা তখন তাঁবু গুটাতে, খানাপিনা করতে ব্যস্ত।

সকালের শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম আবহাওয়া। সূর্যের আলোক চারিপাশের পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে এখনও এই বনাঞ্চল স্পর্শ করেনি। বাতাসে শীতের আমেজ। দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে বন। এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে পথ চলে। নীরবে আপন মনে হেঁটে চলতে চলতে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। নেমে আসি দুধকোশী নদীর উপত্যকায়। উপলবহুল পথে শুভ্র ফেনার মুকুট মাথায় নৃত্যভঙ্গে স্রোতধারা নেমে যায়। পথ কখনো জলের ধারে নামে। কখনো বা তীর ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক ওঠে। বড় বড় গাছের অন্তরালে লুকায়। নদী চোখের আড়ালে যায়; নদী ও পথ যেন লুকোচুরি খেলে। বনের মধ্যে গাছের ডালে পাখি ডাকে। অন্তরে আনন্দ-লহরি তোলে।

নিমা জানায়, এ-সব বনে বাঘ-ভালুকও থাকে। তবে লোক যাতায়াত আজকাল অত্যধিক হওয়ায় পথের ওপর ক্বচিৎ আসে।

নদীর ওপর পুল। অপর পার দিয়ে পথ ধরে এগিয়ে চলি। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রাম আসে। এক জায়গায় দুধকোশীর ধারে পাহাড়ের জঙ্গল কেটে শাকসব্জির মস্ত বাগান। জাপানী ছবির মত কাঠের ছোট কটেজও। সামনে মরসুমী ফুল ফুটে আলো করে রেখেছে। কই, এ-সব তো সে-বছর দেখি নি! শেরপাদের করা বলেও মনে হয় না। নিমা বলে, ঠিকই ধরেছেন। সম্প্রতি তৈরি। জাপানীদের করা। 'মার্কেট গার্ডেন' হয়েছে। সিয়াং-বোচির সেই 'ফাইভ্ স্টার' জাপানী হোটেলে এখান থেকে তাজা তরিতরকারির সরবরাহ হচ্ছে। এদেশে আগে জন্মাত শুধু ভুট্টা, যব (বার্লি) আর অপর্যাপ্ত আলু। এখন এই বাগানে ফলানো হচ্ছে—বাঁধাকপি, কলাইশুঁটি, বীন, গাজর, টমাটো ইত্যাদি। শেরপারাও দেখাদেখি করবার চেষ্টা করছে। কুনডেতে গিয়ে দেখবেন, মিসেস সিলভেসটারও 'কীচেন গার্ডেন' করেছেন। কিন্তু সেখানে তো এমন ভাল ভাবে ও সহজে হবে না। আরও কত উঁচুতে যেমন শীত তেমনি বরফও পড়ে বেশী, জলের অভাব। এখানে নদীর ধারে এই আবহাওয়ায় হয় ভাল এবং সহজেই ফলে।

সাড়ে দশটা বাজে। আবার নদীর ওপর পুল আসে। জায়গাটা দেখেই চিনতে পারি। অপর পারের বাড়িগুলা দেখিয়ে বলি, ঐ না জোরশালা গ্রাম? ঐখানেই গতবার রাত কাটিয়েছিলাম। পরের দিন ভোরে উঠে নামচে-বাজারের চড়াই ভেঙে কুন্‌ডেতে যাই।

নিমা বলে, আজও এইখানেই আমাদের থাকবার কথা,—যদি ধীরেসুস্থে

যেতে চান।

সরোজ তখনি মন্তব্য করে, থাকবার কোনই দরকার নেই। ধীরেসুস্থেই খাসা চলেছি। বরং এখানে যদি কিছু পাওয়া যায় খেয়ে নিয়ে, খানিক বিশ্রাম করে, নামচেবাজার চলে যাই,—সারাদিনই তো এখন পড়ে। 'ওয়েদার'ও চমৎকার। মেঘলা আকাশ। রোদ নেই, বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। এ জায়গাটা উঁচু কতো ?

নিমা জানায়, প্রায় ন'হাজার দু'শ ফুট।

সরোজ উৎসাহিত হয়ে বলে, তাই নাকি ? সকাল থেকে তাহলে হাজার দেড়েক ফুট চড়াই উঠে এলাম ! বুঝতেই পারিনি !

এখানেও পথের পাশে শেরপা-পরিচালিত হোটেল হয়েছে। বাড়ির সামনে সারি সারি ফুলের টব সাজানো। রাস্তার অপর দিকে দুধকোশী নদী। হোটেলে দু'খানা ঘর। সামনের ঘরে চৌকি পাতা ; দুজন সাহেব বোধ করি রাত্রিবাস করেছিল—রুকস্যাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। পাশের ঘরটা বড়। লম্বা টেবিল ও বেঞ্চ পাতা। একপাশে শেরপানী রান্না চড়িয়েছে, —তাকে—সাজানো হোটেলের মালপত্র। হাসিমুখে শেরপানী সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

নিমা অর্ডার দেয়, তাড়াতাড়ি যেন ক'টা চাপাটি ও ভাজা সব্জি করে দেয়,—চায়ের সঙ্গে তাই খাওয়া যাবে।

আমি দোকান ছেড়ে বাইরে আসি, খুঁজতে থাকি—গতবার কোন্ বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম ? তখন সবে সেটা একটা কাঠের নতুন ঘর তৈরি হচ্ছিল, —দরজা মেঝে কিছুই হয়নি, পাশে কাঠের দেওয়াল ও মাথার ওপর ছাউনি থাকায়—তারই ভিতর আশ্রয় নিয়ে রাত কাটানো। এখন ন'বছর পরে সে ঘর কি আর চেনা সম্ভব ? এ-যেন জন্মকালে দেখা শিশুকে তার বালক অবস্থায় চেনবার চেষ্টা। তবুও পুরাতন স্মৃতির সূত্র ধরে এ এক মায়ার খেলা।

রাস্তা দিয়ে ওপর দিক থেকে দু'জন সাহেব দ্রুতপদে নেমে আসেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও মুখের চেহারা দেখে সন্দেহ থাকে না—এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সভ্য। মুখ-ভরতি দাড়িগোঁফ। মাথায় আলুথালু লম্বা চুল। রোদে পোড়া মুখের রঙ্,—মনে হয় যেন ফোস্কাই পড়েছে। হোটেলের দরজার সম্মুখে পৌঁছুতেই আমি তাদের অভিযানের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। তাঁরা ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, চা পাওয়া যাবে এখনি ? বিশেষ তাড়াতাড়ি আমাদের।

বুঝতে পারি, আমাকে হোটেলওয়ালা ভেবেছেন।

সাদরে তাঁদের ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বসাই। অবিলম্বে চা, বিস্কুট দিতে বলি। সরোজ সেই সুযোগে আলাপ জমায়।

একজনের নাম আর্থার চেস্টারম্যান, অপরজনের অ্যাড্রিয়ান গর্ডন। গর্ডন অনেকদিন নেপালে আছেন, নেপালী ভাষা ভাল ভাবে জানেন। এই

অভিযানে তিনি দোভাষীর কাজ করেছেন, অ্যাড্‌ভান্সড্‌ বেস ক্যাম্প—পুরোবর্তী মূল শিবিরের পরিচালক ছিলেন। চেস্টারম্যান বি-বি-সি'র টেক্‌নিসিয়ান—প্রকর্মী। আজ তাঁরা নামচেবাজার থেকে নেমে আসছেন, সোজা লুকলা যাবেন, প্লেনে অভিযানের মালপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। দলনেতা ক্রিশ্‌ বনিংটন ও অপর কয়েকজন সভ্য এখনও খুমজুং-এ—কুনডের ঠিক পাশের গ্রামে রয়েছেন। তাঁদের আবার একদিনের জন্যে থিয়াংবোচি ফিরে যাবার কথা—স্কটের স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে।—সবোজ জানায়, কাঠমান্ডু থেকে আমরা এক প্লেনেই এসেছি, পিছনে তাঁরা আসছেন।

সাহেবরা আমাকে চায়ের দাম দিতে গেলে হেসে বলি, ওটা তোমাদের বিজয়-অভিনন্দনের অতি নগণ্য অংশ। তাঁরা ওঁদের ভুল বুঝতে পেরে হেসে ওঠেন, হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে আবার ঝড়ের বেগে পথ বেয়ে নেমে যান।

আমরাও খাওয়া সেরে রওনা হই।

আবার দুধকোশীর তীর ধরে পথ। কিন্তু পথের সে সবলতা বেশীক্ষণ থাকে না। দুইটা নদীর সঙ্গমস্থল আসে। নদীর উপর পুলও পার হতে হয়। অপর পারে শুরু হয় নামচের খাড়া চড়াই। পাহাড়ের গা ঘেঁসে পথ ঘোরানো উঠেছে। ধীরে ধীরে পা ফেলে উঠি। মাঝে মাঝে ওপর থেকে নেমে আসে মালবাহক ঝব্বু ও ঘোড়ার দল। পিঠের দুদিকে ঝোলানো বোঝার গায়ে এভারেস্ট অভিযানের নাম লেখা। উৎরাই পথে হুড়মুড় করে নামে। গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটোং ধ্বনি ওঠে। শেরপা চালকরা উপর থেকে আমাদের দেখতে পায়, হুঁশিয়ার করে। আমরাও পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়াই। সবোজকে সাবধান করি, কোনমতেই যেন খাদের দিকে দাঁড়িও না; একটু ধাক্কা খেলেই গাড়িয়ে সেই নীচে দুধকোশীতে পড়তে হবে।

মালবাহী জানোয়ারের দল একসঙ্গে পথ জুড়ে এলে কোথাও দাঁড়াবার একটিলও স্থান থাকে না পথের পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে কোনরকমে খানিক উঠে পাথরের উপর পা রেখে দাঁড়াতে হয়। এ-ধরনের অপেক্ষা করায় মনে অবশ্য স্বস্তিবোধ থাকে। চলার পথে ক্ষণিক বাধার সৃষ্টি হলেও এই সুযোগে চড়াই-ওঠায় ক্লান্ত চরণ বিশ্রাম পায়, বুকে দম সঞ্চয়েরও অবসর আসে। দুরূহ চড়াই পথে হঠাৎ-পাওয়া এই বিশ্রামটুকুও অতি আরামপ্রদ।

বেশীক্ষণ বিশ্রামের সময় আসে প্রায় হাজার খানেক ফুট উঠে। এর এক বিশেষ কারণ থাকে। এখানটায় এই পাহাড়ের কাঁধের মতন। খানিকটা সমতল ভূমি, পাহাড়ের অপরদিকের দৃশ্যও দেখা যায়। কিন্তু পথ থেকে নয়। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে দিয়ে কয়েক পা মাত্র এগিয়ে গিয়ে। সেইখান থেকে এই যাত্রাপথে এভারেস্ট শিখরের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়। গতবার দেখেও ছিলাম। তাই সবোজকে বলি আমি এই পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করছি, নিমাকে নিয়ে তুমি ওদিকপানে এগিয়ে দেখে এস, এভারেস্ট তোমায় আজ দর্শন দেন কিনা। আকাশ যেমন মেঘে ঢাকা, দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

সরোজ ফিরে এসে বলে, ঠিকই বলেছেন, কিছুই দেখা গেল না, দূরের সব কিছু ফগে ঢাকা। যাক—ফ্লাস্ক-এ আনা চায়ের সদ্ব্যবহার করে আবার হাঁটা শুরু করা যাবে। চড়াইটা বেশ দারুণই। নিমা সান্ত্বনা দেয়, আদত চড়াইটা পার হয়ে এলেন,—এখনও উঠতে হবে বটে, তবে এখান থেকে পথ ধীরে ধীরে উঠেছে।

অকারণ বসে থেকে লাভ নেই। আবার চলা শুরু। নদীর উপত্যকা এখন অনেক নীচে। পাহাড়ের গা ঘিরে সর্পিল আকারে পথ এগিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পরে একটা বাঁক ঘুরতেই পাহাড়ের ওপর নামচেবাজারের ঘরবাড়ি দেখা যায়,—কিন্তু সে কি এখানে? খেলাঘরের মত ক্ষুদ্র আকার,—এখনও পাহাড়ের কতো উপরে! ভরসা শুধু, কাঁচি-কাটা Zig zag প্রাণান্তকর চড়াই না,—সুদীর্ঘ সরল রেখায় পাহাড়ের বুকে যেন আঁচড় কেটে পথ ক্রমশঃ ওপর-পানে উঠে। নামচেবাজারের পাহাড়ের পিছনে মেঘের ফাঁকে এক গগনস্পর্শী তুষারচূড়া মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে মুখ লুকায়। নিমা জানায়, কোয়াংডে শিখর—২০,৩০০ ফুট উঁচু।

সরোজ বলে, নামচেবাজার কতো?

নিমা উত্তর দেয়, মাত্র এগারো হাজার তিনশ'।

সরোজ মন্তব্য করে, তারই গর্বে এমন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো!

॥ ৬ ॥

অবশেষে নামচে পৌঁছুই। এ-লোকালয়ও এখন আর চেনা যায় না। বাড়িঘরের সংখ্যা বেড়েছে, অলিগলি পথও হয়েছে, দোকানপাট বসেছে, বাড়ির চেহারাও কিছু কিছু বদলেছে। আগে শেরপাদের বাড়িতে কাঠের জালিকাটা কারুকার্যময় উন্মুক্ত গবাক্ষ ছিল, ঘরে তাতেই যা সামান্য আলো যেতো। এখন কাঁচ-বসানো হালফ্যাশনের বড় জানালা হয়েছে,—ফলে, ঘরের মধ্যে আলো বেশী যায়, অথচ হিমশীতল বাতাস ঢোকে না।

এখন পথের [illegible] সাজানো স্থানীয় ও তিব্বতীয় পণ্যদ্রব্য—কার্পেট ইত্যাদি, সেই সঙ্গে আমদানী করা মালপত্রও। কোথাও সাইনবোর্ডে রেস্তরাঁর নাম লেখা,—ভিতরে পাতা চেয়ার টেবিল, বিদেশী ট্যুরিস্ট বসে। দরজার বাইরে রাস্তার ধারে আমন্ত্রণকারী শেরপা বা শেরপানী।

নিমা বলে, এইসব নতুন রেস্তরাঁ যেমন দেখছেন তেমনি আবার শেরপাদের অনেক বাড়িতে ট্যুরিস্টদের থাকবার ব্যবস্থাদিও হয়েছে—হোটেলের মতনই। আজ রাত যদি এখানে কাটাতে চান—আমার জানাশোনা একজনের ঘরে নিয়ে যাই, দেখবেন চলুন।

তাই যাওয়া হয়। শেরপার বাসগৃহ হলেও এখন পান্থনিবাসও। বেশ বড় একটা হলঘর। একপাশে উনুন পাতা,—চায়ের সাজসরঞ্জাম। অপর

দিকে পাশ্চাত্য কায়দায় চেয়ার টেবিল সাজানো। তারই নিকটে নীচু তক্তাপোশের ওপর—ফুলকাটা মোলায়েম কার্পেট বিছানো,—রীতিমত ফরাশ। রাত কাটাতে হলে তারই উপর স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে শোওয়া। নিমা জানায়, কোন কোন বাড়িতে থাকবার জন্যে ছোট স্বতন্ত্র ঘরও পাওয়া যায়। বলেন তো সেখানেও ব্যবস্থা করতে পারি।

সরোজ বলে, সবে তো এখন বেলা একটা। হাতে প্রচুর সময়। চড়াইটা উঠে এসে বেশ ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আপাততঃ ফরাশের ওপর একটু পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে বিশ্রাম নেওয়া যাক্,—চায়েরও অর্ডার দেওয়া হোক্,—তারপর ঠিক করা যাবে এইখানেই আজকের মত স্থিতি, অথবা আজই কুন্‌ডে পৌঁছানো। সেও তো এখান থেকে আবার চড়াই ভাঙা?—আরও কতো ফুট্ ওঠা?

নিমা জানায়, তা হাজার দেড়েক ফুট্-এর ওপর হবেই, কুন্‌ডে উঁচু সাড়ে বারো হাজার থেকে তেরো হাজার ফুট্। কিন্তু, সে-ভাবনা এখন করবার দরকার নেই, একটু বিশ্রাম করে নিন্ তো, তারপর দেহ মন যেমন চাইবে সেইমত করা যাবে। লুকলা থেকে তৃতীয় দিনে আমাদের কুন্‌ডে পৌঁছানোর কথা, সেইমত করাও যেতে পারে। তবে যে ভাবে আজ এই বড় চড়াইটা উঠে এলেন,—এর পর বাকি চড়াইটুকু তেমন কিছু বেশী মনে হবে না। আমরা কুন্‌ডে থেকে নাম্‌চে প্রায়ই যাতায়াত করি। এখানেই যখন একটার মধ্যে এসে গেলেন, তবে আজই কুন্‌ডেতেও অনায়াসে যেতে পারবেন।

সরোজ চায়ের কাপ্-এ চুমুক দিয়ে বলে, তোমার কাছে আর কি? এ পাড়া ও পাড়া। চড়াই উঠে এসে বুকের মধ্যে এখনো যা হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে, পা দুটোও যেমন ভারী মনে হচ্ছে—সে অবস্থাটি কি আর তুমি বুঝবে?—দেখা যাক্, চা খেয়ে খানিক জিরোই তো! তোমার যদি এখানে অন্য কাজকর্ম থাকে, ইতিমধ্যে সেরে আসতে পার।

নিমা বলে যায় ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরবে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম লাভের ব্যাঘাত ঘটে। একটু পরেই দুজন পুলিশ ও তাদের এক কর্তার আবির্ভাব।

ভারতীয়দের নেপালরাজ্যে ঘোরাফেরা সম্পর্কে অনুমতি পত্র নেওয়ার নিয়ম এখন না থাকলেও, যাত্রীদের সম্বন্ধে পুলিশের খোঁজখবর নেওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। এদের আগমনও সেই উদ্দেশ্যে। গট্‌মট্ করে তারা নিকটে এসে বসে। নানাবিধ প্রশ্ন শুরু করে, কোথা থেকে আসছি, কেন এসেছি, কোথায় চলেছি ইত্যাদি।

সরোজ বলে, এখনি এদের মুখ বন্ধ করে দিই,—বলে উঠে বসে পকেট থেকে কাঠমাণ্ডুর সেই পুলিস-অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত পত্রখানি বার করে তাদের দেয় এবং "আমরা বর্ণবাহাদুর থাপা সাহেবের বন্ধু, চেনেন তাঁকে?"—বলে আবার শুয়ে পড়ে।

আর দ্বিরুক্তির প্রয়োজন থাকে না। উদ্যতফণা সাপের মুখে কি-এক

শিকড় ধরলে যেমন ফণা গুটিয়ে তখনি সাপ সরে যায় বলে প্রচার আছে,—এখানে দেখি ঠিক তাই। চিঠিটা পড়ে তারা সসম্ভ্রমে ফেরত দেয়, তখনি উঠে দাঁড়ায়, চলে যেতে গিয়ে ফিরে আসে, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করে, আমরা কোন কিছু সাহায্য করতে পারি ?

সরোজ গম্ভীর ভাবে বলে, দরকার হলে খবর পাঠাব। আমরা এখন বিশ্রাম নিতে চাই।

ঘণ্টাখানেক পর। নিমা আসে। সরোজ বলে, নিমার ইচ্ছা, আমরা আজই কুনডে পৌঁছুই। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে বাইরে পড়ে থাকা কারুরই পছন্দ হয় না। কি বল নিমা ? চল তা' হলে যাত্রাই করা যাক। ধীরে ধীরে চলব। শরীর এখন আবার হাল্‌কা মনে হচ্ছে। নিমা খুশী। উৎসাহ দিয়ে বলে, খুব সহজেই চলে যাবেন। আপনি তো খাসা হাঁটছেন।

অতএব, আবার বওনা।

গ্রামের শেষে মনাস্ট্রী। সরোজ ভিতরে গিয়ে দেখে আসে। তারপরই সুরু হয় পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই। বাঁ দিকে অপর এক পথ সোজা পাহাড় ঘিরে চলে গেছে। সেইদিক পানে আঙুল দেখিয়ে সরোজকে বলি, ও-পথ গিয়েছে শেরপাদের আর এক বড় গ্রামাঞ্চল থামিচকের দিকে। সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলে তিব্বত পৌঁছানো যায় নাংপা পাশ্‌ অতিক্রম করে। শেরপা ও তিব্বতীদের মধ্যে এই অঞ্চলে ঐটেই ছিল প্রধান বাণিজ্যপথ। তিব্বতে চীনাদের আধিপত্য বিস্তারের পর শেরপাদের সঙ্গে চিরাচরিত ব্যবসাসূত্র ছিন্ন হযে গিয়েছিল, এখন নানাসতে আবার কিছুটা চালু হয়েছে। এভারেস্টের নীচে শের্‌পাদের এই অঞ্চলটাকে বলে,—খুম্বু। নামচে হোল খুম্বুর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। বলতে পার কলকাতা শহরের বড়বাজারের মতন। যত বড় বড় শেরপা ব্যাপারীদের এইখানে বাস এবং আড়তও। কিন্তু সম্প্রতি একটা প্রবন্ধে পড়েছি, কালের পরিবর্তনে এ পথে যেমন অনেককিছু অদলবদল হয়েছে, নামচের এই ব্যবসা জগতেও তেমনি বহু অবস্থান্তর ঘটেছে। চিরকাল এখানে ব্যবসা চলত —পরস্পরের পণ্যসামগ্রীর বিনিময়—'বার্টার' পদ্ধতিতে। সে প্রথা এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে—এখন চালু হয়েছে নগদ টাকার কারবার।—টাকা নিয়ে বা দিয়ে বেচা কেনা। এতে মুদ্রা-স্ফীতির আওতায় এরা পড়ে গেছে,—আগেকার সহজ স্বচ্ছন্দ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নিমাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে, এখন নামচেতে সাপ্তাহিক হাট বসে। দূর গ্রামাঞ্চল থেকে হেটেলরা আসে। এক একটা হাটের দিনে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার মাল লেনদেন হয়,—সব টাকায়। হিমালয়ের এই সুদূর দুর্গম অঞ্চলে—এককালে যেখানে নেপাল সরকারের নামে মাত্র রাজ্য বলে প্রচার ছিল—শেরপারা নিজেরাই নিজেদের নিয়মকানুন করে সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দে জীবন কাটাচ্ছিল,—এখন ক্রমশঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার জালে এরা জড়িয়ে পড়ছে।

চড়াই-পথের ক্লান্তি লাঘবের আশায় সরোজ একটা পাথরের ওপর ক্ষণিক

বিশ্রাম নেয়, একদল ট্যুরিস্ট পাশ দিয়ে নেমে যায়। সরোজ তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখুন, শেরপাদের জীবনধারায় এই যে সব পরিবর্তন বলছেন, এর এক প্রধান কারণ আমার মনে হয়, বাইরে থেকে এ-অঞ্চলে লোকজন আসা হঠাৎ বেড়ে গেছে অত্যধিক মাত্রায়।

আমি বলি, তোমার অনুমান ঠিকই। এ দেশ সেদিনও জগৎ থেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন ছিল,—বিদেশী যাত্রী আসত ক্বচিৎই। ১৯৪৯ সাল থেকে নেপাল রাজ্যে বিদেশীদের প্রবেশের ও ঘোরাফেরার বাধানিষেধ ও কড়াকড়ি ক্রমশঃ উঠে যাওয়ার ফলে এখন যেমন পর্বত-অভিযানের সংখ্যাও বেড়েছে তেমনি দেখতেই পাচ্ছ ট্যুরিস্টও আসছে দলে দলে। একটা রিপোর্টে সেদিন পড়লাম, এই নামচের পুলিশ দপ্তরের নথিপত্রে দেখা যায়, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৭০-এর জুন মাসের মধ্যে ভ্রমণ-অনুমতি পত্র—ট্রেকিং পারমিট—নিয়ে বিদেশী ট্যুরিস্ট এ-অঞ্চলে এসেছে ৬৪২ জন। পরের নয় মাসে জুলাই থেকে ১৯৭১-এর এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত এসেছে ৫৩৫ জন। আর, ১৯৭৪ সালে—অর্থাৎ গত বছর—ট্যুরিস্টদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে—প্রায় চার হাজার! সারা খুম্বু অঞ্চলে মোট ৩৩০০ শেরপার বাস, বাইরে থেকে লোক এস [illegible] প্রয়োজনে কতো গাছ কাটা পড়ল, আর চারিদিকে কতো জঞ্জাল রাবিশ জড় হোল তার কিছু প্রমাণ আমরাও দেখছি।

সরোজ আবার চলা শুরু করে প্রশ্ন করে, এ-সব সংখ্যা কি পর্বত-অভিযানের লোকদেরও নিয়ে?

বলি, না। তাদের বাদ দিয়ে। তাদের ধরলে তো অনেক বেশী হবে। তবে আরও এক খবর জানাই,—ট্যুরিস্ট ও অভিযান সব ধরে তাদের কাজে শেরপা নিযুক্ত হয়েছে প্রায় পাঁচশ! সরোজ সন্তোষ প্রকাশ করে, এই ছোট্ট জায়গায় অতোগুলো লোকের কর্ম-সংস্থান—শেরপাদের হাতে আর্থিক উপকারই হোল।

বলি, সেদিক দিয়ে দেখলে এদের অর্থ উপার্জনের একটা পথ খুলেছে ঠিকই। কিন্তু তাতে এদের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে কতোখানি পরিবর্তন আনছে বা ভবিষ্যতে আনবে সেটাও লক্ষণীয়। জাতিগত ভাবে শেরপাদের এতে উপকার বা অপকার হচ্ছে তাও বিবেচ্য। তোমার চোখে হয়ত পড়েনি, আমার কিন্তু পথে আসতে—বিশেষ করে নামচেতে ঢুকে—শেরপাদের বেশ-ভূষারও খুব পরিবর্তন নজরে পড়ল। তাদের সেই ভেড়ার লোমে আপন-আপন-কাপড় ঘরের-তাঁতে বুনে, ঝলঝলে পোশাক তৈরি করে পরা—এখন ছেলেছোকরারা অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে। তাদের পরনে এখন—নাইলনের রঙ-চঙে মাউনটেনিয়ারিং জ্যাকেট, প্যান্ট। শেরপারা যারাই বড় বড় অভিযানে কাজ নেয়, তাদের সর্তই হোল এ-সব পোশাক তাদের প্রত্যেককেই দিতে হবে,—অবশ্য বরফের উপর দিয়ে যেতে এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারে সুবিধা থাকেই। কিন্তু নিজেদের পোশাক থাকলেও এরা এখন প্রতি অভিযানে যা পারে আদায়

করে নেয়—ব্যবহারের জন্যে নয়, বিক্রী করার উদ্দেশ্যে। এসব অঞ্চলে এখন মাউনটেনিয়ারিং পোশাক, জুতা, স্লিপিং ব্যাগ, কিট্ ব্যাগ, রুকস্যাক, আইস্ আক্স প্রভৃতি মালপত্রের বড় ব্যবসা চলেছে। অবশ্য এই বেশ পরিবর্তনের ভিন্ন এক কারণও রয়েছে। তিব্বতী ভেড়ার লোম হোল উৎকৃষ্ট এবং তার চালানও আসত এখানে প্রচুর। এখন সেই ভাল উল পায় না। নিজেদের উপযুক্ত পোশাক আগের মত তৈরি করাও সম্ভব হয় না,—অগত্যা এইভাবে বিদেশী পোশাক যখন পাচ্ছেই, ব্যবহারও করছে,—নতুন ব্যবসারও পথ খুলে গেছে। তবে জানি না বাইরের এইসব পরিবর্তন হলেও শেরপাদের চারিত্রিক যেসব বৈশিষ্ট্য সেবার দেখেছিলাম—তাদের আন্তরিক ধর্মভাব, আত্মনির্ভরতা, জাতিগত ঐক্যবন্ধন প্রভৃতি গুণাবলী ও সামাজিক রীতিনীতি কতোখানি বদলেছে।

এই ভাবেই গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর দিয়ে এগিয়ে চলি। অবশেষে একসময়ে পাহাড়ের মাথার কাছে দেখা যায় বিরাট এক অট্টালিকা—তারই নিকটে আরও দু-একটা ছোট বাড়ি। নিমা বলে ঐ জায়গারই এখন নাম হয়েছে সিয়াংবোচি ঐ.টি জাপানীদের তৈরি-করা সেই ফাইভ্-স্টার হোটেল—নেপালীদের সহযোগিতায় তা। আমাদের পথও গেছে ওর কাছ দিয়ে।

আরও বেশ খানিক চড়াই উঠে সেখানে পৌঁছুই। কোথায় সেই কয় বছর আগে দেখা পাইনবনের স্নিগ্ধ শ্যামশোভা, গিরিনদীর নির্মল নীল জলের কলোচ্ছ্বাস, ধ্যানমৌন প্রকৃতির প্রশান্ত পরিবেশ। এখন বৃক্ষশূন্য করে মানুষের সুখাবাসের উদ্দেশে পাথর ও কাঠ দিয়ে গাঁথা বিশাল বিলাসসৌধ। নিকটে সেবক অনুচর পরিচারকবর্গের থাকবার ঘর। চায়ের দোকানও আছে।

সরোজ বলে, ভিতরে ঢুকে দেখে যাবেন নাকি—কি রকম শাহী ব্যবস্থা হয়েছে?

বলি, দেখবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল বা আগ্রহ নেই। এ সব দেখে কী মনে হচ্ছে জান? এ-যেন ধনমত্ত মানুষের প্রকৃতিদেবীকে বিবস্ত্র করে পৈশাচিক আমোদ লাভের উৎকট চেষ্টা—দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ!

হোটেল ছাড়িয়ে আসি। নিকটে ছোট প্লেন নামবার জন্য লম্বা ময়দান। গাছপালা কেটে, পাহাড়ের মাথা সমতল করে সিয়াংবোচির ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড। অদূরে পাহাড়ের গায়ে বনভূমির অবশিষ্ট গাছগুলি সভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন দেখতে থাকে কোনদিন মানুষের হাতের নির্দয় কুঠারাঘাতে তাদেরও বুঝি বা ছিন্নমূল হয়ে বিলোপ পেতে হয়!

অথচ এই অতি-তীব্র শীতের রাজ্যে বিরল বনভূমিতে যে অল্পসংখ্যক গাছগুলি কোনরকমে প্রাণরক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে, শেরপাদের কাছে তা অমূল্য সম্পদ। সেগুলির সংরক্ষণের জন্যে শেরপাদের প্রবর্তিত কঠোর নিয়মকানুন তারা নিজেরা মেনে চলত, বনভূমি বাঁচিয়ে রাখত।

নিমা দুঃখ প্রকাশ করে বলে, এই এভারেস্ট অঞ্চলে গাছপালা খুবই কম।

তাও যা রয়েছে, চোখের উপর দেখা যাচ্ছে কীভাবে দ্রুত লোপ পেতে বসেছে। এর এক প্রধান কারণ, ট্যুরিস্টরা ছাড়াও এই যে সব বৃহদায়তন অভিযানগুলি আসে, তাদেরই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। এক একটা বেস্ ক্যাম্প মূল শিবিরে প্রায় পাঁচশ' লোকের থাকবার ব্যবস্থা থাকে—তিন মাস সাড়ে তিন মাস ব্যাপী। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠ সরবরাহ হয় এইসব সামান্য যা আমাদের বনসম্পদ, তাই উচ্ছেদ করে।

আমি বলি, তোমাদের একটা সুখবর জানাই, জান কিনা জানি না। সেদিন নিউজিল্যাণ্ড অ্যালপাইন জার্নালে নর্মান হার্ডির একটা প্রবন্ধ দেখলাম,—মানুষের মনে এবার সুবুদ্ধি জেগেছে, এ-সব বনরক্ষণের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। কাঠমাণ্ডুতে ইউনাইটেড্ নেশন মিশনের যে শাখা রয়েছে, তারই প্রচেষ্টায় এই বনভূমি এইবার জাতীয় সংরক্ষিত অরণ্য—ন্যাশনাল পার্ক বলে গণ্য হবে। তোমাদের এখানকার অরণ্যভূমির নামকরণ হচ্ছে - সাগরমাতা ন্যাশনাল পার্ক। দেখ, এইবার হয়ত একটা সুরাহা হবে।

সরোজকে বলি, ঐ যে জাপানী হোটেল দেখলে—ওটা তৈরি করতে খরচ কি রকম হয়েছে ধারণা করতে পার? তারও বিবরণী পড়েছিলাম। প্রায় এক বছর ধরে শতাধিক শেরপা নিয়োগ করে ঐ বাড়ি ও প্লেন নামানোর জায়গা তৈরি হয়—১৯৭২ সালে। বাড়ি তৈরি কাজের জন্যে মজুর ইত্যাদি বাবদ খুমজুং গ্রামের এক শেরপা—আঙ্‌ চিরি বা ঐ ধরনের কি-এক নাম— তাকে তিন লক্ষ টাকায় ঠিকাদারি দেওয়া হয়। অন্যান্য বাবদ আরও কতো খরচ পড়েছে কি জানি!

সরোজ প্রশ্ন করে, হোটেলের ঘরভাড়াও তাহলে নিশ্চয় খুব বেশী?

বলি, 'ফাইভ্ স্টার' হোটেল—তার ওপর এই জায়গায়,—বেশী হবার কথাই। সেই বিবরণীতে তারও উল্লেখ ছিল—দৈনিক ইউ-এস্ পঞ্চাশ ডলার করে;—অর্থাৎ আমাদের চারশ' টাকার ওপর হবে। এখন আরও হয়ত বেড়েছে।

প্লেনের অবতরণভূমি ছাড়িয়ে এসে আবার তরুরাজ্য। মনও তাই দেখে স্বস্তি বোধ করে।

এরই মাঝে এক জায়গায় কয়েকটি কটেজ। সরকারী কোন দপ্তরের। হয়ত বনবিভাগের।

অল্প এগোতেই গাছপালার মধ্যে হঠাৎ মানুষের স্বর শোনা যায়। কয়েক পা আরও যেতেই একটু খোলা জায়গা। সরোজ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আরে! ঐ যে মিসেস্ স্কটরা চলেছেন,—হ্যালো মাইকেল!

তাঁরা দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে যান। স্কট্ নেমে গিয়েছিলেন নামচেতে,— স্ত্রীপুত্রকে এগিয়ে আনতে। স্কটের সঙ্গে পরিচয় হয়। কী দশাসই চেহারা! ফুট্ ছয়েকের উপর উচ্চতায় হবে। কিন্তু লক্ষণীয় তা নয়। সোয়েটার-প্যাণ্ট-ধারী এ-যেন এক হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী। মাথা থেকে জটার মত কটা-রঙের চুল দুই কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে। মুখভরা গোঁফ দাড়ি। অত্যধিক শীতে-

রোদে-হাওয়ায় মুখের তাম্রবর্ণ—যেন তপোক্লিষ্ট। চোখে চশমা। মুখ চোখ ও আচরণ না দেখলে 'হিপি' বলেও সন্দেহ হতে পারত। আমরা দুজন হাত বাড়িয়ে তাঁকে বিজয়-সংবর্ধনা জানাই। সরোজ প্রশ্ন করে, এভারেস্ট শিখরে পৌঁছেই কি ভাব মনে জেগেছিল আপনার?

স্কট্ মৃদু হাসেন, বলেন, ঠিক প্রকাশ করা শক্ত। তবে এও মনে হয়েছিল, আবার আর একটা শিখর জয় হোল আর এইটেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান!

মাইকেল এসে বাপের হাত ধরে দাঁড়ায়,—মুখ তুলে বাপের মন্তব্য শোনে।

বেশীক্ষণ আলাপের সময় থাকে না। বেলা পড়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌঁছানো দরকার। পথও আমাদের দুই দলের আলাদা। আমরা যাব কুন্ডে, ওঁরা যাবেন খুমজুং-এ। তাই 'আবার দেখা হবে' বলে দুই দল দুই পথ ধরি।

অল্পক্ষণ পরেই নীচে কুন্ডে গ্রাম দেখা যায়। উৎরাই পথ। তার আবার দিনান্তে সম্মুখে পথের শেষ। চলার গতিবেগ বাড়ে। সন্ধ্যার আগে কুন্ডে হাসপাতালে পৌঁছে যাই।

এই বাড়িই সে-বছর তৈরি হচ্ছিল দেখে গিয়েছি। এখন বাড়ির সম্মুখে ফুলের বাগান। নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। তারই মাঝখানে একটা উঁচু কাঠের খুঁটিতে লম্বা করে ঝুলিয়ে-বাঁধা-কাপড়ে মন্ত্র লেখা বৌদ্ধ ধর্মপতাকা। বাতাসে মর্মর শব্দ তুলে ওড়ে, যেন অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ করে।

বাড়ির সম্মুখে টানা লম্বা বারান্দা। তারই মাথায় টাঙানো কাঠের বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা,—কুন্ডে হস্পিটাল।

মানুষ আসার শব্দ পেয়ে ডাক্তার সিল্ভেস্টার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসেন, আমাদের দেখতে পেয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, হ্যালো! হ্যালো স-রো-জ! তোমরা আজই পৌঁছে গেছ? খুব ভালো। প্লেন! প্লেন! কোথায় তুমি? বেরিয়ে এসে দেখ, এঁরা এসে গেছেন!—দ্রুতবেগে এগিয়ে এসে সরোজের হাত ধরেন, আমাকেও সম্বর্ধনা জানান, আঙ্কেল, আপনিও এসেছেন, আমরা খুব খুশী।

প্লেনও হাসিমুখে এসে দাঁড়ান। সাদরে নিয়ে চলেন তাঁদের ড্রয়িংরুমে।

॥ ৭ ॥

বারান্দার কোলে সারি সারি ঘর। প্রথমদিকের ঘরগুলিতে হাসপাতালের কাজকর্মের, রোগী থাকবার ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা। ডানদিকের শেষপ্রান্তে ডাক্তার দম্পতির বাসগৃহ। পাশাপাশি দুখানা কামরা। একটাতে রান্নার ও খাওয়ার ব্যবস্থা। সব শেষেরটি ড্রয়িংরুম। তারই মধ্যে স্বতন্ত্র এক কোণে কাঠের পার্টিশন দিয়ে খাটবিছানা পাতা—রাত্রের শয়ন-আয়োজন। আর একদিকে ছোট একঘরে স্নানাগার।

ড্রয়িংরুমের কাঁচ-বসানো দেওয়াল। তাতে রঙিন পর্দা ঝোলান।

দেওয়ালের গায়ে আগুন জ্বালানোর জায়গা—'ফায়ার প্লেস'। গনগন করছে কাঠের আগুন। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে ঘরে ঢুকতেই দেহ আরাম বোধ করে। গদি দেওয়া বেঞ্চ, চেয়ার, সোফা সেট্, টেবিল,—একপাশে র‍্যাক্-ভরতি বই-এর সারি। মাটিতে বিছানো পুরু রঙ্গিন কার্পেট।--দেওয়ালের ওপরদিকে হাতে-আঁকা বড় বড় তৈলচিত্র—হিমালয়ের ল্যান্ডস্কেপ, আবার শেরপাদের প্রতিকৃতিও।

প্লেন—অর্থাৎ মিসেস্ গ্লেনিস্ সিলভেস্টার তাড়াতাড়ি গরম কফি, বিস্কুট কাজুবাদাম এনে দেন, বলেন, খেয়ে একটু জিরিয়ে নিন্, রাত্রে কি খাবেন বলুন, অবশ্য আমাদের এখানে যা পাওয়া যায় তাই খেতে হবে।

সিলভেস্টার বলেন, একটু জিরিয়ে স্নান করে নিন্।

শুনে চমকে উঠি। হিমালয়ের এই তেরো হাজার ফুট-এ, চারদিক ঘিরে বরফের পাহাড় মাথা তুলে,—সন্ধ্যাবেলায় স্নান! দিনের বেলাতেও করা চলবে কিনা তাই সন্দেহ। সাহেবসুবাদের আরামের ধ্যান-ধারণাই আলাদা।

সিলভেস্টারের এই প্রস্তাবের কারণ তখনি প্রকাশ পায়, বলেন, আজ আমাদের স্নানের দিন গেল। জ্বালানী কাঠের অভাবে এখন সপ্তাহে দুদিন মাত্র আমরা জল গরম করে ওপরের ট্যাঙ্কে ভরি, 'শাওয়ারে' ধারা-স্নান করি। আজ এখনও কিছু গরম জল ট্যাঙ্কে রয়েছে। সারাদিন হেঁটে এলেন, এখন স্নান করলে শরীর দেখবেন ঝরঝরে হয়ে যাবে, রাত্রে ঘুমও হবে ভাল।

তবুও ভাবি, আমার অতো সুখে কাজ নেই, এমনিই খাসা আছি।

কিন্তু সরোজের ভিন্ন মনোভাব। বলে, গরম জল যখন পাওয়াই যাচ্ছে, করেই নিই। আমার রাত্রে স্নান করারই অভ্যেস,—বিলেতেও করতাম, কলকাতাতেও প্রায়ই তাই করি।

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি, এ-সব আসবাবপত্র সেই কাঠমাণ্ডু থেকে আনতে হয়েছে বোধ হয়? তিনি বলেন, তা কি আর সম্ভব? আনতে প্রচুর খরচ পড়ত, সময়ও যেত। এ-সবই এইখানে শেরপাদের দিয়ে তৈরি করানো। নিজের হাতেও কিছু করা। শেরপাদের দেখিয়ে শিখিয়ে দিলে এরা চমৎকার করতে পারে—পাকা কাঠের মিস্ত্রী—কারপেন্টারের মত এদের হাতের কাজ। দেখতেই পাচ্ছেন।

দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ সব ছবিও তাদেরই অথবা লামাদের আঁকা নিশ্চয়?

এবার প্লেন উত্তর দেন, মুচকে হেসে,—না। দেখে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু এ-সবই পল-এর নিজের হাতে আঁকা। ঐ তো ওখানে টেবিলে রঙ, তুলি--আঁকার সাজসরঞ্জাম, ইজেলে ঐ একটা অর্ধেক আঁকা ছবিও। কাজের মধ্যে যখনি একটু ফুরসত পান, অমনি তুলি হাতে আঁকতে বসেন।

কদিন পরে আজ এদিকে প্লেন এসেছে, ডাকের চিঠিপত্রও পৌঁছেছে, এক তাড়া। পল্ সিলভেস্টার সেইসব খুলে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। মুখ তুলে বলেন, গ্লেন, এই নাও তোমার নিউজিল্যান্ডের চিঠিও এসে গেছে।

তোমার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছে।

কীসের প্রশ্নপত্র সেদিন তখন বুঝতে পারিনি। কৌতূহলী প্রশ্ন করাও ভদ্রোচিত মনে করিনি। তাঁদের সঙ্গে তার পরে যে কদিন, আপনার লোকের মত ব্যবহার পেয়ে, পরম আনন্দে কাটাই,—সেই সুযোগে এই ডাক্তার দম্পতির আন্তরিক মধুর আচরণে যেমন মুগ্ধ হই, তেমনি তাঁদের সেবাধর্ম এবং সদাকর্মময় নিরলস দিনযাপনের ধারা দেখে তাঁদের প্রতি মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে, তাঁদের ব্যক্তিগত ঘরোয়া কথাও প্রকাশ পায়।

প্রথম দর্শনে পলু-এর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল বুঝিবা প্রৌঢ় ব্যক্তি। মাথাভরা কুঞ্চিত কেশদাম, গালভরতি দাড়ি। চুলের কটা রঙ অথবা পাকা, দিনশেষের আবছা আলোকে বুঝতে পারিনি। তবে গ্লেনকে দেখে বুঝেছিলাম, বয়স তার বেশী নয়।

সরোজের কাছে পরে শুনি ডাক্তারের বয়স এখনও ত্রিশের নীচে। গ্লেন হয়ত তার চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট। বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই এখানে কাজ নিয়ে চলে এসেছে।

উভয়ে সারাদিন কি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কদিন নিজের চোখেই দেখি। আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশ থেকে কতো দূরে এই নির্বান্ধব দেশে হিমালয়ের নির্জন নিভৃতিতে কীভাবে তাঁরা সর্বাক্ষণ বিবিধ কাজের আনন্দে মেতে থাকেন, না দেখলে বিশ্বাস করা দুরূহ হোত।

সিলভেস্টার ডাক্তার, তাঁর প্রধান কর্তব্য হাসপাতাল নিয়ে। বাইরে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া,—দিনের কোন্ সময় থেকে কতোক্ষণ পর্যন্ত রোগী দেখা হবে। কিন্তু দেখি, রোগী আসে যখন-তখন, ডাক্তারও তাকে দেখেন যে সময়েই সে আসুক না কেন। ডাক্তার একজনই, তিনিই চিকিৎসা করেন, ঔষধপত্র কোথায় কি আছে, প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করেন, নিজেই কম্পাউন্ডার,—ঔষধ বার করে দেন, দরকার মত তৈরিও করেন, তিনিই সাজিয়ে রাখেন, জানেন ;—আবার ওদিকে রক্তাদি পরীক্ষা করা তাও তাঁকেই করতে হয়। নিমা অবশ্য সাহায্য করে,—বুদ্ধিমান উৎসাহী তরুণ,—কাজকর্ম শিখে নিচ্ছে। গ্লেনকেও হাসপাতালের কাজে সহায়তা করতে দেখি, যদিও তাঁর নিজেরও নানান কাজ রয়েছে।

হাসপাতালে রোগী বেশী আসতে আমরা কদিন দেখিনি। হাসপাতালের বেড্ও সে সময়ে খালি। রোগী শুধু মানুষই আসে না। একদিন এক শেরপা প্রকাণ্ড একটা ভেড়া নিয়ে এসে হাজির। বিরাট একজোড়া শিঙ্। তবুও বেচারীকে নেকড়ে বাঘে ধরে। আঁচড়ে-কামড়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত। প্রাণে মরেনি। নিমা ও সেই শেরপা তার শিঙ্ ও পা চেপে ধরে শুইয়ে রাখে, সিলভেস্টার সযত্নে ক্ষতস্থানগুলি পরিষ্কার করে ঔষধ লাগান, ইনজেকশনও দেন। ডাক্তার সিরিঞ্জ হাতে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বলেন, দেখছ সরোজ! কতো রকম চিকিৎসা করতে হচ্ছে। নানা ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করছি।

আর একদিন। এক শেরপা এসে উপস্থিত। তাকে ভালুকে আক্রমণ

করেছিল। নখের আঁচড়ে মুখের ও বুকের চামড়া খানিক ছিঁড়ে দেয়, কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসে। ক্ষত বেশী বিষাক্ত হবার আগেই ঔষধ পড়ে যাওয়ায় সেরে উঠছে।

ঔষধপত্রও রাখতে হয়েছে বিবিধ প্রকারের। নিজেরা তো আনানই। আবার কিভাবে পেয়েও যান তাও একদিন দেখি। তিনজন শেরপা প্রকাণ্ড তিনটে প্যাকিং কেস নিয়ে হাজির। ব্যাপার কী? ব্রিটিশ এভারেস্ট অভিযান শেষ হয়েছে। অভিযাত্রীদল ফিরে চলেছেন। তাই খুমজুং থেকে দলের ডাক্তার নিজে সঙ্গে এনে হাসপাতালে দিয়ে গেলেন তাঁদের অব্যবহৃত সব ঔষধপত্রাদি।

সিলভেস্টারের কী আনন্দ! সারাদিন প্যাকেটের পর প্যাকেট খুলে নিজের হাতে ডিস্পেন্সারি ঘরে ঔষধ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে মেতে যান। তাঁর উৎসাহ দেখে আমরাও তাঁর সাহায্যে লাগি।

একদিন সন্ধ্যায় পর সবাই নৈশভোজনে বসেছি। এমন সময় টর্চ হাতে দুজন শেরপা এক জাপানীকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে আসেন। জাপানী একদল ট্যুরিস্ট এসেছে, তাদের মধ্যে এক মহিলা অসুস্থ, এখনি ডাক্তারকে দেখতে যেতে হবে। খুমজুং-এ এখন তাঁরা রয়েছেন।

সিলভেস্টার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, গতকাল সিয়াংবোচিতে সে দল প্লেনে এসে নেমেছে খবর পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে একজন ডাক্তারও আছেন শুনেছি, তবুও আমাকে ডাকতে আসা কেন? শেরপা জানায়, তিনিও নিজে অসুস্থ।

আর কথাবার্তা নয়। রইল প্লেটে পড়ে আধ-খাওয়া খাদ্য। তখনি উঠে, গায়ে মোটা জামা চাপিয়ে, টুপি দিয়ে মাথাকান ঢেকে, টর্চ হাতে, ব্যাগ নিয়ে সিলভেসটার রওনা হন। এই শীতের রাতে। বলে যান, আমার জন্যে তোমরা অপেক্ষা কোরো না,—কতো রাত হবে কি জানি। নিমাও তাঁর সঙ্গে চলে।

ভাবি, ডাক্তারদের এমনি তো কর্তব্যবোধ, এমনি ভাগ্যও।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তিনি ফিরে আসেন। আমাদের গল্পের আসর তখন জমেছে ড্রয়িংরুমে।

সরোজ প্রশ্ন করে, রোগীকে কি রকম দেখলে?

ডাক্তার বলেন, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। প্লেনে চেপে হঠাৎ এই অল্‌টিচিউডে এসে পড়ায়, তারই প্রতিক্রিয়া—'অল্‌টিচিউড্ সিক্‌নেস্'। মহিলাটির লাংসের ফুসফুসের অবস্থা ভাল নয়। সঙ্গী ডাক্তারটিরও রক্তের চাপ খুব বেড়ে গেছে। দুজনকেই কাল নীচে কাঠমাণ্ডুতে ফেরত পাঠাতেই হবে। প্লেন কাল এলে হয়।

সরোজ আমার মুখের পানে তাকায়। কলকাতায় ঠিক এই আশংকার বিষয় আমরা আলোচনা করেছিলাম। সিলভেস্টার বলেন, এই যে আজকাল ট্যুরিস্টরা প্লেনে করে উড়ে এসেই এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের দিকে কালবিলম্ব

না করে ছোটেন, তার ফলে pulmonary ও cerebral oedemaতে আক্রান্ত হওয়া আশ্চর্যের কিছুই নয়। অথচ দেখুন, এভারেস্ট অভিযাত্রীদল যাঁরা এখন ফিরে চলেছেন তাঁরা কতোখানি এ সম্পর্কে সাবধানী। তাঁদের অনেকেই এখান থেকে যাত্রা শুরু করার আগে এই কুনডেতে থাকা এবং বেস ক্যাম্প-এ এগিয়ে যাওয়া নিয়ে এক সপ্তাহের ওপর কাটান—acclimatisation-এর উদ্দেশ্যে। সেই কারণে তাঁদের মধ্যে altitude sickness তেমন বেশী কিছু দেখাও দেয়নি।

পরদিন। প্লেন আসে। সিলভেস্টার তাঁদের প্লেনে উঠিয়ে দিতে চলেন। বলেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব,—প্লেন, তোমরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিও,—আমার অপেক্ষায় থেক না যেন।

সিলভেস্টারের সঙ্গে আমরা বারান্দায় বেরিয়ে আসি। সেখানে দেখি, প্রকাণ্ড একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স। ডাক্তার সেটা ঠেলে বারান্দার ধারে নিয়ে যান। ধাপ বেয়ে নীচে বাগানে নামেন। তারপর রোয়াকের পাশে দাঁড়িয়ে পিঠের ওপর বাক্সটা বেঁধে ঝুলিয়ে নেন্।

সরোজ বলে, ও কী! ওটা তো দেখছি মালভরতি—বেশ ভারী। তুমি নিজে বয়ে নিয়ে চলেছ? একটা শেরপা পোর্টারকে ডেকে পাঠালেই হোত।

পিঠের বোঝার ভারে অল্প কুব্জদেহে, মাথা ঘুরিয়ে, চশমার মধ্যে দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে, ঈষৎ হেসে ডাক্তার বলেন, সে সময়েও একটা মানুষই এটা বয়ে নিয়ে যেত,—আমিও কি একটা জোয়ান মানুষ নই? আজ প্লেনে এটা কাঠমাণ্ডু পাঠাতে হবে,—আমাকে যখন ওদিকে যেতেই হচ্ছে—আর খালি পিঠেই চলেছি, তখন আবার অপর একজনকে অযথা ডাকা কেন?—বলে ধীর-পদে সিয়াংবোচির চড়াই-এর দিকে এগিয়ে চলেন।

এইসব কাজকর্ম ছাড়া ডাক্তারের পড়াশুনাও আছে। দপ্তরের হিসাবপত্র রাখা, চিঠিপত্র, রিপোর্ট লেখা এসবও রয়েছে। তবুও তারি মাঝে যখনি কিছু অবসর পান, অকারণ সময় কাটান না, রঙতুলি নিয়ে ইজেলের সামনে বসে যান, আপন মনের ভাবে ডুবে ছবি আঁকেন। সুন্দর আঁকতে জানেনও।

আর তাঁর অর্ধাঙ্গিনী সেই মহিলা,—প্লেন? তাঁর কথাও বলি।

সুশ্রী তরুণী। সাজসজ্জার জাঁকজমক নেই। গোলাপী রঙের পুল-ওভারের ওপর একটা উলের জ্যাকেট গায়ে। মাথার চুল আধুনিক কায়দায় পুরুষদের মত ছোট করে ছাঁটা নয়,—সেকালের বাঙালী মেয়েদের মত কপাল থেকে দুপাশে টেনে আঁচড়ান,—তবে পিছনে খোঁপা নয়, পিঠে ঝোলে ছোট বেণী। এই তুষারগিরি ঘেরা হিমাঞ্চলে মহিলার শীতকাতরতা নেই। হয়ত সারাদিন যেভাবে কর্মরতা থাকেন, শীতজড়তা সভয়ে দূরে পালায়। দৈনন্দিন সাংসারিক কার্যাবলী তো আছেই; রান্নাবান্না নিজেও করেন। সাহায্যকারিণী শেরপানী পরিচারিকা আছে। নাম তার ডোমলে। হাসিখুশী চটপটে মেয়ে। বাড়ির অন্যান্য কাজকর্মের ফাইফরমাস খাটে একটি শেরপা বালক,—বছর বারো বয়স। সরোজ তার নাম জিজ্ঞাসা করায় লাল টুকটুকে গালে টোল

খাইয়ে একমুখ হেসে উত্তর দেয়,—উর্‌কিয়েন ! প্লেন বলেন, বেচারীর বাপ-মা নেই, খাওয়া-পরার সংস্থানও নেই। আমি ডেকে এনে কাছে রেখেছি। বেশ ছেলেটি, নয় ?

রান্নাঘরের বাইরে প্লেনের আর এক কাজ,—ফুল ও সবজির বাগানে। ফুল তো ফুটেছেই, এখানকার অনুর্বর জমিতে কিছু শাকসবজিও ফলিয়েছেন। বলেন, জানেন নিশ্চয়, এখানকার আসল ফসল হোল আলু। অপর্যাপ্ত হয়—প্রতি বাড়ির সংলগ্ন ক্ষেতে। এ-দেশের প্রধান খাদ্যই হোল আলু। আমাদের বাগানেও হয়েছে।

অন্য কর্মভারও প্লেন স্বেচ্ছায় নেন। এক মাইল দূরে খুমজুং গ্রামে হিলারীর প্রতিষ্ঠিত স্কুল। সপ্তাহের মধ্যে ক'দিন সেখানে প্লেন শেরপা ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে যান।

আর সেই সেদিন ডাকে-আসা প্রশ্নপত্র ? তার বিষয়েও জানতে পারি। নিউজিল্যান্ডের উচ্চশিক্ষা পরিষদের অনুক্রম অনুযায়ী পত্রযোগে—করেসপনডেন্স কোর্স-এ—কি এক স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর করে পাঠান। তার জন্যেও তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়।

এ ছাড়া আছে উল-বোনার কাজ। হাত খালি থাকলেই হাতের আঙুল যন্ত্রের মত ক্রুশ-কাঠি নিয়ে বুনতে থাকে। স্বামীর পুলওভার, নিজের গায়ের জ্যাকেট, এমন কি উর্‌কিয়ানের গায়ের ঐ সোয়েটার—এ সবই তাঁর নিজের বোনা।

দু'জনের অতো কাজের মধ্যে ডুবে থাকা—তা বলে কি আমাদের গল্পগুজব চলে না ?

দু'বেলা—বিশেষ করে সন্ধ্যায়—খাবার টেবিলে আমাদের জোর আসর জমে। আহারের অবসরে এই তাঁদের বিশ্রামের সুযোগ।

চারিপাশে বরফের পাহাড়ে ঘেরা তেরো হাজার ফুট উঁচুতে গ্রাম। ঘরের দেওয়ালে কাঁচ বসানো। বাইরে কনকনে শীত। কিন্তু উনুনের ও ফায়ার প্লেসের আগুনের উত্তাপে ঘরের ভিতর আরামপ্রদ। ভোজনের জন্য বহুবিধ ব্যঞ্জনের লোকদেখানো আয়োজন নয়, হবার উপায়ও নেই। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্য,—ঘরে তৈরি গরম গরম রুটি, টোস্ট, টমাটো সুপ, কখনো কখনো বাগানের তাজা সবজি গাজর মটর, বীন, মুলো, পালঙ-শাক, আর নিত্য দুবেলা ডিস্‌ভরতি আলুসিদ্ধ যে যত পার খাও; গোল-মরিচ গুঁড়া, লবণ মাখিয়ে গল্প করতে করতে সবাই খেতামও প্রচুর। সবশেষে গরম চা বা কফি।

সকালে বারান্দার নীচে পাথর-বাঁধানো ছোট্ট আঙ্গিনায় চেয়ার টেবিল পেতে রোদে বসে ব্রেকফাস্ট খাওয়া সে এক পরম বিলাস মনে হোত। পরিজ, টোস্ট, মাখন, জ্যামজেলি, চা, কফি—আবার চাই কী ? কিন্তু এ-সবই অপূর্বতার আস্বাদ লাভ করত আরও এক ভিন্ন কারণে। ঘরের ভিতর যেমন থাকা-খাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য, আতিথেয়তার আন্তরিকতা, সজ্জন সঙ্গ,—ঘরের বাইরে

ততোধিক হিমালয়ের শান্ত সৌম্য বিরাট প্রাকৃতিক শোভা। তারই মাঝে রোদে বসে খাওয়া।

বাড়ির পিছনে যে পাহাড—নাম তার খুম্বিলা বা খুমুলা—১৯,৩০০ ফুট উঁচু। শেরপাদের ইনি আরাধ্য দেবতা। এঁরই নাম থেকে এ-অঞ্চলের খুম্বু নামকরণ। মাথায় তার এ-সময়ে স্বল্প তুষার-আবরণ। বাড়ির সুমুখে—সমতলভূমি, তার কোল জুড়ে কুনডেগ্রামের ঘরবাড়ি। সবই প্রায় একই ধরনের দেখতে। শ্লেটপাথরের ঢালু ছাদ। পাথর-গাঁথা দেওয়াল। কেবলমাত্র গ্রামের মনাস্ট্রি বা গোম্ফা ও বৌদ্ধস্তূপ বা চোরটেন আপন আকৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে।

নিমা বলে, গ্রামের চেহারা সেবার যেমন দেখেছিলেন এবারও বাইরে থেকে প্রায় একই রকম দেখছেন, কিন্তু বাড়ির ভেতরে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নামচের মতন এখানেও কয়েকটা বাড়িতে ট্যুরিস্টদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাঁচের জানলাও বসেছে। ঘর ভাড়া দিয়ে গ্রামবাসীদের রোজগারের নতুন সহজ এক পন্থাও খুলে গেছে।

তার এ সকল মন্তব্য আমার এখন যেন কানে যায় না। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি, গ্রাম ছাড়িয়ে আরও দূরে। দূর অথচ কতো নিকটে। সামনেই দিগন্তবিস্তৃত আকাশচুম্বী গিরিশ্রেণী। নীল আকাশের সামিয়ানার তলে সারি সারি শুভ্র তুষারকিরীট শৈলরাজন্যবর্গের সভা বসেছে।

কাংটেগা—২২,৩৪০ ফুট—কিয়াং বা কাঙ, মানে ঘোড়া, টেগা অর্থে জিন। অর্থাৎ জিন পরানো সাদা ঘোড়া আকাশে যেন দাঁড়িয়ে। আমা ডাবলাম, (২২,৪৯৪ ফুট) আমা অর্থে মাতা,—জননীর ন্যায় প্রশান্ত মূর্তি। অথচ শিবলিঙ্গাকৃতি। গাড়োয়ালে গোমুখের নিকটে শিবলিঙ্ শিখরের অনুরূপ।

তামসেরকু -২১,৭৩০ ফুট। খুশমাখান—২১,০০০ ফুট।

পাঁচ থেকে বারো মাইলের মধ্যে দূরে গগনস্পর্শী এতগুলি তুষারচূড়ার সমাবেশ। রাত্রিদিন কতই না তাঁদের নানা ভাবের বেশবিন্যাস, রূপবর্ণের পরিবর্তন। কখনো দেখি প্রভাত সূর্যের প্রথম কিরণসম্পাতে স্বর্ণকমলের রক্তিম শোভা। কখনো বা দীপ্ত রৌদ্রঝলসিত উজ্জ্বল রজতদীপ্তি। আবার অকস্মাৎ কখনো বা ঘন মেঘের অন্তরালে অবলুপ্ত। হয়ত ক্ষণিক পরেই ছিন্ন মেঘের ছিদ্রপথে একটুখানি ঝিলিক দর্শন। বাড়ির বাইরে এলে তো কথাই নেই, ঘরের ভিতর থাকলেও কাঁচের জানলা দিয়ে সারাক্ষণই হিমগিরির এই অপরূপ সৌন্দর্য এখন আমাদের দৃষ্টিপথের নিত্যসাথী।

এমন কি আমাদের দুজনের রাত্রিযাপনের জন্য হাসপাতালের যে ঘরখানি নির্দিষ্ট হয়েছে—নূতন-আনা সারি সারি তিনখানি খাট পাতা—সেখানেও আমার খাটের পাশে কাঁচের জানলা, রঙ্গীন পর্দা ফেলা। সেই পর্দা সরিয়ে বিছানায় শুয়েও রাত্রে ঘুম ভাঙলে তাকিয়ে দেখতে থাকি, গিরিশিরে শুভ্র তুষাররাশির হিম অঙ্গে রজনীর স্বচ্ছ নীলাম্বরীর কোমল আচ্ছাদন। সেই

বিরাট পাহাড়গুলি যেন শান্ত শিশুর মতন ঘুমে অচেতন।

কিন্তু তাদের দুরন্তপনাও দেখি একদিন দিনের বেলায়।

হঠাৎ শব্দ শুনি, মনে ভাবি, প্লেন আসে। নিমেষে ভুল ভাঙে,—এ যে অতি নিকটে একসঙ্গে যেন একাধিক বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর নিনাদ। অথচ বাইরে মেঘশূন্য আকাশ। দীপ্ত রৌদ্র। সকলে তখনি বারান্দায় বেরিয়ে আসি। অবাক হয়ে দেখি, অশনিসম্পাত নয়, হিমানী-সম্প্রপাত,—অ্যাভালান্স! গ্রাম ছাড়িয়ে নীচে নদী। তারই অপর পারে—এখান থেকে কাক-ওড়া-পথে মাইল পাঁচ ছয় দূরে—তামসেরকু (২১,৭৩০)—তারই উপরিস্থ হিমবাহের—গ্লেসিয়ারের এক বিশাল অংশ ভেঙে নীচে পড়েছে। পাহাড়ের নিম্নাঙ্গ ঘিরে এখন তুষারকণার বাষ্পকুণ্ডলি—মেঘের আকারে চারিপাশে ছড়িয়ে রয়েছে, যেন কেশর ফুলিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহদল সগর্জনে আস্ফালন করে। শব্দের প্রচণ্ডতা ক্রমশঃ কমলেও গুরু গুরু ধ্বনি অনেকক্ষণ চলে,—হয়ত অলক্ষ্যে আরও অংশ ধ্বসে পড়ে। আধ ঘণ্টার উপর সেই তুষারকণার কুজ্ঝটিকার আবরণে পাহাড়ও যেন মেঘাবৃত দেখায়। সরোজ এ-দৃশ্যের ফটো তোলে।

কদিন পরে এভারেস্ট অভিযাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হলে তাঁদের মন্তব্য শুনি, এই অভিযানের মধ্যে এত বড় অ্যাভালান্স তাঁরা দেখেননি।

হিমালয়ের তুষাররাজ্যে এই তাণ্ডবলীলা দেখে ভাবি, ঐসব বিপৎসঙ্কুল অঞ্চলেও তো নির্ভীক মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান চলে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোও আশ্চর্যের নয়।

তেমনি এক মৃত্যু ঘটে এইবারও মাত্র কয়েকদিন আগে এক বৃটিশ এভারেস্ট অভিযানে। সুসংবাদটির বিবরণ প্রথম শুনি ডাক্তার চার্লস ক্লার্কের মুখে। এই অভিযানে ডাক্তার রূপেই তিনি যোগ দিয়েছেন। সেদিন অভিযানের অব্যবহৃত ঔষধপত্র কুনডে হাসপাতালে দান করার জন্য তিনি নিজেই আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জর্জ গ্রীনফিলড—বিলাতের সানডে টাইমস পত্রিকার সাহিত্যিক সংবাদ প্রতিনিধি। ডাক্তার ক্লার্কেরও দীর্ঘ সুগঠিত দেহ। দাড়ি গোঁফ তো এখন থাকবেই। দেখায় যেন অনেকটা রবিনশন ক্রুশোর ছবির মতন। অতি অমায়িক ব্যবহার। সদালাপী। সহজেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে। লণ্ডনে মিডলসেকস হাসপাতালে তিনি 'নিউরোলজির' রেজিস্ট্রার। তিনি সেই করুণ কাহিনীটি বলেন।

॥ ৮ ॥

এবারকার অভিযানের সর্বোচ্চ তাঁবু—৬নং শিবির—গাড়া হয় ২৭,৬০০ ফুটে। ২৫শে সেপ্টেম্বর সেইখান থেকে প্রথম শিখরারোহী জুড়ি—ডুগ স্কট ও ডুগল হ্যামটন যাত্রা করে শিখর (২৯,০২৮) আরোহণ করেন। আবহাওয়া তাঁরা পরিষ্কার পান, শিখরদেশ থেকে দিগন্তব্যাপী অপূর্ব দৃশ্যও উপভোগ করেন। নিরাপদে তাঁবুতে ফেরেনও।

পরের দিন সেই ৬নং তাঁবু থেকে দ্বিতীয় দলের যাত্রা শুরু হয়। সেদিন

দলে চারজন,—শেরপা পেরুটেমবা, ব্রডম্যান, বয়সেন ও মাইক বার্ক। পেরুটেমবা ও ব্রডম্যানের জুড়ি শিখরে পৌঁছে দেখেন আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটছে। পাহাড়ের নীচে থেকে চারদিক ঘিরে পুঞ্জীভূত মেঘ উঠছে। দিগন্তও মেঘাচ্ছন্ন। শিখরের উপর পৌঁছেও উন্মুক্ত দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয় না। অবিলম্বে তাঁরা নামা শুরু করেন। তখন বেলা প্রায় দুটো বাজে। অল্পদূর আসতেই দেখেন মাইক বার্ক একাকী উঠে আসছেন। তাঁর কাছে শোনেন, তাঁর সঙ্গী বয়সেনের অক্সিজেন যন্ত্র বিকল হওয়ায় ও ক্রমপন্থা হারিয়ে যাওয়ায় পথ থেকে ৬ং তাঁবুতে তাঁকে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে।

বার্কও একজন প্রসিদ্ধ, বহু অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। বয়স তাঁর ৩২ বছর। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও দু-বছরের কন্যাকে রেখে এসেছেন। এই অভিযানে তাঁর কিন্তু যোগদান কেবলমাত্র এভারেস্ট শিখর আরোহণের আকর্ষণে নয়। তিনি একজন সুদক্ষ 'ক্যামেরাম্যান'ও। বি-বি-সি-র টেলিভিসানের চিত্রগ্রাহক রূপে তাঁর এই দুঃসাহসিক যাত্রা। ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি চলেছেন,—জগতের সর্বোচ্চ শিখর থেকে ছবি তুলে এনে জগদ্বাসীকে দেখাবেন, নিজের মনের বহুদিন সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

ব্রডম্যানদের সঙ্গে তাঁর যেখানে দেখা হয়, সেখান থেকে শিখরদেশ পৌঁছুতে মাত্র মিনিট পনেরো লাগার কথা। বার্ক জানান, ব্রডম্যানরা যেন আরও খানিক নেমে গিয়ে এভারেস্টের দক্ষিণ শিখরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন, তিনি মূল শিখর থেকে ছবি তুলে অতি শীঘ্রই ফিরে আসবেন ও তাঁদের সঙ্গ নেবেন।

ব্রডম্যানরাও সেইমত সেখানে নেমে যান, তাঁর অপেক্ষায় থাকেন। তখন বেলা পৌনে তিনটে। কিন্তু দেখতে দেখতে অকস্মাৎ চারিদিক ঘন মেঘে ছেয়ে ফেলে। আচম্বিতে প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝা ওঠে। দিগন্ত চোখের আড়ালে চলে যায়। তবুও সেই ভয়ংকর অবস্থায় তাঁরা বার্কের পথ চেয়ে বসে থাকেন। ঝড়ের বেগ ও উদ্দামতা ক্রমশঃ আরও বাড়ে। বার্কের তবুও দেখা নেই। ফিরে আসার আর কোন সম্ভাবনাও থাকে না। এই প্রলয়ংকর দুর্ধর্ষ বায়ুবেগের মধ্যে এভারেস্ট শিখরের উন্মুক্ত প্রদেশে মানুষের জীবন্ত অবস্থান অসম্ভব।

ব্রডম্যানরা তবুও আশা ধরে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। অবশেষে উপলব্ধি করেন, আর বেশী বিলম্বে নিজেদেরও প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী। তারপর কোনক্রমে—নানান্ বিপদের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা যখন বিমূঢ় অবস্থায় প্রাণমাত্র হাতে নিয়ে ৬ং শিবিরে ফিরে আসতে সমর্থ হন, তখন দিবাবসানের অন্ধকার তো নেমেছেই, সেই ধ্বংসোন্মত্ত ঝঞ্ঝার তাণ্ডবনৃত্য আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

এই ঝড় দুদিন সমভাবে চলে। বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় একশ' মাইল থাকে। বার্কের অনুসন্ধানে যাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কারও পুনরায় শিখর অঞ্চল অভিমুখে এগুনো সম্ভব ছিল না। অভিযানেরও এইখানেই ছেদ পড়ে।

আর মাইক বার্ক? তিনি কখন কোথায় কীভাবে এই জগতের সর্বোচ্চ শিখরদেশ থেকে হারিয়ে গেলেন সে-কাহিনী চিরন্তন প্রহেলিকাচ্ছন্ন থেকে যায়।

ডাক্তার ক্লার্ক তাঁর অভিমত জানান, যে-সময়ে বার্ককে শেষ দেখা গিয়েছিল, এবং তারপরও যতোটুকু সময় আবহাওয়া প্রতিকূল হয়নি, তাতে মনে হয়, তিনি শিখরদেশে পৌঁছেছিলেন এবং নামবার সময়ে হঠাৎ ঝড়ের মুখে পড়েন। দৃষ্টিক্ষীণতার জন্যে বার্ক পুরু কাঁচের চশমা ব্যবহার করতেন। হয়ত ঝড়ে ও মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়া—তিনি দিগভ্রান্ত হয়ে শিখরের ভুল অঞ্চলে এগিয়ে যান, তিব্বতের দিকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনা সফল-অভিযানের বিজয় আনন্দের উপর কী গভীর শোকচ্ছায়া ফেলে তার কিয়ৎ নিদর্শন পাই ক'দিন পরে।

সিংয়াবোচি থেকে যে-প্লেনে কাঠমাণ্ডু ফিরি তাইতে সহযাত্রী ছিলেন বনিংটন,—অভিযানের দলনেতা। নবতম সুকঠিন পথে এভারেস্ট শিখর বিজয়, তার উপর এভারেস্ট চূড়ায় এই সর্বপ্রথম বৃটেনের খাস অধিবাসীর পদার্পণ। সেই অভিযানের নেতা সভ্যসমাজে ফিরে আসছেন। অতএব কাঠমাণ্ডুর বিমানঘাঁটিতে বনিংটনের বিজয়-সংবর্ধনা স্বাভাবিক। প্লেন থেকে নেমে এগিয়ে যেতেই দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকার সংবাদদাতা ও ক্যামেরা চালকবর্গ তাঁকে ঘিরে স্বাগত জানায়, গলায় মালা পরায়, ছবি তোলে। তাঁদের প্রথম প্রশ্নই হোল, এই গৌরবময় সাফল্যে আপনার কি রকম আনন্দ হচ্ছে বলুন।

বনিংটন তখনই উত্তর দেন, আনন্দ? অবশ্যই গভীর আনন্দ বোধ করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখের অনুভূতিও কম নয়। বিজয়ী হয়ে ফিরেছি বটে, কিন্তু আমাদের এক সঙ্গীকে হারিয়ে এসেছি, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি!

বছরখানেকের মধ্যে এই অভিযানের পূর্ণ বিবরণী দিয়ে বনিংটন যে সচিত্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন—Everest, the Hard way,—The First Ascent of the South-West Face এভারেস্ট—সুকঠিন পথে—সেটি উৎসর্গ করেন 'মিক্' বার্কের স্মৃতি-উদ্দেশ্যে।

সেই উৎসর্গ পত্রে বার্কের নামের সঙ্গে আরও একজনের নাম সংযুক্ত দেখা যায়,—সে এই অভিযাত্রী দলভুক্ত সভ্য নয়, বৃটিশও নয়,—নগণ্য এক শেরপা যুবা। নাম তার,—মিংমা নুরু। এই অভিযানকালে তারও আকস্মিক মৃত্যুর সকরুণ কাহিনী ডাক্তার ক্লার্কের মুখে প্রথম শুনি, পরে বনিংটনের বিবরণেও পড়ি।

॥ ৯ ॥

শেরপা মিংমা ছিল স্বাস্থ্যবান যুবক। কিন্তু জন্মাবধি মূক ও বধির। থিয়াংবোচি ছাড়িয়ে এভারেস্টের দিকে যেতে শেরপাদের ফোরিচে গ্রাম। সেইখানে তার ঘর। এবারকার শিখরজয়ী স্কট্‌—যাঁর কথা আগেই লিখেছি,—তিনি পূর্বেও ১৯৭২ সালে এক অভিযানে এ-পথে আসেন। সেবার ঐ

ফেরিচে গ্রামে মিংমাদের বাড়িতে তাঁকে একরাত্রির জন্যে আশ্রয় নিতে হয়। মিংমার সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। বাক্যালাপ করতে গিয়ে প্রকাশ পায়, ছেলেটি কালা ও বোবা। অদ্ভুত শব্দ করে সে আপন মনের ভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করে, পারে না,—অসহায় ভাবে তাকায়। চোখের ও হাতের ইসারায় পরস্পরের কথা চলে। মিংমার বিষণ্ণ বদন, করুণ চাহনি, অথচ ঠোঁটের কোণে কেমন যেন এক কঠোর দৃপ্ত ভাবের অভিব্যক্তি। স্বভাবতঃই স্কটের হৃদয়ে মমতা জাগে। তিনি তাঁদের অভিযানের ছোটখাটো কাজে তাকে নিয়োগ করিয়ে দেন। এ বছরও স্কটের সঙ্গে তার দেখা হয়। এবারও কাজ দিয়ে তাকে সাহায্য করতে চান।

ফেরিচে গ্রাম ছাড়িয়ে গোরখশেপ। এইখান থেকে বেঁকে গিয়ে এভারেস্টের দিকে সরাসরি যাবার পথ,—সেখানে সামনে পড়ে খুম্বু হিমবাহ—গ্লেসিয়ার। তারই উপর অভিযানের মূল শিবির—বেস্ ক্যাম্প—পাতা হয়,—১৭,৮০০ ফুট্-এ।

গোরখশেপের নিকটেই কালাপাথর—অনুচ্চ এক পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর থেকে এভারেস্ট শিখরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। স্কট্ গোরখশেপ থেকে মূল শিবিরের দিকে না গিয়ে তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে কালাপাথরে ওঠেন, ফিরে এসে মূল শিবিরে যাবেন। মিংমাকেও তিনি সঙ্গে নেন্, তাঁদের ক্যামেরার সরঞ্জাম বইবে, কিছু উপরি রোজগারও তার হবে।

বিকেলবেলা গোরখশেপে তাঁরা ফিরে আসেন। দেখেন, তখনও মালপত্র মূল শিবিরের দিকে নিয়ে যাওয়া চলেছে, কয়েকজন শেরপা ইয়ক্ চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুকম্পা ও স্নেহপরবশ স্কট্ শেরপা সর্দারকে ডেকে বলে দেন, মিংমাকেও যেন মাল বইবার কিছু কাজ দেওয়া হয়, সেই সুযোগে বেচারীর আরও কিছু উপার্জন হবে। মিংমা সেইমত মাল নিয়ে ইয়কের পিছনে যাত্রা করে।

বছরের এই সময়ে পাহাড়ের এই অঞ্চলে প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক আবহাওয়ার নিয়ম,—সারাদিন আকাশ ও চারিদিক পরিষ্কার থাকে, সন্ধ্যার দিকে কিছু তুষারপাত শুরু হয়, পাহাড়ের আশপাশ বরফে ঢাকা পড়ে। রাত্রের মধ্যেই আবার মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ দেখা দেয়। পরদিন রৌদ্র উঠলে সেই নতুন পড়া তুষারও গলে যায়। শেরপারা এ-ধরনের আবহাওয়ায় যাতায়াত করতে অভ্যস্ত। মূল শিবির গড়ে তোলার কাজে সারাদিন এপথে লোক চলাচল থাকে। সেদিন সন্ধ্যার পরও মূল শিবিরে দেখা গেল মিংমা মাল নিয়ে পৌঁছয় নি। শেরপারা এতে কোন দুশ্চিন্তার কারণ দেখে না। মনে করে হয়ত পথ হারিয়েছে, কোথাও রাত কাটিয়ে সকালে আসবে। কিন্তু পরের দিন সকালেও যখন পৌঁছুল না তখন দুভাবনা জাগল, তুষারপাতের মধ্য পথ হারিয়ে বেচারী কোন দুর্ঘটনায় পড়েনি তো? হয়ত পথ ভুলে কোথাও গিয়ে পাথরের আড়ালে হাত পা ভেঙে বা গুরুতর আঘাত পেয়ে পড়ে আছে! পথ দিয়ে অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে ঠিকই, কিন্তু

মুক মিংমার তো চেঁচিয়ে জানাবার ক্ষমতা নেই, অসহায় অবস্থায় অলক্ষ্যে সে কোথায় রয়েছে; অনুসন্ধানকারীদের চিৎকারও তার বধির কর্ণকুহরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

শেরপা সর্দারদের নিয়ে সাহেবরা তখনি কয়েকটি দলগঠন করেন। 'ওয়াকিটকি' বেতার যন্ত্র হাতে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে খুঁজতে বার হন। কিন্তু খোঁজা কি সহজ ব্যাপার? হিমবাহের বুকে বড় বড় শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে আছে। কোথায় কার আড়ালে কি রয়েছে বোঝা অসম্ভব। তবুও চেষ্টার ত্রুটি হয় না।

ভাগ্যের বিড়ম্বনা। স্কটের দলই প্রথম দেখতে পান, বরফ-গলা জলধারায় কি যেন বস্ত্রখণ্ড। স্কট ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে যান। তুষারসলিল থেকে মিংমার প্রাণশূন্য হিমশীতল দেহ কোলে তুলে নেন। পাথরের ওপর শুইয়ে দেন। দেখেন, তখনও তার নিষ্পলক চোখে সেই করুণ চাহনি, ঠোঁটের কোণে সেই কঠোর দৃপ্ত ভাবের অভিব্যক্তি!

স্কটের চোখে অশ্রুর বন্যা নামে।

খবর পেয়ে আর সকলে এসে যান। স্কট শোকার্ত-কণ্ঠে অনুশোচনা করেন, ভাবেন, তিনিই তার মৃত্যুর কারণ।

সঙ্গীরা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। দলনেতা বনিংটনও তাঁকে বুকে জড়িয়ে সাশ্রুনয়নে বলেন, স্কট, জীবনে মৃত্যুশোক আসেই। আমিও কি কম পেয়েছি? আমার প্রথম সন্তান কনরাড্ স্কটল্যাণ্ডে ছোট্ট এক নদীর ধারে খেলা করতে করতে কিভাবে জলে পড়ে যায়, সেদিন তার মৃতদেহ এইভাবেই জল থেকে তোলা হয়!

এর পর সাহেবদের মনে মিংমার মৃত্যু নিয়ে আর এক দুশ্চিন্তা জাগে। শেরপা মালবাহকরা তাদের এক সঙ্গীর এই আকস্মিক মরণ কীভাবে নেবে? শোকবিহ্বল হয়ে হয়ত অভিযানে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, শেরপাদের ধর্মবুদ্ধি ও জন্মান্তরবাদে অটুট বিশ্বাস। মিংমার প্রাণহীন দেহ দেখে তারা মন্তব্য করে, মিংমার এ-জন্মের দুঃখময় দিন ফুরাল, সে চলে গেল। এবার হয়ত জন্ম নেবে রোগহীন সুন্দর জীবদেহ ধারণ করে!

॥ ১০ ॥

ডাক্তার চার্লস ক্লার্ক লোকটি বেশ মিশুক। অনেকক্ষণ বসে গল্প করলেন। কুনডে হাসপাতালে ঔষধপত্র রেখে ফিরে যাবার আগে আমন্ত্রণ জানালেন, বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে খুমজুং চলে আসুন, আমাদের তাঁবু পড়েছে সেখানে, —হিলারীর সেই স্কুলের মাঠে।—ডাক্তার দম্পতিকেও যাবার জন্যে বলেন।

কিন্তু বিকেলে সিস্টেসটারের যাওয়া হয় না, কাজে আটকে যান। প্লেন আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে চলেন।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে পথে যারই সঙ্গে দেখা হয়, প্লেনকে অভিবাদন জানায়, প্লেনও তাদের কুশল সংবাদ নেন।

প্লেন বলেন, এই শেরপারা বেশ লোক ভাল, খুব হাসিখুশী, ভদ্র ব্যবহারও, কর্মপটুও। এই বরফের রাজ্যেও শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল, কিন্তু এদের গোচারণ ভূমি নিযে কিছুকাল থেকে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে।

সরোজ বলে, হাঁ, শুনেছি, এইসব অভিযান ও ট্যুরিস্ট সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার কারণেই এই সংকট।

প্লেন বলেন, আরও এক বড় কারণ আছে। ইয়ক, চমরী—এসব হোল শেরপাদের গৃহপালিত পশু। এদের গোধন। টাকা হাতে এলেই এরা ইয়ক কেনে, পোষে। যার যতো ইয়ক, সে ততো বড়লোক। বলতে পারেন ঐ ইয়কের ভরসায় এদের জীবনযাত্রা। ওই গরুর দুধে মাখন ঘি দই ঘোল —এসব তো হয়ই, আবার ঐ ইয়কই হোল এদেশের যানবাহন। তার চামড়ায় এদের জামা, জুতা তৈরি করে, আবার এর মাংস খায়, রক্তও পান করে। ইয়ক কেনাবেচা এক বড় ব্যবসাও। এখন সমস্যাটা জেগেছে ঐ গোধনের অভাবে নয়। পশুসংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে। চীনাদের তিব্বত দখলের পর ভারতে, সিকিমে যেমন হাজার হাজার তিব্বতী শরণার্থীরা নেমে গেছে, তেমনি আশ্রয় নিয়েছে নেপালেও এবং এই খুম্বু অঞ্চলেও। আর শুধু মানুষই আসেনি, এক এক পরিবারের সঙ্গে এসেছে পঞ্চাশ বা তার বেশীও তাদের পালিত ইয়ক। কি অনুপাতে এই ইয়ক-সংখ্যা এই সব গ্রামে বেড়েছে তার কিছু ধারণা হবে, একটা কথা শুনলেই। আগেকার দিনে একজন শেরপা একটা অভিযানে কাজ করে দুটো ইয়ক কেনার মত টাকা আয় করত এবং পনেরোটা ইয়ক হলে তার সুখে জীবন কাটত। এখন একটা অভিযানের রোজগার থেকেই কুড়িটা ইয়ক কেনা যায়! গ্রামে গ্রামে এখন লোকের সঙ্গে পশুসংখ্যাও এত অত্যধিক হয়ে গেছে, বন থাকবে কী করে? চারণভূমিই বা এত কোথায়?

সরোজ বলে, ইউনাইটেড নেশন মিশনের পরিকল্পনাতে অরণ্য-সংরক্ষণ হলে আশা করা যায় কিছুটা প্রতিকার হবে।

প্লেন মন্তব্য করেন, বন-রক্ষা হতে পারে, কিন্তু বাইরে থেকে আসা এতো মানুষের ও প্রাণীর সংস্থান ও পুনর্বাসন —সেও তো এক বৃহৎ সমস্যা।

সরোজ প্রশ্ন করে, আচ্ছা এই যে আপনাদের হাসপাতাল, তারপর খুমজুং-এ যে চলেছি সেখানকার স্কুল—অন্যান্য গ্রামেও শুনেছি আরো স্কুল হয়েছে,—এ-সব শেরপাদের উপকারার্থে হিলারীসাহেবের চেষ্টায় ও উৎসাহে গড়ে উঠেছে শুনেছি,—এসব এখন চালাচ্ছেন কারা?

প্লেন জানান, হিমালয়ান ট্রাস্ট নামে এক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, তারই পরিচালনায় চলে। শেরপাদেরও এ-ব্যাপারে উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাব নেই। বাড়ি তৈরির কাজে তারা বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দান করে। এই তো হিলারী সম্প্রতি ফাপলু গ্রামে রয়েছেন, সেখানে একটা বড় হাসপাতাল খোলা হচ্ছে। আমাদের কুনডে হাসপাতাল তো ছোট্ট প্রতিষ্ঠান।

প্লেন কথা থামিয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন,

শেরপাদের জীবনে হঠাৎ এমন বিপুল পরিবর্তন যেমন সুফল আনছে, তেমনি কুফলও ফলাচ্ছে। যেমন দেখুন, এদের মধ্যে ভাল ভাল আর্টিস্ট আছে। তাদের হাতে আঁকা পট, টঙ্কা প্রভৃতি দেখেছেন নিশ্চয় ? এখন ট্যুরিস্টদের চাহিদা মেটাবার জন্যে তারা এনতার আঁকছে, বিক্রীও হচ্ছে—এবং তার ফলে যা ঘটবার তাই ঘটেছে—টাকার লোভে আঁকার উৎসাহ বেড়েছে, উৎকর্ষ কমেছে, রঙ্-তুলি নিয়ে যেমন-তেমন ছবি এঁকে ট্যুরিস্টদের গছানোর চেষ্টা চলেছে।

এসে যাই খুমজুং গ্রামে। কুনডে, খুমজুং পাশাপাশি গ্রাম—মাইলখানেক মাত্র ব্যবধান। পথও সমতল। প্রাকৃতিক দৃশ্যও প্রায় একই রকম। গ্রাম বাঁদিকে, ডাইনে প্রকাণ্ড মাঠ। তারই একধারে, পাহাড়ের নীচে, রঙচঙে ঝকঝকে স্কুলবাড়ি। ছবির মত দেখতে। সেই মাঠে এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের কয়েকটা তাঁবু।

ডাক্তার ক্লার্কের সঙ্গে দেখা হয়। বনিংটন কোথায় কাজে বেরিয়েছেন। ক্লার্ক নিয়ে চলেন তাঁদের এক তাঁবুতে। ভেতরে লম্বা টেবিল পাতা। দুপাশে সারি সারি চেয়ার। কয়েকজন চা কফি পান করছিলেন। আমাদেরও যোগদান করতে আমন্ত্রণ করেন। স্কট্ও রয়েছেন। টেবিলের একধারে মাইকেল তার মায়ের সঙ্গে 'স্পেলোফান'—শব্দ-বিন্যাস খেলায় ব্যস্ত। সরোজকে দেখে উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে, হ্যালো। হ্যালো! মা, তুমি এখন যেতে পার, ঐ ওঁরা এসে গেছেন,—সরোজকে ডাকে তার সঙ্গে খেলতে। মিসেস্ স্কট্ মুক্তি পান, সরোজকে বলেন, দেখুন তো, আমাকে কোনমতেই ছাড়তে চায় না—অথচ আমার অন্যত্র কাজ রয়েছে,—নিন এর সঙ্গে খানিক খেলুন।

প্লেনও তাঁর সঙ্গে তখনি বার হয়ে যান।

গল্পগুজবে—চা কফি পানের আসর জমিয়ে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায়। প্লেন এসে বলেন, এইবার আমাদের ফিরতে হবে, চলুন যাওয়া যাক।

তাঁবুর বাইরে আসি। ডাক্তার ক্লার্ক-এর সঙ্গে কার অসুস্থতা সম্পর্কে প্লেনের আলোচনা হয়। দেখি দুজনেই বেশ উদ্বিগ্ন। প্লেন আমাদের বলেন, একটু অপেক্ষা করবেন ? চট্ করে ঐ তাঁবুতে আমাদের এক অসুস্থ বন্ধুকে একবার দেখে আসি।

তিনি সেইদিকে চলে যান্। আমরা বাইরে ঘোরাফেরা করি। চারদিকে শেরপারা কাজে-কর্মে ব্যস্ত। ডাক্তার ক্লার্ক তাদের মধ্যে একজনকে ডাকেন, কাছে এলে তার কাঁধে হাত রেখে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন,—এই হোল আমাদের আর এক এভারেস্ট শিখর বিজয়ী—শেরপা পেরুটেম্বা।

হাসিখুশী সাধারণ শেরপার মত চেহারা, দেখে বোঝাই যায় না অতো বড় কৃতী। তাকে প্রশংসাবাদ জানাই। হাতে তার 'ছাং' ভরা মগ্। আমাদের বলে, আপনাদের জন্যেও আনাই।

সরোজ ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করে বলে, আপনি দাঁড়িয়েছিলেন এভারেস্টের মাথায়, আর এখন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা একটা ফটো তুলি। চুড়ার ওপর উঠে আপনার মনে কি হয়েছিল বলুন।

পেরুটেম্বা মুচকে হেসে উত্তর দেন, আনন্দ তো হয়েছিলই, গর্বভাবও কিছু ছিল,—আর সব ছাপিয়ে ছিল মনে ভক্তি—যাঁর করুণায় ওখানে পৌঁছুতে পেরেছি—তাই তো সেখানে বুদ্ধদেবের মূর্তি রেখে এলাম।

প্লেন এসে যান। আমরাও বিদায় নিয়ে কুন্ডের পথ ধরি।

প্লেনকে সরোজ প্রশ্ন করে,' অসুস্থ হয়েছেন কে? অভিযাত্রী দলের কেউ নাকি? আপনাদের কথাবার্তায় মনে হোল যেন গুরুতর কিছু?

প্লেন বলেন, এঁদের দলেব বটে, তবে ইনি যোগ দিয়েছেন এই নেপালে কাঠমাণ্ডুতে। অভিযানের জন্যে শেরপা ও পোর্টার ইত্যাদি ব্যবস্থা করা বিষয়ে এবং মাল পরিবহনের কাজে ইনি সহায়ক ছিলেন। নেপালী ভাষা ভাল ভাবে জানেন, তাই কর্নেল রবার্টস্ নিজে এ-কাজের ভার এবার নিতে না পারায় মাইক্ চেনিকেই সেই কার্যভার দেন,—বেস্ ক্যাম্প--নীচের মূল শিবিরের চেনিই ছিলেন প্রধান পরিচালক ম্যানেজার।

চেনি? নামটা শুনে বলি, ও-নাম আমার জানা। যদিও তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। হিমালয়ান ক্লাবের আমি সভ্য। চেনির নাম প্রতি বছর ক্লাবের বার্ষিক বিবরণীতে দেখতাম দার্জিলিঙ সমিতির সম্পাদক হিসাবে। কয়েক বছর থেকে কিন্তু তা দেখছি না। শুনি তিনি হিমালয় ভালবাসেন, বহু ঘুরেছেন, অভিযানেও অংশ নিয়েছেন। উনি কি আজকাল নেপালে থাকেন?

প্লেন বলেন, হাঁ, আপনি ঠিকই চিনেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলে দেখতেন, এ রকম অসাধারণ মনোবলসম্পন্ন মানুষ দেখা যায় না। তাঁর এই অসুখের ইতিবৃত্ত শুনলে স্তম্ভিত হবেন। চেনি আগে গুর্খা সেনাবিভাগে ছিলেন। অবসর নেওয়ার পর চা বাগান করেন। দার্জিলিঙে থাকতেন। তারপর হঠাৎ একসময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরীক্ষায় রোগ প্রকাশ পেল,—ক্যান্সার! ডাক্তাররা বললেন, মাস দুয়েকের বেশী আর বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। ঘোরাফেরা -কাজকর্ম সব বন্ধ করে খুব সাবধানে জীবনের এই কয়টা বাকি দিনগুলি কাটানো ছাড়া আর কোন কিছু করবার নেই। চেনি কিন্তু এই আসন্ন মৃত্যুর সতর্কবাণীতে সন্ত্রস্ত হলেন না, দমেও গেলেন না। ভাবলেন ঠিক আছে,—মৃত্যু তো সকলেরই একদিন হবেই, আমার না হয় সময়টা আগে-ভাগে জানতে পারলাম,— এখন যে কটা দিন বেঁচে আছি প্রাণভরে আপন মনোমত জীবন উপভোগ করে নিই তো।—তখন নিজের সীমিত জীবনের ভবিষ্যৎ ধারা স্থির করে ফেললেন। চা-বাগান ছেড়ে দিলেন,—শয্যাশায়ী হয়ে রোগী সেজে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকার জন্যে নয়। হিমালয়কে ভালবাসেন চিরকাল, তাই ঠিক করলেন, বাকি দিনগুলি নেপালে এসে হিমালয়ের মধ্যে কাটাবেন। সেই উদ্দেশ্যে যাত্রাও তখনি করলেন। রুগ্ন মানুষ ভাবে নয়, সাধারণ যাত্রীদের মতনও নয়। নিজের ল্যান্ড-রোভার মোটর বার করে, তাই নিজে চালিয়ে চলে এলেন এই পাহাড়-পথে,—ডাক্তারদের শত নিষেধ সত্ত্বেও। এখানে এসে তিনি রবার্টস্-এর-ভ্রমণ সংস্থায় তাঁর সহকারীরূপে যোগ

দিয়েছেন, এখন 'মাউনটেন ট্রাভেলে'র তিনি ডিরেকটরও। ডাক্তারের ঘোষণা করা তাঁর সেই দু'মাসের মিয়াদী আয়ুষ্কাল পার হয়ে এখন তিনি ক'বছর এখানে কাটিয়ে দিলেন,—শুধু কাটানোই নয়, সুস্থ থাকলেই কাজকর্মে মেতে থাকেন, পাহাড়েও ঘোরেন,—যেমন এই অভিযানের কাজেও এবার যোগ দিয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই দুরারোগ্য রোগের অসহ্য কষ্ট পান, সহ্য করেও থাকেন। কদিন হোল তাঁর সেই যন্ত্রণাটাই আবার বেড়েছে। অবাক হয়ে যেতে হয় তাঁর মনের জোর দেখলে। মৃত্যুভয়কে এইভাবে উপেক্ষা করতে পারে কোন মানুষ ভাবাই যায় না।

সরোজ জিজ্ঞাসা করে, বয়স হোল কত ?

প্লেন জানান, বছর ছেচল্লিশ। চেনির এই বিস্ময়কর জীবনকাহিনী বনিংটন তাঁর এভারেস্ট—সাউথ ওয়েস্ট ফেস্—বইখানিতেও লিখেছেন।

নির্বাক হয়ে শুনি সেই অসামান্য মনোবল-অধিকারী মানুষটির কথা।

ভাবি, পরম আশ্চর্যময় মানুষের মনোজগৎ। এই তো দেখি মৃত্যুর সমন পেয়েও একজন মানুষের কী অসীম সহনশীলতা, অটল নির্ভীকতা! অথচ সাধারণতঃ কতো মানুষেরই মন ঘিরে অকারণে সদা ওঠে ভয়, এই বুঝি কখন কি হয়!

॥ ১১ ॥

পরদিন। কুনডে থেকে চলি থিয়াংবোচি। বিকালে সেখানে পৌঁছব। রাত্রিবাস করে, সকালে সূর্যোদয় দেখে, কাল দুপুরে এখানে ফিরে আসা। সঙ্গে খাবার, স্লিপিং ব্যাগ ইত্যাদি চলে। সিলভেস্টার নিমাকেও সঙ্গে পাঠান। সেখানে থাকবার, খাওয়ার ব্যবস্থাদি সে করে দেবে। প্লেন বলেন, মাল বইবার জন্যেও তো আর একটা লোক দরকার ? দেখি কতোখানি ভারি হয়েছে ?—কিট্ ব্যাগটা দু'হাতে তুলে ধরে মন্তব্য করেন, বাঃ! ওজন তো বেশী নয়। ভালই হয়েছে। ডোমলেকে বলি তার ভাইকে ডেকে আনুক, সেই নিয়ে যাবে। বেচারী বোবা, কালা।

শুনে মনে পড়ে, সেই নুরু মিংমার করুণ কাহিনী।

সরোজ বলে, এ-অঞ্চলে মূক-বধির বেশি নাকি!

বছর পনেরো-ষোল বয়েসের ছেলেটি। বেঁটে। গাট্টাগোট্টা। পাহাড়ী ছেলেদের যেমন হয়,—ফোলা ফোলা গাল, টুকটুকে লাল। মুখের দিকে তাকাতেই বড় বড় দাঁত বার করে হাসে। কথা বলতে, শুনতে না পারলেও বোঝে সব। দিদির সঙ্গে এসে সেও বোঝা দু'হাতে উঁচু করে তোলে। ঘাড় নেড়ে বোঝায়, ঠিক আছে, নিয়ে যেতে পারব।

ডোমলে ঘরের মধ্যে থেকে তার ভাইটির জন্যে একটা কম্বল এনে দেয়। মাথার ওপর হাত তুলে, ওপরদিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে কোথায় যেতে হবে,—মুখেও বারকয়েক বলে,—থিয়াংবোচি! থিয়াংবোচি! —কানে তো সে শোনে না, হাতের ইসারা ও ঠোঁট নড়ার ভঙ্গি দেখে সে কি

বুঝল জানি না, কিন্তু ঘাড় নেড়ে সে জানাল, বুঝতে সে পেরেছে।

সরোজ ডোমুলেকে বলে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে, ভাবনা নেই। নাম কি ওর?

নাম? নাম আবার কি থাকবে? ডোমলুের ভাই বলেই সর্বত্র পরিচয়।

ভাবি, সত্যই তো। তার নিজের নামের প্রয়োজন কী? সে-নামে তাকে ডাকলে সে শুনতেও পাবে না, সাড়া দিতেও পারবে না। জীবনে জানতেও পারবে না, কী তার নাম।

সকালে তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে চারজনে রওনা হই। নির্মেঘ নির্মল আকাশ। চারিপাশে তুষারশিখরগুলি রৌদ্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। খুমজুং গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলি। নিমার সেখানে সামান্য কি কাজ আছে, এই সুযোগে সেরে যাবে। আমরা পথের ধারে পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করি। ডোমুলের ভাই বোঝা রেখে খানিক এদিক ওদিক ঘোরে। অল্প পরে কাছে এসে হাতের ইসারা করে দেখায়, সে আর অপেক্ষা করবে না, এগিয়ে চলল। করতলে ঢেউ খেলানোর ভঙ্গি করে, পাহাড়ের নিম্নাংশে আঙুল দেখিয়ে আমাদের বোঝায়, সেই বহু নীচে নদী—সেখানে গিয়ে সে বসবে।—তার হাতে ও চোখে ভাষা যেন ফুটে ওঠে। ভাবি বেচারী নদীর রূপ জানে, স্রোতের তীব্রবেগে গতি জানে,—অথচ তার কল্লোল শোনে না, নদী বলে নাম জানে না।

সরোজ তার প্রস্তাবে ব্যস্ত হয়। পাশের পাথরে হাত চাপড়ে বোঝায়, এইখানে তুমি বস—একসঙ্গে আমরা যাব।

সে মানতে চায় না। ঘাড় নাড়ে। হাতের ইসারায় বোঝায়, তোমরা বস আমি চললাম।—মুখে হাসি ও পিঠে বোঝা নিয়ে পাকদণ্ডী পথ ধরে সে একাকী নেমে যায়।

সরোজ চিন্তিত হয়ে বলে, দেখুন, আবার একে নিয়ে কি কাণ্ড হয়! পথ চেনে তো?

নিমা ফিরে এলে তাকে জানানো হয়। সে আশ্বাস দেয়, ভাববেন না, ও পথ চেনে, ঠিক যাবে।

আমি ভাবি, আকারে ইঙ্গিতে সে তাহলে ঠিক বোঝে আমরা কোথায় চলেছি।

আমরাও পাকদণ্ডী পথ ধরে খানিক নেমে সাধারণ রাস্তা ধরি।

কিছুদূর যাবার পর বড় বড় গাছের জঙ্গল। তারই মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে পাহাড়ী ছোট নদী। পাথর থেকে পাথরে ডিঙিয়ে জলের ধারা পার হতে হয়। পাহাড়ের খাঁজের পথ বেয়ে কলকল ধ্বনি তুলে জলধারা নেমে যায় বহু নীচে দুধকোশীর বুকে আশ্রয় নিতে। আমাদের পথও পাহাড়ের গা ঘিরে, ঘুরে ঘুরে, নামে সেই দুধকোশীরই কূলে। পথের শেষের অংশ গহন বনঘেরা। নদীর উপর কাঠের পুল। অদূরে দুধকোশী ও ইমজাখোলা নদীর সঙ্গম। নদীর তটে ও জলের মধ্যে বড় বড় শিলাখণ্ড। সরোজকে দেখাই, জলঘেরা

কোন্ পাথরটার ওপর বসে গতবার বিশ্রাম করেছিলাম।

আমার চোখে সেই অতি সাধারণ পাথরটি অতীতের স্মৃতি-মধুরিমায় অসামান্য হয়ে ওঠে।

নিমা বলে, এখন আর বিশ্রাম নিতে এখানে লোকে বসে না। ঐ যে অল্প ওপরে গাছগুলো,—সেইখানে ফুনগুটিংগা গ্রামে হোটেল হয়েছে,—চলুন, আপনারাও ওখানে বসে চা খাবেন।

অতএব নির্জন শান্ত নদীতট ও সুশীতল শিলাসন ফেলে তাই করা হয়। সেইখানে পথের ধারে দুখানা ঘর। শেরপা হোটেল। হোটেলের সামনে পথে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সাহেব। সরোজ দেখেই বলে, আরে! ঐ যে ডাক্তার ক্লার্কও দাঁড়িয়ে! হ্যালো ডক্!—বলে এগিয়ে যায়। ক্লার্কও দেখে এগিয়ে আসেন।

তাঁদেরই দল। আবার কয়েকজন থিয়াংবোচি চলেছেন। এঁদের অভ্যর্থনায় বিলেত থেকে যাঁরা নতুন এলেন, তাঁদের এভারেস্ট দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন। দলের আর সবাই অনেক আগে এগিয়ে গেছেন, এঁরা ক'জনও যাবার জন্যে প্রস্তুত।

ক্লার্ক বলেন, আসুন, আজ আলাপ করিয়ে দিই,—এই ইনিই ক্রিশ্ বনিংটন—অভিযানের দলনেতা। সেই একই রকম মাথা-ভরা ঝাঁকড়া কটা চুল, এক-মুখ দাঁড়িগোঁফ, রোদে-পোড়া গাঢ় রঙ, সর্বদেহে হিমালয়ের নির্মম তুষার-রাজ্যে বাসের অভ্রান্ত সাক্ষ্য। এখানে এখন দাঁড়িয়ে একেবারে খালি গায়ে। পরনে শুধু প্যান্ট। যেন নিজ গৃহের নিভৃত কামরায় আপন খুশিমত পোশাক। আচরণেও তেমনি সহজ, সরল, অনুপচারিক।

করমর্দন করে তাঁকে বিজয় অভিবাদন জানাই। সরোজ বলে, আপনারা বুঝি এখনি রওনা হবেন? একটু দাঁড়ান, 'লিডার্'-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা ফটো তোলা যাক্। নিমা, তুমি ক্যামেরাটা ধরে এইখান থেকে ছবিটা তোলো দিকি- আমি সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি।

বনিংটন পথের পাশে রাখা তাঁর রুকস্যাক্ থেকে জামা বার করতে উদ্যত হন্।

বাধা দিয়ে বলি, যে-বেশে রয়েছেন, সেইভাবেই ছবি নেওয়া হবে। জানেন না? হিমালয়ে আমাদের সাধুসন্ন্যাসীরা থাকেন নির্বস্ত্র অবস্থায়। আপনি আসছেন সদ্য এভারেস্ট থেকে,—চেহারাও দেখাচ্ছে সাধুদের মতন, জামাও ছেড়েছেন নিজে থেকে,—ছবিও উঠবে এইভাবে।

তোলাও হয় তাই। সঙ্গে ডাক্তার ক্লার্ক ছাড়া অন্য যে দুজন থাকেন,—বার্কলে ব্যাঙ্কের অ্যালেন ব্রিটন ও সানডে টাইম্স্-এর গ্রীনফিল্ড—উভয়ের পোশাকপরিচ্ছদে বিলাত থেকে সদ্য আসার নিদর্শন।

তাঁদের তাড়াতাড়ি থাকায় তখনি রওনা হন্। আমরাও হোটেলে ঢুকি। বাইরে দরজার নিকটে আমাদের মালের বোঝা দেখে আশ্বস্ত হই, ডোম্‌সের ভাই তাহলে কখন আগে এসে পৌঁছে গেছে। কোথাও বোধ হয় পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, আমাদের দেখতে পেয়ে হাজির হয়। সরোজ তার

পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেয়। সে আঙুল তুলে পাহাড়ের মাথার পানে দেখায়, মুখের ও চোখের ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে, এইবার মস্ত চড়াই—পাহাড়ের ঐ ওপরে উঠতে হবে। অদ্ভুতভাবে ঠোঁট বিকৃত করে সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে,—বেশ কষ্টকর!

সরোজ মাথা নেড়ে ইসারায় বলে. ঠিক আছে, আমরা তাই উঠব। চল এখন চা খাবে।

নিমা বলে, চা আপনারা খান, আমরা ছাং নেব।

সেইমত অর্ডার দেওয়া হয়। হোটেলের ভিতর অন্যান্য খদ্দেরও রয়েছে—বিদেশী ট্যুরিস্ট, পথচারী শেরপাও। হোটেলে শুধু খাদ্যপানীয়েরই ব্যবস্থা নয়, পর্বত-অভিযাত্রীদের ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত পোশাক, জুতা, লাঠি, টুপি ইত্যাদি পণ্যেরও ব্যবসা চলে।

আমরাও আর অকারণ দেরি করি না। থিয়াংবোচির সেই চড়াই আরম্ভ হয়।

সরোজকে বলি, তুমি নিজের শক্তি ও দম বুঝে ওঠ, তাড়াতাড়ি করতে যেও না, করার কোন আবশ্যকতা নেই. হাঁপিয়ে পড়বে। যখনি ক্লান্তিবোধ হবে, চলার গতিবেগ আরও কমাবে, নেহাৎ দরকার হলে দাঁড়িয়ে বা বসে বিশ্রাম নিতে পার, তবে ঘন ঘন না বসতে হয় এমন ভাবেই চলা ভাল। কে পাশ দিয়ে কতো জোরে এগিয়ে গেল, কে কতোখানি পেছিয়ে রইল,—তার জন্যে ভাবনা কোরো না,—নিজের সামর্থ্যমত চলবে—চলার আনন্দ পাবে। নিমা তোমার সঙ্গে রইল। আমিও আমার মত চললাম,—বলে আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী চলতে থাকি। বার্ধক্যে দেহের শক্তির হ্রাস পেয়েছে, ভুলি না। স্বাভাবিক গতিবেগ আরও সংযত করি। ধীর পদক্ষেপে চড়াই-পথে উঠি। বহুকালের অভ্যাস. পথ চলতে কোথাও বসি না। আপন মনে একা একা চলার এক গভীর আনন্দবোধ থাকে। নদী যেমন সাগরে আপন আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলে, তেমনি নিজেকে হিমালয়ের অপার শান্তি ও মহিমার মাঝে নিঃশেষে মিশিয়ে দেওয়ার অপার্থিব এক অনুভূতি।

কখন নদী ছেড়ে ঘন বনের মাঝ দিয়ে চড়াই বেয়ে অনেকখানি উঠে আসি, খেয়ালই করি না। চমকে উঠি মানুষের পায়ের শব্দ শুনে। থিয়াংবোচি থেকে কয়েকজন ট্যুরিস্ট নেমে চলেছেন। চোখাচোখি হতেই পরস্পরে মৃদু হাসির বিনিময় হয়, মৌনতার সূত্রে যেন মনের কথা গাঁথা হয়ে যায়,—কী অপূর্ব সৌন্দর্যময় এই বিশাল হিমালয়!

পথের পাশে গাছপালা বিরল হয়ে আসে। বহু নীচে নদীর ক্ষীণ রেখা চড়াই-শেষের ইঙ্গিত জানায়। খানিক গিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই থিয়াংবোচিও এসে যায়।

তখনও বেলা শেষ হতে অনেক দেরি। আকাশ পরিষ্কার। তবে পাহাড়ের বুকে কোথাও কোথাও খণ্ড খণ্ড মেঘ বিচরণ করে।

পথের শেষে সেই বৌদ্ধ চোরটেনের নিকট দাঁড়িয়ে চারিপাশে তাকিয়ে

দেখি। সম্মুখেই যেন সুবর্ণমণ্ডিত থিয়াংবোচির সেই সুপ্রসিদ্ধ মনাস্ট্রি। গ্রামের ঘরবাড়ি। এপাশে ঐ সেই উন্মুক্ত ময়দান, তারই শেষপ্রান্তে ঐ দেখা যায় সেই সুপরিচিত অতিথিনিবাস—রেস্ট হাউস্—যার অভ্যন্তরে সে-বছর নিদ্রাহীন অবিস্মরণীয় রাত্রিযাপন করি,—আর তারই পশ্চাতে দেখা যায় নাপ্ৎসে-লোট্সের সংযোগকারী দিগন্তবিস্তারী গিরিপ্রাকার। পিছনে মাথা তুলে এভারেস্টের অমল ধবল তুষারশিখর।

সাগ্রহে সরোজের প্রতীক্ষা করি। আবার হয়ত কখন কোথা থেকে মেঘের সঞ্চার হয়, এভারেস্ট অদৃশ্য হন। হিমালয়ের অবারিত দৃশ্য দেখার সুযোগ,—সেও ভাগ্যের কথা। সরোজের পৌঁছুতে কিছু বিলম্ব ঘটে। এভারেস্টও তখন ঘন মেঘের অন্তরালে অবলুপ্ত। সরোজ হতাশকণ্ঠে বলে, এত কষ্ট করে এসেও দেখা পেলাম না!

বলি, এখন পেলে না, তাতে কী? ধৈর্য ধরে থাক, মনে অটুট বিশ্বাস রাখ। হিমালয় করুণাময়। দেখা তিনি দেবেনই। এখনও সারারাত্রি রয়েছে, কাল সকাল আছে—দরকার হয় তো কাল সারাদিনও থাকা যাবে।

নিমা পৌঁছেই রাত্রিবাসের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। বলে, পিছনে আরও সব ট্যুরিস্ট আসছে, আগে থেকে হোটেলে জায়গা দখল করে রাখি।

মাঠের ধারে মনাস্ট্রির এলাকার গায়ে নতুন-তৈরি শেরপা হোটেল। পাথরের গাঁথনি। ঢালু খাদ। পাশাপাশি দুখানা ঘর। একটাতে রাত কাটানোর জন্যে প্রায় ঘর জুড়ে তক্তাপোশের মতন,—সারি সারি চেরাকাঁঠের তক্তা পাতা,—তারই উপর যে যেখানে পার আপন শয্যা বিছিয়ে শুয়ে পড়। দুজন জার্মান এসে একটা কোণা অধিকার করেছেন,—অবশিষ্ট অংশে প্রচুর জায়গা। তারই খানিক অংশ দখল করে আমরা কিট্ ব্যাগ খুলি, বিছানা পাতি, খুচরা জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখি। পাশের ঘরে হোটেলের দোকান, সেইখানেই রান্না হয়, রাত্রে শেরপারা শোয়ও।

এইবার নিশ্চিন্তমনে মনাস্ট্রি দেখতে যাওয়া।

প্রথমে যাই প্রধান লামার দর্শনে। নিমা আমাদের গাইড। লামার বাসগৃহে নিয়ে চলে। বাড়ির ভিতর সেই বসবার ঘর,—গতবার যেখানে লামার অসুস্থ ভ্রাতার সঙ্গে আলাপ হয়। সে বছর তখন প্রধান লামা এখানে ছিলেন না, পথে তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল।

প্রধান লামাকে নিমার সাহায্যে সেই সব কথা জানাই। তাঁর ভাই-এর সংবাদও নিই। শুনে দুঃখ পাই, তার কিছুকাল পরে তাঁর ভাই ইহলোক ত্যাগ করেন। সে বছর অসুস্থ দেহেও নিজে সঙ্গে থেকে মনাস্ট্রির ভিতরে ঘুরে ঘুরে আমাকে সব দেখিয়েছিলেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা স্মরণ করি, লামাকেও বলি।

লামা চা-বিস্কুট আনিয়ে খাওয়ান। প্রণাম করে মনাস্ট্রি দেখতে চলি।

মঠে প্রবেশ করে মনে হয়, কালের গতি এখানে যেন স্তব্ধ হয়ে স্থাণু দাঁড়িয়ে থাকে। ন'বছর আগে ঠিক যেমন দেখে গিয়েছি এখনও সব তেমনি

রয়েছে। সেই বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন মূর্তি, সেই থাকে থাকে সাজানো পুঁথি, সেইসব বাদ্যযন্ত্র, সুন্দর টঙ্কা। এমন কি মঠের ভিতর ধূপদীপের ও বদ্ধ আবহাওয়ার অতি-পরিচিত বিচিত্র গন্ধটিও। শুধু 'ভিজিটারস্ বুক্'টি দেখি যাত্রী-প্রবাহের সচলতার প্রমাণ দেয়,—দর্শনার্থী আগন্তুকের সাক্ষর সংখ্যা বেড়েছে।

সেবার কয়েকটি মূর্তি চুরি যাবার খবর শুনেছিলাম। সেগুলির সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

মঠ থেকে নেমে মাঠে আসি। সরোজকে বলি, চল, ঐ রেস্ট হাউস্‌টাও দেখে আসবে—ঐখানে সেবার রাত কাটিয়েছিলাম। নতুন রঙ্ করেছে, মনে হয়। ঝক্‌ঝক্ করছে।

নিমা বলে, বাড়িটা সম্প্রতি আবার নতুন করে ভালভাবে তৈরি হয়েছে।

সরোজ প্রশ্ন করে, মাঠের পূর্বদিকে দূরে ওপারের ঐ বাড়িটা বুঝি সেই স্কুলবাড়ি? তার সুমুখে মাঠে রঙ্‌চঙে কয়েকটা তাঁবু পড়েছে, মনে হয় বনিংটনদেব তাঁবু,—হাঁ ঐ তো সব ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

আমরা চলি রেস্ট হাউস্-এর দিকে। নিকটে পেঁছে দেখা যায়, দরজায় তালা দেওয়া। কাঁচের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারি। হাঁ, ঠিকই, বাড়িটা আরও মজবুত করা হয়েছে, দেওয়ালের কাঠগুলিও মনে হয় এখন ভালভাবে বসিয়েছে।

বাড়ির পিছনে সেই গাছের গুঁড়ি-কেটে-তৈরি বেঞ্চে বসবার জায়গাটা এখনও রয়েছে। তবে ভগ্নাবস্থা। তা হোক্, এখনও বসা চলে। সুমুখে নীচে ইম্‌জাখোলা নদীর দীর্ঘ উপত্যকা। তারই শেষভাগে নাপ্‌ৎসে-লোট্‌সের শৈলশ্রেণী,—এখন মেঘাবৃত, এভারেস্টও অদৃশ্য। আকাশ থেকে যেন পর্দা ঝুলিয়ে দিগন্ত ঢাকা।

সরোজ বলে, এখন আর মেঘ সরছে না, চলুন ফেরা যাক্।

আমি জানাই, তুমি ফেরো, আমি কিছু পরে যাব।

একা গিয়ে বসি সেই কাষ্ঠাসনে—বনশেরা শান্ত নির্জন নিভৃতিতে।

সন্ধ্যার ছায়া নামলে হোটেলে ফিরি।

মানুষের মাঝে এ এক ভিন্ন জগতে যেন ফিরে আসা।

মাঠে আরও তিনটে তাঁবু পড়েছে। কজন অস্ট্রিয়ান্ পর্বতারোহী এসেছে। হোটেল ঘরেও অন্যান্য টুরিস্টদল। আমরা আমাদের পূর্ব-দখল-করা জায়গার যথাসম্ভব অংশ ছেড়ে দিই। নিমাকেও বলি, ডোম্‌লের ভাইকে নিয়ে আমাদের পাশে শুতে। প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচুতে—বরফের পাহাড়-ঘেরা-শীতের দেশ, ঘেঁষাঘেঁষি হলেও অসুবিধা নেই। তা ছাড়া, যাঁরা পরে এলেন তাঁদেরও তো আশ্রয় চাই। আমরা থাকব ঘরের মধ্যে, কেউ থাকবে বাইরে পড়ে, তা কি কখনো হয়? হিমালয় যাত্রাপথে সে-শিক্ষা পাওয়া নয়।

বাইরে প্রচণ্ড শীত। আকাশ মেঘে ঢাকা। দেখবার কিছুই নেই। তাই

রাত হবার আগে সকলে যে যার আহার শেষ করে শয্যাগ্রহণ করি। অপর যাত্রীরাও স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছেন। এক কোণে রয়েছেন এক বৃটিশ দম্পতি। তারপরেই দুই সুইস্ অভিযাত্রী। নিমার ছেড়ে-আসা জায়গায় শুয়েছেন দুজন ফরাসী। আর এক কোণে দুজন জার্মান।

সরোজ হেসে বলে, এইটুকু ঘরের মধ্যে মানুষ সাজিয়ে ইউরোপের মানচিত্র আঁকা হয়েছে।

পাশের ঘরে তখনও হোটেলের রান্নার, খাওয়াদাওয়ার পর্ব চলে। হাসি ও গল্পের স্রোতের ঢেউ এ-ঘরেও ভেসে আসে। ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়। আপত্তি করার উপায় নেই। কিন্তু সেখানে যখন ট্রানজিস্টার খুলে উচ্চ-নিনাদে নেপালী সিনেমার নৃত্যসঙ্গীত বম্বে ফিল্মের অনুকরণে শুরু হয়, তখন মনে বিরক্তি জাগে। হিমালয়ের এই শব্দহীন শান্ত নিভৃতিতেও ঐ গান! নিঃশব্দতার মর্যাদা রক্ষা কি এখানেও সম্ভব নয়? বিদেশী ট্যুরিস্টরাও পরস্পরে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নিমাকে বলি, বিবাদ না করে যদি কোন রকমে যন্ত্রটা থামাতে পার চেষ্টা করে দেখ। সে উঠে যায়। গান থামে না, তবে শব্দ ক্ষীণ হয়। দুই ঘরের মাঝের কাঠের দরজাটা বন্ধ করে তাতে পাথর দিয়ে আটকে রাখাও হয়।

রাত্রে বৃষ্টি নামে। কাঠ ও শ্লেটপাথর বিছানো ছাদ। ঘরের মধ্যে জল পড়ে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দিকটায় পড়ে না। জার্মান যাত্রী দুজনের দুর্ভোগ সব চেয়ে বেশি,—সারারাত জলে ভেজে!

॥ ১২ ॥

ভোর হতেই উঠে পড়ি। জামা টুপি পরে গরম চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে কনকনে শীত। তা হোক্। সানন্দে দেখি, কখন বৃষ্টি থেমেছে,—আকাশ নির্মেঘ, নির্মল। চারিদিক ঘিরে মাথা তুলে সারি সারি তুষারশিখর। ঐ তো দেখা যায়,—এভারেস্ট চূড়াও,—সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত! অবিলম্বে সরোজকে ডেকে আনি। আমার ডাক শুনে অন্যান্য ট্যুরিস্টরাও শয্যা ছাড়েন, বাইরে আসেন। বিস্ময়-বিমোহিত নয়নে সকলে হিমালয়ের অপরূপ শোভা নির্বাক হয়ে দেখতে থাকেন। এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সাহেবরাও এসে যান,—বনিংটন, স্কট্, স্কট্-পত্নী, ডাক্তার ক্লার্ক প্রভৃতি। বিলাত থেকে সদ্য আগত সঙ্গীদের বনিংটন শিখরগুলির একে একে নাম বলে দেন,—এ যেন গৃহাগত নূতন অভ্যাগতের নিকট গৃহস্বামীর পরম-প্রিয় আত্মীয়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া: পূর্বদিকে ঐ আমা ডাবলাম (২২,৪৯৪), দক্ষিণ-পূর্বে ওটা তামসেরকু (২১,৭৩০), তারই পাশে—আমাদের সব চেয়ে নিকটে—ঐ কাংটেগা (২২,৩৪০), দক্ষিণ-পশ্চিমে ঐ হোল কোয়াংডে (২০,৩০০), উত্তরদিকে ওটা টাওয়াচে (২১,৪৬৫)। আর সম্মুখে ঐ লোটৎসে (২৭,৮৯০) ও নাপ্‌ৎসে (২৫,৮৫০)—দুই-এর মাঝখানে পিছনে মাথা তুলে ঐ এভারেস্ট শিখর (২৯,০২৮)।

মাত্র মাইল দশ-পনেরো দূরে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে এতোগুলি গগনচুম্বী তুষারশিখর! স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখি। ক্রমে পূর্বদিকের গিরিশ্রেণীর অন্তরালে অলক্ষ্যে কোথায় সূর্যোদয় হয়। তারই রক্তিমছটা কয়েকটি তুষার-শিখর উজ্জ্বল করে তোলে। হিমাদ্রির শুভ্র ললাটে কে যেন রক্তচন্দনের তিলক পরায়।

সরোজ ও ট্যুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে ফটো তুলতে ব্যস্ত হয়।

বার্কলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রিটন আমার পাশে দাঁড়িয়ে। নধর দেহ। গোলগাল মুখ। চোখে চশমা। পরনে মূল্যবান্ পোশাক পরিচ্ছদ। সদ্য বিলেত থেকে এ দেশে আসা খাস বৃটিশ,—চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। যেন বাগান থেকে তুলে-আনা তাজা গোলাপফুল। নিষ্পলক নেত্রে তিনিও মুগ্ধ হয়ে হিমগিরির এই সৌন্দর্যসুধা পান করেন। হঠাৎ কানে আসে তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত অস্ফুট স্বগত-উক্তি—ও! হাউ ওয়াণ্ডারফুল! জগতে এমন অপরূপ দৃশ্যও আছে!

তাঁর দিকে ফিরে তাকাই। তিনিও আমার দিকে তাকান। শান্ত স্বরে বলেন, কি বিস্ময়কর দৃশ্য! হিমালয়ের এমন আশ্চর্য রূপ! মনে অতি-বিচিত্র অনুভূতি জাগায়,—এ যেন পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে এসেছি,—জাগতিক ধ্যানধারণা—সব কিছুর মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়ে মনে অদ্ভুত এক ভাব জাগছে!

তাঁর মন্তব্য শুনে মৃদু হাসি।

মর্মে মর্মে জানি, হিমালয়ের মহান দৃশ্যাবলীর জীবনীশক্তি আছে। শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, পাহাড় পর্বত. বন অরণ্য, নদ নদী সাগর প্রভৃতির জীবন জীবন্ত তরুলতার মত নয়,—অধিদৈবত—দেবতার চিৎশক্তির অধীন। সেই কারণেই মানুষের মনের উপর এদের ক্রিয়ার সম্ভাবনা হয়। নিবিষ্টচিত্তে অপরূপ নৈসর্গিক শোভার নিরীক্ষণ অজানিত ভাবে ও সহজেই মানবহৃদয়ের উচ্চস্তরের ভাবগুলি বিকশিত করে তোলে, পদ্মকোরক যেমন সূর্যকিরণে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

ভাবি, আজ সাহেব ব্রিটনের উক্তিও কি সেই তত্ত্বেরই সমর্থন করে?

প্রকৃতির সেই প্রকৃত লীলাভূমিতে ঘণ্টা দুই সময় চোখের পলকে কাটে।

নিমা প্রাতঃরাশ তৈরি করে ডাক্ দেয়।

তারপর, কুন্ডের ফিরতি পথে পা বাড়ানো। বেলা একটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছানো।

॥ ১৩ ॥

কুন্ডেতে সিল্ভেস্টারদের সঙ্গে আনন্দে আরও দুদিন কাটে। ইতিমধ্যে তাঁদের স্বদেশবাসী তিন-চারজন বন্ধুও আসেন। বিভিন্ন কর্মসূত্রে তাঁরা নেপালের অন্যত্র থাকেন। কাজের ফাঁকে দু'চার দিনের জন্য এ-অঞ্চলের পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে এসেছেন।

তাঁদেরই একজনের কাহিনীও এখানে শোনাই।

দুপুরবেলা। সিল্‌ভেস্‌টার কোথায় কাজে বাইরে বেরিয়েছেন। বারান্দায় বসে সরোজের সঙ্গে গল্প করছি। লম্বা লম্বা পা ফেলে এক সাহেব এলেন—এক ঝলক দমকা হাওয়ার বেগে। যথারীতি পিঠে বাঁধা রুক্‌স্যাক্‌। রোগাটে লম্বা চেহারা, চোখে মুখে কেমন এক রুক্ষ কঠোর ভাব। মাথা-ভরতি এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল। পরনে হাফ্‌-প্যাণ্ট, গায়ে পুরা-হাতা সার্ট—আস্তিন গুটানো। তার ওপর সোয়েটার। পায়ে জুতা মোজা। কিন্তু সে সবই অতি ব্যবহৃত, জীর্ণ, কোথাও কোথাও তালি-দেওয়াও। প্যাণ্ট ও জামায় শুক্‌না কাদামাটির ছোপ। শুধু তাই নয়। মুখে হাতে কয়েকটি ক্ষতচিহ্নও,—ঝরা রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। দেখেই মনে হয়, সাক্ষাৎ ভবঘুরে। কোথাও একটা হাঙ্গামাও বাধিয়েছিল। এসেই সিল্‌ভেস্‌টারের খবর নেন। সরোজ তাঁকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে। জানায়, ডাক্তার বেরিয়েছে, এখনি আসবে হয়ত।

পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্‌ খুলে নামিয়ে রেখে তিনি বসেন। পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করে ধরান।

সরোজও আলাপ জমায়।

নাম—মার্‌এ জোন্‌স্‌। সিল্‌ভেস্‌টারের সঙ্গে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। প্রায় সমবয়সী। বাড়িও নিউজিল্যাণ্ডে। হিলারী তাঁকে সেখান থেকে আনিয়েছেন। ফাপ্‌লুতে যে বড় হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে, তারই কাজে সাহায্য করার জন্যে। ফাপ্‌লু থেকেই আসছেন এখন। না,—তিনি ডাক্তার নন। ড্রাফট্‌সম্যান—বাড়ির নকশা-অঙ্কনকারী।—কথা বলেন কেমন যেন আনমনা ভাবে। নিজে থেকেই জানান, পেশায় ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান হলেও নেশা হোল আমার পাহাড়-পর্বতে ঘোরা—মাউন্‌টেনিয়ারিং। অনেকদিন একটানা কাজের খাটুনি গেল। এখন কদিনের ছুটি নিয়ে চলে এলাম এখানে। কাল আমাদের আর এক বন্ধুও সস্ত্রীক পৌঁছুবেন। পরশু সেই বন্ধুর সঙ্গে এখানকার কোন পাহাড়ের শিখরদেশে উঠতে যাব,—ঐ যে পল্‌ এসে গেছে!—হ্যালো পল্‌!—বলে তড়াং করে উঠে এগিয়ে যান্‌। সিল্‌ভেস্‌টারও বারান্দায় উঠে এসে হাত বাড়িয়ে বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। পরক্ষণেই চমকে উঠে প্রশ্ন করেন,—এ কী ব্যাপার! তোমার মুখে হাতে ক্ষতচিহ্ন, রক্তের দাগ—

মার্‌এ এতক্ষণে যেন এ বিষয়ে সজাগ হয়ে ওঠেন। মুখ চোখ উত্তেজনায় আরক্ত হয়, তীক্ষ্ন কণ্ঠে বর্ণনা করেন তাঁর আসার পথের এক দুর্ঘটনা।

সঙ্গে তাঁর চিরসাথী প্রিয় টেরিঅ্যার কুকুরটিও আসছিল। কুন্‌ডে পৌঁছুবার ঘণ্টা তিন-চার আগে পথের পাশে একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকে তিনি চা খেতে বসেন। কুকুরটা নিকটেই দরজার কাছে খেলা করছিল। এমন সময় দুটো শেরপা ছোকরা কোথা থেকে এসে কুকুরটাকে খেদিয়ে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যায়। স্বভাবতঃই তিনি ভাবলেন, কুকুরটাকে নিয়ে তারা আশেপাশেই খেলা করছে। কিন্তু চা পান করে বেরিয়ে এসে তাদের কোথাও দেখতে পান না, কুকুরটাও নেই। নাম ধরে অনেক ডাকলেন, তবুও এল না,

সাড়াও দিল না। তার অতো আদরের কুকুর, তাকে ফেলে আসতে পারেন না। অগত্যা অপেক্ষাই করেন। ঘণ্টাখানেক পরে দেখেন, শেরপা ছোকরা দুটো ফিরে এসে দোকানে চায়ের অর্ডার দিচ্ছে। কুকুরটি তাদের সঙ্গে নেই দেখে তিনি কুকুরের কথা তাদের জিজ্ঞাসা করেন। তারা বিস্ময়ের ভান প্রকাশ করে বলে, কুকুর! ও ধরনের কোন কুকুরই আমরা কখনো দেখিনি।

মারুএর সন্দেহ হোল, কুকুরটাকে তারা কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে, পরে বিক্রী করবে বলে। কুকুরটা ফেরত দেবার জন্যে তিনি অনেক অনুরোধ করলেন। তাদের সেই এক কথা, সে-কুকুর তারা কখনো দেখেইনি। মারুএ তাদের চুরির অপরাধে দায়ের করবেন বলে ভয় দেখাতে লাগলেন।—এইভাবে উভয়পক্ষে বচসা চলে। এমনি সময়ে ছোকরা দুটো তাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করে মারতে শুরু করে। তিনিও তাদের কয়েক ঘা বসাতে ছাড়েননি। কিন্তু দুজন ষণ্ডা শেরপার সঙ্গে একা আর কতক্ষণ লড়বেন? ছোকরা দুটো তাঁকে টেনেহিঁচড়ে পথের ধারে খাদের দিকে নিয়ে চলে। সেখানে পাঁচশ ফুট নীচে নদী, তাইতে ফেলে দেবার উদ্দেশ্যে ধাক্কা মেরে ঠেলে দেয়। গড়িয়ে যেতে যেতে ভাগ্যক্রমে প্রায় পঞ্চাশ ফুট পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গাছের শক্ত ডাল ধরতে পেরে তিনি কোনমতে গতিরোধ করেন, তার প্রাণও বাঁচে। আধ ঘণ্টা পরে মারুএ যখন অনেক কষ্টেসৃষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে রাস্তায় আবার উঠে এলেন, শেরপা দুটোকে তখন আর দেখতে পেলেন না, মনে হয়, তাঁর কী হোল দেখবার জন্যে তারা আর অপেক্ষাও করেনি। ঘটনার সময় সেখানে যে আর কেউ ছিল না, এমন নয়। দোকানদার, তার স্ত্রী ও দু'তিনজন খরিদ্দার সারাক্ষণই দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটা দেখেছে, কিন্তু মারামারির সময় মধ্যস্থতা করা তো দূরের কথা, তাঁকে ঐভাবে নদীতে ফেলে দেবার কালেও তাদের বাধা দিতে কেউ এক পাও এগিয়ে আসেনি। নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে তখন সব কিছু দেখেছে এবং তিনি প্রাণ বাঁচিয়ে এখন উঠে আসার পরও তাঁর দিকে সেইভাবেই তাকিয়ে থাকে, যেন কোন অঘটনই ঘটেনি। মারুএ তাদের আচরণে বিরক্ত হয়ে কারও সঙ্গে বাক্যব্যয় না করে সোজা চলে আসেন কুনডেতে।

মারুএর বর্ণনা শুনে আমরা ভাবতে থাকি, কী অল্পের জন্যই না তাঁর প্রাণটা কোনরকমে বেঁচে গেছে! বহু নীচে সেই নদীতে পড়লে আর কি রক্ষা ছিল! মারুএর কিন্তু সে-ভাবনা দেখি না, তাঁর গভীর শোক, আদরের কুকুরটিকে হারানোর জন্যে। সিলভেস্টারকে তিনি জানান, কাল ভোরেই আমি আবার সেখানে ফিরে যাচ্ছি, কুকুরটার সন্ধান করব, তেমন হয় তো, সেই শেরপা দুটোকে টাকা দিয়ে আমার কুকুর আমিই কিনে আনব।

পল বলেন, কুকুর তোমার ফিরে পাবার কোনই আশা নেই, নাই বা তার সন্ধানে আবার গেলে।

মারুএ কোনমতেই রাজী হন না। জিদ ধরেন, যাবেনই।

সিলভেস্টার বলেন, ঠিক আছে। আমিও কাল তোমার সঙ্গে থাকব। এখন চল তো, তোমার ক্ষতস্থানগুলি পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিই,

জামাকাপড়ও বদলানোর ব্যবস্থা করি।

কিছুক্ষণ পরে মার্এ পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসেন। এখন আর তাঁর কথাবার্তায় কোন উত্তেজনা নেই। ইউরোপে ও নিউজিল্যান্ডের পাহাড়ে তাঁর নানান্ অভিযানের গল্প করেন। হেসে বলেন, কলকাতার অভিজ্ঞতাও আমার কম মজাদার নয়। সেখানে যখন পৌঁছুলাম তখন আমার অর্থের অনটন চলেছে। তাই হোটেলে না থেকে সেখানকার সেই ময়দানে দু'রাত্রি কাটাই। পুলিসের নজর এড়াতে সারারাত কম লুকোচুরি খেলতে হয়েছিল!

সরোজ বলে, এবার কলকাতায় গেলে আমার কাছে উঠো।

মার্এ বলেন, ঠিকানাটা নিয়ে রাখব।

পরের দিন ভোর হতেই সিল্ভেস্টার ও মার্এ কুন্ডে থেকে বেরিয়ে পড়েন। ডাক্তার বলে যান, সন্ধ্যার আগেই তাঁরা ফিরে আসবেন।

সিল্ভেস্টার তাঁর কাজকর্ম ফেলে এইভাবে মার্এর সঙ্গ নিলেন কেন তখন বুঝতে পারিনি। কারণটা জানলাম সেইদিনই কিছু পরে।

বেলা দশটা নাগাদ বব্ ম্যাক্এরে ও তাঁর স্ত্রী জোন্ কুন্ডে পৌঁছুলেন। এঁদেরই আসার কথা মার্এ আগের দিন বলেছিলেন। বব্ ইন্টারন্যাশানাল রেডক্রশ্-এ কাজ করেন। দু বছর নেপালে রয়েছেন। এইবার আফ্রিকায় বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন। তিনিও অতি উৎসাহী মাউন্টেনীয়ার, তাই হিমালয় ছাড়বার আগে কোন শিখর-অভিযান করে যাবেন বলে মার্এর সঙ্গে পূর্ব পরামর্শমত এখানে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর পাহাড়ে ওঠার সব সাজসরঞ্জাম। সরোজের কাছে মার্এর দুর্ঘটনার কথা শুনে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, ও-কুকুর কি আর ফেরত পাওয়া যায়? ও আবার না গেলেই পারত। কিন্তু তাকে আটকানোও মুশ্কিল। এখন ভালয় ভালয় দুজনে অক্ষত দেহে ফিরে এলে হয়!

সরোজ জানায়, সিল্ভেস্টারও তাকে বারণ করেছিল, কিন্তু সে শুনলে না, যাবেই বললে।

বব বলেন, পল্ তার সঙ্গে গিয়ে ভালই করেছে, সেও তো ওকে ভালভাবেই চেনে

সরোজ সপ্রশ্ন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বব্-এর দিকে তাকায়। মার্এর জীবনের এক করুণ অধ্যায় বব্ তখন আমাদের বলে।

মার্এর এক প্রণয়িণী ছিলেন। তিনিও মাউন্টেনীয়ার। তাঁদের বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত। এমনি সময়ে হিমালয়ের এক দুর্গম পর্বত-অভিযানদলে যোগদান করার সুযোগ আসে। তাঁরা সেই অভিযানে যাত্রাও করেন, কথা থাকে ফিরে এসেই বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। দুর্ভাগ্যের কথা, সেই অভিযান-পথে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় সেই মহিলার মৃত্যু ঘটে। সেই থেকে মার্এও কেমন যেন বদলে গেছে, মাঝে মাঝে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আচরণ করে বসে। সিল্ভেস্টার সেই কারনেই তার সঙ্গে গিয়েছে,—আবার কোথাও কোন হাঙ্গামা না বাধে।

সৌভাগ্যের বিষয়, পল্ ও মার্এ নিরাপদেই সেদিন সন্ধ্যার আগে ফিরে আসেন। সেই শেরপা দুজনকে তাঁরা দেখতে পাননি, কুকুরটারও সন্ধান মেলেনি। দোকানদারের কাছে সিল্ভেস্টার খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সেই ছোকরা দুটি তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, ও অঞ্চলের বাসিন্দাও নয়, অমন অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ করায় ওদিকে আর তাদের দেখাও যায়নি।

ডাক্তার তাকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের চোখের সুমুখে ঘটনাটা ঘটল, অথচ তোমরা কেউ তাদের মারধোরে কোনরকম বাধা দিলে না, এমন কি যখন এঁকে নীচে নদীর দিকে ঠেলে ফেলে দিলে তখনও চুপ করে রইলে,—এটা কী রকম ব্যাপার ?

সে তাতে শান্তভাবে উত্তর দিল, ব্যাপারটা তো ঘটেছিল তাদের সব অচেনা অজানা লোকেদের মধ্যে, তার ভেতর তারা কেউ নাক গলাতে যাবে কেন ?

সিল্ভেস্টার ঘটনাটি বলে মন্তব্য করেন, দেখছেন, এ-সব বিষয়ে শেরপাদের কি রকম অদ্ভুত নির্বিকার মনোবৃত্তি!

তবে শেরপাদের দেশে আমাদের থাকাকালীন এ ধরনের ঘটনা ঐ একটি মাত্রই শুনেছিলাম। নইলে শেরপারা অতি শান্ত, ভদ্র, হাসিখুশী, সঙ্গীপ্রিয় জাতি, অতিথিসেবা তাদের জাতিগত ধর্ম।

মার্এর কথাটা শেষ করি।

কুকুরটার সন্ধানে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেও মার্এ সে সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। অতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

পরের দিন সকালে তাঁরা যখন সাজগোজ করে অভিযানে রওনা হবেন, তখন কিন্তু তাঁর মুখ গম্ভীর যেন কী-এক ভাবনায় বিভোর। সরোজ তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার সময় উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে হালকা ভাবে বলে, পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখবে হয়ত তোমার কুকুরও সেখানে তোমারই খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মার্এর চোখ দুটি আশার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, আশ্চর্য নয়,—হিমালয় দিতে পারেন সব কিছুই!

তাঁরা যাত্রা করার পর সরোজ মন্তব্য করে, মার্একে তার কুকুরের দেখা পাওয়ার কথা বললাম কেন জানেন ? আমার মনে হয়, ওর নিজের বিশ্বাস, হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে তার মৃত প্রিয়ারও সাক্ষাৎ পাবে!

মার্এ তাঁর অভিযানের মধ্যে তাঁর প্রণয়িনীর বা কুকুরের সাক্ষাৎ পাননি নিশ্চয়, কিন্তু আমরা নেপাল থেকে ফিরে আসার পরের বছর সরোজ আমাকে জানায়, হিলারী গঙ্গাবক্ষে "Ocean to sky"—সাগর থেকে আকাশ—যে নৌ-অভিযান করছেন, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে 'মার্এ জোনস্" নাম দেখলাম,—কুন্ডের সেই মার্এই হবেন হয়ত।

আমাদের কুন্‌ডে-বাসের দিন ফুরিয়ে আসে। সরোজের কর্মক্ষেত্রে ফেরবার তাড়া থাকে। সিংয়াবোচি থেকে প্লেনে কাঠমাণ্ডু আসা সাব্যস্ত হয়। প্রথম দিন যাত্রীর ভিড়ে জায়গা মেলে না। বনিংটনের দলবলও প্লেন ধরার চেষ্টায় অপেক্ষা করেন। দ্বিতীয় দিনে আমাদের টিকিট পাওয়া যায়। অতি ছোট প্লেন। প্যালেটাস্ পোর্টার। ছয়জন মাত্র যাত্রী নেয়। আমরা দুজন ছাড়া, এক নেপালী অফিসার, এক জাপানী ট্যুরিস্ট, বনিংটন ও তাঁর এক সঙ্গী তাইতে ওঠেন।

প্লেনের পাইলট্ প্রৌঢ় সুইস্। হৃস্টপুষ্ট। হাস্যরসিক। প্লেনের পাশে দাঁড়িয়ে ধূমায়মান কফিভরা বড় মগে চুমুক দিতে দিতে বলেন, 'রি-ফুয়েল' করে নিচ্ছি!—পানশেষে প্লেনেও ওঠেন। স্টার্ট দেন। মাথা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের সতর্ক করান, ঠিক হয়ে সবাই বসুন—কোমরে ভাল করে বেল্ট বেঁধে। আমার একবার 'প্লেন্-ক্র্যাশ্' হয়,—যে ক'টি যাত্রী ছিল, সবাই মারা যান, আমি একাই কীভাবে বেঁচে যাই!

বনিংটন ঠিক তাঁর পিছনেই বসে। উত্তর দেন, তাতে আমরা ভয় পাই না ;—এভারেস্টের একেবারে কাছ দিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন?

পাইলট্ হেসে বলেন, নিশ্চয়। পায়ে হেঁটে কাছে গিয়েও বুঝি শখ মেটে নি?—দেখুন তবে এবার আকাশ থেকে।

চক্ষের পলকে বোঁ করে প্লেনের গতিবেগ ঘুরিয়ে দেন। বিদ্যুৎবেগে প্লেন এভারেস্টের নিকটে চক্র দিয়ে আবার আপন পথ ধরে। মূল শিখরের অনেকখানি অংশ নিকট থেকে ক্ষণিক দেখার পরম সৌভাগ্যলাভ করি।

আজ ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আকাশে একখণ্ডও মেঘ নেই। সেই স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ অসীম নীল সাগরে যেন হংসশুভ্র পাল তুলে তুষারশিখর তরণীগুলি নিশ্চল হয়ে ভেসে থাকে।

পাইলট্ সগর্বে গল্প শোনান, একবার প্লেন নিয়ে এভারেস্টের ওপর ৩১,০০০ ফুট্ উঁচুতে ঘুরেছিলাম,—সঙ্গে ছিলেন দুজন জাপানী। প্লেনের চেয়ারগুলি খুলে রাখা হয়েছিল। জাপানী দুজন মেঝেতে শরীর বেঁধে শুয়ে থাকেন। প্লেনের খোলা অংশ দিয়ে ফটো তুলে যান,—অবশ্য প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কষ্টভোগও তাঁদের হয়েছিল খুব। অক্সিজেনও ব্যবহার করতে হয়েছিল।

বনিংটন উৎসুক হয়ে তাঁদের ঠিকানা জানতে চান, বলেন, সে ছবিগুলি যে করে হয় দেখতে হবে। পাইলটেরও উৎসাহ জাগে, বলেন, আপনাদেরও হিমালয়ের শিখরগুলি ভাল করে দেখিয়ে দিচ্ছি,—আকাশ আজ বড় পরিষ্কার। —বলে চলন্ত প্লেনটাকে কখনো সোজা রেখে, কখনো কাত করে, কখনো বা দু'পাশের পাখা দুটি উঁচু-নীচু করে—চূড়াগুলির আবরণমুক্ত দৃশ্য দেখান, একের পর এক নাম বলে যান,—ঐ হিমলচুলি, ঐ মানসলু, ওটা গৌরীশঙ্কর,

ওধারে ঐ দূরে অন্নপূর্ণা,—ডাইনে ওদিকে দেখুন—ও পাহাড়গুলি তিব্বতে—ঐ মিররূপিকু......

বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকি, বিশ্ববিধাতার বিরাট সৃষ্টি, ভুবনমোহিনী অরূপ মূর্তি। এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই, ভুলে যাই আমি দেহধারী নগণ্য জাগতিক জীব। এ যেন কোন্ অনন্ত স্বপ্নসাগরে দেহাতীত শুধু এক আনন্দচেতনা অনাদি কাল ধরে ভেসে চলে,—যুগ থেকে যুগান্তরে!

অথচ কতোটুকুই বা সময় যায়? এক ঘণ্টাও লাগে না, বায়ুযান কাঠমাণ্ডু পৌঁছায়।

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলে, এরই মধ্যে যাত্রা শেষ! কথা রইল, আসছে বছর আপনার সঙ্গে গাড়োয়ালে যাবই।

পর বৎসর সে যায়ও তাই।

গোসাঁইকুণ্ড

গোসাঁইকুণ্ড নামটি প্রথম শুনি চল্লিশ বছর আগে। সেই আমার প্রথম নেপাল যাওয়াও ;—১৯৩২ সালে। তখন বুঝতাম, নেপাল মানেই কাঠমাণ্ডু। এ-ধারণা এখনও হয়ত কারো কারো আছে।

কাঠমাণ্ডু যাওয়াও পশুপতিনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে।

সে-সময়ে কাঠমাণ্ডুর কলেজে কয়েকজন বাঙালী অধ্যাপক ছিলেন। হিমালয়ে তাঁদের বাস, তাই হিমালয়ের প্রতি ভালবাসাও। তাঁদের অগ্রণী ছিলেন সুধীরবাবু। তিনিই উৎসাহ জাগান, নেপাল-হিমালয় দেখলেন কই ? প্রকৃত পরিচয় করতে চান, তো চলে যান অন্ততঃ গোসাঁইকুণ্ডে। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই ঘুরে আসতে পারবেন। এমন কিছু দূর দেশ নয়। তবে, হাঁ,—দুর্গমতা আছে ;—হিমালয়ের পথে সেটা আর আশ্চর্য কি বলুন ? কাঠমাণ্ডু ৪,৪২৩ ফুট্ উঁচুতে—নামেই। দেখছেনই ;—প্রকাণ্ড ভ্যালি। চারিদিকে দূরে দূরে পাহাড়। লোকে বলে, এখানে বিশাল হ্রদ ছিল, পরে শুকিয়ে যায়। আপনারা এলেন দক্ষিণ থেকে,—মহাভারতলেখ্ বা রেঞ্জ ডিঙিয়ে, শিশাগর্হি আর চন্দনগর্হি পার হয়ে। আবার কাঠমাণ্ডুর উত্তর অঞ্চলে যে বিরাট পাহাড়ের সারি, তারই মধ্যে লাংটং হিমল রেঞ্জ। ওখানকার বরফের পাহাড় এখান থেকেও দেখা যায়। তারই দক্ষিণ কোলে গোসাঁইকুণ্ডের পাহাড়। চোদ্দ-পনেরো হাজার ফুট্ উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া। গোসাঁই-কুণ্ডের নাম শোনেন নি আপনারা, তবে গোসাঁইথান শিখরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়,—২৬,২৯১ ফুট্ উঁচু,—সে হোল আরও উত্তরে, তিব্বতের মধ্যে। গোসাঁইকুণ্ডে পেঁছে দেখবেন, বরফের পাহাড়ে ঘেরা অপূর্ব হ্রদ। একটা নয়, সারি সারি কয়েকটাই। হ্রদের পর হ্রদের সোপান বেয়ে ত্রিশূলীনদীর এক ধারা নেমে আসে। দেখে আসুন। অদ্ভুত জায়গা। আনন্দ পাবেন।

কথা শুনে আমারও মন মাতে। যাওয়ার সংকল্প করি। কিন্তু, ইচ্ছা হলেই তো সব ইচ্ছার পূরণ হয় না। বছরের পর বছর যায়। কতোবার যাওয়ার আয়োজনও করি। তবুও, যাওয়া ঘটে না। দু'একজন উৎসাহী বন্ধুবান্ধব আমারই মুখে গল্প শুনে ঘুরেও আসেন। আমি শুধু আশা নিয়েই বসে থাকি। নেপালেও যে তার মধ্যে ঘুরতে যাই না, এমনও নয়। সেখানকার দুর্গমতর স্থানও দেখা হয়। তবু, গোসাঁইকুণ্ড অদেখাই থেকে যায়। ভাবি, এ-যেন আমার আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখা !

দু'বছর আগেকার কথা। হঠাৎ-ই ঠিক করি, আর নয়, এবার ঘুরে আসতেই হবে। নাই বা হোল যাওয়ার কোনও পূর্ব-আয়োজন। পথে

বেরিয়ে তো পড়ি। যাব হিমালয়ে, সে তো আমার আপন দেশ। মনে পড়ে যায়, মায়ের কথা।

গ্রীষ্মকাল। পুরীতে তিনি নিঃসঙ্গ দিন কাটান। মনভরা আনন্দ নিয়ে থাকেন। বলেন, জগন্নাথদেব রয়েছেন, একা আবার কই!—খবর না দিয়েই হঠাৎ হাজির হই। সমুদ্রের ধারেই বাড়ি। খিড়কির দরজা দিয়ে পিছনের উঠানে ঢুকে ডাক দিই,—'মা'!

উত্তর আসে না। ঠাকুরঘরে পূজায় বসেছেন। বারান্দায় উঠে দোর-গোড়ায় দাঁড়াই। সেখান থেকেই প্রণাম করি। নিমীলিত চক্ষু অল্প খুলে তাকান। আবার তখনি বোজেন। শান্ত একাগ্র হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে মধুমাখা ঈষৎ হাসির ইঙ্গিত। সারা মুখমণ্ডলে মাতৃস্নেহের অপূর্ব এক দীপ্তি। নিঃশব্দ, নির্বাক। তবুও, সারা পূজাগৃহে যেন অস্ফুট গুঞ্জরণ তোলে, এলি বাবা! আয়।

আমার হিমালয় যাত্রাও তেমনি। যেন, মাতৃগৃহে ফেরা। চারিদিকের তরুলতা, বনের পাখি, ঝরণার ধারা, পাহাড়-পর্বত, আঁকাবাঁকা পথের রেখা, সাদা মেঘ, সুনীল আকাশ,—নীরব ভাষায় যেন সাদর আহ্বান জানায়,—এলি বাবা! আয়, আয়।

কাঠমাণ্ডু যাওয়া এখন কতো সহজ। চলে যাই পাটনায়। সেখান থেকে প্লেন ধরব। আমার কুয়ারি গিরিপথের তরুণ সহযাত্রী শেষকিরণের কানে যাত্রার খবরটা পেঁছে যায়। সে তখন বিহারেরই এক জায়গায় চাকরি করে। দেখি, মূর্তিমান পাটনা স্টেশনে হাজির। খুশিভরা মুখে জানায়, চলে এলাম সঙ্গে যাব বলে,—নেপাল যে এখনও আমার দেখাই হয় নি!

ভাবি, চলেছিলাম একা,—যেমন যাই। সে-যাওয়ার এক অপরূপ স্বাদ। গভীর আনন্দ। নির্জন গহন বনপথে আপন-মনে বয়ে-যাওয়া পাহাড়ী ঝরণার মতন।

কিন্তু, স-সঙ্গী যাত্রার সুবিধাও থাকে। পথের ব্যবস্থাদির ভার সঙ্গী সানন্দেই বয়। আমার শুধু নিশ্চিন্ত মনে পথ চলার আনন্দ সঞ্চয়।

তাই, শেষকিরণকে দেখে মন স্বস্তিও পায়।

ভাবি, অলক্ষ্যে বসে কে আমার হিমালয়-পথের সুখ-সুবিধার এমন সুরাহা করেন, কি জানি।

পরদিন সকালে পেঁছে যাই কাঠমাণ্ডুতে। পাটনা থেকে আকাশ-পথে আসতে মাত্র মিনিট চল্লিশ লাগে! আরব্য-উপন্যাসের কার্পেটে বসে উড়ে আসারই মতন।

কাঠমাণ্ডু আমার কয়েকবারই দেখা। তাই শহরে অযথা সময় কাটানোর সার্থকতা নেই। শেষকিরণকে জানাই, গোঁসাইকুণ্ড থেকে ফিরে এসে তুমি কাঠমাণ্ডু দেখো ধীরেসুস্থে। এখন চল, পথঘাটের খবর নিই, অবিলম্বে

যাত্রার আয়োজন করা যাক্‌।

সেই উদ্দেশ্যে দুজনে তখনি ধর্মশালা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথায় এ-বিষয়ে সঠিক খবর ও সাহায্য পাব, তা জানা আছে। কাঠমাণ্ডুর এক উপান্তে প্রসিদ্ধ বোধনাথ স্তূপ। বৌদ্ধতীর্থ। সেখানকার প্রধান লামা, নাম তাঁর চীনীয়া লামা বা চীনী লামা। তাঁর পূর্বপুরুষ,—পিতামহই বোধ হয়,—চীনদেশ দেশ থেকে নেপালে আসেন, তাই এই নামকরণ। গোসাইকুণ্ডের পথের এক জায়গা থেকে কয়েক মাইল বেঁকে গেলে নেপালের হেল্‌মু বা হেলম্বু অঞ্চল। সেইখানে প্রথমে এসে তাঁরা বসবাস শুরু করেন। সেখানকার জমিদার বা ছোটখাটো রাজার মতনই তাঁদের প্রতিষ্ঠা হয়। এখনও সেইখানে—মালেম্‌চি গ্রামে—চীনী লামার ঘরবাড়ি, বিরাট সম্পত্তি। আত্মীয়স্বজন, পরিবারবর্গও সেইখানে থাকেন। চীনী লামাও বোধনাথ থেকে যাতায়াত রাখেন।

হেল্‌মু অঞ্চলের আর এক বিশেষত্বও আছে। হেল্‌মুবাসীরা এক সম্প্রদায়ের শের্‌পা উপজাতি বলে প্রচার। শেরপাদের প্রধান বাসকেন্দ্র—সোলো খুম্বু। নেপালের নামচেবাজার-থিয়াংবোচি অঞ্চলে। এভারেস্ট গিরিশ্রেণীর পাদদেশে। হেলমু থেকে বহুদূরে। তাই, এই দুই ভিন্ন অঞ্চলেব শের্‌পাদের মধ্যে আচার-ব্যবহারে, আকৃতি-প্রকৃতিতে, এমন কি ভাষাগত পার্থক্য থাকে। কিন্তু, উভয় অঞ্চলেরই বাসিন্দাদের ধর্মভিত্তি একই,—সকলেই তিব্বতী প্রাচীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। উভয় সম্প্রদায়েরই পূর্বপুরুষরা নেপালের বাইরে তিব্বত অঞ্চল থেকে এদেশে আসেন। অতএব, জাতি হিসাবে পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্কের যোগসূত্র আছে, এই এদের বিশ্বাস। বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধও কখনও কখনও গড়ে ওঠে। যদিও, সোলো-খুম্বুর শেরপারাই উচ্চতব বা কুলীন শেরপা বলে প্রসিদ্ধ। সোলো-খুম্বু আমার আগেই দেখে আসা। তাই, হেলমুর শেরপা গ্রামও দেখবার কৌতূহল থাকে।

১৯২৯ সালে তিব্বত যাওয়ার পথে রাহুল সংকৃত্যায়ন ছদ্মবেশে এই হেলমু অঞ্চলে কয়েকদিন কাটান। তাঁর বিবরণও এ দেশ দেখবার আগ্রহ জাগায়।

সেই চীনী লামার কাছেই এখন চলি পথঘাটের খবর জানতে।

বোধনাথের বিরাট স্তূপ ঘিরে চারিপাশে ঘরবাড়ি। চীনী লামা এই তীর্থক্ষেত্রের মোহন্তস্থানীয়। তাই, তাঁর আবাসগৃহের চাকচিক্য আছে। দ্বারদেশে মোটর গাড়িও দাঁড়িয়ে। বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই সুপরিচিত তিব্বতী আবহাওয়ার গন্ধ পাই। মাখন, ঘি, ছাং, ধূপ—এদেরই সংমিশ্রণে বিচিত্র এক গন্ধ। খবর নিয়ে দোতলার গিয়ে উঠি। বারান্দার কোলে বসবার লম্বা ঘর। তিব্বতী টঙ্কা, ছবি টাঙানো। তিব্বতী রঙ্‌চঙে কার্পেট পাতা। আবার আধুনিক সোফা, চেয়ার টেবিলও আছে।

চীনী লামা খবর পেয়ে বেরিয়ে আসেন। ফরসা, গোলগাল চেহারা। বয়স হলেও সবল কর্মক্ষম দেহ। দাড়ি গোঁফ মাথা কামানো। চোখে চশমা।

হাসিখুশী চাহনি দেখে আশ্বস্ত হই। হলুদ রঙের সিল্কের তিব্বতী ঝলমলে আলখাল্লা পবনে। মাথা নত করে অভিবাদন জানাই। আমাদের আসবার কারণও বলি। যাত্রার অভিলাষ জেনে প্রকৃতই খুশী হন। ইংরেজি ও হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু হলেও বাঙলাদেশে বাড়ি জানামাত্রই বাঙলায় কথা বলে অবাক করে দেন। বলেন, শান্তিনিকেতনে কিছুকাল ছিলাম যে!

মাতৃভাষার আশ্চর্য প্রভাব। অপরিচয়ের অন্তরাল তখনি সহসা যেন সরে যায়।

শেষকিরণের বাড়ি বোলপুরে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। উল্লসিত হয়ে সে-খবর সে তখনি শুনিয়ে দেয়। চীনী লামারও উৎসাহ জাগে। সাগ্রহে জানতে চান, কবি তো চলে গেছেন,—জগদানন্দবাবু, ক্ষিতিবাবু এঁরা সব কেমন আছেন?

যাঁদেরই নাম করেন, সবাই এখন গতাসু। তখনি বোঝা যায়, শেষকিরণের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর এক যুগের ব্যবধান!

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, আপনার বয়স হোল কত? কোন্ কালের সব খবর নিচ্ছেন?

তিনি হেসে বলেন, তা' বটে! দূরে থাকলে, এমনিই মনে হয়, সবই বুঝি তেমনিই আছে!

তখন জানতে পারি, বয়স তাঁর তিরাশী। বলেন, এইবার দেহ ভাঙতে শুরু করেছে। মালেমচি যাতায়াতে অসুবিধে বোধ করি। আপনারা মালেমচিও যাবেন, খুব ভাল কথা। আমার ছেলে এখন সেখানে। দেখা হবে। যাওয়ার ব্যবস্থা সবই করে দিচ্ছি। কবে যাত্রা করবেন, বলুন। আজই তো কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছুলেন?

তখনি বলি, কাল যদি সব ব্যবস্থা হয়ে যায়, পরশু ভোরেই যাত্রা করতে চাই। সুন্দরীজলের দিক দিয়ে পাহাড়ে উঠব, তারপর মালেমচি ও গোসাঁইকুণ্ড দেখে অপর দিকে ত্রিশূলীবাজার হয়ে নামব।

ব্যবস্থাও সেইমতই হয়। লামাজি বলেন, আজই মালেমচি থেকে আমার লোক আসছে, তাদের মধ্যে থেকে হুঁশিয়ার দুজনকে দেব, সঙ্গে গিয়ে ঘুরিয়ে আনবে। মালপত্রও বয়ে নিয়ে যাবে। চান তো, সাধারণ ডালভাতও করে দেবে। বাসনপত্র সঙ্গে নেই জেনে বলেন, তার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। আমার এখান থেকেই, যা দরকার, দিয়ে দেব, ওদেরই সঙ্গে ফেরত আসবে। চাল, ডাল, আটা, ঘি, কিছু সবজি মশলা কিনে প্যাক করে নেবেন। অযথা মালপত্র বাড়াবেন না যেন। মালেমচি পর্যন্ত পথে গ্রাম পাবেন, তারপর গোসাঁইকুণ্ড পর্যন্ত আর লোকালয় নেই। গ্রামে আলু ছাড়া আর কোন কিছু পাওয়ার আশা রাখবেন না। চায়ের সরঞ্জামটা একটু বেশি করেই রাখবেন, শীতের দেশ তো, সঙ্গে লোক দুটোও থাকবে।

হঠাৎ মনে পড়ে, ওদিকে ত্রিশূলীবাজারের পথে পাহাড় থেকে নামবার সময় আমার কয়েকটি বন্ধু একবার গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে যথেষ্ট হয়রানি

ভোগ করেন। তাঁদের সঙ্গে যে পোর্টার ও গাইড্ ছিল, ওদিকের পথ তাদের জানা ছিল না। লামাজিকে সে-কথা বলি। তিনি আশ্বাস দেন, পথ চেনে এমন লোকই দেব। পরশু তো এই বোধনাথ হয়েই আপনাদের সুন্দরীজল যাবার রাস্তা। সেই পর্যন্তই জীপ্ যাবে। ভোরেই চলে আসবেন। লোক আপনার এখানে তৈরি থাকবে, জীপ্-এ বসিয়ে নেবেন।

পরের দিন শেষকিরণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে। সব কিছু পরিপাটি প্যাক করে রাখে। ট্যুরিস্ট দপ্তরে গিয়ে খোঁজও নেয়, গোঁসাইকুন্ড যেতে ভারতীয়দের কোন অনুমতিপত্রের আবশ্যকতা আছে কিনা। ফিরে এসে বলে, অফিসার বললেন, কোনই প্রয়োজন নেই। চীনী লামাও সেই কথাই বলেছিলেন, তবুও একবার জেনে এলাম।

সন্ধ্যায় দুজনে নিশ্চিন্ত মনে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। কাল যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত। মনভরা আনন্দ। সারি সারি দোকানে সাজানো নানারকম বিদেশী জিনিসপত্রের উজ্জ্বল সম্ভার। শেষকিরণ মুগ্ধ ও লোলুপ দৃষ্টি ফেলে তাকায়। বলে, আমাদের দেশে এ-সব জিনিস আর পাবারই উপায় নেই,—কালোবাজার ছাড়া। শুনি, এখান থেকে নাকি কেউ কেউ লুকিয়ে নিয়ে যায়।

বলি, চলেছ গোসাঁইকুণ্ডে, এখন ও-সব চিন্তা মনেও এনো না, শুধু সেই হিমালয়ের পথের কথাই ভাবো।

রাত্রে শুয়ে তাই-ই দুজনে ভাবি। কখন ঘুমিয়েও পড়ি। হঠাৎ একসময়ে ঘুম ভাঙে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঘরের ছাদে, দরজা জানালায় চারিদিকে জলধারার উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য। শেষকিরণও জেগে। বলে, শুনছেন জলের শব্দ? ভোরে থামবে তো?

বলি, না থামলেও ক্ষতি নেই, শুধু জীপ্ ট্যাক্সিটা ঠিকমত এলেই হয়।

বৃষ্টি থামে না। তবুও, জীপ্ সময়মতই আসে। তখনও ভোরের আলো ফোটে নি। ঘনঘটা অন্ধকার। একটানা বৃষ্টিপাতের নির্মম ঝমঝম্ ধ্বনি। ভাবি, যাত্রার প্রারম্ভেই এ-যেন পার্বত্য-প্রকৃতির দপ্তরে অভিযাত্রীর মনোবলের পরীক্ষা-গ্রহণের ঘণ্টার সঙ্কেত!

বর্ষাতি গায়ে দুজনে বৃষ্টির কশাঘাতের সম্মুখীন হই। জীপ-এর মধ্যে মালপত্র রেখে উঠে বসি। ভয় নয়, ভাবনা নয়, মনে কোন বিরক্তি ভাবও নয়। দুজনেরই হৃদয়ভরা অসীম আনন্দ। উদ্বেল উৎসাহ। হিমালয়ের যাত্রাপথের এ সব তুচ্ছ বাধা-বিঘ্ন? সে তো থাকেই। গোলাপ তুলতে কাঁটা বেঁধে, পদ্ম তুলতে কাদা লাগে। বিশ্বাস রাখি, মেঘ আসে, আবার কাটেও। আঁধারের বুক চিরেই তো আলোর খেলা!

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সাল। ৫-১০-এ যাত্রা শুরু। বোধনাথের পথ খানিকটা ভাঙাচোরা।। তায় বৃষ্টিবাদল। তাই মাল চারেক মাত্র দূর হলেও পৌঁছুতে আধঘণ্টা লাগে।

শেষকিরণ সহর্ষে জানায়, বৃষ্টি কমে এসেছে, আকাশের ঐ কোণে আলো।

ফুটছে দেখছেন ?

বোধনাথে পোর্টার দুজন তাদের মালপত্র নিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু চীনী লামার কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি চা না খাইয়ে ছাড়েন না। বলেন, যাত্রা তো শুরু হয়েছেই, পথের প্রথম চা-পর্ব আমার কাছেই হোক্।

৬-৩০শে আবার জীপ্-এ ওঠা।

বৃষ্টি থামে। সকালের আলো ফোটে। প্রকৃতি দেবী যেন প্রাতঃস্নান সেরে কষায় বস্ত্র ধারণ করেন, স্মিত বদনে আশিস্ জানান।

জীপ্ ছুটে চলে। বোধনাথ ছাড়িয়ে গোকর্ণ, তারপর সুন্দরীজল। ৭-১৫তে পৌঁছে যাই। শহর থেকে মাত্র আট-ন'মাইল পথ। সুন্দরীজল প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। কাঠমাণ্ডুর সমতল উপত্যকা এইদিকে এখানেই শেষ হয়। সুমুখেই হিমালয়ের শিউরী গিরিশ্রেণী। পথের পাশেই বাগমতী নদী। পর্বতকারা থেকে মুক্তি পেয়ে সমতলে নামে। পাহাড়ের কিছু উপরে নদীর জলপথের গতিরোধ করে জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে। কাঠমাণ্ডু শহরের জলসরবরাহের ব্যবস্থা। পুরানো Hydro-electric power house-3।

পাহাড়ের নীচেই লোকবসতি। জীপ্ ছেড়ে এতক্ষণে পায়ে হাঁটা পথ আরম্ভ। মাটিতে পা ফেলতেই মন আনন্দে মেতে ওঠে। চড়াই শুরু হবার মুখেই দোকান। সকলে মিলে একসঙ্গে আবার চা-পান করি।

শেষকিরণ পোর্টারদের সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়ে হতাশ হয়। ভাষার অন্তরায়। হিন্দী মোটেই বোঝে না। নির্ভেজাল পাড়াগেঁয়ে। সরল প্রকৃতি। ছোট ছেলের মতো মুখে অকারণ হাসি। সবল স্বাস্থ্য, কিন্তু অতি দরিদ্র। খালি পা। ছেঁড়া ময়লা পায়জামা। শতচ্ছিন্ন সার্ট। একটা মোটা চটের থলিতে মালপত্র পুরে পিঠে বেঁধে যাবার জন্যে তৈরি হয়। ৭-৩০শে ধীরে ধীরে চড়াই পথে সবাই উঠতে থাকি। পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর সাজানো সোপানশ্রেণী। পাশেই জলের মোটা পাইপ্। নদীর নৃত্যপরা জলধারা। নিম্নগতি বেগবতী বাগমতী। কলোচ্ছ্বাসে নেমে চলে। কিছুদূর চড়াই উঠে পথের পাশে ঝরণা। আরও এগিয়ে এসে Reservoir--জলাশয়। ছোট পুল পার হয়ে আবার চড়াই। অনেকখান উঠে এসে পাহাড়ের ঢালু গায়ে ছোট গ্রাম। মূল খড়ক। ৬,৫৫০ ফুট্। তিন মাইল মাত্র আসা হোল। বেলা ৯-৪০। পথের পাশে একটা চালাঘর। পোর্টাররা মাল নামিয়ে ঘরের দাওয়ায় রান্নার আয়োজন করে। পথের অপর দিকে সমতল বড় একটা পাথর, তার-পরই নেমে যায় পাহাড়ের ঢালু গা। সেই শিলাখণ্ডের উপর আমরা দুজনে জামা জুতো খুলে বিশ্রাম নিই। যেন বিশাল উঁচু প্রাসাদের মাথার উপর বারান্দায় বসে আছি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, পোর্টার দুজন মুখ বুজে কলের মত কাজ করে চলে। জল আনে, কাঠ আনে, উনুন ধরায়, রান্না চড়ায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাবারও তৈরি। ভাত ও একটা সব্জি। খেতে বসেছি পথের পাশে সেই পাথরেরই উপর। পাহাড়ের বাঁক বেঁকে এক বিদেশী যাত্রী উপর দিক থেকে নেমে আসে দেখি। বছর ২২/২৩ বয়স। কাঁদিনের না-

কামানো অল্প দাড়িগোঁফ। রোদে পোড়া তামাটে রঙ্। দেহের লম্বা গড়ন। পরনে হাফ প্যান্ট, সার্ট। পিঠে রুক্স্যাক্। শেষকিরণ হেসে অভিবাদন করে। সেও হাসিমুখে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, নীচে থেকে এলেন বুঝি? সুন্দরীজলে কাঠমাণ্ডুর কোন জীপ্ পাব নাকি?

শেষকিরণ বলে, আমাদের জীপ্‌টা সকালেই ফিরে গেছে। আর জীপ্ এসেছে কিনা জানা নেই। আপনি আসছেন কোথা থেকে? ভোরে বেরিয়েছেন নিশ্চয়? খাওয়াদাওয়াও হয় নি? বসে পড়ুন আমাদের সঙ্গে। যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাক্।

হাসিমুখে তখনি সে নিঃসঙ্কোচে আমাদের সঙ্গে আহারে যোগদান করে।

ছেলেটির ফ্রান্স-এ বাড়ি। সবে পড়াশুনা শেষ করেছে। হিমালয় দেখবার অনেক কালের ইচ্ছা। হেলেমু ঘুরে এখন কাঠমাণ্ডুতে ফিরছে। না,— গোসাঁইকুণ্ড যায় নি। অনুমতিপত্র ছিল না। দু সপ্তাহ এ অঞ্চলে ঘুরেছে। একাই। আনন্দ পেয়েছে প্রচুর। আবার সুযোগ পেলেই হিমালয়ে আসবেই।

আহারশেষে আর অপেক্ষা করে না। বলে, জীপ্-এর সন্ধান নিচ্ছিলাম বটে, পাই ভাল, না পেলেও অসুবিধে সেই, হেঁটেই কাঠমাণ্ডু চলে যাব, সন্ধ্যের মধ্যেই পৌঁছেও যাব।—পিঠে রুক্স্যাক্ বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। করমর্দন করে, ধন্যবাদ জানায়, আবার হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের নিম্নগামী পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়।

শেষকিরণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। অস্ফুটে বলে, কেমন চমৎকার চলেছে! যেন, পাহাড়েরই একঝলক হাওয়া!

আমি ভাবি, পথের এই-ই মায়ার খেলা। চেনা পরিচয় নেই। কোন্ সুদূরের বিদেশী। হঠাৎ দেখা। সামান্য খাবার,—তাই একই সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া। প্রাণখুলে দুটো কথা বলা। আবার তখনি ছাড়াছাড়ি। যে যার পথে নামা। ক্ষণিকের দেখা, তবু অক্ষয় স্মৃতি রেখে যাওয়া।

আমরাও আবার যাত্রা করি ১১-৩০শে।

আবার চড়াই। পাহাড়ের মাথার দিকে উঠে চলা। ঘন বনময় পথ। মাইল দুই যাবার পর ছোট গ্রাম। যে পাহাড়ের গা বেয়ে চলি, তার এইদিকের শেষ গ্রাম। গ্রাম ছাড়িয়ে আবার চড়াই। বনের স্নিগ্ধ ছায়াও। পাহাড়ের কাঁধ ডিঙিয়ে এবার অপর দিকে নামা। মনে হয়, হাজার নয়েক ফুটেরও উপর দিয়ে আসা। ঘণ্টাখানেক নামার পর পাহাড়ের অপর দিকে বনলুঙ্ভঞ্জন গ্রাম। প্রায় ৮০০০ ফুট উঁচু। পথ নেমেই চলে। দূরে আকাশের গায়ে বরফের চূড়া মাথা তুলে থাকে। গণেশহিমল, হিমলচুলি, নাংটংহিমল। চব্বিশ পঁচিশ হাজার ফুট উঁচু সব চূড়া। আরও চার-পাঁচশ' ফুট উৎরাই-এর পর আবার গ্রাম। পাহাড়ের কাঁধের উপর দিয়ে এগিয়ে উন্মুক্ত সমতলভূমি। ক্রমে নীচে পাতিভঞ্জন গ্রাম দেখা দেয়। আরও মাইল খানেক নেমে গ্রামে প্রবেশ করি। প্রায় ৬,৫০০ ফুট্। ৪-৩০শে পৌঁছে যাই। আজ এইখানেই রাত কাটানো। সুন্দরীজল থেকে মাইল দশেক আসা হোল।

পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই গ্রাম শুরু। ডানদিকে পথ থেকে সামান্য দূরে প্রথম যে বাড়িখানি, দেখেই চোখে ধরে। ছিমছাম দোতলা পাকা বাড়ি। আশপাশে খোলা জমি। কয়েকটা বড় বড় গাছের ছায়া। অদূরেই ঝরণা। ভাবি, এখানে আশ্রয় মেলে না ?

শেষকিরণ খবর নিতে এগিয়ে যাবে এমনি সময়ে এক পাহাড়ী যুবক বাড়ির দিক থেকে আসে। নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় চলেছি ? রাত কাটাতে চাই তো এখানেই থাকতে পারি।

বাড়িটি মন্দির। পুজারী সপরিবার বাস করেন। ছেলেটির পরনে প্যাণ্ট, বুশ সার্ট। দেখতে চালাকচতুর। মিষ্টভাষী। পোর্টারদের ডেকে নিয়ে একতলার বারান্দায় মালপত্র তখনি রাখিয়ে দেয়। আমাদের বলে, ওপরের ঘরে আরামে আপনারা থাকতে পারেন, নীচের এ-বারান্দার একদিক খোলা, রাত্রে শীত লাগবে।

আমরা জানাই, এখানে আমাদের কোনই অসুবিধে হবে না।

নিশ্চিন্ত আরামে মালপত্র খুলে বসি। শেষকিরণ বলে, আসবার সময় গাছতলায় দেখলাম, বিদেশী ভাল রুকস্যাক, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বাধা—একটু দূরে একটা সাহেবকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম,—খোঁজ নিয়ে আসি কোথায় ঘুরে এল।

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরায় যার আনন্দ, অপর কাউকে সেইভাবে ঘুরতে দেখলেই আলাপ জমাবার আগ্রহ।

একটু পরে ফিরে আসে। অস্বাভাবিক উত্তেজনা নিয়ে। বলে, এমন মনোমত রাত কাটাবার জায়গা পেয়ে বেশ আরামে গুছিয়ে বসেছেন, কিন্তু খবর যা শুনে এলাম. ভাবনার কথা। এখানে থাকবেন কিনা ঠিক করুন—এখনও বেলা আছে, অন্য জায়গা সন্ধান করলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

ঘটনাটা যা জানায়, শুনে স্তম্ভিত হই। আমাদের সভ্য সমাজের শহরে ব্যাপারটা ঘটলে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না, কিন্তু হিমালয়ের এই নিভৃত অঞ্চলে পাহাড়ীদের মধ্যে ঘটনাটা ঘটা অতীব বিচিত্র।

সাহেবটি আমেরিকান। হেলমু ঘুরে ফিরছে। শেষকিরণের সঙ্গে আলাপ হতে সঙ্কোচভরেই তাকে জানায়, আপনারা ঐ বাড়িতে উঠেছেন, একটা বিষয়ে সাবধান করিয়ে দিই। জানানো উচিত বলে বলছি। ওপরে যাবার সময় আমিও ওখানে রাত কাটাই। ঐ ছেলেটাই আগ্রহ করে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দেয়। জায়গাটা পরিষ্কার। ছেলেটির কথাবার্তা ব্যবহারও ভাল। সাহায্য করতেও উন্মুখ। আপনারা যে বারান্দায় উঠেছেন, আমিও সেইখানেই রাত কাটাই,—যদিও ওপরে গিয়ে থাকবার জন্যে বার বার সে পীড়াপীড়ি করেছিল। ভোরে উঠে আবার যাত্রা করতে তৈরি হল, মালপত্র গোছাতে গিয়ে দেখি, আমার জ্যাকেট্টা অদৃশ্য। জিনিস তো আমার সামান্যই, যা কিছু এই রুকস্যাকে। খুঁজব আর কোথায় ? উধাও হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি ! ছেলেটাকে ডেকে বলি। সে আশ্চর্য হবার ভান করে। আমার সন্দেহ হয়। সে বলে,

তোমাকে বললাম ওপরে গিয়ে শুতে। তুমি তবুও থাকলে খোলা বারান্দায়। রাত্রে বাইরের লোক কে নিয়ে গেছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। আমি কি করব ?

পাহাড়ে ঘুরতে আমার ঐ একটিমাত্র জ্যাকেটই সম্বল। তাই, অভদ্র ভাবেই তাকে বলতে হয়, তোমাদের ঘর দেখব, চল। প্রথমে যেতে দেয় না। আমি জোর করি, ঢুকিও এবং ওপরের ঘরে গিয়ে দেখি, আমার জ্যাকেট লুকিয়ে রাখা! আর, 'সিন' কিছু করি নি, ওকেও কিছু বলি নি। জামাটা তুলে নিয়ে চলে যাই। এখন দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, সাবধানে থাকবেন।

হিমালয় পথের এক পরম শান্তি জিনিসপত্র, এমন কি টাকাকড়িও বাইরে খোলা পড়ে থাকলেও হারানোর ভয়ভাবনা থাকে না। আজ খবরটা আমাদের দুর্ভাবনা জাগায়। তবুও ঐখানেই রাত কাটানো স্থির করি। যথাসম্ভব সাবধানেও থাকি। তবে মনে অস্বস্তি থাকে।

ছোকরাটির সঙ্গে পরে আলাপ করে জানি, শহরে গিয়ে কিছু লেখাপড়া শেখে, ভারতের কয়েকটা বড় শহরেও ঘুরে গেছে, কিছুকাল চাকরিও করেছে, এখন আবার নিজের গ্রামে ফিরেছে। কিন্তু, কী বিষময় শিক্ষা নিয়ে হিমালয়ের এই শান্তিরাজ্যে অশান্তির বীজ বপন করছে, ভাবতেও দুঃখ জাগে।

রাত্রে বৃষ্টি নামে, শীতও বাড়ে। তবুও সজাগ হয়ে রাত কাটাই।

সকালে উঠে আবার তৈরি। ৬টা ২০-তে যাত্রা শুরু। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

পাতিভঞ্জন থেকে দুদিকে দুটা পথ যায়। একটা রাস্তা পাহাড়ের উপরদিকে উঠে চলে সোজা গোসাঁইকুণ্ডের অভিমুখে। সেই পথই আমরা ধরি। আগামী কাল ঐ পথে সাঁওনে মুনির নিকটে পৌঁছে গেলেম, অঞ্চলের মালেমচি গ্রামে আমাদের নামবার কথা। অপর পথটি পাতিভঞ্জন থেকে কিছুদূর গিয়ে তারাং-মারাং খোলার নদীপথ ধরে নামতে থাকে, ইন্দ্রাবতী নদীর তীরে আসে, পরে হেলমুর ঐ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে ঐ মালেমচিতে এসে ওঠে।

পাতিভঞ্জন ছাড়িয়ে খানিক সমতল পথ। তারপর আবার চড়াই। বৃষ্টিও নামে। বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় জলের মধ্যে ধীরে চড়াই উঠতেই থাকি। পথ যেন শেষই হয় না। মাইল তিনেক চলার পর পাহাড়ের মাথায় চিপ্লিং গ্রাম। মেঘ কেটে রোদ ওঠে। চারিদিক উন্মুক্ত। মনেও প্রফুল্লতা আসে। খান কয়েক মাত্র চালাঘর। তারই একটাতে আশ্রয় মেলে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের আহারপর্বও শেষ করা হয়। এখানেও আর একজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট-এর সঙ্গে দেখা, হেলমুর গ্রামগুলি ঘুরে এই পথে ফিরছে।

আবার যাত্রা শুরু। কিন্তু চড়াই-এর শেষ আসে না। কেবল উঠেই চলি। অবশেষে পরিশ্রমের পুরস্কার আসে। পথ সহজ ও সরল হয়। মামুলী পাহাড়ী পথ। পাইনের ঘন বন। বৃষ্টি-ভেজা বনের সুমিষ্ট সুবাস। মনের আনন্দে এগিয়ে চলি। সোজা পথ। গোলভঞ্জন বা গোলবু গ্রামও দেখা দেয়। হাজার নয় ফুট উঁচুতে হবে মনে হয়। পাহাড়ের মাথায় চারিপাশ খোলা। পরিচ্ছন্ন গ্রাম। কয়েকটা দোকানঘর। ক্ষণিক বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা। বিস্তীর্ণ ময়দান পার হতেই আবার চড়াই। তবে বেশি নয়। খানিক

গিয়েই নামা। নীচে বালোমুচি গ্রাম চোখে পড়ে। নেমে আসি গ্রামে। বেলা ৪-৩০। পাহাড়ের গায়ে খানকয়েক মাত্র পাথর ও কাঠের তৈরি ঘর। খেতের জমির পাশ দিয়ে পথ। প্রথমেই যে দোতলা বাড়ি তাতেই আশ্রয় নেবার জন্যে পোর্টাররা ঢোকে। রাস্তার দিকে বাড়ির পিছন দিক। পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠান পার হয়ে ঘুরে বাড়িতে ঢুকতে হয়। দিনশেষে যাত্রা সাঙ্গ করে বিশ্রামস্থলে পৌঁছানো,—মনে তৃপ্তি আনে। নিশ্চিন্ত হয়ে সুন্দর পাথর-বাঁধানো উঠানে এগিয়ে গিয়ে পা দিই। হরিষে বিষাদ নামে। সুদর্শন ছদ্মবেশী অঙ্গন যে এমনই দারুণ পিচ্ছিল হবে ভাবতেই পারি না। পাদস্পর্শ মাত্র তার ফলভোগ করি। ভাগ্যক্রমে তেমন আঘাত পাই না!

উঠান যেমনি চাতুরী করুক বাড়িটি মনোরম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠি। সামনে খোলা কাঠের বারান্দা। নীচে উঠানের শেষে পাহাড়ের ঢালু গা বহু নীচে নদীর উপত্যকায় নেমে যায়। সুমুখে অপরপারে দূরে দিগন্তবিস্তৃত হিমালয়ের উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। একদিকে তুষারশিখরও দেখা যায়। যুগল হিমল চূড়া—দোবজে লাকপা (২৩,২৪০)।

বারান্দার কোলে প্রকাণ্ড একখানি ঘর। গৃহস্বামী তিব্বতী শেরপা বলেই পরিচয় দেন। শেরপাদের বাসগৃহের অনুরূপই ব্যবস্থা। একই ঘরের মধ্যে সব কিছুর আয়োজন। ঘরের মধ্যেই উনুন। ঘরও গরম হয়ে থাকে। সেইখানেই গৃহস্বামীর রান্না, আমাদের পোর্টারদেরও। রাত্রে শোবার ব্যবস্থাও সকলের ওই সেই একই ঘরে। গৃহকর্তার স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে - আমরাও কজন। তবে এতো বড় ঘর, জায়গার অভাব নেই।

পরিবারের সকলেই হাসিখুশী। ধনী গৃহস্থ বলেই মনে হয়। থাকেনও পরিচ্ছন্ন ভাবে। ভাষা না বুঝলেও কথাবার্তা আচরণে অতি ভদ্র।

আনন্দেই রাত কাটে।

সকাল ছ'টায় আবার পথ চলা।

গোসাঁইকুণ্ডের পথে এই বালোমচি গাঁও শেষ গ্রাম। কিন্তু আমাদের কাছে নয়। আজই বিকালে গোসাঁইকুণ্ডের পথ ছেড়ে আমরা অন্য দিকে নেমে যাব হেলমুর মালেমচি গ্রামে। সেখানে দু রাত কাটাবার কথা।

বালোমচি গাঁও ছাড়িয়ে আবার চড়াই। পাইনের বন। হিমালয়ের প্রভাতবায়ুর মধুর পরশ। মন আনন্দে ভরে থাকে। চড়াই-এর দুরূহতা দেহ মনে ক্লান্তি আনে না। অনেকখানি উঠবার পর পাহাড়ের গা বেয়ে নামা। বনের মধ্যে দিয়ে পথ। নেমে এসে ক্ষীণাঙ্গিনী নির্ঝরিণীর সঙ্গ পায়। পথ ও ঝরণা যেন হাত ধরাধরি করে কিছুদূর চলে। কখনও ধারার ডাইনে যায়, আবার ঘুরে এপারে আসে। তারপর ছাড়াছাড়ি। পথরেখা পাহাড়ের গা বেয়ে দূরে সরে। ঝরণাধারাও যেন অভিমানভরে বনের অন্তরালে আত্ম-গোপন করে।

সহজ সোজা পথ। শিলাস্তূপের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলা। পথের পাশেই

সুদৃশ্য এক জলপ্রপাত। সাবধানে তারই ধারা পার হওয়া। সামান্য উঠতেই পাহাড়ের আড়াল সরে। সম্মুখেই প্রকাণ্ড সমতলভূমি। ময়দানের একপাশে কাঠের খুপরি। দু'তিনজন লোক ঘোরে দেখি। মাঠের উপর কয়েকটি চমরী গাইও চরে। পোর্টাররা মাল নামায়। বোঝা যায়, এইখানেই দুপুরের আহার। ঘরের মধ্যে রান্নার আয়োজন হয়। আমরা দুজনে মাঠের উপর প্লাস্টিক্ সীট্ বিছিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসি। হঠাৎ শেষাকিরণ লাফিয়ে ওঠে। বলি, হোল কি? সে বলে, দেখি না, চমরী গাই চরছে, দুধ যদি পাই, গরম কফি খাওয়া যাবে। ততক্ষণ রোদ পোহান আপনি।

মিনিট পনেরো পরে হাসিমুখে ফিরে আসে। দু'হাতে ধূমায়িত কফিভরা মগ্। একটা পাথরের উপর লম্বা পা ঝুলিয়ে আরামে বসে। তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করে বলে, আঃ! দুধটা যেমন ঘন, তেমনি মিষ্টিও দেখছেন? আপনি তো এ গাই-এর দুধ আগেও খেয়েছেন, মানস সরোবরের পথে, নামচের পথেও নিশ্চয়?

হঠাৎ চমকে উঠে থেমে বলে, দাঁড়ান্ দাঁড়ান্—একটু দেখে খাবেন—এই রে! দুটো লোম ভাসছে দেখছি!

হেসে বলি, আশ্চর্য কি? এ-সব দুধের ও এক নিত্য সঙ্গী!

ঝরণায় স্নান সারা হয়। রোদে বসে আহারেও তৃপ্তি আনে।

আবার জুতা জামা পরে তৈরি। পথও তৈরি থাকে তার চড়াই নিয়ে। বনের মধ্যে পথ ঢোকে। চড়াই-এর পর চড়াইও উঠে চলে। এক জায়গায় রাস্তা দু ভাগে ভাগ হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যেই। আবার দুদিক থেকে এসে দু পথ এক হয়। জায়গার নামও তাই দোবাট।

বনের ভিতর দিয়ে আরও চড়াই উঠে খানিক উৎরাই নামার আরাম উপভোগ। পথের মাঝে ঝরণা। ছোট ময়দান। কয়েকটা ঝুপড়ি। জন-প্রাণীবিহীন। গরু ভেড়া ছাগল নিয়ে চরাতে এলে থাকবার আশ্রম। আবার সামনের পাহাড়ের চড়াই ওঠা। মাঝে মাঝে কয়েকটা শূন্য বড় খুপরি।

অবশেষে, বন ও চড়াই অতিক্রম করে এসে গিরিশিরায় পৌঁছানো। ঘন বন দূরে নীচে পড়ে থাকে। ছোট ছোট রোডোডেনড্রন গাছ এখানে ওখানে পাহাড়ের মাথায় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। শেষাকিরণ বলে, মে-জুনে এলে চমৎকার ফুলের শোভা দেখা যেত!

গিরিশিরা বেয়ে সোজা পথ। পাহাড়ের দুপাশেই ঢালু গা। বহু নীচে দুদিকেই উপত্যকা। কিছু পরে পথের মাঝখানে সারি সারি কয়েকটা বৌদ্ধ চোরটেন্ (Chorten)। পোর্টাররা দাঁড়ায়। বুঝিয়ে দেয়, একটা পথ পাহাড়ের ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে যায় গোসাঁইকুণ্ডের দিকে। ও পথ ধরে গেলে কালই গোসাঁইকুণ্ডে পৌঁছানো যায়। আমরা কিন্তু এখন যাব ডানদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথ নীচে নেমে চলে, সেই পথ ধরে মালেমচিতে। কয়েক পা এগিয়ে পোর্টার দেখিয়েও দেয়,—বহু নীচে—মনে হয় এ-পাহাড়ের পায়ের

কাছে—অতিক্ষুদ্র বিন্দুর মতো গ্রামের ঘরবাড়ি।

শেষকিরণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। হাসে। বলে, বুঝছেন ব্যাপারখানা? এই তিনদিনে চড়াই-এর পর চড়াই ভেঙে এই যে হাজার চৌদ্দ ফুট উঁচুতে উঠেছি, আজ যাত্রাশেষে একেবারে ঐ নীচে নেমে আবার পুনর্মূষিক হওয়া! এ-যেন সেই Snakes Ladders গোলকধাঁধা খেলা। কতো করে একশোর কাছাকাছি উঠে সাপের মুখে পড়া,—আবার একের কাছে নেমে যাওয়া!—তাই হোক। যাওয়া যাবে। বহুৎ আচ্ছা!—বলে পোর্টারের কাঁধে হাত দিয়ে সোৎসাহে ইসারা করে বলে,—চল, নীচে নামা যাক্।

সাপের মুখে পড়ে নামাই বটে। কোথায় উঠে এসেছিলাম, আকাশ-ছোঁয়া বৃক্ষবিরল গিরিশিখরে, এখন আবার নেমে চলা সেই কোন্ পাহাড়-ঘেরা পাতালপুরে।

আমিও হাসি। কিন্তু, আমার হাসির ভিন্ন উৎস। নীচের দিকে তাকিয়ে নিজের বয়সের কথা মনে পড়ে। আটষট্টি বছর এ দেহ অক্লান্ত কাজ করে এবার ছুটির নোটিশ দিয়েছে। কিছুকাল থেকে কোমরের কাছে মাঝে মাঝে একটা বেদনা আশ্রয় নেয়। অতিথিব মর্যাদা দিয়ে তাকে দেহের সঙ্গী হিসাবে মেনে নিতেও হয়। পাহাড়ে-পর্বতে ঘোরাফেরা কিছু কমানোর তাগিদও বুঝি। তবুও চলে আসি এই গোসাঁইকুণ্ডের পথে। ধীরে ধীরে গিয়ে ঘুরে আসব, সে-বিশ্বাসও রাখি। কিন্তু আজ বহু নীচের ঐ মালেমচি গ্রাম অকরুণ ভাবে স্মরণ করায়, এই দুরূহ চড়াইপথ আবার নতুন করে উঠতে হবে দুদিন পরে। মনের কোণে সন্দেহ উঁকি মারে, গোসাঁইকুণ্ডের সঙ্গে হেলুমুর প্রোগ্রাম যোগ করা নিবুদ্ধিতার পরিচয় হয় নি তো!

হিমালয় পথে চলতে আত্ম-বিশ্বাসের এ অভাব পূর্বে কখনও অনুভব করি নি।

কিন্তু তখনি আবার মনে হয়, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেই কি এতকাল পথ চলেছি? মনের সত্যকার বিশ্বাসের যেখানে ভিত্তি সেখানে তো সংশয়ের স্থান নেই। আজও নয়। তবে আর আশঙ্কা করি কিসের?

হাসি ফোটে মুখে। নবীন উৎসাহ জাগে মনে। নেমে চলি পাহাড়ের গা বেয়ে।

আবার বড় বড় গাছের ঘন বন। বেলা থাকলেও মনে হয়, যেন সন্ধ্যা নামে। জনমানবের কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। এ-সব গহন বনে জন্তু জানোয়ারের বসবাস স্বাভাবিকই। তবুও, তাদের সাক্ষাৎ মেলে না। ভাবি, দেখা পেলে মন্দ হয় না। প্রকৃতির মুক্তরাজ্যে বন্যপ্রাণীর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণ,—সে এক রোমাঞ্চময় দৃশ্য। নামার পথে গতিবেগ বাড়ে। সন্ধ্যার আগে গ্রামে পৌঁছানোর আগ্রহ ত্বরান্বিত করে। ক্বচিৎ কখন গাছের ফাঁকে হঠাৎ হয়ত সেই বহুদূরের গ্রাম আবার দেখা দেয়। মনে হয়, বাড়িঘর আর যেন অতো বেশি ক্ষুদ্রকায় বা অস্পষ্ট নয়। দূরত্ব কমায় মনে চলার উৎসাহ বাড়ায়।

অনেকখানি নামবার পর বনের মধ্যে খানিকটা খোলা জমি। দ্বটি ঝ'পড়িও। কিন্তু লোকজন নেই।

এবার প্রায় সমতল পথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরণা। একটা বড় ঝরণার পাশে শিলাখণ্ডের উপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হয়। গ্রাম নিকটে। দু'একজন গ্রামবাসীও দেখা যায়। মনে একটা নিশ্চিন্ত আরাম বোধ,—এই তো কেমন পে'ছৈ গেলাম।

এগিয়ে গ্রামে ঢুকি। প্রকাণ্ড সমতলভূমি। উপর থেকে মনে হয়েছিল, এ-বুঝি এ-পাহাড়ের পাদদেশে। এখন বোঝা যায়, এরপরও পাহাড় নেমে গেছে আরও অনেক নীচে— উপত্যকায়। সেখানে নদী পার হয়ে অপরপারের পাহাড়ের গায়ে হেলমুর অন্য গ্রামও স্পষ্ট দেখা যায়। তার মধ্যে থারুকে-গিয়াংই প্রধান। ৯,৩০০ ফুট উঁচুতে। Yangri danda (প্রায় ১১ হাজার ফুট) পাহাড়ের গায়ে। এ-পারে মালেমচির উচ্চতাও ৮,৫০০ ফুট। এদিকের পাহাড়ের নাম থারে বা উরিন্ ডান্ডা ; এও প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু। দু' পাহাড়ের মাঝে নীচে মালেমচি নদী। গ্রামে প্রবেশ করতেই ডানদিকে প্রথম যে বাড়িখানা, তার পাঁচিল-ঘেরা প্রকাণ্ড এলাকা। ফুলফলের বাগিচাও। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরী লম্বা দোতলা বাড়ি। সামনে সুন্দর রেলিং দেওয়া বারান্দা। দেখেই মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন। পরে জানতে পারি, ঐটিই চীনী লামার বসতবাটী।

বেলা পাঁচটা বাজে। পোর্টাররা চীনী লামার লোক। এ-গ্রামেরই বাসিন্দা। তাই তারা সোজা নিয়ে চলে চীনী লামার অতিথিশালায়।

মাঠের মধ্যে এলোমেলো ছড়ানো খান চল্লিশ ঘর নিয়ে গ্রাম। প্রায় সবই দোতলা। গ্রামের মধ্যখানে চতুষ্কোণ চত্বর। তারই সম্মুখে লম্বা কাঠের বাড়ি। একতলা। সারি সারি কখানা ঘর। সামনে টানা বারান্দা। কিন্তু সেখানে জায়গা মেলে না। জন পাঁচ-ছয় বিদেশী ট্যুরিস্ট আগেই আশ্রয় নিয়েছে। নিকটেই আর একটা কাঠের বাড়ি। দোতলা। তাতেই থাকবার ব্যবস্থা হয়। উপরে একখানাই ঘর। প্রকাণ্ড হল্-এর মতন। আসবাবপত্র কিছুই নেই। খালিই পড়ে আছে। উপরে উঠেই সোলোখুম্বুর শেরপাদের ঘরের কথা স্মরণ হয়। সেখানকার মতনই এখানকার বাড়ির একই রকম ধরনধারণ,— প্ল্যান। নীচের তলায় গৃহপালিত পশু থাকে। উপরে গৃহ-স্বামীর সপরিবার বসবাসের ব্যবস্থা। সব কিছু ঐ একটা বড় ঘরের মধ্যেই। একদিকে উনান,— তারই নিকটে জানলার ধারে,— বসবার, শোবার আয়োজন,— হাতখানেক উঁচু কাঠের প্ল্যাটফর্মের মতন। কাঠের জানালাগুলিতে কারুকার্য থাকে। ঘরের দেওয়ালে সারি সারি তাক,—বাসনপত্র ইত্যাদি সাজানো থাকে। ঘরের আর এক অংশে মালপত্র রাখবার ভাঁড়ার। সোলোখুম্বুতে শেরপাদের ঘরে দেখেছিলাম—ঝকঝকে তকতকে পেতল, রুপা, পোর্সেলিন্ ইত্যাদি বাসনকোসন ও নানান্ জিনিস ভরা তাক, চারিদিক সাজানোগোছানো ঝলমল করে। দেখেই বোঝা যায়, ধনী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। যেমন দামী আসবাবপত্রে

ঝমকালো গৃহখানি, তেমনি সদাহাস্যমুখর আনন্দোচ্ছল দৈনন্দিন সংসারজীবন। মালেমচিতে সে সচ্ছলতা দেখি না, সেই রঙ্গ-ব্যঙ্গে ভরা প্রাণবন্ত জীবনধারাও নয়। এ ঘরখানি তো একেবারে শূন্য। উলঙ্গ শিশুর মত। স্পষ্ট বোঝা যায়, কিছুকালই এ-ঘরে কেউ বাস করে নি। আমরাই মালপত্র খুলে ঘরখানি এখন দখল করি। নিরিবিলি ভালই থাকি।

মালেমচিতে দু'রাত্রি কাটাই। ঘুরেফিরে সব দেখে বেড়াইও।

পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। মাঠের উপর দাঁড়িয়ে বোঝাই যায় না সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে এই গ্রাম। অনুভব করা যায়, রাতের শীতের হিমস্পর্শে। ময়দানের তিনদিক ঘিরে গগনস্পর্শী গিরিপ্রাচীর। একদিকে শুধু পাহাড়ের ঢালু গা নেমে যায় প্রায় দু হাজার ফুট নীচে মালেমচিখোলা নদীর উপত্যকায়। কিন্তু সেদিকেও নদীর অপরপারে মাথা তুলে সু-উচ্চ শৈলশ্রেণী। তারই গায়ে হেলমুর সেই থারকেগিয়াং গ্রাম। গ্রামের মধ্যে চোরটেন (Chorten) এপার থেকেও চোখে পড়ে। এইভাবে চারিপাশে উঁচু পাহাড় ঘিরে থাকায় মালেমচি গ্রাম থেকে তুষারশিখরের দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। তাহলেও মালেমচির আপন সৌন্দর্য আছে। শান্ত পরিবেশ। বন উপবন পাহাড়ী ঝরণা। ফল ও ফুলের শোভাও। এ-অঞ্চলের আপেল ও পিয়ারা-নাশপাতি--নেপালে খ্যাতি রাখে। সুদূর হিমালয়ের নিভৃত দুর্গম অঞ্চল। আধুনিক সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এখানকার অধিবাসীরা। সাধারণ নেপালীদের মত আকৃতিও নয় আচার-ব্যবহারও নয়। তিব্বতী বংশজাত। সেই লম্বা-চওড়া গড়ন। উন্নতনাসা। নয়নযুগল মঙ্গোলীয়। ভাষাও নেপালী-গুরখালি নয়, তিব্বতী-সংশ্রিত। ধর্মেও বৌদ্ধ। হেলমুর মহিলারা প্রখ্যাত সুন্দরী। বেশভূষাতেও তাদের নানান্ রঙের চাকচিক্য, দেহের অলঙ্কারেরও জলুস। শোনা যায়, এককালে নাকি নেপালের রাজা-উজিররা এখান থেকেই তাঁদের রাণীদের সখী সংগ্রহ করতেন।

ট্যুরিস্ট মহলে নেপাল সরকার কর্তৃক হেলমুর প্রাকৃতিক শোভার এবং বিশেষ করে, নারীসৌন্দর্যের প্রচারও প্রচুর। ফলে দলে দলে বিদেশী ট্যুরিস্ট এ অঞ্চলে আসেন দেখি। মালেমচিতেও কয়েকটি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নেপালের বিদেশী ট্যুরিস্ট মহলে এ-যেন স্বর্গ-রাজ্য। ইন্দ্রের রাজসভার অপ্সরাদের যেন জন্মভূমি।

বিকালে ঘরে এক বিদেশী যুবক এসে হাজির। জার্মান ও ফরাসী ভাষা ভাল জানে, ইংরেজী বলে ভাঙা ভাঙা। নিজে থেকেই আলাপ করতে আসে। বলে শুনলাম, আপনারা গোসাঁইকুণ্ডে চলেছেন। আমার যাবার ইচ্ছে। নেপালে সর্বত্র ঘোরবার অনুমতিপত্র আমার আছে। আপত্তি না থাকে তো একই সঙ্গে যেতে চাই।

তার পরিচয় পাই। সুইস। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। বছর পঁচিশ বয়স। স্বদেশে কিছুকাল চাকরি করেছে। হিমালয়ে ঘোরবার আবাল্য প্রবল আগ্রহ। হাতে কিছু টাকা জমতেই বেরিয়ে পড়েছে। বাড়িতে বাপ মা আছেন।

এসেছিল একাই। পথে কয়েকজন বিদেশী সঙ্গী জুটেছে। কিন্তু, তাদের গোসাঁইকুণ্ড যাবার অনুমতিপত্র নেই। তার নিজের যাবার উদ্দেশেও জানায়। হিমালয়ের সাধুসন্ন্যাসীদের কথা শুনেছে, তাঁদের দর্শন করতে চায়। গোসাঁইকুণ্ড প্রসিদ্ধ তীর্থ। সেখানকার মন্দিরের কারুকার্য দেখাও উদ্দেশ্য। তা'ছাড়া নিকটবর্তী দু'একটা গিরিশিখরে আরোহণ করারও ইচ্ছা।

শুনে বলি, একসঙ্গে যেতে অন্য আপত্তি ছিল না, কিন্তু দু'পক্ষেরই যে অসুবিধে হবে।

সে শুনে আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করে।

সহজভাবেই তাকে বোঝাই, তুমি মাউনটেনীয়ার, বয়সও তোমার অনেক কম। তুমি হয়ত এখান থেকে একদিনেই কুণ্ডে পৌঁছুতে চাইবে!

সে তখনি বলে, সে তো বটেই। এমন কিছুই দূর নয়, একদিনেই তো যাওয়া যাবে।

হেসে বলি, তাই তো বলছি। একদিনে তোমার পক্ষে যাওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু, আমার এ বয়সে তা এখন চলবে না। আমি ভেবেছি, যাব দু'দিনে। তাই নাকি সাধারণতঃ সবাই যায়ও। প্রয়োজন বোধ করি তো তিনদিনও আমার লেগে যেতে পারে ওখানে পৌঁছুতে। মোট কথা, যাব আমি নিশ্চয়ই, যত সময়ই লাগুক। তা ছাড়া আমার হাতে সময়ের টানাটানি নেই, পৌঁছানোটাই বড় কথা, হেঁটে চলার আনন্দ পাওয়া তো আছেই। তাই তোমার মত তুমি চল, আমিও আমার শক্তিমত যাব,—ওখানে গিয়ে আবার দেখা হবে।

তারপর হেসে বলি, আমার এ-সঙ্গীটি তোমার সঙ্গে যেতে চায় তো যেতে পারে, তোমার সঙ্গে চলতেও পারবে,—ও-ও মাউনটেনীয়ার।

শের্ষাকিরণ কটমট করে আমার দিকে তাকায়, গম্ভীর হয়ে বলে, যা' তা' বলবেন না।

সাহেব আমার যুক্তি বোঝে। বলে, সেটা ঠিক কথা। কিন্তু এখান থেকে একটা লোক আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকার হবে. জিনিসপত্রও কি নিতে হবে জানলে সুবিধে হয়।

তখন শুনে স্তম্ভিত হই, কী স্বল্প আয়োজন করে সে যেতে প্রস্তুত।

সঙ্গে আছে শুধু একটা রুকস্যাক, তাতে একটা স্লিপিং ব্যাগ, দু'একটা জামা, খুচরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস।

বলি, একটা টর্চ আছে তো?

নাঃ। তাও দরকার হয় না।

কেন? তুমি ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনীয়ার, তাই?

সে হেসে ওঠে। বলে. না; অভ্যাস অনুভব করি না। দিনের আলো থাকতেই সব কাজ সেরে নিই। রাত্রে তো স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে ঘুমানো।

চা-চিনি সঙ্গে নেবে তো?

পাহাড়ে এসে চিনি খাই না। চা না পেলেও অসুবিধে হয় না।

সিগ্রেট ?

তাও নয়।

খাবার জন্যে কি সঙ্গে নেবে ?

কয়েকটা সুপ্-প্যাকেট আছে। যেখানে যখন যা পাওয়া যায়, তাই খাই।

মালেমচি ছাড়বার পর আর লোকালয় নেই, তাই কিছু পাবেও না।

এখানে ডিম পাওয়া যায় না? তাই কয়েকটা সঙ্গে নিয়ে নেবো,—দিন তিন-চারেকের তো ব্যাপার।

তার কথাগুলি মনে আনন্দ দেয়। ভাবি, অর্থের অভাব-অনটন নয়, স্বভাবগঠনের কী কঠোর সংযম। আমাদেব দেশের ছেলেবাও যেন এমনি হয়।

তাকে আরও জানিয়ে দিই, সাধু-সন্ন্যাসীর বা কোন লোকজনেরই সেখানে দেখা পাবে না। গোসাঁইকুণ্ডে স্থায়ীভাবে কেউই থাকেন না। যাত্রীরা যায়, আসে। দু'এক রাত্রি হয়ত কাটায়। তাও অল্প সংখ্যকই। আর মন্দিরের কারুকার্য? মন্দিরই সেখানে কোন কিছু নেই। পাহাড় আর হ্রদ। প্রাকৃতিক সেই মন্দির।

এ-সব শুনেও এঞ্জিনীয়াবের উৎসাহ কমে না। যাত্রার উদ্যোগ করে।

মালেমচির মঠও দেখে আসি। গ্রামের একপাশে। যেমন তিব্বতী বৌদ্ধ-বিহার—বড় একটা হল্‌ঘর। দেওয়ালভরা বৌদ্ধ দেব-দেবীর রঙিন্ চিত্র। তিব্বতী টঙ্কা। বুদ্ধদেবেব বড় মূর্তিও।

কিন্তু, এখানকার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গুম্ফা গ্রামের বাইরে। মাঠ ছাড়িয়ে খানিক গিয়ে পাহাড়ের গায়ে। প্রাকৃতিক গুহা, আবার খানিকটা অংশ পাথর দিয়ে গাঁথাও। এক সাধু থাকেন সেখানে। হিন্দী জানেন। ভারতের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি ঘুরে গেছেন।

মুখচোখে সাধকের উজ্জ্বল দীপ্তি। ধীরে কথা বলেন,—অল্পই। মনে হয় লোকজনের সংস্রব এড়াতে চান্। একাই থাকেন এই গুহাতে।

মনে পড়ে যায়, প্রসিদ্ধ তিব্বতী সাধু ও মহাযোগী মিলারেপাব জীবনী। ন'শো বছরেরও আগের কথা। এই হেলমু থেকে মাত্র চারদিনের পথ,—তিব্বতে কিয়াংসা উপত্যকা। সেইখানে কিরংগ্রামেব নিকটে তাঁর জন্ম। খৃষ্টীয় ১০৫২ সালে। সংসাব ত্যাগ করে তিনি অধ্যাত্মশক্তির সন্ধানে ঘোরেন।

ওদিকে আবার ধর্মগুরু অতীশ দীপঙ্করের শরীর ছিল বাঙলাদেশেব। খৃষ্টীয় ১০৪২ সালে ভারতবর্ষ থেকে অধ্যাত্ম সম্পদ বহন করে দীপঙ্কর তিব্বতে যান ও ধর্মপ্রচার করেন। তাঁরই তপঃশক্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন গুরু মার্পা। সেই মার্পার নিকটে মিলারেপা দীক্ষা নেন। শুরু হয় তাঁর হিমালয়ে তিব্বতে সুদীর্ঘ তপশ্চর্যা। এই মালেমচি গ্রামেরই সন্নিকটে কোন এক নিভৃত গুহার মধ্যেও কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। পরে মাউন্ট এভারেস্টের উত্তর অঞ্চলে চুব্‌বার গুহায় দিন কাটান। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে তাঁর দেহাবসান হয়। অস্থিচর্মসার, বিবস্ত্র, কঠোর সেই তপস্বী।

তবুও অসাধারণ কাব্যশক্তির অধিকারী। আশ্চর্য সমন্বয়। তিব্বতী মহাযান বৌদ্ধধর্ম ইতিহাসে যোগিরাজ মিলারেপার নাম ও তাঁর কাব্য অমর হয়ে আছে। বহু অলৌকিক কাহিনীও তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায়।

আজ মালেমচির এই গুহায় বসে সেই সব কথাই স্মরণে আসে। এইরকমই হয়ত মিলারেপাও থাকতেন এইখানেই। কে জানে?

বড় ছোট সাধুর বিচার করা কি সহজসাধ্য?

চীনী লামার বাড়িতেও যাই।

বিরাট এলাকা। সাজানো বাগান। কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ি। তিব্বতী প্রথায় সাজানো। আবার, আধুনিক সোফা টেবিল চেয়ারও আছে। কারণও বোঝা যায়। সুসজ্জিতা সুন্দরী মেয়েরা ঘোরেন ফেরেন। কেউ কেউ শহরে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন, পরিচয়ে তার প্রমাণ পাই।

চীনী লামার বড় ছেলেকে সবাই জেঠা বলে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। ষাট বছর বয়স। বয়সের তুলনায় আরও বৃদ্ধ দেখায়। স্বাস্থ্যও ভেঙেছে। জ্বর ও কাশিতে ভুগছেন। চিকিৎসার জন্যে কয়েকদিনের মধ্যেই কাঠমাণ্ডু যাবেন। ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড ফরাশ। গালচের উপর বসে বালিশে ঠেসান দিয়ে আসর জমান, আমাদের আগেকার দিনের জমিদারদের মত। তবে নিকটেই জ্বলন্ত উনুন। হরদম চা তৈরি হচ্ছে। অসুস্থ দেহেও আমাদের আপ্যায়ন করেন। চা বিস্কুট খাওয়ান। বাগিচার আপেল আনিয়ে সঙ্গে দেন। বলেন, পথে কদিন খাবেন। ওদিকে পাবেন না তো কিছুই।

ভাবি, অতিথি-সেবা বোধ করি মানুষের সহজাত ধর্মই।

গাইড্ সঙ্গে কে চলেছে খবর নেন। বলি, আপনারই বাবার দেওয়া লোক।

তাদের ডেকে পাঠান। দেখে বলেন, ওঃ! এরা চলেছে? ঠিক আছে।

বুঝতে পারি, তাদের হুঁশিয়ার করে দেন, ঠিকভাবে নিয়ে যেতে, যত্ন নিতে,—পথে যেন কোন অসুবিধা না হয়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ফেরবার পথের কথা। ওদিকে বনের মধ্যে রাস্তা এরা চেনে নিশ্চয়?

তখন জানতে পারি, সেদিকের ফেরবার পথে এরা দুজনেই নতুন। এদের হ্রদে যাতায়াত এই দিক দিয়েই।

জেঠা বলেন, তা হলেও এরা নিয়ে যেতে পারবে, চিন্তিত হবেন না। পাহাড়ী লোক, গভীর বনের মধ্যেও পথ চিনে নেওয়া এদের সহজ স্বভাব।

মনে পড়ে, বন্ধুদের সে-বছর নিগ্রহের কথা। তাই ভেবে বলি, ওরা সঙ্গে আছে, চলুক। কিন্তু আরও একটা লোক যে ওদিকের পথে গেছে, এখান থেকে ঠিক করে দিন, সঙ্গে যাবে, ওদিকের বনের পথটা পার করিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

জেঠা বলেন, দরকার ছিল না। তবু বলছেন যখন, ব্যবস্থা করে দেব। কতগুলো টাকা অযথা খরচ হবে।

ভাবি, তা হোক। নিশ্চিন্ত মনে চলাও যাবে।

শীতের রাজ্যে গরম ঘরে আরামে বসে থাকতে দেখি, বহু লোকজন আসে তাঁর কাছে,—নানান কাজে। কেউ বা আসে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে, কেউ বা কোন পরামর্শে, আবার কেউ বা কোন ভেট নিয়ে। দুজন আসে একটা শিকার করা হরিণের ছাল-ছাড়ানো ধড় নিয়ে। ঘরের মধ্যে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের সাড়া জাগে। তখনি বড় ছুরি বার হয়। ঘরের মধ্যেই দু'তিনজনে মিলে মাংস কাটা শুরু করে দেয়। রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। বীভৎস সে এক দৃশ্য! একটা কী রকম দুর্গন্ধও একটু আগের ঘরের সেই শান্ত মনোরম আবহাওয়া নিমিষে অন্তর্ধান করে। লোকগুলির সহজ মধুর বিনম্র দৃষ্টি ও আচরণ কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। এখন দেখি, তাদের চোখেমুখে হিংস্র লোলুপ ক্ষুধার্ত চাহনি।

শেষকিরণ অস্ফুটে বলে, চলুন, উঠে পালাই।

উঠতে যাব, জেঠা বলেন, চললেন কোথায়? বসুন—আবার চা দিচ্ছি। মাংসটা কাটা হোক, আপনাদের সঙ্গে খানিকটা দিয়ে দেব,—কদিন থাকবে, পথে আর খাবারের ভাবনা থাকবে না।

দুজনেই মাছ মাংস খাই না শুনে অবাক হন। বলেন, সে কী! তবে কি খেয়ে থাকেন?

হেসে বলি, ঐ তো আপেল দিলেন,—আসব আবার পরে বিকেলে।

পালিয়েই আসি দুজনে সেই বীভৎস দৃশ্য এড়িয়ে। সারা গা যেন কেমন ঘুলাতে থাকে।

পরের দিন। সকাল ৬টায় আবার যাত্রা। নতুন গাইডও সঙ্গে চলে। পরনে কোট, পায়জামা। মাথায় টুপি। দেখেই বোঝা যায় পোর্টার দুজনের চেয়ে অবস্থাপন্ন। চালাকচতুর। স্ফূর্তিবাজও। নিজের মালপত্র কুলিদের ঘাড়েই চাপায়। গান গায়। হিন্দী জানে। আচার-ব্যবহারেও আদব-কায়দা রাখে। শেষকিরণও হাসিঠাট্টা করা, কথা বলার সঙ্গী পায়; তার গানের ধুয়া ধরে তাকে উৎসাহ দেয়।

গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকখানি সোজা পথ। দুদিন আগেও এই পথেই আসা। পাহাড়ের চড়াই-এর নীচে পৌঁছে পুরানো পথের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। মালেমচি আসবার রাস্তা বাঁদিকে পড়ে থাকে, আমরা ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে উঠতে থাকি। এতে নাকি পাহাড়ের মাথার উপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পৌঁছানো যাবে।

চড়াই-এর মুখেই দেখা সুইস ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। পিছন থেকে এসে আমাদের ধরে। সঙ্গী তার মালেমচি গ্রামের এক শেরপা যুবক। সাহেব হাসিমুখে 'সুপ্রভাত' জানায়। শেষকিরণ হাত বাড়িয়ে ক'টা লজেন্স তার হাতে দেয়। আমাদের নতুন গাইডকে বলে, সাহেবের সঙ্গে ছোকরাকে বলে দাও যেন ভালভাবে নিয়ে যায়।—সাহেবকে বলে, তোমরা তো আজই পৌঁছে

যাবে ? কাল বিকেলে হ্রদের ধারে দেখা হবে।

হাসিমুখে অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে সাহেব অক্লেশে চড়াই-পথে উঠে চলে। দেখতে দেখতে গভীর বনের মধ্যে আঁকাবাঁকা পথের আড়ালে দ্রুতগামী মূর্তি দুটি অদৃশ্য হয়।

আমরা উঠতে থাকি ধীর মন্থর গতিতে।

নিবিড় বন। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছের সমাবেশ। ডালে ডালে ঝুলে-থাকা দীর্ঘ লতার জালে যেন বাঁধা। দিনের বেলায়ও থমথমে ভাব। আবছা আলো-ছায়া। নিঝুম নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝিল্লীর মুখর স্পন্দনধ্বনি। কোথাও বা নেমে-আসা পাহাড়ী ঝরণার অকস্মাৎ কলহাস্য। আড়াল থেকে হেসে উঠে আনমনা বিদেশী পথিকের মনে চমক জাগায়। চমকে উঠি হাতে আঙুলের ফাঁকে রক্তরেখা দেখেও। জোঁকের বেশ উপদ্রব। হাতের লাঠি বেয়েও ওঠে। গাছ থেকে মাথায়, ঘাড়ে পড়ে। বুটের কোন্ ফাঁক দিয়ে মোজা ভেদ করে, পায়ে আঁকড়ে ধরে। রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠে। যখন টের পাওয়া যায়, ততক্ষণে রক্তাক্ত দেহ,—যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক! গায়ের জামা, গেঞ্জি, প্যান্ট, মোজা—রক্তরাঙা হয়ে ওঠে।

ভাবি, ফুলেও তো কীট থাকে!

উঠেই চলি চড়াই-এর পর চড়াই। প্রায় ঘণ্টা দুই চলার পর পাহাড়ের মাথার কাছে পৌঁছুই। বহু নীচে নদীর উপত্যকা। অদূরে তুষারশিখর। পাহাড়ের গায়ে লম্বা পাথরের ঘর। খানিকটা সমতলভূমি। সেই খুপরির এক কোণে রান্না চাপে। অপর দিকে প্লাসটিক বিছিয়ে বিশ্রাম নিই।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার যাত্রা। যেন পথ চলাই সারাদিনের কাজ। তাতেই আনন্দ। সামান্য বাকি চড়াইটুকু উঠতেই এই পাহাড়ের মাথা। স্থানের নাম সাঁওনে মুনি। মনে হয়, হাজার বারো ফুট উঁচু। গাছপালাশূন্য ময়দানের মত। একটা বড় চোরটেন-স্তূপ। পাহাড়ের অপরদিকেও ঢালু গা। দুদিকের উপত্যকা একই সঙ্গে দেখা যায়। এবার অপরদিকে নামা। সেইদিকে অল্প নীচে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি পাথরের ঘরবাড়ি, ঝুপড়ি।

মনে হয় এককালের গণ্ডগ্রাম। এখন জনশূন্য। খাঁ খাঁ করে। নাম থারেপাট্টি। তাকিয়ে দেখি আর ভাবি, জীবন্ত প্রাণী আর তার মৃতদেহের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য, জনাকীর্ণ পল্লী এবং পরিত্যক্ত শূন্য বসতির মধ্যেও যেন তেমনি প্রভেদ। অন্তরে শ্মশানবৈরাগ্য জাগায়।

সেই নির্জন নীরব গৃহগুলির পাশ দিয়ে নেমে চলি। পাথর-বিছানো রাস্তা। কিছুদূর যেতেই আবার বন শুরু। বড় বড় গাছের ছায়াতলে উৎরাই পথে নামতে কোন ক্লান্তিবোধ নেই। মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দু-একটা ভাঙা ঝুপড়ি। কি কারণে, কবে, কার এখানে থাকবার প্রয়োজন হয়েছিল, বুঝি না।

পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ ঘুরে চলে। বন ছাড়িয়ে এসে বিকেলে এক ঝরণার ধারে সাথীরা পিঠের বোঝা নামায়।

এখনও বেলা রয়েছে। ভাবি, এরি মধ্যে থামল কেন? আরও কিছুদূর

এগনো যেত তো ?

গাইড জানায় এগোলে আর থাকার ভাল জায়গা মিলবে না। এখানে ঐ গুহার মধ্যে আজ রাত কাটানো।

গুহা ? কই ? তাকিয়ে দেখি।

পথের উপর দিয়ে বয়ে যায় ঝরণার ধারা। পাথরে পাথরে পা রেখে জল ডিঙিয়ে, পথ ছেড়ে, পাশে সামান্য ওপরে উঠতেই পাহাড়ের কোলে প্রকান্ড চেটালো পাথর। যেন, শান-বাঁধানো চাতাল। তারই এক অংশের মাথার উপর—হাত চার-পাঁচ উঁচুতে সাপের ফণার মত, ঝুলে-থাকা আর একটা বড় পাথরের আচ্ছাদন। পাথরে-গড়া এ-যেন অনন্ত শয্যার রূপায়ণ। তারই তলায় আজ রাত কাটানো। একদিকে পাহাড়ের গায়ের পাথর। অপর তিনপাশ খোলা। একধারে মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দূরে সেই শিলাখণ্ডেরই গা বেয়ে ঝরণার ধারাটি নেমে চলে, অল্প গিয়ে, পথ পেরিয়ে, সশব্দে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুরম্য জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। সেই শিলাবেদির উপর কম্বল-শয্যা পাতি। অপর কোণে সাথীরা পাথর সাজিয়ে উনান পাতে। জঙ্গল থেকে কাঠ আনে। আগুন জ্বালে। রান্না চড়ে।

সন্ধ্যা নামার আগেই খাওয়াদাওয়া সেরে 'স্লিপিং ব্যাগ'-এ মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি। মনে এক বিচিত্র অনুভূতি। কোথায় লাগে সভ্য শহরে, পাকা বাড়ির ঘরের মধ্যে খাটের ওপর গদি-পাতা বিছানা ! দেহ-সুখের বিলাস ? তার আবার মূল্য কী ? এখানে কঠিন পাথরের উপর শয্যা পাতা, তাতেই মন-ভরা তৃপ্তি, অসীম আনন্দ। যেন, সারাদিন বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে দুরন্তপনা করে এখন প্রকৃতি-মায়ের স্নেহময় কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়া। ঝরণার কলকল ধ্বনির মাঝে যেন মায়ের অস্ফুট কণ্ঠ বলে, কোথায় ছিলি সারাদিন ? নে,-এখন চুপ করে শান্ত হয়ে ঘুম দিকিনি। জনকল্লোল গুনগুন সুরে ঘুমপাড়ানী গান গায়।

সারা হিমালয়ও যেন শিশুর মত গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে। নিথর, নিঃসাড়।

শীত ? বেশ আছে। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবার ভয় করে না। যেমন বন্য জন্তু নিশ্চয় নিকটে কোথাও ঘোরে, অথচ কাছে আসে না।

মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠি। ঘুমঘোরে ভুলে-যাওয়া মনে ভাবতে থাকি, কোথায় আছি ?

মুখের আবরণ সরাই। তাকিয়ে দেখি। রজনীর গাঢ় অন্ধকার নয়—স্নিগ্ধ নীলাভ তরল আলোর স্বচ্ছতা। তারই মাঝে পাহাড়ের কালো কালো পাথর-গুলোর ঘনঘোর আকৃতি। ওপাশে ঐ তো সঙ্গীদের কম্বল মুড়ি দেওয়া ঘুমে অচেতন দেহগুলি। ওধারে উনুনে তখনও আগুনের শিখা জ্বলে। গাইড্রা প্রচুর কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছে, আবহ গরম থাকবে, জন্তু-জানোয়ারও নিকটে ঘেঁষবে না। মাথার উপর অতন্দ্র প্রহরায় তেমনি জেগে রয়েছে আকাশের তারাগুলি। অসতর্ক হয়ে হাত ছড়াই। নিকটের

করুণাধারার জলবিন্দু বাতাসে উড়ে হাতে লাগে। জল ছিটিয়ে জলবালারা যেন উচ্ছলিত হয়ে হেসে ওঠে। হাত গুটিয়ে চোখ বুজি। কখন আবার চোখে ঘুম নামে। কোন্ ফাঁকে রাতও কেটে যায়। ভোরের আলো ফুটে জানিয়ে দেয়, নবীন প্রভাত পাহাড়েব আড়ালে উঁকি মারে। ম্লানমুখী তারাগুলি সলজ্জে মুখ ঢাকে।

মনে পড়ে তখনি, আজই তো গোসাঁইকুণ্ডে পৌঁছানো! উৎসাহে অবিলম্বে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ি। সঙ্গীরাও সবাই জাগে। আবার সজীবতা, চঞ্চলতা। তোড়জোড়, সাজগোজ। চা ও রুটি খেয়ে সাড়ে ছ'টায় আবার পথ চলা। সব্জি ও রুটি সঙ্গেও রাখা হয়। দুপুরে পথে আজ আর রান্নার পাট নয়। পোর্টাররা কিছু শুক্না কাঠ সংগ্রহ করে। গোসাঁইকুণ্ডে ব্যবহারে লাগবে। এরপরে আর বড় গাছ পাওয়া যাবে না।

পথ এখন খানিক নেমে চলে। বনভূমি অতিক্রম করে। চারিপাশে অনাবৃত উলঙ্গ গিরিশ্রেণী। যেন ভীষণাকৃতি অতিকায় দানবের দল। শৈলশৃঙ্খলিত হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে। বন্দীর দল,—তবু মাথা নত নয়। উদ্ধত উন্নত শির। তবুও উলঙ্গ অঙ্গে রত্নভূষণের চাকচিকা। রুক্ষ কঠোর পাথরের বুকে অজস্র ফুলের শোভা। পথের পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ জেন্সিয়ানা (Gentiana Stipitata)। উজ্জ্বল নীল নয়নে তাকিয়ে থাকে। মাথা দুলিয়ে যেন প্রশ্ন করে, কে গা তোমরা অচিন্ পথিক এলে আমাদেব দেশে?

সাদা থোকা থোকা Primula denticulata। কদম ফুলের মতন গোল গড়ন। ছোট ছোট ফুলেব যেন তোড়া। রাশি রাশি সাদা Anaphalis। ছোট ছোট ক্রিশেমথিমাম-এর আকার। Everlastingsও বলে। তুলে রাখলেও শুকিয়ে ঝরে পড়ে না। কাগজের ফুলের মত দেখায়।

আরও নাম-না-জানা আলপাইন কতো রকম ফুল।

প্রকৃতিও যেন ঘোমটা খুলে মুখ তুলে তাকাল। অবারিত দৃষ্টি চলে বহুদূর। নীচে নেমে যায় খদ। সেখানে দূরে আঁকাবাঁকা শীর্ণকায় নদীর রেখা। অদূরে সুমুখে দিগন্তজোড়া পাহাড়ের চূড়া। আকাশে মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে। আমাদের পথও ঘুরে যায় সেইদিকেই।

গাইড্ আঙুল তুলে দেখায়, ঐ দেখুন, পাহাড়ের গা বেয়ে পথ এখন নেমে যাবে নীচে ঐ বড় ঝরণার ধারে। তারপর, ঐদিকের ঐ উঁচু পাহাড়ের গা ধরে উঠে চলে একেবারে মাথা পর্যন্ত। ভাল করে নজর করুন, ঐ যে বড় বড় পাথর দেখছেন পাহাড়ের মাথায়—দূরে বলে এখান থেকে দেখাচ্ছে ছোট, কিন্তু ওগুলো প্রকাণ্ড পাথর সব—তারই পাশ দিয়ে ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে যাব—অপর দিকে,—ঐ চড়াইটাই হোল সব চেয়ে বড়। দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের গায়ে রাস্তার রেখা—সরু সুতোর মত?

পথ দেখি কল্পনার চোখে। বাস্তবে দেখা যায়,—বিশাল শৈলশৃঙ্গ। শুষ্ক কঠোর। নির্মম হৃদয় নিয়ে যেন অপেক্ষা করে।

গাইড্ বলে, পাহাড়ের এদিকে বরফ এখন নেই, অপর দিকে নামবার সময়

হয়ত পাওয়া যাবে।

শের্বাকিরণ সোৎসাহে বলে, চল তা হলে এগিয়ে দেখা যাক, কেমন বরফ ওখানে। কই, গান ধরো তোমার.—বলে তার মুখে শোনা গানের একটা কলি নিজেই ধরে। পোর্টার দুজন হেসে ওঠে। গাইড্‌ও সুর ধরে। এগিয়ে চলে। পিছু পিছু আমিও নামতে থাকি।

উৎরাই পথ সহজেই ফুরায়। সেই বড় ঝরণার ধারে পেঁাছাই। কয়েকটি ধারা নেমে আসে পাহাড়ের মাথা থেকে। প্রচণ্ড শব্দ তুলে। অপরূপা সুন্দরী লাস্যময়ী গিরিনন্দিনী নয়,—উন্মত্ত প্রবাহিনীর সংহারিণী মূর্তি। ত্রিশূল হাতে নেমে আসে ভৈরবী। গৈরিকবসনা। অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি তুলে।

চারিপাশে পাহাড়ের প্রকাণ্ড ধ্বস,—প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার ধ্বংসাবশেষ।

সাবধানে ধারাগুলি পার হয়ে অপর দিকে গিয়েই আবার চড়াই সুরু। এখন কেবলি চড়াই। ঘুরে ঘুরে উঠেই চলি। অনেকখানি উঠে এসে দু'তিনটে ঝুপড়ির ভাঙা দেওয়ালের অংশ দেখি। ছাউনি নেই। অদূরে কয়েকটা ছোট ছোট গাছও। পোর্টাররা কয়েকটা শুকনা ডালপালা সংগ্রহ করে, আগুন জ্বালায়। চা তৈরী করে দুপুরের আহারও সারা হয়। গাইড বলে, যাত্রীরা মেলার সময় এইসব জায়গায় আশ্রয় নেয়। শুনি, গোসাঁইকুণ্ডের উৎসব-মেলা, শ্রাবণী পূর্ণিমায়, রাখিবন্ধনের দিন।

শের্বাকিরণ ভাঙা দেওয়ালের পাশে কি যেন দেখে এগিয়ে যায়। ফিরে এসে বলে, যা ভাবছিলাম তাই,—কাল রাত্রে এখানে কে আগুন জ্বালিয়েছিল, টাটকা পোড়া কাঠ। এখনও ধোঁয়া উঠছে। আমাদের এঞ্জিনীয়ার নয় তো? দেখে মনে হয়, রাত কাটিয়েছিল এইখানে। ওরা কি তাহলে কাল পেঁাছয় নি, আজ সকালে গেছে?

বলি, গিয়ে জানতে পারবে। আমরা আজ ঠিকমত পেঁাছতে পারব তো? —বলে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের চূড়া যেমন উঁচু ছিল, মনে হয়, তেমনিই আছে! এতখানি চড়াই ভেঙেও দূরত্ব যেন কিছুই কমে নি! অচল হিমালয়ের অদ্ভুত খেলা। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকেও যেন কেবলি দূরে সরে যায়। এগিয়ে গেলেও কাছে আসে না, ধরা দেয় না। এ যেন সেই ঈশোপনিষদ-এর তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ!

তবুও ধরতেই হবে। এইভাবেই তো হিমালয়-পথের শিক্ষাদান! উৎসাহে হাঁটতে থাকি। চড়াই-চড়াই-চড়াই। ধীরে ধীরে পা বাড়াই। মাঝে মাঝে মাথা তুলে তাকাই। পাহাড়ের শিখরদেশ নিকটে এল কিনা। কিন্তু কোথায় কি! সেই আকাশ-ছোঁয়া চূড়া তেমনি দূরেই মনে হয়! ধরার মানুষের কাছে ধরা দেবার যেন কোন লক্ষণই নেই।

ভাবি, আর উপরের দিকে তাকানো নয়। মাথা হেঁট করে চড়াইপথে চড়তেই থাকি। মন ভোলাবার খোরাকও মেলে। পথের আশপাশে ফুলের মেলা। ছোট বড় ঝরনার ধারা। গান গেয়ে নেমে চলে আপন মনে। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটুকরা সমতলভূমি। এখানে ওখানে ছড়ানো

শিলাখণ্ড। গাইড বলে, পাহাড় কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে, বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। সামনে এখনও খাড়া চড়াই বাকি।

বাকি বলেই বেশিক্ষণ বসতে মন চায় না। উঠে আবার চলতে সুরু করি। আড়চোখে উপরের দিকে দৃষ্টি ফেলি। এখনও ঐ ক-তো দূরে পাহাড়ের চূড়া!

একটা সাদা মেঘ আকাশে ভেসে এসে পাহাড়ের মাথায় ঠেকে, আবার উড়ে চলে। যেন, তীরে তরী লেগে আবার নীল সাগর ভেসে চলে।

মানসলোকের আকাশে মনও আমার মেঘ হয়ে উঠে যেতে চায়।

এবার পথের উপর শুধু ঝবাপাথর, বালি, কাঁকর, শিলাস্তূপ। পাহাড়ের চূড়ার শেষ চড়াই। মই বেয়ে ওঠার মত খাড়া ওঠা। পথের রেখামাত্রও নেই। যেখান দিয়ে পারা যায় উঠে চলা। শুধু,—উপরদিকে লক্ষ্য করে,—ঐ প্রকাণ্ড পাথরটার কাছে গিয়ে উঠতেই হবে।

ধীরে ধীরে উঠলেও এতক্ষণে বুঝতে পারি, দেহে অপরিসীম ক্লান্তি নেমেছে। পা দুটো যেন লোহার মুগুরের মত অতি ভারী। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পেটে। মাথার ভিতরও কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। চোখে জ্বালা জাগে। গলা শুকনা কাঠ। জানা আছে, এ-সবই পাহাড়ের উচ্চতা—altitude-এর প্রভাব-জনিত। অথচ মনে হয় না হাজার পনেরো ফুট-এর বেশি উপরে এসেছি। আমার কাছে এ-উচ্চতা নতুন নয়। এমন উঁচুতে উঠে আগে তো কখনও এতখানি অস্বাভাবিক বোধ হয় নি।

তখনি মনে পড়ে, হিসাবে ভুল আমারই। সে-আমিও তো আর নেই। বছরের পর বছর এগিয়ে চলে। মানুষের বয়সও বাড়ে। শক্তিও কমে। এতদিনে পাহাড় মনে করিয়ে দেয়, বয়সেরও ধর্ম আছে, সে-ধর্ম মেনে চলাই উচিত। তবু মনের বল হারাই না। বিশ্বাস রাখি, হিমালয়ের অশেষ করুণা পথের শেষে পৌঁছে দেবেই।

দেনও তাই। নিবিষ্ট মনে অতি ধীরে পা ফেলে এগোতে থাকি। মনে হয় কোথা থেকে কে যেন এসে অলক্ষ্যে হাত ধরে নিয়ে চলেন। মনেপ্রাণে নিজেকে সঁপে দিই তাঁরই হাতে।

হঠাৎ দেখি, পৌঁছে গেছি পাহাড়ের মাথায়!

অনেকখানি সমতলভূমি। ছড়ানো শিলাস্তূপ। তিব্বতী পতাকা। চোর্‌টেন্‌স্‌-স্তূপ। গাইড ও পোর্টাররা cairn-এ পাথর সাজায়। প্রচণ্ড বাতাস। কে যেন শ্রান্তদেহে সজোরে শীতল বাজন করে।—আঃ! কী তৃপ্তি! মনভরা অসীম আনন্দ। কি জানি, কেন, দুচোখ বেয়ে জলধারা নামে। হৃদয়ভরে প্রণতি জানাই। কাকে? তাও কি জানি?

শেষকিরণের ডাকে চমক ভাঙে। চেঁচিয়ে ডাকে, এগিয়ে আসুন—এইদিকে —নীচে হ্রদ দেখা যায়। পা ফেলতে দেখি, এ কী! কোথায় গেল দেহের

সেই ক্লান্তি ও অবসাদ ? হিমালয়-পথের ক্ষণস্থায়ী শারীরিক গ্লানি হিমালয়ই নিজহাতে যেন মুছে দেন। এ-যেন, অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে বিশুদ্ধ করা। নবীন উৎসাহে এগিয়ে যাই। পাশ-এর নাম শুনি, বালমু-শিশা—balmushissah। হাজার পনেরো ফুটের কাছাকাছি উঁচু হবে। ওদিকে পাহাড়ের ঢালু গা। কিছু নীচে পাহাড়ের কোলে বিশাল হ্রদ। স্বচ্ছ নীল জল টলমল করে। হ্রদের অপর দিকে স্তরে স্তরে গিরিশ্রেণী। দূরে তুষারশুভ্র শৈলশিখর। প্রকৃতির অপরূপ রূপরাশি। যেন দিগন্তবিস্তৃত মহাসাগর। পাহাড়ের পর পাহাড়ের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ কার মন্ত্রবলে স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের মাথায় তরঙ্গশীর্ষে পুঞ্জীভূত হংসশুভ্র তুষার-ফেনার উজ্জ্বল দীপ্তি। এই বিশ্বের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ার মুহূর্তে যেন শিলীভূত ঊর্মিরাশি।

সোৎসাহে নেমে চলি হ্রদের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাই। কিন্তু দিনের যাত্রা শেষ হয় না। গোসাঁইকুণ্ড এখনও কিছুদূরে। পাহাড়ের এ-অঞ্চলে হ্রদ একটিই নয়। বিভিন্ন স্তরে সারি সারি একাধিক হ্রদ। যেন নীল পদ্মের মালা। গিরিরাজের শিরোশোভা।

পাশ-এর নীচেই সব চেয়ে উপরে এটি সূর্যকুণ্ড। কিন্তু সূর্য ওদিকে পাটে বসেন। তাই এই হ্রদের তীরে আর বিলম্ব নয়। হ্রদের পাড় ঘুরে এগিয়ে চলি। খানিক যেতেই নীচে অপর আর এক হ্রদ দেখা দেয়। পাহাড়ের গা বেয়ে সেখানে নামি। আবার এগিয়ে গিয়ে আরও নীচে আর এক স্তরে আরও হ্রদ। সেটিও পাশে রেখে এগিয়ে চলা। আবার নীচে আর এক হ্রদ। এ-যেন হ্রদেরই রাজ্য।

কিন্তু হ্রদগুলি পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। সূর্যকুণ্ড থেকে একটি জলের ধারা নীচের হ্রদে লাফিয়ে পড়ে। সে-হ্রদ থেকেও আর এক জলস্রোত আরও নীচের হ্রদের বুকে ঝাঁপায়। এইভাবে সব হ্রদগুলিই জলধারার একই সূত্রে যেন গাঁথা। হ্রদগুলির স্বতন্ত্র নামও আছে, সরস্বতী কুণ্ড, রক্তকুণ্ড, দুধকুণ্ড, নাগকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড ইত্যাদি। চতুর্থ হ্রদটিই সর্বপ্রধান—গোসাঁইকুণ্ড। সব চেয়ে বৃহৎ আকারও।

গোসাঁইকুণ্ডের তীরের পাহাড়ের উপর যখন পৌঁছুই, নীচে বহুদূরে হ্রদের অপর কোণে ধর্মশালার ঘরখানি ছোট্ট দেখায়। কোথাও গাছপালা নেই। শুধু পাহাড়, পাথর,—আর হ্রদের সুনির্মল স্বচ্ছ জলরাশি। দিনের আলো কমে আসে। আরও দ্রুতগতিতে শেষ পথটুকু এগিয়ে চলি। হঠাৎ পাহাড়ের এক বাঁকে সুইস-ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে দেখা। শেষকিরণের হাত ধরে বলে, পৌঁছে গেলে তোমরা ? দূর থেকে দেখতে পেয়েই ছুটে আসছি—সাদর অভ্যর্থনা জানাতে।—আঙ্গুল তুলে দেখায়, হ্রদের ঐদিকের পাহাড়ের ঐ চূড়ায় আজ উঠেছিলাম,—অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু এখন এখানে দেখছি নিকটের কোন পাহাড়ের মাথায় বরফ নেই। বরফ পড়া শুরু হলে আরও কতো সুন্দর দেখাবে।

শেষকিরণ বলে, তোমরা পেঁছুলে কবে ?

ওঃ! সে-কথা বলা হয়নি। আজই সকালে। সঙ্গের লোকটা একদিনে কোনমতেই এল না। পথে এক জায়গায় খোলা আকাশের নীচে bivouac করা গেল মজা করে। সে-আনন্দ ভোলবার নয়।

শেষকিরণ বলে, জায়গাটা আমরা দেখেছি, দুপুরে আমরাও সেইখানে বিশ্রাম নিয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে নেমে আসি সরোবরের ধারে। তারপর তীর ধরে এগিয়ে যাই হ্রদের অপর কোণে। ধর্মশালায় পেঁছুই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোর মাঝে। চারিদিকে কেমন এক মায়ার খেলা। আকাশে মেঘ জমে। পাহাড়ে ছায়া ফেলে। দৈত্যাকার পাহাড়ের শ্রেণী। নীলজলের স্বচ্ছ শ্যামশোভা। যেন অন্ধকার বনে ভীতচকিত হরিণের জ্বলজ্বলে চাহনি।

তীরের সামান্য উপরে লম্বা পাথরের ঘর। টিনের ছাদ। ভিতরের তক্তা-বিছানো মেজে। তারই একপাশে মালপত্র রাখি। শয্যাও পাতি।

হিমালয়ের অসীম কৃপা। পেঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নামে। টিনের ছাদে মাদল বাজে। শেষকিরণ বলে, যেন আমাদের পেঁছানোরই অপেক্ষায় ছিল।

পোর্টাররা রান্না চাপায়। বৃষ্টির মধ্যেই হ্রদে গিয়ে জল আনে। গাইড বলে, বাইরে এবার বরফও পড়া শুরু হোল।

জল গরম করে শেষকিরণ গুঁড়া দুধ দিয়ে কফি তৈরি করে। বিছানা ছেড়ে আমাকে উঠতে দেয় না। এঞ্জিনীয়ারকেও কাছে ডাকে। ভাগাভাগি করে সবাই খাই। শুধু খাওয়ারই তৃপ্তি নয়। হিমালয়ের এই একান্ত নিভৃত সুদুর্গম অঞ্চলে মানুষে মানুষে হৃদয়ের অব্যক্ত আনন্দের আদানপ্রদান। হিংসাদ্বেষ নয়, রেষারেষি নয়,—বিশ্বপ্রকৃতির অপাপবিদ্ধ কল্যাণময় অপার সৌন্দর্যে আত্মহারা মানবের পরস্পরের মিলন।

রাত্রে গাঢ় ঘুম আসে না। প্রচণ্ড শীত। সারাদেহেও বেদনা। কেমন এক আচ্ছন্ন ভাব। শেষরাতে উঠে বাইরে যাই। আকাশ মেঘশূন্য। তারায় ভরা। রাত্রের বর্ষণের ফলে পাহাড়ের মাথায় তুষার জমা। উজ্জ্বলকান্তি দেখায়। পাহাড়ের মাথায় কাছে বোধ হয় ত্রয়োদশীরই একফালি চাঁদ। দেখায় যেন চন্দ্রমৌলি দেবাদিদেব মহাদেব কপালে বিভূতির প্রলেপ মেখে গভীর ধ্যানাসীন। অদূরে ঘন নীল কাঁচের মত হ্রদের স্বচ্ছ বারিরাশি। জলের বুকে পাহাড়ের প্রতিবিম্ব দোলে। আকাশের চাঁদ ও তারার দলও সেই জলমুকুরে আপন ছায়া দেখে।

মনে হয়, ক্ষীরোদ সাগরে অনন্তশয়নে শ্রীবিষ্ণু নন—স্বয়ং শিবসুন্দর! তন্ময় হয়ে দেখি।

তখনি স্মরণে আসে ঠিকই তো! এই হ্রদের কিংবদন্তীও শিবকেই কেন্দ্র করে।

সমুদ্র মন্থনে উত্থিত গরল পান করে শিবেরও কণ্ঠে জ্বালা ধরে। ত্রিশূলে দিয়ে তিনি হিমাগিরির শৈল-বুকে আঘাত হানেন। তখনি এই বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। সরোবরের হিমশীতল জলে নীলকণ্ঠ বিষজর্জর দেহের প্রদাহ জুড়ান। সেই বারিশয্যায় শায়িত থাকেন। সেই কারণেই এই হ্রদের নামকরণও —গোসাঁইকুণ্ড। গোস্বামী—জগদীশ্বর। বড় গোসাঁই,—শিবেরই নাম। সারা উত্তরভারতে এ নামের বহু প্রচলনও। বিশেষতঃ, বাঙলাদেশে। উত্তরভারত ও বঙ্গদেশের সঙ্গে তিব্বত ও নেপালের দীর্ঘকালের সংযোগ। নেপালেও এই গোসাঁই নামের প্রচার আশ্চর্য কি? ভাবি কি জানি হয়ত বাঙালী অতীশ—শ্রীজ্ঞান দীপংকরেরই দেওয়া। তিনি তো নেপালের মধ্যে দিয়েই তিব্বতে যান।

অতীশ দীপংকরের জীবন যেমন পরম আশ্চর্যময়, তেমনি ধর্মোজ্জ্বলও।

আমরা আর ঘুরি কতোটুকু? তিনি ছিলেন মহাসমুদ্র। আমরা গোষ্পদ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ৯৮২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজবংশে তাঁর জন্ম। ঢাকা বিক্রমপুরের নিকটে। একত্রিশ বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধভিক্ষু হন। কোথায় সেই সুদূর প্রাচ্যে সুবর্ণদ্বীপ—সুমাত্রা,—সমুদ্রপথে সেখানে চলে যান সুপ্রাসিদ্ধ আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট ধর্ম শিক্ষা নিতে। বারো বছর সেখানে কাটান। সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফেরবার পথে তাম্রদ্বীপে—সিংহলেও—নামেন। তারপর বজ্রাসনে—বুদ্ধগয়ায় এসে থাকেন। রাজা মহীপাল বিক্রমশীলায় তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন। বাঙালী অতীশের তখন নাম হয়েছে শ্রীজ্ঞান দীপংকর। সেইখানে বাসকালে পশ্চিম তিব্বতে Gu-Ger রাজা Ye-ses-od বার বার দীপংকরকে নিমন্ত্রণ জানান তিব্বতে আসার জন্যে। দীপংকর যাত্রা করেন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নেপালের মধ্যে দিয়ে তাঁর তিব্বতে প্রবেশ। সেখানে মানসসরোবরে তর্পণ ও শ্রীকৈলাস দর্শন করেন। পশ্চিম তিব্বতের সুপ্রাচীন থোলিং—Tholing-মঠে গিয়ে থাকেন। বিশুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিব্বতের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেন। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে লাসা শহরের নিকটে তাঁর দেহাবসান হয়।

এই বাঙালী দীপংকরেরই প্রচারিত ধর্মের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে তিব্বতে Gelugpa (Yellow robed) লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়, দলাইলামার প্রতিষ্ঠা ও তাঁর অসীম প্রভাব প্রতিপত্তিও এই সম্প্রদায়েরই মূলে।

হাজার বছর আগে বাঙালীর সে এক অমর কীর্তিকাহিনী।

গোসাঁইকুণ্ডের তীরে বসে সেই সব কথাই মনে পড়ে।

হ্রদ থেকে উৎপন্ন নদীর জলধারার নাম হয়—ত্রিশূলী। শিবের হাতের ত্রিশূলের আঘাতে সৃষ্ট হ্রদ থেকে জন্ম বলে। ত্রিশূলীগণ্ডকের এও এক উৎসমুখ।

সকালের আলো ফোটে। শেষকিরণ যায় নিকটের গিরিশিখরে। ফিরে এসে বলে, ওপর থেকে অপূর্ব দৃশ্য। গণেশহিমল (২৪, ২৯৯ ফুট), লাংটং-হিমল (২৩, ৭৭১ ফুট), দোরজেলাকপা (২২, ৯২৯ ফুট)—চূড়াগুলি সামনেই, যেন হাতের নাগালেই।

ঘুরে বেড়াই হ্রদের ধারে। তীর্থস্থান। তবু, কোন মন্দির নেই। ধর্মশালার নিকটে হ্রদের একটু উপরে পাথর সাজিয়ে গাঁথা বেদী। তারই মাঝখানে মুক্ত আকাশের নীচে শিবলিঙ্গ। পিছনে কয়টা কাঠের খুঁটি। রঙিন ধ্বজা ওড়ে। প্রশস্ত হ্রদ। ডিম্বাকার। নেপালের ট্যুরিস্ট দপ্তরে লেখে, ১৪,৩৭৪ ফুট উঁচুতে। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে। হেলমু থেকে মাইল পনেরো।

হ্রদের দীর্ঘতা মাইলখানেক প্রায় হবে, প্রস্থে হয়ত আধ মাইল।

হ্রদের তীরে বসি। চারিদিক শান্ত, স্তব্ধ। যেন, পটে আঁকা চিত্র। স্বচ্ছ জলে প্রভাতের আলো ঝিক্‌মিক্‌ করে। দেখে মনে হয়, হ্রদ তো নয়, এ-যেন ধরিত্রীমাতার উন্মীলিত নীলাভ নয়ন। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন ঐ মেঘহীন সুনীল আকাশপানে। কী অপরূপ স্নেহভরা মধুর চাহনি! মনে পড়ে, মনীষী **Henry David Thoreau**-র উক্তি,—এক সরোবরের রূপবর্ণনা দিতে লেখেন —"**the landscape's most beautiful and expressive feature. It is earth's eye, looking into which the boholder measures the depth of his own nature.**"

কথাগুলির নিহিতার্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

নিশ্চিন্ত মনে নিঃসঙ্কোচে সেই মঙ্গলময় সৃষ্টির মাঝে নিজেকে ধরা দিই। সীমাহীন অপার্থিব আনন্দে মন ভরে ওঠে।

হঠাৎ মেঘ উড়ে আসে। সামান্য তুষারপাত হয়। কিছু পরে আবার আকাশ মেঘশূন্য, রৌদ্রদীপ্ত। শেষকিরণ আসে গামছা কাপড় হাতে, বলে, আসুন, স্নান করে নিই।

হ্রদের জলে গা হাত পা মুছি, মাথায়ও দিই। দেহে মনে পরিতৃপ্তি আনে।

দিনের আহার শেষ করে সাড়ে দশটায় আবার যাত্রা শুরু হয়। নতুন পথে। এঞ্জিনীয়ার ফিরে চলে, যে-পথে এসেছিল, সেই পথ ধরে। বিদায় নেবার সময় বলে যায়, আবার হয়ত দেখা হবে হিমালয়ের কোনখানে। নিশ্চয় আসব আবার ফিরে।

শুনে হাসি। ভাবি, সে কী দেখতে এসে কি-ই বা পেয়ে গেল যার দুর্বার আকর্ষণে আবার এই হিমালয়ে আসতে চায়,—তার ব্যাখ্যা কি কেউ দিতে পারে?

হ্রদ থেকে ফেরবার পথের বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

গোঁসাইকুণ্ড ছাড়িয়ে এসে আবার ওদিকের পথের পাশেও হ্রদ পাই। হ্রদ থেকে হ্রদান্তরে লাফিয়ে-পড়া সেই জলধারা এ-হ্রদেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। পথের নীচে আরও হ্রদ দেখা যায়। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে রাস্তা চড়াই বেয়ে উঠে চলে পাহাড়ের মাথার দিকে। বিশুষ্ক উলঙ্গ পাহাড়ের গা বেয়ে

ওঠা। তবে, চড়াই বেশি নয়। খানিক গিয়েই উৎরাই শুরু হয়। সুমুখে দিগন্তপ্রসারী পাহাড়ের সারি। একটার পর একটা মাথা তুলে। দূরে তুষার-শিখর। পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল আকারে বহুনীচে পথ নামে। আমরাও নামতে থাকি। এবার কেবলই নেমে চলা। কখনো শিলাস্তূপের মধ্যে দিয়ে, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, কখন বা স্নিগ্ধ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মালভূমির উপর দিয়ে। সেখানে ফুলের মেলা ; ঝরণার খেলা। ক্রমে গাছপালা নিকটে আসে। বনভূমি শুরু হয়। কিন্তু নামার আর শেষ হয় না। অনেক দূর এসে বনের ধারে সুন্দর বাড়ি। বৌদ্ধমঠ। সিংগোমুফা। এদিকের এই প্রথম লোকালয়। মনোরম পরিবেশ। গুম্ফার কয়েকটি ঘর। বড় বাগান। নিকটেই ঝরণা। চার-পাঁচজন সহকর্মী নিয়ে লামা থাকেন। বাগানের পাশে একটা লম্বা ঘর দেখিয়ে সহকর্মী বলেন, ওখানে সরকারী চিজ্—পনির তৈরির আয়োজন হচ্ছে।

সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে লামা থাকতে চান। চা খাওয়ান। সন্ধ্যার আহারও একসঙ্গেই হয়।

গুম্ফার হল-এ প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি। তারই সামনে কাঠের মেজেতে শয্যা পেতে সুখনিদ্রা দিই।

গাইড্ এখান থেকে মালেমচি ফিরে যাবে। বলে, এরপর পথ ভুল করার আশঙ্কা নেই। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে পোর্টারদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি—পাহাড়ের ওদিকে দাঁড়িয়ে।

পরের দিন। সকাল ৬॥ টায় আবার চলা। গুম্ফা ছাড়তেই গভীর বন। তারই মধ্য দিয়ে সরু পথে হুড়হুড় করে নেমে চলা। মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড় দেখা যায়, আবার তখনি বনের গাছপালা যেন ঘিরে ধরে। এক জায়গায় পথ দুভাগ হয়। পোর্টাররা থমকে দাঁড়ায়। পরামর্শ করে। দুদিকেই একটু এগিয়ে দেখে। তারপর বাঁদিকের পথ ধরে চলতে থাকে। আমাদের সন্দেহ হয়, ভুল পথ ধরল কিনা। কোথাও কোন জনমানব নেই যে জিজ্ঞাসা করা যাবে। এদিকে, পথ কেবলি নামতে থাকে। বোঝা যায়, বহুনীচে নদীর উপত্যকা, সেইদিকেই চলে। মনে ভাবনা জাগে, যদি ভুল পথ ধরে থাকি, আবার এই উৎরাই দুর্দান্ত চড়াইরূপে ভেঙে উঠতে হবে। অযথা সময় যাবে, দেহেরও অতিরিক্ত পরিশ্রম হবে। শের্ষাকিরণ পোর্টারদের বোঝায় ; তারা সরল ভাবে স্বীকার করে, পথ তো তারা চেনে না, তবে মনে করে ঠিক পথেই চলেছি। না হয়, ফিরে আসব।

শের্ষাকিরণ হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলে, বলাটা তো বেশ সহজ, কিন্তু এই চড়াই ভেঙে আসা কি তেমন সহজ হবে ?

গভীর অরণ্য। নিঃসীম নিস্তব্ধতা। মনের মধ্যেও গভীর দুর্ভাবনা। কিন্তু করবারই কি আছে ? ভাবি, ভাগ্যে দুর্ভোগ থাকে, ভুগতেই হবে।

অনেকখানি নামবার পর শের্ষাকিরণ হঠাৎ কান খাড়া করে দাঁড়ায়,—চমকে-ওঠা হরিণের মতন। ঘাড় বেঁকিয়ে বলে, চুপ, ঘণ্টার শব্দ শুনছেন না ?

নিশ্চয় গরু মোষ চরছে, তাহলে লোকও আছে।

শব্দ ধরে বনের মধ্যে পোর্টারদের একজনকে নিয়ে এগিয়ে যায়। অল্প পরে ফিরে আসে হাসিমুখে। বলে, ঠিক পথ ধরেই চলেছি,—যাক্ বাবা!

ফিরে-পাওয়া উৎসাহ নিয়ে নেমে চলি,—হুড়হুড় করে। নদীর ধারে পেঁছুই। পাহাড়ী নদী। বোধ হয়, সেই হ্রদ থেকে বেরিয়ে-আসা ত্রিশূলী খোলা। এখানে ছোট ধারা নয়। খরস্রোতে হুংকার তুলে দুদিকের পাহাড় কেটে নেমে চলে দুরন্ত নদী। দুপাশেই ঘন বন। নদীর তীর ধরে সরু পথ। চারিপাশে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর অরণ্যশোভা। হাসি পায় মনে। ভাবি, এই গহন বন, ঐ নদী, এই মনোরম পথ,—অল্প আগেই মনে উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল, এখন এদেরই মধ্যে আবার সৌন্দর্য বোধ করি। চোখ যেন জানালা, দেখে শুধু মন। কিন্তু সত্যিকার দেখে সে কোন্ জন? তাই ভাবি। মনে পড়ে,

যচ্চক্ষুষান পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

নদীর উপর কাঠের পুল। ওপারে তীরে শিবমন্দির। দুটো চালাঘর। তিন-চারজন লোকও। সেইখানে বিশ্রাম নেওয়া হয়। ভুট্টার খই ভাজিয়ে চা খাওয়াও হয়। দুপুরের আহারও শেষ করি।

এবার এপারের পাহাড়ের উপর দিকে পথ উঠতে থাকে। রাস্তাও এতক্ষণে প্রশস্ত হয়। চড়াইও অল্প, দুর্গম নয়। ঘণ্টাখানেক চলার পর বেশ বড় গ্রাম। অনেক ঘরবাড়ি, দোকানপাট, লোকজন। তিব্বতী বড় মনাস্ট্রীও। গ্রামের নাম ধুনজে। প্রায় ন'হাজার ফুট উঁচু। গোসাঁইকুণ্ড থেকে মাইল পনেরো, শুনি। সুমুখের পাহাড়ের গায়ে আর একটা রাস্তা দেখা যায়। লাংটাং যাবার ঐ পথ।

গ্রামে আর দাঁড়াই না। আজ সারাদিনই পথ চলার বাসনা। আগামী কালই ত্রিশূলীবাজার পেঁছানোর উদ্দেশ্য। সেখান থেকে কাঠমাণ্ডু বাস চলে।

তাই চলতে থাকি। পাহাড়ের গা দিয়ে সুন্দর পথ। দেখে মনে হয় সমতল। কিন্তু ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। চলার গতিবেগও বাড়ে। পথে লোক চলাচল আছে। মাঝে মাঝে গ্রাম পড়ে। বিকালে তেমনি এক গ্রামের দোকানে বসে চা খাওয়ার মাঝে ক্ষণিক বিশ্রাম হয়। নেপালী মিলিটারী একটা দল সেখানে নীচে থেকে এসে পেঁছায়। দলপতির সঙ্গে শেষকিরণ আলাপ জমায়। তাদের চা-বিস্কুট খাওয়ায়। অল্প পরে কাছে এসে গম্ভীর ভাবে জানায়, খবর নিয়ে এলাম। এরা চলেছে উত্তরদিকে সেই লাংটংহিমলের পথে। তবে পরে সে-পথ ছেড়ে দিয়ে ওরা যাবে রসুয়াগরহি পাশ-এ। ত্রিশূলী-গঙ্গার যে-ধারা তিব্বত থেকে বেরিয়ে হিমালয় ভেদ করে নেপালে ঢুকেছে,—সেই অঞ্চলে। তিব্বত সীমান্তের ঘাঁটিতে এদের 'ডিউটি' পড়েছে। আমি কিন্তু ভেবে রেখেছি, পরের বার নেপালে এসে ঐ লাংটং-এ যেতেই হবে। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা নাকি।

বলি, খুব ভাল কথাই। কিন্তু আপাততঃ এখন আর দেরি করা নয়। এখনও বেলা আছে। আরও কিছু এগোনো যাবে। দোকানদারের কাছে খবর নিলাম, মাইল দুই গেলেই আবার গ্রাম পাব।

শেষকিরন চলতে চলতে গল্প করে, তার প্যাংটংভ্যালির পরিকল্পিত ভ্রমণ সম্পর্কে। উৎসাহভরে বলে, আপনিও তো আসবেন নিশ্চয় ?

আমি হাসি। তার এখন নবীন রঙীন স্বপ্ন দেখার যৌবন। আমার এখন ভাঙা হাটের পালা। গোসাঁইকুণ্ড দর্শনের আশা পূর্ণ হয়েছে, এখন আবার নিশ্চিন্ত মনে একান্তে শান্তভাবে কোথাও নিভৃত বাস :

পরের গ্রামে পোঁছাই। বেলা প্রায় শেষ। কিন্তু, গ্রামে আশ্রয় মেলে না। খান চার-পাঁচ মাত্র চালাঘর। যেমন নোওরা তেমনি লোকগুলিরও নেশার ভাবে বেসামাল অবস্থা। তাদের সঙ্গে থাকতেও ভরসা হয় না, মনও চায় না।

অগত্যা আবও এগিয়ে চলা। চলতে চলতে অন্ধকার নামে। কোথা দিয়ে কি ভাবে যাই, ভাল করে দেখতেই পাই না। শেষকিরণ পাশে পাশে চলে। মাঝে মাঝে পথের উপর নেমে আসা ঝরনার ধারা, পাথরে পাথরে পা দিয়ে পার হওয়া। ওদিকে আকাশেও কালো মেঘ জমে, বিদ্যুতের চমক জাগে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় লাগে। অল্প পরেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নামে। শেষকিরণের দুশ্চিন্তা জাগে। হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে, ধরে চলবেন নাকি ?

হেসে বলি, কোনও ভয় নেই। পা দুটোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি,— চলে যাব ঠিক। [illegible]

ভাগ্যক্রমে ঠিকভাবেই পরের গ্রামে পৌঁছে যাই। নাম শুনি, বামচে। সাত হাজার ফুট উঁচু। চারিদিক নিবিড় আঁধার। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি। পথের পাশে চালাঘরে দোকা[illegible] মিটমিট করে আলো জ্বলে। কয়টা লোক জটলা করে। কথা বলতে গিয়ে বোঝা যায়,—এরাও নেশায় চুর।—বহু নীচে দূরে ত্রিশূলীবাজার শহরের বিজলী আলো অন্ধকারের বুকে জোনাকির মত জ্বলে। দেখে মনে কীসের যেন আশা জাগায় :

পথের খানিক উপরে একটা দোতলা বাড়ির উপরতলায় প্রকাণ্ড খালি ঘরে থাকবার ব্যবস্থা কোনরকমে করা হয়। উপরে টিনের ছাদ। ঘরে ঢুকে মা[illegible] খোলবার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। টিনের উপর প্রচণ্ড শব্দ তোলে। শেষকিরণ হেসে বলে, শুনছেন বৃষ্টির ধারাগুলো কি বলছে ?—"খুব পালিয়ে এসেছ ঘরের মধ্যে। ধরতে পারলাম না পথে। একটুর জন্যে বেঁচে গেলে।"

বলি, সত্যিই তাই। এ-দুর্যোগ পথে নামলে অন্ধকারে হয়েছিল আর কী।

পরের দিন ভোরে আকাশ পরিষ্কার। দিগন্ত[illegible] হাসেন। গতকালের

দুর্যোগ দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে।

আনন্দে উৎসাহে পথ চলা আবার। আজই হাঁটাপথের সমাপ্তি!

আবার একটানা নেমে চলা। পথ প্রশস্ত। কখন সহজ সরল, কোথাও বা ভাঙা পাথর বিছানো, সেখানে চলার ব্যাঘাতও জাগায়।

পাহাড়ের গায়ে চাষের জমি। ছোট ছোট গ্রাম। পা চলে, বেলা বাড়ে। ৯-১৫ বাজে। পথের ধারে গ্রামের দোকান। শেষকিরণ বলে, এক কাপ করে চা খাওয়া যাক।—দোকানে ঢুকে উনানের নিকটে তৈরি ভাত-ডাল দেখে মত বদলায়। বলে, দুপুরের খাওয়াই সেরে নিলে হয়। দইও রয়েছে দেখছি।

বলি, বুদ্ধিমানেরই মত কথা।

ঘরের নিকটেই ঝরণা। কাকস্নান সেরে খাওয়াদাওয়া, ক্ষণিক বিশ্রাম করে আবার প্রস্তুত। এখান থেকে সোজা ত্রিশূলীবাজার। হাঁটার পর্ব শেষ।

কিন্তু পাহাড়ে হাঁটার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের সমাপ্তি নয়। দোকানের পাশের আর এক ঘরে বিদেশী তিন মূর্তি টুরিস্ট রুক্‌স্যাক্‌ আদি পিঠে ঝুলিয়ে ওঠে। শেষকিরণ যথারীতি তখনি খোঁজখবর নিতে যায়। 'আমেরিকান্‌ পিস্‌ কোর্‌'-এর লোক। চলেছে লাংটং ভ্যালিতে। সঙ্গে শেরপা, পোর্টার আছে।—শেষকিরণ বলে, খাসা আছে, কাঠমাণ্ডুতে কি করে জানি না, তবে হিমালয়ে ঘোরবার সুযোগ পায় খুব।—মনে থাকে যেন, লাংটং-এ আমাদেরও নিশ্চয় আসতেই হবে—দেরি নয়, আসছে বছরেই!

আবার যাত্রা। কেবলি নামাও। অবশেষে উৎরাই পথের শেষ হয়। প্রকাণ্ড গ্রাম। পাশেই সুন্দরী গিরি নদী,—নামও অতি সুন্দর,—বেত্রবতী। গ্রামের নামও তাই। নিকটেই ত্রিশূলী-বেত্রবতী সঙ্গম। বেত্রবতীর উপর বড় পুল। পার হয়ে গ্রামের আরও ঘরবাড়ি, দোকানপাট। একটা জীপ্‌ দাঁড়িয়ে। ক্ষণিক বিশ্রাম নিয়ে বাকি পথ শেষ করার আগ্রহে এগিয়ে চলি। ত্রিশূলীনদীর তীর দিয়ে সোজা পথ। স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকি। ত্রিশূলীবাজার এখান থেকে মাত্র চার মাইল। তবুও পথ শেষ হতেই চায় না। যাত্রা সাঙ্গ করার আকুল আগ্রহ যেন পথের শেষ প্রান্তটিকে কেবলি দূরে ঠেলে রাখে!

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ত্রিশূলীবাজারে এসে পেঁছাই। পাহাড় ঘেরা নদীর উপর ছোট শহর। তিন হাজার ফুট উঁচুতে। আজ আর বাস নেই। রাত্রিবাসের আস্তানার সন্ধান করি। পাহাড়ী শহরের আবহাওয়া। লোক-জনের ভিড়। হোটেলগুলি অপরিচ্ছন্ন। হঠাৎ নদীর পুলের উপর সামনা-সামনি দেখা হয় ভারতীয় এক তরুণের সঙ্গে। নিজে থেকে এসে জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে আসছি, কোথায় চলেছি। ডেরার খোঁজে, শুনে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানায়, চলুন আমার কোয়ার্টার্‌স্‌-এ। জানেন নিশ্চয়, ত্রিশূলী-বাজারের প্রসিদ্ধি এখানকার Hydro-electric Project-এর জন্যে,—আমাদের ভারত সরকারের সহযোগিতায় এই পরিকল্প। এখন চালু হয়ে

গেছে, তবু কয়েকজন ভারতীয় এখনও আমরা এখানে রয়েছি। বাঙালীও আছেন দু'চারজন। ঐ পাহাড়ের ওপরে যে ঘরবাড়ি দেখছেন, ঐ আমাদের আস্তানা। সামান্য চাকরি করি। আমার বাংলোতে দুখানা মাত্র ঘর। আমার এক বন্ধু—এখানকার স্কুলে পড়ায়—সে আর আমি দুজনে থাকি,—আপনাদের একটা ঘর ছেড়ে দেব,—এক রাত্তিরের তো ব্যাপার,—কষ্ট হবে হয়ত আপনাদের,—তা হলেও চলুন—কোথায় হোটেলে উঠবেন?

একরকম জোর করেই নিয়ে চলে। উত্তরপ্রদেশে এর বাড়ি। সাদাসিদে মিশুক ছেলে।- সরল মন। সাদর যত্নসহকারে থাকবার ব্যবস্থা করে। নিজেই রান্না করে খাওয়ায়। বাঙালী দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। হঠাৎ এই সুদূর বিদেশ-বিভুঁই-এ এক স্বদেশবাসীকে পেয়ে সবাই খুব খুশী। আমাদেরও মনে হয় যেন আপনজন।

মাস্টারমশাই বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যার পর। পরিচয় হতে নাম শুনেই বলেন, আশ্চর্য! আজই তো একটা হিন্দী বই-এ এ-নামটা পেয়েছি!

আমি তখন বলি, হিন্দী বই-এ আমার নাম? ভুল করছেন নিশ্চয়।

তিনি তাঁর বিছানার উপর বালিশের তলা থেকে বইটা বার করেন। মলাটটা চোখে পড়তেই চিনতে পারি। নিমিষে সব কথা মনে পড়ে। অনেক দিন আগেকার এক ছোট্ট ঘটনা। অতি সামান্য ব্যাপার। কলকাতাবাসী এক রাজস্থানী ভদ্রলোক গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী তীর্থ থেকে ফিরে এসে হিন্দীতে এক বই লেখেন। কয়েকটা ফটো আমার কাছ থেকে নিয়ে তাতে ছাপান। বই-এর মুখবন্ধে তাই প্রাপ্তিস্বীকার উক্তি!

মাস্টারজী নামটা দেখিয়ে বলেন, এই তো আপনারই নাম। আজই পড়েছি, মনে থাকবে না?

বলি, শিক্ষকতা করেন, তা তো থাকবেই। কিন্তু অবাক হচ্ছি এই অদ্ভুত যোগাযোগে। কোথায় কলকাতা,—কোথায় উত্তরপ্রদেশে আপনার বাড়ি,—কোথায় নেপালে সুদূর হিমালয়ের মধ্যে এই ত্রিশূলীবাজার। আজই আমার নামের সঙ্গে আপনার হঠাৎ পরিচয়, আবার আজকেই আমারই সঙ্গে সাক্ষাৎ-দেখা! ভাবি, জগৎ কতো ছোট, জগতের মানুষ কতো কাছে! শিক্ষার প্রসার, আশ্চর্য তার প্রভাব।

পরের দিন ভোরে বাস ধরি। বাস ছাড়বার আগে সামনের চায়ের দোকানে বসে শেষাকিরণ ও আমি প্রাতঃরাশ সারি। পোর্টার দুজনের হিসাবও মিটিয়ে দিই। তাদের এখান থেকে হেঁটে কাঠমাণ্ডু ফেরবার কথা। শেষাকিরণ বলে, এতদিন একসঙ্গে ঘুরলাম, এখন আমরা যাব বাস-এ, ওরা যাবে হেঁটে—সেই একই জায়গায়!- -এ হোতেই পারে না।

অতএব, তাদের জানানো হয়, আমাদের সঙ্গে বাস-এ চল, ভাড়ার জন্যে ভাবতে হবে না, আমরাই দেব।

বক্তব্যটা তাদের বোঝানো যায় না। ভাষার অন্তরায়। নিকটের টেবিলে

এক নেপালী ভদ্রলোক। একা বসে চা খান। তিনি নিজে থেকে তাদের ভাষায় ব্যাপারটা পোর্টারদের বুঝিয়ে দেন, পোর্টাররাও খুশী হয়।

ঘটনাটা কিছুই নয়। কিন্তু তার পরেও আছে।

ভদ্রলোকের দিকে আমাদের প্রথম দৃষ্টি পড়তেই আমাদের দুজনের মনে একই ভাবের উদয় হয় এবং নীচু গলায় শেষকিরণের কানে কানে সে-সম্পর্কে মন্তব্য করি। শেষকিরণও ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

নেপালী ভদ্রলোকও দেখি যথেষ্ট সচেতন। মুচকে হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলেন, কি বলছেন, বেশ বুঝতে পারছি আমাকে সুভাষচন্দ্রের মতন দেখতে,—এই কথাই তো? আমার এখানে নামই রটে গেছে—নেতাজী! বলে হো হো করে হেসে ওঠেন।

জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু বাংলাটা শিখলেন কোথা থেকে?

কলকাতাতেও যে কিছুকাল কাটিয়েছি।

সুভাষচন্দ্রকে চিনতাম, জানতাম। তিনি যে নন, সে-বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই। তবুও, আশ্চর্য মিল দেখে অবাক্-ই হই। ওদিকে বাস-এর হর্ণ দেয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও আলাপ করার সুযোগ থাকে না।

বাস-এ বসে শেষকিরণ আপন মনে হাসে। জিজ্ঞাসা করি, হোল কী তোমার?

সে বলে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা! বলেন কী! হাসব না? কখনও তো তাঁকে চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। এই নিয়ে চাঞ্চল্যকর এক কাহিনী লিখতেই তো পারেন?

হেসে বলি, তা পারি কই? এই গোসাঁইকুণ্ডের নাতিদুরূহ যাত্রা নিয়েও তো রোমাঞ্চকর গল্প তৈরি হতে পারে, কিন্তু আমার দ্বারা হয়ে ওঠে না।

কাঠমাণ্ডু চুয়াল্লিশ মাইল দূরে। সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ে, সাড়ে বারোটায় পৌঁছেও যাই।

গোসাঁইকুণ্ড-যাত্রা-কাহিনীরও শেষ হয়।

গুপ্তেশ্বর

॥ ১ ॥

দেবতাত্মা হিমালয়ের কথা ছেড়েই দিই, ভারতের বিভিন্ন অংশেও কতো বিচিত্র দর্শনীয় স্থান আত্মগোপন করে থাকে, তারই বা সন্ধান রাখা কি সম্ভব?

স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে নাম শুনি, গুপ্তা। সাধু ভাষায় গুপ্তেশ্বর বা গুপ্তনাথ। হিমালয় পর্বতে নয়। দূর দেশও নয়। বহুদিনের কথাও নয়। এই গত ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। অথচ আজ লিখতে বসে মনে হয়, সুদূর ও নিকট, অতীত ও বর্তমান সবই বুঝি একই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা। মহাকালের বুকে একই মালায় দোলে।

বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর এক নিভৃত গোপন অঞ্চল। ঘনান্ধকার গভীর অরণ্য। পাহাড়ের এক প্রান্তে বিরাট গুহা। অতিকায় দৈত্য যেন মুখব্যাদন করে বসে থাকে। সূচীভেদ্য অন্ধকার সুদূর বিস্তৃত সেই গুহার গহন অভ্যন্তরে গুপ্তেশ্বর মহাদেব। অভিনব আকৃতির বিশাল শিবলিঙ্গ। সেই অজ্ঞাত অখ্যাত দেশে তাঁর অধিষ্ঠান হোল কেন ও কিভাবে এবং তাঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমারই বা ঘটে কেমন করে, তারই কাহিনী শোনাই।

ইস্টার্ণ রেলওয়ের গ্র্যান্ড-কর্ড লাইনে শোন নদীর উপর প্রসিদ্ধ দীর্ঘ সেতু। নদীর এক পারে ডেহরি-অন্-শোণ স্টেশন, অপর পারে শোণনগর জংশন। ডেহরি-অন্-শোণ থেকে এক শাখা রেল-লাইন গিয়েছে রোটাস-এর দিকে। আবার, শোণনগর থেকেও নদীর পূর্ব-কূলেও আর এক লুপ-লাইন চলে যায়। পালামৌ ও হাজারিবাগ জেলার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সে লাইন বরকাখানা হয়ে গোমোতে এসে গ্র্যান্ড-কর্ডএ মেশে। সেই লাইনে শোণনগর থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে জাপ্‌লা স্টেশন। নাম শুনিনি কখনও আগে। কিন্তু 'পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট' নামটা শুনে আসছি বহুকাল থেকে। তারই ফ্যাক্টরী যে এই জাপ্‌লায় এবং সেই কারণেই জাপ্‌লার খ্যাতি,—তা জানলাম এই প্রথম।

হিমালয়ের কুয়ারি-গিরিপথের তরুণ সঙ্গী শের্ষাকরণ কাজ নিয়ে জাপ্‌লায় যায়। পৌঁছেই লেখে, শোণনদের তীরে চমৎকার জায়গা। ধু ধু করছে বালির চর। ওপারে বিন্ধ্যপাহাড়। তারই মাথায় রোটাসগড়। খবর পেলাম, ওপারের ঐ পাহাড় ও জঙ্গল ভেদ করে যায় গুপ্তেশ্বর গুহায় যাবার পায়ে হাঁটা পথ। অদ্ভুত সুন্দর নাকি দৃশ্য। মাইল পনেরো-ষোল মাত্র দূর। কিন্তু গভীর বন। গাইড্-এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সামনেই শিবরাত্রি। গুপ্তেশ্বরের বড় মেলা। চিঠি পেয়েই চলে আসুন। এ সুযোগ কি ছাড়া চলে?

অজানা কীসের এক আকর্ষণ আবার পথে টানে। কালক্ষেপ না করে জাপ্‌লায় চলে আসি।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

এসেই শেষাকিরণকে জানাই, এলাম বটে, কিন্তু গুপতায় যাওয়া যাক ক'দিন পরে। শিবরাত্রির মেলাটা চুকে যাক—অতো ভিড় আমার সহ্য হয় না। এক সপ্তাহ পরে চলো,—নিরিবিলি, মনের শান্তিতে বেশ ঘুরে আসা যাবে।

তরুণ শেষাকিরণের উন্মুখ মন বিলম্ব সয় না। তবু বলে, ভালো, তাই হবে।

॥ ২ ॥

জাপ্‌লাতেই ক'দিন কাটাতে হয়।

নদীর এপারে ফ্যাক্টরী, ওপারে Quarry—চুনা পাথরের খনি। ওপারের পাহাড় ভেঙে পাথর আনে এপারে। সেই পাথর থেকে তৈরি হয় সিমেন্ট। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখি—বিন্ধ্যপাহাড়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ। যেন দেহের মাংস কেটে নেওয়ায় অস্থি-পঞ্জর প্রকট হয়। বালুকাময় নদীর বিস্তীর্ণ বুকে সারি সারি লোহার বিরাট স্তম্ভ। দাম্ভিকের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তারই উপর দিয়ে লম্বা তারের লাইন ঝোলে, ছোট ছোট ট্রলি যাতায়াত করে। ফ্যাক্টরীর রোপ্‌ওয়ে। ওপারের পাথর আসে এপারে।

ভাবি, কোন্‌ অতীত যুগে জন্ম হয় ঐ বিন্ধপর্বতের। কতো কাল বহে যায় ঐ পাথরগুলি জমাট হয়ে গড়ে উঠতে : ভূগর্ভ থেকে বিন্ধ্যপাহাড়ের মাথা তুলতে। কালক্রমে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বুদ্ধিবলে আবার সেই পাহাড় ভাঙে, পাষাণ স্তূপ চূর্ণ করে। সিমেন্ট হয়। সেই মানুষ আবার বিচূর্ণ সিমেন্ট জমায়, রচনা করে ঘর বাড়ি পথ ঘাট শহর। ঐ পাহাড়েরই অংশ ভেঙে সম্পূর্ণ নূতন এক রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়। ওদিকে কালের চক্র ঘুরতে থাকে। আবার মহেঞ্জোদারো, তক্ষশীলা, নালন্দার ভগ্নস্তূপে পাহাড়ের সৃষ্টি করে। অতীত ও বর্তমানের ভেদ ঘোচে ; মহাকালের একটানা স্রোত বহে চলে।

শোণের ওপারেও একদিন রাত কাটাই। বাউলিয়া খনি। পাহাড়ের গায়ে। চারিপাশে লোকজনের কর্মব্যস্ততা। পাথর ভাঙার অবিরাম বিকট শব্দ। ট্রলি, ট্রাক, লরি, জীপ চলাচলের ঘর্ঘর ধ্বনি। পাহাড়ের গায়ে দলে দলে মানুষ ঘোরে, পাথর কাটে,—যেন পিপীলিকার সারি চলে, কুরে কুরে ছিদ্র করে। ব্যস্তসমস্ত, সদাচঞ্চল। এই কলকোলাহল ও জনতার মধ্যে থাকতে মন চায় না। তাই খনির পল্লীর মাঝখানে রেস্ট হাউসে না উঠে চলে যাই মাইল চারেক দূরে ফ্যাক্টরীর 'কে সিক্‌স' K-6 বাংলোতে।

বাংলোর বিস্তীর্ণ এলাকা। একপাশে অল্পদূরে পাহাড়। গুরুগম্ভীর। আর একদিকে শোণনদের বিশাল বিস্তৃতি। প্রশান্ত, উদার। বাংলোর সুমুখে সাজানো বাগান। সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন্‌। একধারে সিমেন্ট

দিয়ে গাঁথা প্রকাণ্ড Swimming pool—স্নান ও সাঁতারের আনন্দবিলাসের আয়োজন। এখন জলহীন, শূন্যগর্ভ। চারিপাশে অতিশান্ত নির্জন পরিবেশ।

বাংলোটিও মনোরম। বিরাট ঘর, লম্বা বারান্দা। অতি দামী আসবাবপত্র। বড় বড় সোফা-সেট্, চেয়ার টেবিল ফায়ার প্লেস।

পরম আনন্দে একদিন কাটাই। সন্ধ্যায় বৃদ্ধ চৌকিদারের সঙ্গে বসে গল্প করি। এই বাংলোর ইতিহাসও শুনি।

এককালে এই ফ্যাক্টরীর মালিক ছিলেন সাহেবরা। বড় সাহেব অর্থাৎ ডিরেক্টর থাকতেন এই বাড়িতে। বারো মাসই। পরিবারবর্গ নিয়ে। চৌকিদার বলে, এখন আর এ কি সাজানো দেখছেন? সাবেককালের আসবাবপত্র অনেক চলে গেছে, এখন সামান্যই এখানে রয়েছে। আপনি বলছেন তো পরিষ্কার করে ঘরদোর আমি রেখেছি। কিন্তু এ কি একা সাফ্ করে রাখা সম্ভব? সে-সময়ে দুজন লোক থাকতো, যাদের শুধু কাজই ছিল সারাক্ষণই আসবাবপত্র—কৌচ-সোফা-চেয়ার-টেবিল সাফ করা। ঝাড়ন হাতে এখানে ওখানে ঘুরছে। তবু কোথায় কোন্ কোণে মেমসাহেব হঠাৎ ধুলো নজরে পড়লেই হুলস্থূল! এই বুঝি চাকরি যায়। আবার কাজে খুশি হলে বখশিশও করতেন তেমনি। ডাইনিং হলে ঐ যে খাবার টেবিল,—সাহেব-মেমরা যখন খেতে বসতেন,—বেয়ারাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার রেওয়াজ ছিল না। দরজায় ঢুকেই ঐ যে কাঠের পার্টিশনে ফুলকাটা সিল্ক লাগানো, তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে সিল্কের ফাঁকে নজর রাখতে হোত,—কোন্ পাত্রে খাবার ফুরিয়ে এল;—খাওয়ার ধরন-ধারণ দেখে বুঝে নিতে হোত কার কোন্ ডিস ভাল লাগছে, কাকে আরও কি দিতে হবে।

সেকালের দৈনন্দিন সাহেব-মেমদের জীবনযাত্রার অনেক ঘরোয়া কাহিনীও শোনায়। কে কেমনভাবে থাকতেন, কার কেমন মেজাজই বা ছিল, কবে কি হঠাৎ ঘটল, নাচগানে আনন্দে ছেলেমেয়েদের কেমন দিন কাটতো, কবে কোন্ এক ছোট ছেলের একদিনের কি অসুখে হঠাৎ মৃত্যু ঘটল,—নানান্ বৈচিত্র্যময় ছোট ছোট ঘটনা।

এখন জনশূন্য প্রকাণ্ড সেই বাড়ি। এখনও সাজানো গোছানো। বসবাসেরই উপযোগী। এখনকার কর্তারাও মাঝে মাঝে আসেনও শুনি। তবুও আজ নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নির্জন গৃহে বসে এই বৃদ্ধের মুখে গল্প শুনি। আর মনে হয়, যেন এখনও সেই সাহেব-মেমেরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এ ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ান, চাপা গলায় কথা বলেন, পাশের বন্ধ ঘরে রুগ্ন শিশু যাতনায় কেঁদে ওঠে।

অতীত যেন কথা কয়, বর্তমানের শূন্যগৃহের নৈঃশব্দতায়।

কথার মোড় ঘোরাই। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, এতো নিকটে ঐ পাহাড়, জঙ্গলও তো থাকবার কথা। জানোয়ার আসে না?

চৌকিদার বলে, আগে মাঝে মাঝে দেখা যেত বৈকি। 'কোয়ারি'র কাজ

বেড়ে যাওয়ায়, লোকজনও অনেক এসে গেছে, ট্রাক-মোটর অনবরত যাতায়াত করে,—এখন ক্বচিৎ কখনো হঠাৎ ছুটকে দু'একটা আসে। একবারের ঘটনা বলি। ১৯৪০-৪১ সাল হবে। গরমের সময়। রোদের প্রচণ্ড তেজ। একদিকে পাহাড় তাতে, আর একদিকে চরের বালিও তাতে। তার ওপর লু-ও ছোটে। এখানকার গরমকাল দুর্দান্ত। যেন আগুন জ্বলে। তাই তো বাগানে দেখেছেন অমন স্নান করার, সাঁতার কাটার বাঁধানো জায়গা। সন্ধ্যে হলেই সাহেব-মেমরা ঐখানে জলের মধ্যে খেলা করতেন, জলের ভেতর লাফিয়ে পড়ার জন্যে তক্তাও নজর করছেন নিশ্চয়? একদিন দুপুরে গুর্খা গার্ড গাছতলায় দাঁড়িয়ে যথানিয়ম পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ দূর থেকে দেখে সেই 'সুইমিং পুল'এর জলে নেমে প্রকাণ্ড এক হরিণ জল খাচ্ছে। তখনি রাইফেল তুলে গুলি ছোঁড়ে। হরিণও এক গুলিতেই খতম্। গার্ডের মনে মহাস্ফূর্তি, হরিণের মাংস পেয়ে সাহেব নির্ঘাত বখশিশ করবেন। ছুটে জানোয়ারের কাছে গিয়ে দেখেই পিছন ফিরে এক ছুটে বাংলোয় এসে হাজির। 'সাহাব্ সাহাব্ জল্দি জল্দি' করে ডাক। সাহেব বেরিয়ে আসতেই pool-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,—'বাগ্! বাগ্!' সাহেব বোঝেন না। এগিয়ে এসে দেখেন, সত্যি একটা বাঘ গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। খুব ধমক লাগালেন গুর্খাটাকে!—এই তো সেদিনের কথা।

অথচ প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।

চুপ করে শুনি, মনে হয় বই-এর পাতায় গল্প পড়ি।

॥ ৩ ॥

জাপ্লা থেকে একদিন বেড়াতে চলি দশাশায়। শোণনদের মধ্যে দ্বীপ। চরের উপর ছোট-বড় শিলাস্তূপ। তারই এক টিলার উপর শিবলিঙ্গ। শিবরাত্রিতে মেলা বসে। সাতদিন চলে। প্রথম রাত্রের মেলায় বেশি ভিড়। তাই পরদিন চলি। চরের উপর দিয়ে মাইল চারেক মাত্র হাঁটা। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা। ফেরবার সময় নৌকাও পাওয়া যায়, স্রোতের মুখে সহজেই ভেসে আসে।

সকালে সঙ্গী শেষকিরণের সঙ্গে যাত্রা করি। স্থানীয় একটি লোকও সঙ্গে চলে। ফ্যাক্টরীর নিকটেই খেয়াঘাট। কয়েকটি নৌকা বাঁধা। পাড়ের উপর গ্রাম। শিবমন্দির। মুসলমান জমিদার। তিনিই তৈরি করিয়ে দেন। নদীর একটা জলধারা এই দিকে। গ্রীষ্মকালে খরতাপে এ ধারা শীর্ণকায়া হয়। তখন হেঁটেই জলটুকু পার হওয়া যায়। এখন শীতের শেষ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। নৌকায় বসে ধারা পার হতে মিনিট তিনেক লাগে ওদিকে বালুচর। সেখানে নেমে পাঁচ-ছ' মিনিট হাঁটা। জলের কাছে ভিজে বালি। কালচে রঙ, কোথাও বা সবুজ শেওলা পড়ে। আশপাশে চরের উপর ছোট ছোট ক্ষেত, শাক-সব্জির। আবার এক জলধারা। নদীর প্রধান প্রবাহপথ। তাই প্রশস্তও। কলকল শব্দে জলস্রোত-বহে চলে। সেখানেও

আর এক খেয়া বাঁধা। লগি ঠেলে নিয়ে চলে। এক এক জায়গায় সাত-আট ফুট জলের গভীরতা। কোথাও আবার জলের মধ্যে ডুবে-থাকা চরের মাথা দেখা যায়। নদীর গতিপথের নীচের দিকে দূরে ফ্যাক্টরীর 'রোপ্-ওয়ে'। নদীর বুকে উঁচু থামের সারি।

এখানেও পার হতে মিনিট পাঁচ-ছয় লাগে। জলের মধ্যেই নৌকা দাঁড়ায়। জুতো খুলে বাকি জলটুকু পার হওয়া। আবাব বালির চড়া। সকালের রোদে চিক্‌মিক্ করে। যে দিক থেকে নদী নেমে আসে সেই দিকে বালি ভেঙে এগিয়ে চলি। দুদিন আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বালির মধ্যে পা তেমন বসে যায় না। অথচ বালি ভিজেও নেই। জুতো হাতে খালি পায়ে চলতে থাকি অতি আরামে মনের আনন্দে।

অপর পাড়ে পাহাড়েব শ্রেণী। নীল আকাশের গায়ে গাঢ় ব্রাউন কালির যেন প্রলেপ দেওয়া। পাহাড়েব মাথার উপর কয়েক মাইল দীর্ঘ সমতলক্ষেত্র। তারই উপব রোটাস্ ফোর্টের প্রাকার ও দু' একটা বাড়ি নজরে পড়ে।

ধু-ধু করে বিশাল বালির চর। তাবই উপর দিয়ে এগিয়ে চলি। সামনে ও দূরে ছোট ছোট পাহাড়,—আবছা ধোঁয়াটে। তাবই একটা দেখিয়ে সঙ্গী গ্রামের লোকটি বলে, ওরই কাছে দশীশা। আরও মাইল তিন দূর হবে।

শীতের সকালে রোদের তেমন তেজ নেই। চারিদিক শান্ত, নীরব। অল্পদূরেই নদীর ধারা। হঠাৎ কয়টা জলচর পাখী শব্দ তুলে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। যেন ঘুমন্ত শিশু স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠেই চুপ করে।

বালির উপব পা যেন আপনা থেকেই চলতে থাকে। ক্রমে দূরের অস্পষ্ট পাহাড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। পাহাড়তলিতে গ্রামে ঘরবাড়িও চোখে ধরা পড়ে। যেন দূরবীনে ঠিকমত এতক্ষণে 'ফোকাস' হয়।

কিন্তু নদীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য বোধ করি। কী বিশাল বিস্তৃতি! অদূরে দুটি প্রকাণ্ড নদীর যেন সঙ্গম মনে হয়।

সঙ্গী গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করি। বলে, দুটো নদীই তো ওখানে মিশেছে—ডান দিকে ঐ হোল শোণ, বাঁ দিকের ঐটা নর্থ কোয়েল। ডালটনগঞ্জের পাশ দিয়ে এসে এখানে শোণে পড়েছে।

শেষকিরণ আমার দিকে তাকায়। চোখে-মুখে পুরানো স্মৃতির স্নিগ্ধ প্রলেপ। প্রশ্ন করে, মনে পড়ে শোণনদের উৎস? অমরকণ্টকের পাহাড়?

নর্মদার উৎপত্তি স্থান অমরকণ্টক। সেই কারণেই তার প্রসিদ্ধি। কিন্তু শোণ ও মহানদীর জন্ম যে ঐ অমরকণ্টক অঞ্চলেই সে কথার প্রচার নেই।

শেষকিরণ আপন মনে গল্প করে যায়। কয় বছর আগে অমরকণ্টকের পথের সঙ্গী ছিল সে। মানসপটে আমারও সেদিনের স্মৃতি ফুটে ওঠে।

ভাবি, শোণ নাম এল কোথা থেকে? গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানও (Arrian) এর উল্লেখ করেন শোণস্—Sonos নামে। পুরাণেও পাওয়া যায়, ঋক্ষ পর্বতে মেখল গিরিশ্রেণী থেকে এ নদের উৎপত্তি। মেখলের

আধুনিককালে নাম হয়েছে মৈকাল পর্বতশ্রেণী। তারই এক অংশে অমরকণ্টক পাহাড়। কালিদাসের মেঘদূতের সেই আম্রকূট—ত্বামাসার প্রশমিত বনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না বক্ষত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।···

সেইখানে নর্মদার উৎপত্তি। তাই পদ্মপুরাণে নর্মদার আর এক নাম মেখলসুতা। ঐ অঞ্চলে দুই গিরিশ্রেণীর সংযোগ। বিন্ধ্য ও সাতপুরা। অমরকণ্টক থেকে নেমে নর্মদা বয়ে চলে এই দুই গিরিপ্রাচীরের মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে। পুরাণে পর্বত দুটির নাম লেখে সোমপর্বত ও সুরথাদ্রি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পাওয়া যায়, শোণো মহানদশ্চৈব নর্মদা সুরথাদ্রিজা। সেই 'সোম' থেকেই কি শোণের নামকরণ ?

মনে পড়ে অমরকণ্টকের কথা।

পাহাড়ের মাথায় অতি মনোরম স্নিগ্ধ সবুজ অধিত্যকায় নর্মদার উৎস। চমৎকার পাথরবাঁধানো বিরাট কুণ্ড। ঘাটের উপর সারি সারি মন্দির। সুন্দর কারুকার্য। চারিদিকে অমলিন শুভ্র দীপ্তি। অতি পরিপাটি। যেন শ্বেতপদ্মের গুচ্ছ। শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি ওঠে। পূজা-আরতি হয়। তীর্থযাত্রীর ভিড় জমে। কুণ্ডের একদিক থেকে ক্ষীণাঙ্গিনী ধারা ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গে নেমে চলে। যেন রাজপ্রাসাদে সোহাগিনী রাজকন্যার জন্মগ্রহণ। স্বর্গের দেবীর মর্তে অবতরণ। তাই তাঁর জন্মক্ষেত্রও পুণ্যভূমি। তীর্থদর্শনে পুণ্যাতুর যাত্রীর সমাবেশ। ধর্মশালারও ব্যবস্থা।

আর শোণনদের উৎপত্তি ? সেখানে মন্দির নয়। বাঁধানো ঘাট নয়। ধর্মশালা নয়। যাত্রীদের আসা-যাওয়াও নয়। লোকচক্ষুর অগোচরে, ঘন বনানীর অন্তরালে, নিভৃতে একান্তে নগণ্য পাহাড়ী ঝরণার বুকে তার জন্মগ্রহণ। দীন-হীন আদিবাসীর কুটিরে যেন অখ্যাত সন্তানের জন্ম। শাঁখ বাজে না। দীপ জ্বলে না। আনন্দ-রোল ওঠে না।

নর্মদা আর্যদের লোকপূজ্যা দেবী। শোণ যেন অনার্য দেবতা। তাদেরই প্রতীক।

সে-বছর অমরকণ্টকে এসে শোণনদেরও উৎস দেখতে যাই।

সেই একই পাহাড়ের মাথার উপর। নর্মদার উৎস থেকে মাত্র মাইল দেড়-দুই দূরে। স্থানীয় নাম শোণমুড়া। অতি-ক্ষুদ্র পাহাড়ী ঝরণা। চারিপাশে বড় বড় গাছের সমাবেশ। শুষ্ক রুক্ষ বন্য পরিবেশ। দিনেও যেন সন্ধ্যার আবছা আঁধার। উঁচু-নীচু পাহাড়ী অঞ্চলে চতুর্দিকে ছড়ানো ছোট-বড় শিলাস্তূপ। কালো কালো পাথরগুলির মধ্যে দিয়ে ঝির ঝির করে নেমে আসে ক্ষীণকায়া ধারা পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে। কখনো বা পাথরগুলির আড়ালে লুকোচুরি খেলে। পাতার ফাঁক দিয়ে কালো জলে আলোর ঝিলিক হানে। যেন শিশুর মুখে সরল হাসি ফোটে, কলকাকলি ওঠে। এক জায়গায় ঝরণার বুকে কয়েকটা পাথর। তারই খাঁজে খানিকটা সঞ্চিত জল। ছোট কুণ্ডের মত। হাত কয়েক উপরে বনের ধারে একটি লতাপাতার কুটির। শেষকিরণ আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে আবার

থাকেন কে ?

মানুষের সাড়া পেয়ে দুটি সাধু বেরিয়ে আসেন। মাথায় জটা, লম্বা দাড়ি। মুখে হাসি।

প্রশ্ন করে জানি, সাধনভজনে এই বনের মধ্যেই দিন কাটান। বৃদ্ধ মহাত্মা বছর কুড়ি-পঁচিশ ঐ অঞ্চলেই আছেন। অপরজন বছরখানেক মাত্র এসেছেন।

শেষাকিরণের কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করে, অমরকণ্টকের জঙ্গলে বাঘ থাকে শোনা যায়,—এখানে আসে না? থাকেন কি করে? হিংস্র জানোয়ার ?

সাধুজী অতি সহজকণ্ঠে উত্তর দেন, হিংসার কোন পরিচয় তো পাইনি, তবে জানোয়ারের দর্শন হামেশাই মেলে। এই যে জল জমে আছে, এইখানেই তো রোজ সন্ধ্যায় একজোড়া বাঘ আসে জল খেতে।

হঠাৎ কি যেন তাঁর মনে পড়ে। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রশ্ন করেন, হাঁ ভাল কথা, গত দুদিন তাদের দেখা যায়নি। গেল কোথায়? অসুস্থ হয়নি তো ?

ভাবি, আশ্চর্য দেশ কাল-মানুষ! আপন সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজনের জন্য নয়, অরণ্যবাসী সাধুর দুর্ভাবনা,—বন্য পশুর অদর্শনে। যেন শিশুর ভাবনা, পোষা বক্‌ছানার অন্বেষণে।

শোণমুড়ার সেই ছোট থালাটুকু ধরে খানিক এগিয়ে গেলেই পাহাড়ের মাথার শেষ। বহু নীচে সমতলভূমি। সোজা খাড়া পাহাড় থেকে জলের ধারা নীচের দিকে লাফিয়ে পড়ে। পাহাড়ের শিলাময় ঢালু গায়ে গাছপালার ঘন আচ্ছাদন। সেই পাষাণ ও অরণ্যজালের মধ্যে ক্ষুদ্র ধারা কোথায় অদৃশ্য হয়। সাধুজী বলেন, পাহাড় বেয়ে নামার পথে শোণনদের কোথাও দেখা মেলে না। গুপ্তপথে সমতলভূমিতে নেমে তবে হঠাৎ আবার নদীর জল প্রকট হয়। আঙুল তুলে দেখান,—ওই দূরে নীচে 'শোণ বচরওয়ার'—এখান থেকে মাইল কুড়ি-পঁচিশ, পাণ্ডুয়া রোড থেকে দশ মাইল মাত্র—ঐখানে আবার শোণের আত্মপ্রকাশ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

পাহাড়ের বহু উপর থেকে দেখা যায়, প্রায় হাজার দুই ফুট নীচে দিগন্তপ্রসারী সমতলভূমি, তরুলতার ঘন সবুজ আস্তরণ,—তারই বুকে স্বর্ণময় বালুরেখায় আঁকা নদীর সর্পিল গতিপথ। শোণনদের যৌবন শুরু।

আর আজ দশীশার পথে দেখি, সেই শোণেরই পরিণত জীবনের উদার বিস্তৃতি। নদীর প্রায় দুমাইল দীর্ঘ প্রসার। পাটনার নিকটে গঙ্গার জলে আত্মসমর্পণের পূর্বে বিরাট প্রস্তুতি।

দশীশার পথে এগিয়ে চলি। দূরের সেই ছোট পাহাড় নিকটে আসে। গ্রামের দিকে যাই না। নদীর কূল ধরে আরও খানিক এগিয়ে চলা। জলের ধারে গ্রাম্য জীবনের আবহাওয়া। কয়েকটি নৌকা বাঁধা। তীরে গরু-

মহিষ ঘোরে। মেয়েরা কলসী ভরে জল আনে। জলে ছিপ ফেলে ছেলে-পুরুষ উৎসুক নয়নে বসে থাকে।

অদূরে নদীর তীরে মেলার চালাঘরের সারি। লোকজনের কিছু ভিড়। চরের ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকেও যাত্রী আসে। নদীর উঁচু-নীচু পাড়। কোথাও বা বর্ষায় মাঠে ঢুকে-আসা জমা জল। এখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে। নদীর পাড়ে একটা টিলার উপর ভাঙা গম্বুজের অংশ। হয়ত কোন্ কালের-মন্দির। এখন 'শূন্য সে দেবতালয়'।

অতি সাধারণ গ্রাম্যমেলার আয়োজন। শহর থেকে মাল এনে সারিবাঁধা ছোট ছোট দোকান সাজানো। রঙিন কাপড়-চোপড়, কলাই ও অ্যালুমিনিয়মের বাসনপত্র, কাচের চুড়ি, মনিহারীর দোকান। তেলেভাজা, পুরী, জিলাপী, মিষ্টান্নের বেচাকেনা। স্থানীয় জিনিসের মধ্যে পাথরের শিল-নোড়া।

নিকটেই নদীর এক ছোট ধারা। এখন জল কম। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে সারি সারি যাত্রী পার হয়। অপরদিকে বড় চর। চরের উপর বড় বড় পাথরের স্তূপ। একটা ছোট টিলা। দোতলা-সমান উঁচুতে সমতল পাথর। সমচতুর্ভুজ আকার। বারো চোদ্দ হাত লম্বা এক এক দিক। মাঝখানে শিবলিঙ্গাকৃতি শিলাখণ্ড।

দিগন্তবিস্তৃত নদীর চর। মাঝে মাঝে জলের ধারা। প্রধান প্রবাহপথের ঠিক উপরেই শিবের অধিষ্ঠান। এঁরই নাম দশীশা!

নদীতে স্নান করে যাত্রীরা ফুল-ফল দিয়ে পূজা করে। নিকটবর্তী সেই গ্রামের অধিবাসীরাই পূজারী। অশুদ্ধ সংস্কৃত ও হিন্দী মেশানো মন্ত্র পাঠ করে।

সঙ্গী জাপুলো গ্রামের সেই লোকটির কাছে এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা শুনি, জানেন না বুঝি দশীশা নাম হোল কেমন করে? 'দশানন' থেকে 'দশীশা' হয়েছে। শিবভক্ত রাবন গেলেন কৈলাসে। মহাদেবকে কাঁধে নিয়ে ফিরে চলেন নিজের রাজ্যে—লঙ্কায়। পথে এইখানে শিবকে চরের ওপর নামিয়ে বিশ্রাম নেন। নদীতে স্নান করেন। ভোজন সারেন। বিশ্রাম সেরে আবার যাবার জন্য তৈরি। কিন্তু কোথায় শিব? কোথাও খুঁজে পান না—এই বিজন চরে, পাথরের স্তূপে। অগত্যা নিরাশ হয়ে একাই ফিরে চলেন, নিজের রাজ্যে। শিবও সেই থেকে এইখানেই অধিষ্ঠান করেন।

প্রচলিত গ্রাম্য কাহিনী। কিভাবে কে এর প্রথম প্রচার করে, কি জানি। কিন্তু তখনি মনে পড়ে, এর পিছনেও কি কোন নিহিত তথ্য আছে?

ভারতভূমির আদিম অধিবাসীরা ছিল অনার্য। আর্য-অনার্যে যখন প্রচণ্ড জাতিসংঘাত শুরু হয়, সুসভ্য আর্যরা তাদের বলতেন,—রাক্ষস। রাবণ ছিলেন সেই রাক্ষসদেরই রাজা। শিব ছিলেন সেই অনার্যদেরই দেবতা। তাই শিবের বিরুদ্ধে আর্য-উপাসকদের বিরোধ চলার অনেক আখ্যান আছে। আর্যদেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে শিবের বিরোধেরও বহু কাহিনী পড়া যায়। কিন্তু

আর্যে-অনার্যের মধ্যে ক্রমে ধীরে ধীরে যোগস্থাপন হয়। শিবকে বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে মিলিয়ে একদিন এই আর্য-অনার্য ধর্মবিরোধের অবসান ঘটে।

রামায়ণের যুগে রাম-রাবণের যুদ্ধও হয়ত সেই আর্য-অনার্য বিরোধেরই নিদর্শন। রাক্ষসরাজ রাবণও তাই স্বধর্মনিষ্ঠ শিব-উপাসক।

আবার আর একদিকে কোন কোন পণ্ডিত ঐতিহাসিকদের মতে রাবণের লঙ্কারাজ্য ছিল অমরকণ্টক অঞ্চলে,— বিন্ধ্য ও সাতপুরার পার্বত্যপ্রদেশে।

অমরকণ্টক-নিঃসৃত সেই শোণনদের তীরে দশীশায় বসে রাবণরাজের এই কাহিনী শুনতে অদ্ভুত লাগে।

মনে হয়, রামায়ণ-যুগের সেই সুদূর অতীত যেন কানে কানে কথা শোনায়। মহাকালের অনন্ত তরঙ্গে একই সঙ্গে দোলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কবি এলিয়টের ভাষায়—

'Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past
If all time is eternally present
All time is unredeemable."

৪ ॥

শিবরাত্রির এক সপ্তাহ পরে গুপ্তেশ্বরের পথে যাত্রা করি। মেলার ক'জন যাত্রী ফিরে আসে দেখি। শোণের চরের উপর দেখা। খালি পা। পা ভর্তি ভিজে বালি, কাদা। সবে নদীর একটা ধারা হেঁটে পার হয়েছে। হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে তোলা। জামাকাপড় ধূলি-মলিন, যেন ফ্যাকাশে গেরুয়া রঙ। মুখচোখে ক্লান্তির চিহ্ন। মুখে খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। উস্কখুস্ক চুল। সারাদেহে তীর্থযাত্রীর ছাপ। তবুও যাত্রাশেষের পরম তৃপ্তি ও আনন্দ চোখে-মুখে উথলে ওঠে। শেষকিরণের পরিচিত একজন এগিয়ে আসে, বলে, আপনারা এক সপ্তাহ দেরি করেই রওনা হলেন দেখছি। যান, দেখে আসুন,—খুব ভাল লাগবে। কিন্তু সাবধান! লোকাল গাইড একজন কাউকে সঙ্গে রাখবেন। পাহাড়ে পথ,—ভীষণ জঙ্গল, একবার পথ হারালেই চক্ষুস্থির! আমাদের কাল তাই হয়েছিল—ঘণ্টা সাত-আট ঘুরে আবার পথ পাই। এখন দেখছি, পেয়েছি এই ভাগ্যি,—ও-জঙ্গলে পথ হারালে আর না পাবারই কথা। তবুও তো এ ক'দিন যাত্রীদের আসা-যাওয়া চলছিল,—আপনারা তো পথে লোকজনই পাবেন না।

শেষকিরণ হেসে বলে, আমাদের জঙ্গলে হারালে কারও কোনই ক্ষতি হবে না,—কিন্তু কতোখানি দূর বলুন তো,—যাতায়াত কতো হবে?

সে বলে, তা সত্তোর-আশি মাইল হবে।

শেষকিরণকে বলি, চলো,—আর দেরি করো না, আমরা আগাই। এঁদেরও

ছেড়ে দাও, ক্লান্ত আছেন,—তা ছাড়া কাল পথ হারিয়ে কষ্ট পেয়েছেন খুব। তারা জাপ্‌লার দিকে এগিয়ে যায়। শেষকিরণ হেসে আমার দিকে চায়। বলে, সত্তোর-আশি মাইল বলে কী ? বোঝা যাচ্ছে পথ হারিয়ে এমনি ভয় পেয়ে ঘুরেছে, কতোখানি দূর তার আর কাণ্ডজ্ঞান নেই।

শোণনদের বিরাট্‌ চর। তারই বুকে মাঝে মাঝে জলের প্রবাহ। কোথাও ক্ষীণধারা, কোথাও আবার তড়িৎ-গতি স্রোতের বেগ। জাপ্‌লা ছেড়েই খেয়ানৌকায় ওঠা। তারপর হেঁটে বালির চর পার হওয়া, আবার আর এক খেয়ায় নদীর প্রধান ধারা পার, আবার হাঁটা, চরের মধ্যে জমে-থাকা শেওলা পড়া অল্প জল, আবার বালি, চাষের ভূমি, আলের উপর দিয়ে পথ, শেষে আবার আর এক জলধারা ; ওপারের গ্রামের ঘাট, ধোপার পাটাতন। নিকটে ফ্যাক্টরীর রোপওয়ের শেষ লোহার থাম। নদী ছেড়ে পারে উঠি। ফ্যাক্টরীর জীপ্‌ পাই। মাইল দুই এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ঠিক নীচে বাউলিয়া Quarry। পথে রেল-লাইন পার হই,—ডেহরি-অন্‌-শোণ থেকে লাইন আসে রোটাস্‌ হয়ে বাউলিয়াতে।

ফ্যাক্‌টরীর এক বড় কর্তার সঙ্গে আলাপ হয়। বাউলিয়া রেস্ট হাউস্‌-এ না থেকে মাইল চারেক দূরে K. 6 বাংলোতো রাত কাটাই। পরের দিন ভোরে গুপ্‌তো রওনা হওয়ার সব আয়োজনও সেই অফিসারই করে দেন। দূরত্বের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এখান থেকে দু'মাইল আরও এগিয়ে আমাদের চুনাহাট্টার Quarry। সেখান থেকে পাহাড়ে উঠে যাত্রা শুরু করলে— গুপ্‌তো মাইল পনেরো-ষোল দূর হবে। কিন্তু আপনারা রোটাস্‌ ফোর্টও দেখে যেতে চান বলছেন—তাহলে আবার বাউলিয়ায় ফিরে ওদিকে মাইল-খানেক আরও এগিয়ে পাহাড়ে উঠতে হবে। ফোর্ট দেখে গুপ্‌তোয় যেতে ও-পথে আরও পাঁচ-ছ' মাইল বেশি হবে। তা হলেও একদিনেই পোঁছে যাবেন, ফেরবার সময় ঐ চুনাহাট্টার দিক দিয়ে নামবেন। দুদিনে মোট ৩৭।৩৮ মাইল হাঁটতে হবে।

গাইড-এর কথা তুলি। তিনি বলেন, লোক তো যাবেই সঙ্গে। জঙ্গলের পথ। রাস্তা হারাবার আশঙ্কা খুবই। ভাল লোকই দেখেশুনে দিতে বলে দিচ্ছি। যাতায়াতে দুদিন লাগলেও, সঙ্গে অন্ততঃ তিনদিনের রেশন রাখতে হবে,—কে জানে, কোথায় কি কারণে আটকে পড়েন। কোন ভাবনা নেই, বেশ আনন্দেই ঘুরে আসবেন। শেষকিরণ তো সঙ্গে থাকছেই। একা এ-বয়সে আপনাকে ছাড়া চলবে না।

হেসে বলি, আমার জন্যে কোন ভাবনা নেই, একা ঘুরতেও কোন ভয় নেই। আপনি গুপ্‌তোয় কবার ঘুরে এসেছেন ?

তিনি হেসে বলেন, এতো নিকটে আছি কিনা, তাই একবারও যাইনি। গেলেই হয়, তাই যাওয়াও হয় না। ঘুরি না যে তা নয়। ছুটি পেলেই চলে যাই দূর-দূর দেশে,—ঘরের পাশে এটা আর দেখা হয় না।

হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে নজর পড়ে, চমকে ওঠেন, বলেন, ওঃ, এতোখানি

সময় কেটে গিয়েছে। 'কোযাবি'তে যেতে হবে যে। উঠলাম এখনি—কাল ভোরে তৈরি হয়ে থাকবেন। জীপ্ এসে নিযে যাবে,—পাহাড়ের তলা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

বায়ুবেগে বেরিযে যান। যেন প্রতি মুহূর্তটি স্বণ মূল্য। তবুও পরের দিন দেখি, প্রতিটি আয়োজনই নিখুঁতভাবে কবা। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

ভোরে জীপ্ আসে। বাউলিযা হয়ে রোটাস ফোর্টের ঠিক নীচে পাহাড়ের তলায় নামিয়ে দিয়ে যায়। বিন্ধ্যপর্বতের কৈমুর (Kaimur) গিরিশ্রেণী। সামনেই পাহাড়, কিন্তু চড়াই ওঠা শুরু হয় আধ মাইল যাবার পর। চারপাশে শুকনা গাছপালা, ঝোপঝাড়। তারই মাঝ দিযে পাযে-হাঁটা পথ। সঙ্গী গাইড দুজন পথ দেখিয়ে চলে। শেষকিরণ তাদের সঙ্গে আলাপ করে। একজনের নাম ত্রিবেণী ঠাকুর, অপরজনের রামলছমন। দুজনেরই লম্বাচওড়া চেহারা। কিন্তু মাল ভাগ করে নেবার সময়েই নজর করেছি, দুজনের পদমর্যাদা আলাদা। রামলছমন ভারবাহক, প্লাসটিক সীটে জড়ানো কম্বল ও কাপড়-জামার বোঝাটা তার ঘাড়ে চলেছে। ত্রিবেণীর কাঁধে ঝুলছে সকলের 'রেশনে'র থলেটা। হাতে ওর প্রকাণ্ড একটা কুড়ুলও আছে।

শেষকিরণ বলে, ভালই করেছ ওটা এনে, কাজে দেবে খুব।

ত্রিবেণী বলে, এটা না হলে তো চলবেই না। পথে কাঠ কাটতে লাগবে, তা ছাড়া জঙ্গলের পথ তো—কোথায় কি হঠাৎ দেখা যায় কে জানে?

শেষকিরণ প্রশ্ন করে, কতোবার এদিকে এসেছ?

ত্রিবেণী বলে, আমি একবার এসেছি, বছরদশেক আগে। রামলছমন বার তিন চার এসেছে, তবে গত চার-পাঁচ বছর ওর আসা হয়নি। শেষকিরণ আমার দিকে তাকায়, হেসে ওদের বলে, তাহলে তোমাদের তো দুজনের মিলিযে পথ বেশই জানাশোনা!

গল্প করতে করতে এগিয়ে চলি। ক্রমে চড়াই শুরু হয়। ঘুরে ঘুরে পথ ওঠে। চুনা পাথরই বেশি। নীচে দূরে শোণনদের ধারাপথ ও বিস্তীর্ণ বালির চর সুন্দর দেখায়।

প্রায় হাজারখানেক ফুট চড়াই। পাহাড়ের নীচের দিকে পাথর, মাটি, গাছপালা। উপর অংশে শুধু পাথর ও শিলাস্তূপ। যেন রুক্ষ শুষ্ক পেশীবহুল দেহের উপর-অংশ অনাবৃত, নিম্নদেশে পাংশুবরণ লুঙ্গি জড়ানো।

উপরে উঠে দুর্গের সিংহদ্বারে পৌঁছুই। একঘণ্টারও কম সময় লাগে। পাহাড়ের মাথার উপর সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। পাঁচ মাইলের বেশি লম্বা চার মাইলেরও অধিক চওড়া বিশাল মালভূমি। চারিদিকে পাথর দিয়ে গাঁথা প্রকাণ্ড প্রাকার। বিরাট অজগর সাপের মত বেষ্টন করে আছে। কালের কবলে কোথাও বা ভগ্নস্তূপে পরিণত। দুর্গের চারটি প্রধান সিংহদ্বার ছিল। আমরা আসি রাজঘাট দিয়ে।

সানুদেশে দাঁড়িয়ে বোঝাই যায় না, পাহাড়ে উঠেছি। এখানে-ওখানে ভাঙা বাড়ীঘর, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা মসজিদ। কোথাও আবার

সেনাবাসের কুঠুরি। প্রাচীন দুর্গ। প্রবাদ, পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্রের আমলের, তাঁর পুত্র রোহিতাশ্বের নাম থেকেই আধুনিক নাম রোটাস্। ঐতিহাসিক যুগে রোটাস্ দুর্গ শের শাহ্-এর বিজয়কীর্তির সঙ্গে বিজড়িত।

এখন খাঁ-খাঁ করে চারিদিক। কোথায় সেই সব জয়গর্বিত সৈন্যসামন্ত! কোথায় বা রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক, লোকলস্করের কর্মব্যস্ততা, ছুটাছুটি, হৈ-চৈ! এখন ভগ্নস্তূপের সারি সারি কঙ্কাল যেন বিজন মরুপ্রান্তরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে দু' একটা লোক যাতায়াত করে দেখি। পাহাড়ে ওঠার পথেও দেখেছি, হন্-হন্ করে উঠে আসে, কাঁধে কেরোসিনের টিন এর মত বড় বড় টিন। প্রশ্ন করে শুনি, পাহাড়ের উপর অসংখ্য মহুয়া গাছ, তাই মদ চোলাই হয়। কয়েকজনের লুকিয়ে-করা কারবার নয়। রীতিমত সরকারী ব্যবসা। উপর থেকে চোলাই হয়ে নীচে আসে, চালান যায়।

রোটাস্ দুর্গের এখন এই পরিণতি, পাহাড়ের নীচে লোকালয়গুলিতেও এখন এই কারণেই এর প্রসিদ্ধি।

পাহাড়ের মাথায় ডাকবাংলো। তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে রাজপ্রাসাদ দেখতে চলি। পাথরের বিরাট অট্টালিকা। এখনও অক্ষতদেহে দাঁড়িয়ে আছে। সিংহদ্বারের দুদিকের প্রাচীরে খোদাই-করা দুটি হাতির প্রতিকৃতি। বিশাল সিংহদ্বার। বাইরের নোটিশ বোর্ডে দুর্গের সামান্য ইতিহাস লেখা। শেষাবরণ পড়ে গেলে, কি লেখা জানেন ?—রোটাস্ ফোর্ট প্রবাদ, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের স্মৃতিবিজড়িত এবং খারওয়ার, ওরাঁও ও খেরো আদিবাসীদের আবাস-কেন্দ্র। দীর্ঘকাল হিন্দু রাজাদের আধিপত্যে থাকার পর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শের শাহ্ দখল করেন। পরে সম্রাট আকবরের করায়ত্ত হয়। ১৫৮০-১৬০০ সালে বাংলা ও বিহারে তাঁর সামন্ত-শাসক ছিলেন রাজা মান সিং। তিনি এইখানে তাঁর প্রধান নগর স্থাপনা করে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। দুর্গটিরও বহুল সংস্কার হয়। এর পরিসীমা প্রায় ২৮ মাইল। বাইরে যাবার ৮৩টি পথ আছে, তার মধ্যে প্রধান চারটি হোল ঘোড়াঘাট, রাজঘাট, কাথাউটিয়া ও মেন্দাঘাট। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এই দুর্গ সমর্পণ করেন।

ভাবি এ ইতিহাস তো মাত্র সেদিনের কথা। বিন্ধ্যপর্বতের এই অঞ্চলে আরও কত প্রাচীনতর কালের ঐতিহাসিক তথ্য ছড়িয়ে আছে। গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের ভাবুয়া রোড। স্টেশন থেকে মাইল দশেক দূরে ভাবুয়া। সেখান থেকে আরও পাঁচ মাইল গিয়ে পাহাড়ের উপর মুণ্ডেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির। সেখানে ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। আবার, সাসারামের শের শাহের কবরস্থান। নিকটে অশোকের শিলালিপি,—খৃষ্টপূর্ব ২৩২-এর। সাসারামের নামকরণের প্রবাদ, সহস্রবাহু অর্জুন নামে এক নৃপতির অঙ্গচ্ছেদ করেন পরশুরাম। সহস্র অর্জুনপুর থেকেই সাসারাম। এ-ও কি প্রাচীন আর্য-অনার্য সংঘাতেরই এক কাহিনী? ভাবতে ভাবতে

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করি। বিরাট চত্বর। মহলের পর মহল। সবই পাথরে তৈরি। কোথাও তিনতলা, কোথাও চারতলা। অগুণ্তি ঘর, দালান। কাঠের কোনও কাজ নেই, ছিল কিনা জানি না। তাই ঘরের কোথাও দরজা-জানালা দেখি না। কোথাও কোথাও দেওয়ালে রঙের অস্পষ্ট আভাস। সম্ভবতঃ সেকালে চিত্রিতই ছিল। মাঝে মাঝে উপরে ওঠার ধাপ। কোন্ সিঁড়ি কোথায় নিয়ে যায়, কোন্ ঘর বা অলিন্দ দিয়ে কোথায় যাওয়া যাবে, বোঝাই দুষ্কর। হঠাৎ কোথাও এসে দেখি, তিনদিকেই দেওয়াল, আর এগোবার উপায় নেই। গোলকধাঁধার মত উপরে নীচে ঘরগুলি তৈরির এমনি বিচিত্র পরিকল্পনা।

শেষকিরণ আপনমনে হাসতে থাকে। বলি, হোল কি? বলে, ভাবছি, সেকালের রাজা-বাদশাদের ব্যাপার,—রাণী বা বেগমদের নিয়ে লুকোচুরি খেলতেন নাকি?

রামলছমন মালপত্র নিয়ে সিং-দরজার কাছে বসে আছে। ত্রিবেণী সঙ্গে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করি, কি ঠাকুর, খুব তো অন্দরে নিয়ে চলেছ, ফেরবার পথ বার করতে পারবে তো?

সে বলে এখানে এতোবার এসেছি, চোখ বেঁধে দিলেও চলে যেতে পারি।

শেষকিরণ হেসে বলে, সেই ভাবে ওদিকের জঙ্গলের পথটাও যেন নিয়ে যেতে পার।

প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে পাহাড়ের মালভূমির ও দুর্গের দৃশ্য সুন্দর দেখায়। প্রাসাদ-এলাকার অল্প দূরেই গ্রাম-- পবন জলাও। বড় বড় গাছের অন্তরালে। সেইখানেই গবর্ণমেন্টের মদের ভাটি। এ অঞ্চলে জলের প্রধান ব্যবস্থাও সেইখানে। কুয়া আছে, জলাশয়ও আছে শুনি।

ত্রিবেণী বলে, এখান থেকে নেমে দেখে আসবেন চলুন না।

শেষকিরণ বলে, ও দিক দিয়ে তো গুপ্তায় যাবার পথ নয়? আর গিয়ে কাজ নেই। দেরি হয়ে যাবে,--সাড়ে আটটা বাজে, এখনও তো মাইল কুড়ি হাঁটতে হবে,—চলো, কোন্ দিক থেকে নামতে হবে দেখাও।

তারপর, আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, বাতাসে গন্ধ পাচ্ছিলেন না? এখানেও যেন তাড়ির গন্ধ আসছে!

প্রাসাদ ছেড়ে হাঁটা শুরু। প্রায় সমতল পথ। মাঝে মাঝে সামান্য উঁচু নীচু। দু-একটা পাহাড়ী ঝরণার গতিপথ। একটাতে সামান্য জলের ধারা। চারিদিকে বড় বড় গাছ। মহুয়া, আম, বেল। কোথাও চাষের ক্ষেত। গরু-মহিষ চরে। দু-একটা লোকও যাতায়াত করে।

আধ ঘণ্টা চলার পরই জনমানবহীন প্রান্তরে এসে পড়ি। চারিদিক শুকনো খট্ খট্ করে। গাছগুলোও যেন আকারে ছোট হয়ে যায়। শীতের শেষে প্রায় শূন্যপত্র। যে কয়টি পাতা আছে,—তাও শুষ্ক, বিবর্ণ, ধূসর, ধূলিবরণ। গাছগুলি যেন বিবস্ত্র হয়ে সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে—সহস্র বাহু শূন্যে তুলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বনপথ হলেও তাই এখানে

অরণ্যের ছায়া নেই। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শেষে দিগন্তেও দৃষ্টি চলে—গাছগুলির ফাঁক দিয়ে। দূরে দূরে ছোট পাহাড়ের শ্রেণী। সে সবও তেমনি নীরস, বিশুষ্ক। চারদিকেই শ্মশান-ভূমির বৈরাগ্য। হঠাৎ কোথাও বা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নস্তূপ, দু-একটা গম্বুজ। প্রাণহীন, নিস্পন্দ। যেন মলিন গেরুয়া-বেশে প্রকৃতি দেবী মৃত সন্তানের কঙ্কাল আঁকড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে।

এরই মধ্যে প্রাণের বিদ্যুৎ-স্পন্দন দেখি মাঝে মাঝে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে সবুজ টিয়া। নিস্তব্ধতার বুক চিরে শব্দ তুলে। বিশুষ্ক বিবর্ণতার মাঝে ঘন সবুজের তড়িৎ-রেখা টেনে। মরণের মাঝে যেন জীবন হাসে। নিশ্চয় অদূরে টিলার অন্তরালে গ্রাম আছে, চাষবাসও হয়ত চলে।

সরু পথ ধরে এগিয়ে চলি। হঠাৎ দু-তিনটে পথের রেখা। ভিন্ন ভিন্ন দিকে যায়। ত্রিবেণী ও রামলছমন পরামর্শ করে। কোন্ পথটা ধরা উচিত দুজনেরই সন্দেহ জাগে। এমন জায়গায় ঠিক পথ মনে রাখাও সম্ভব নয়। তবু কোন্ পথ গ্রামের দিকে যায়,—আশপাশ দেখে খানিকটা ধরা চলে। তাছাড়া কিছুদিন আগেই যাত্রীরা দল বেঁধে যাওয়ায় পথের উপর পায়ের চিহ্নগুলিও খানিকটা সাহায্য করে। আমাদের গাইডরা দু-একবার ভুল পথ যে ধরেনি এমন নয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমাদের ঘুরতে হয়নি, সেই দু-এক ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন লোক এসে গেছে,—ঠিক পথের তখনি সন্ধান মিলেছে। কিন্তু লোকজনের এ পথে দেখাসাক্ষাৎ অতি বিরল।

ভাবি বিরাট পৃথিবীর এখনও কতো অংশই না জনশূন্য। জলশূন্যও। কোথাও এক ফোঁটা আর জল দেখি না!

তবুও পথ চলার কষ্ট নেই। সকালের শীতের আমেজ এখনও আছে। মনের আনন্দে একটানা এগিয়ে চলি। মাঝে মাঝে দু-একটা টিলার মত ছোট পাহাড় পথরোধ করে। সামান্য চড়াই-উৎরাই করে পার হতে হয়।

প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর এই পাহাড়ের মাথার শেষে আসি। আবার এক প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। সেনানিবাসের ভাঙা ব্যারাক্। তোরণের ভিতর দিয়ে পার হয়ে নীচে খানিক নামা। ডান দিকে দুই পাহাড়ের মধ্যে বহু নীচে সবুজ গাছে-ভরা উপত্যকা। দূরে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। এ পাহাড় ছেড়ে আবার আর এক পাহাড়ের মাথায় ওঠা।

সামান্য চড়াই। সে-পাহাড়ের মাথার উপর আবার সমতল মালভূমি। পাহাড়ের গায়ে চওড়া পথ। শুনি বন-বিভাগের জীপ্ চলাচলের রাস্তা। সেই বড় সড়ক ধরে চলতে হয়। পাহাড়ে পায়ে হাঁটা পথে চলার আনন্দ আছে। মোটর-পথ ধরে হাঁটার কোনও কষ্ট না থাকলেও, অরণ্যপথে হাঁটার শ্রম-মধুর বৈচিত্র্য হারিয়ে যায়। মাইলখানেক এগিয়ে গিয়ে শুনি, এরই কাছাকাছি বাঁ দিকে কোথা দিয়ে পাহাড় থেকে নামবার পথ আছে। ফেরবার সময় সেই পথ দিয়ে নামতে হবে। আমরা পরের দিন ফিরেছিলামও তাই। সেদিকে একেবারে খাড়া পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে নেমে যাওয়া। পাহাড়ের

গা বেয়ে পাথর থেকে নীচের পাথরে অতি সন্তর্পণে পা ফেলা। কোথাও বা ধাপের মত। মাইলখানেকেরও উপর নেমে গিয়ে পাহাড়ের নীচে দিয়ে আরও এক মাইল গিয়ে চুনাহাট্টার কোয়ারি। সেখান থেকে K. 6 বাংলো মাইল দুয়েক।

এখন গুপ্তো যাবার মুখে সে-পথ সম্বন্ধে কোনই কৌতূহল নেই। শুধু ভাবনা, সন্ধ্যা নামার আগে গুপ্তোয় পৌঁছুতে পারলেই হয়।

সকাল সাড়ে ছটায় পাহাড় চড়া শুরু—সেই থেকেই একটানা ঘোরাঘুরি, চলা। এখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজে ক্ষণিক বিশ্রামের প্রয়োজন। ত্রিবেণী বলে, মাইলখানেক আরও গেলেই একটা বড় গ্রাম। সেখানে দোকান-পাট আছে। দুপুরে ঐখানেই খানিক বসা যাবে।

এমনি সময়ে দেখা যায়, ডান দিকে বনের সরু পথ দিয়ে জনতিনেক মেয়ে ও পুরুষ আসে। আদিবাসী। জঙ্গলের কাঠ কেটে বোঝা আনে। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছ? গুপ্তো—শুনে বলে, ও-পথে কেন? মোটরের রাস্তায় অনেক ঘুরতে হবে। ও-গ্রামে যাবার দরকার কি? হুরুমেটা হয়ে তোমাদের যেতেই হবে। এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাও,—আধ ঘণ্টার মধ্যেই হুরুমেটা পৌঁছে যাবে। অতো ঘুরে গেলে গুপ্তো পৌঁছুতে আজ আর পারবে না, রাত হয়ে যাবে।

রাস্তা ছেড়ে বনের হাঁটাপথে পা বাড়াই। আদিবাসী মেয়েটি চেঁচিয়ে নিষেধ করে। রামলছমন বলে, ও-রাস্তায় যেতে মানা করছে, বলছে, বনের মধ্যে পথ চিনতে পারবে না, একবার ভুল পথে চলে গেলে আর বার হতে পারবে না।

শেষকিরণ বলে, ত্রিবেণীঠাকুর! তোমরা দুজনে ঠিক করো, কি করবে—, আমাদের যেদিকে যেতে বলবে, সেই দিকেই যেতে আমরা তৈরি।

তারা আবার আদিবাসী পুরুষ দুটির সঙ্গে পরামর্শ করে। ওরা উৎসাহ দেয়, কোন ভয় নেই, চলে যাও বনের মধ্যে দিয়ে। এক জায়গায় দু'তিনটে পথ পাবে বটে—সেখানে ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে যেও,—খানিক গিয়েই সোদিকে ক্ষেত পাবে, তার ধার দিয়ে আরও খানিক এগুলেই আবার এই বড় রাস্তা ঘুরে এসে গেছ দেখবে। সেখানেও বড় রাস্তা ধরে যেও না যেন, রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকে আবার জঙ্গলের পাশ দিয়ে হাঁটা-পথ ধরবে। দেখবে কাঁটা-বেড়া দেওয়া রিজার্ভ জঙ্গল এলাকা—চলে যাও, কোনো ভয় নেই।

মেয়েটি কিন্তু তখনও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বারণ করতে থাকে। পুরুষ দুটিকে বকতে থাকে, কেন ওদের জঙ্গলের পথে পাঠাচ্ছ—লোক দুটি মুচকে হাসে, চোখ টিপে আমাদের ইশারা করে বনের পথ ধরতে।

গভীর বনই বটে। মাঝে মাঝে অন্য দিকে পথও কয়েকটা গিয়েছে ঠিকই কিন্তু আশা-আশঙ্কা, পথ-ভোলার উদ্বেগ, গাছের ফাঁকে হঠাৎ বন্য জন্তুর আবির্ভাবের প্রত্যাশা,—সব মিলে মন ভরে রাখে, পথের দীর্ঘতা ও দেহের অবসাদ-বোধও ভোলায়।

নির্দেশমত ঠিকই হুরমেটায় পৌঁছে যাই। বেলা সাড়ে এগারোটায়।

ছোট গ্রাম। খানকয়েক চালাঘর। জাপলায় শুনেছিলাম, এ অঞ্চলের সব গ্রামে প্রচুর দুধ, দই, ঘোল পাওয়া যায়। গ্রামের কাছাকাছি সর্বত্র বহু গরু-মহিষও চরে দেখি। কিন্তু কোন গ্রামেই যাওয়া বা আসার সময়ে কোন কিছুই পাইনি। হয়ত মেলার সময় মেলে। আমরাও হয়ত দিনের অসময়ে গ্রামে খোঁজ নিই।

গ্রামে ঢুকে কোথায় একটু বিশ্রামের স্থান পাওয়া যায় তাকিয়ে দেখি। ত্রিবেণী বলে, বসবেন,—এখানে নয়। গ্রামের মধ্যে অপরিষ্কার, হাওয়াও খেলে না, জলও পাবেন না। ঐ যে মাঠের শেষে বড় বড় গাছ, সেইখানে বসবেন, জলও আছে।

অতি মনোরম স্থান। দুদিকের ঢালু মাঠের মাঝখানে একটা পাহাড়ী ঝরণাব ধারাপথ। কয়েকটা বড় বড় গাছের ছায়া। চারিপাশে কালো পাথর। বিশালকায় কচ্ছপ ও কুমীরের দল যেন জটলা পাকিয়ে রোদের ভয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু ঝরণায় জলের ধারা নেই। বর্ষাকালে নিশ্চয় এই পথ ধরে প্রবাহ নামে। এখন শুধু কয়টা বড় পাথরের তলায় খানিকটা জল জমে আছে। সবুজ রঙ। পাতা ও শেওলা ভাসে। বেঙাচি ঘোরে।

তাতে অবশ্য আমাদের ভাবনা নেই। পাড়ের উপর বাঁধানো বড় পাতকুয়া। হাত চার-পাঁচ নীচেই জল। টলমল করে, ঝুঁকে দেখলে মনে হয়, অপরের চোখের তারায় যেন নিজের ছায়া দোলে। পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ। স্নানের লোভ জাগে। পিপাসাও লাগে। গ্রামের মেয়েরা বালতি দড়ি নিয়ে জল তুলতে আসে। ত্রিবেণী একজনের কাছে বালতি দড়ি চেয়ে রেখে দেয়। বলে, ঘণ্টাখানেক পর গ্রামে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো।

কোন দিকে ঘর?

খিল খিল করে হেসে মেয়েটি রেখে দিয়ে যায়। জলভরা কলসী মাথায় ফিরে চলে।

একটা প্রকাণ্ড সমতল পাথরের উপর লম্বা হয়ে শুই। ধূপের ধোঁয়ার মত দেহের ক্লান্তি কোথায় মিলিয়ে যায়। মনেব আনন্দ প্রাণে সুগন্ধ ছড়ায়। গ্রাম্যজীবনের কি মধুর শান্তি! অচেনা মানুষেও কি সহজ সুন্দর ব্যবহার, অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র নেই। কঠিন শিলা-শয্যা, তবু মনে হয় শান্তিপ্রদ কোমল সুখস্পর্শ।

দেহের ক্লান্তি যাওয়ায় বুঝতে পারি তখনও শীতের আবহাওয়া আছে। নতুন জলে হঠাৎ স্নানের সাহস পাই না। ভাল করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে ফেলি। বাংলো থেকে সঙ্গে আনা ভোরে তৈরি পরোটা-সবজি, আমের আচার, গুড় ও পেঁড়া—পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করি। তবুও পেট পুরে খাই না, সামনে এখনও দীর্ঘ পথ—অর্ধেকেরও উপর বাকি—অলক্ষ্যে বসে যেন সাবধান করে।

এ পথে যে চার-পাঁচটি মাত্র গ্রাম পেয়েছি, প্রত্যেক গ্রামের অদূরে ঝরণার

কাছে এমনি বিশ্রামের স্থান ও জলের কুয়ার ব্যবস্থা। ক'দিন আগে যাত্রীদের সে-সব স্থানে বিশ্রাম নেওয়ার চিহ্ন। পাথর সাজিয়ে তৈরি-করা উনানে এখনও ছাই ও পোড়া কাঠ।

দুপুর একটা দশ মিনিটে আবার যাত্রা। আবার শু শু করে মাঠ। সেই শুকনো বন। ঢেউখেলানো পাহাড়ী অঞ্চল। ছোট ছোট টিলা। মাঝে মাঝে জলশূন্য ঝরণা। ক্বচিৎ কখনো একটা গ্রাম। গ্রামবাসীর উৎসুক কুতুহলী দৃষ্টি। একঘণ্টা পরে হর্সাড় গ্রাম ছাড়িয়ে আসি। তারপর প্রায় দু'ঘণ্টা আর একটিও লোকের মুখ দেখি না। শুধু চারি পাশে বন। শুনি হরিণ ও ময়ূর আছে অনেক। কিন্তু একটিরও দেখা নেই। এক জায়গায় পথের পাশে ভাঙা একটি মন্দির। শেষকিরণ ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে দেখতে যায়। ত্রিবেণী নিষেধ করে, খারাপ জায়গা, যাবেন না—আর কিছু থাক্ বা না থাক্, বড় বড় সাপ তো আছেই। শেষকিরণ হেসে বলে, আমাদের আবার ভয় কি—রামলছমন সঙ্গে আছে, ভাবনা কির নাকি? রামলছমন কাঁধের বোঝা নামিয়ে গাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম খোঁজে, কথা শুনে হাসতে থাকে।

পথের ধারে ধারে বেলগাছ। ছোট ছোট ফল ধরেছে। শেষকিরণ বলে, শিবের মাথায় চড়ানো যাবে, বেলপাতা ও দুটো বেল নেওয়া যাক।

রামলছমন বলে, গুহার কাছেও পাবেন, তবু নিতে চান তো পেড়ে দিই।—উঠে পেড়ে থলিতে পুরে রাখে।

চারিপাশে শুষ্ক বিবর্ণ গাছপালা—তারই মধ্যে কেবল এই বেল ও মহুয়া গাছগুলির স্নিগ্ধ সবুজ পাতা। দূর থেকে দেখায় যেন গুরুগম্ভীর পাষাণপুরীর প্রাকারের উপর কারা যেন সবুজ পতাকা ওড়ায়। শেষকিরণ বলে, দেখছেন, মহুয়া গাছগুলি কি সুন্দর দেখায়,—যেমন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তেমনি রূপের শোভা। এ বনের যেন সম্রাজ্ঞী।

আপন মনে আবৃত্তি করতে থাকে:

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর,
লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিল ঊর্ধ্বে ধরে।
আমি তো দেখেছি তোরে
বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস দাঁড়ায়ে,
শাখা যত আকাশে বাড়ায়
শালতাল সপ্তকর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস
গম্ভীর বন্দন।

হঠাৎ চুপ করে যায়, অস্ফুটে বলে, কি অদ্ভূত বর্ণনা। চোখের সামনে জীবন্ত সেই ছবিই দেখছি আজ। আবার ক'দিন পরে এলে দেখতাম সেই আর এক ছবি—

সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে
জোগাস মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে
পূর্ণিমার নৃত্যমত্ততারি।

শেষকিরণের স্বর আবার স্তব্ধ হয়। একটু পরে গুন্‌গুন্‌ করে বলে :

কানে কানে কহি তোরে
বঁধুরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি। সে লজ্জা পেয়ে বলে, ঠাট্টা করে তাকাবেন না। কি অদ্ভুত ভাব ভাষা বর্ণনা বলুন তো? মহুয়া বনের রূপ-রস-গন্ধ কবিতার মধ্যে একাকার হয়ে আছে।

সত্যই মনে হয়, সেই কাব্যের মূর্ছনা যেন বনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, মহুয়া যেন কবির স্তুতি শুনে লাজভরে সবুজ ঘোমটা টানে।

একই সঙ্গে সবাই চলি। পথ হারানোর ভয় আছে। একসময়ে হঠাৎ শেষকিরণকে দেখতে পাই না—এই তো ছিল, গেল কোথায়? সকলে অপেক্ষা করি। অল্প পরেই দেখা দেয়। মুখে আনন্দের হাসি। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে মুঠো খোলে। বলে, নিন্‌, খেতে বেশ লাগবে, টক্‌-টক্‌, মিষ্টিও—হঠাৎ পেয়ে গেলাম, ভাল জিনিস। জঙ্গলের পথে এ-সব মুখে দিয়ে না চললে কি বনভ্রমণের আনন্দ থাকে?

সুধা-ভরা পাকা বড় টোপাকুল,—গাঢ় লাল রঙ। যেন জমাট রক্ত। চারিপাশে কুলগাছ দেখেছি বটে। পথ চলতে পায়ে কাঁটার তীক্ষ্ন খোঁচাও হঠাৎ পেয়েছি। কিন্তু শুধু বুনো ছোট ছোট ফলই নজরে পড়েছে,—বিষটক্‌, জানিও। তারই মধ্যে কোথায় শেষকিরণের দৃষ্টি পড়ে—সুপুষ্ট ফলভরা গাছের দিকে। একরাশ পেড়ে আনে, পকেট ভর্তিও। নিজে খায়, সকলকে দেয়। সারাদিন পথ চলার মাঝে খেতে লাগেও ভাল।

জঙ্গলের মধ্যে অল্প খানিক নেমে যাওয়া। উপলবহুল পার্বত্য ঝরণা। দু'পাশেই বড় বড় গাছের ঝোপ। যেন কাঁধ ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীচে গাছে-ঘেরা সুড়ঙ্গপথে নদী চলে। নদীর বুকে বড় বড় পাথর। এখানেও এখন জলের প্রবাহ নেই। স্থানে স্থানে জমা ঘন সবুজ জল,—জলকুণ্ডের মত। কালো কালো বীভৎস শিলা, ঘন গাছের নিবিড় ছায়া,

নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশ, কেমন যেন ছমছমে ভাব। অদূরে শেওলা-পরা পাথরেব মাঝে সবুজ জলের ঘোলাটে ঝিকিমিকি,—দেখায় যেন জমাট অন্ধকারে কোন বন্য পশুব চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। ত্রিবেণী জানায়, এ-সব জায়গা ভাল নয়। জানোয়ার আসে জল খেতে। হরিণ তো এখানে আছেই। বাঘও থাকে। ভালুকও।

শেষকিরণ বলে, দাঁড়াও না, দেখা যাক আসে কিনা।

ত্রিবেণী তাড়া দেয়, দেরি করবেন না আর পথে,—গুপ্তায় তাহলে আজ আর পেঁছুতে পারবেন না।

মনে মনে খুশি হই শুনে। মাঝে আর একটা মাত্র গ্রাম। পায়ে আমার হিমালয়ে ঘোরা 'বাটা'র বুট। প্রায় বছর-দুই এটা ব্যবহার করিনি। আজই প্রথম পায়ে দিয়েই বিশ মাইল পাহাড় পথে হাঁটা,—সুবুদ্ধির পরিচয় দিইনি। এরি মধ্যে পায়ে ফোস্কা পড়েছে। প্রতি পদক্ষেপেই টের পাচ্ছি। আজ যদি এ-গ্রামে রাত কাটাতে হয়,—মন্দ নয়, ভাবি।

কিন্তু বেলা সাড়ে চারটের মধ্যেই সেই গ্রামে পেঁছুই। দূর থেকে বাজনার আওয়াজ শোনা যায়। শেষকিরণকে বলি, তুমি আসছ আগে থেকে খবর পাঠিয়েছিলে বুঝি ?

আবাব ছোট ঝরণা। গাছেব ছায়া। পাড়ে পাতকুয়া। চাষের জমি। মাঠের শেষে অনেকগুলি কুঁড়েঘর, দু'তিনটে পাকা বাড়িও। বড় গ্রাম। নাম বণ্ডা।

গ্রামে ঢোকার মুখে পথের ওপর একটা পালকি ঘিরে মেয়েপুরুষের ভিড়। সেইখানেই ঢাক মাদল বাজে। পালকির মধ্যে বর বসে। রাঙন কাপড় জামা চাদর। মাথায় টোপর। পালকির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েরা ডালা হাতে বরণ করে। শিলনোড়া নেড়েও একজন দেখাতে থাকে।

এরা আদিবাসী নয়। ছত্রি শ্রেণী বলে পরিচয় দেয়। মাইল-ছয় দূরে আর এক গ্রামে বর চলেছে বিয়ে করতে।

ত্রিবেণী আবার তাগাদা দেয়। বলে, এখনি রওনা হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গুপ্তায় পেঁছে যাব। দেরি করবেন না,—চলুন, না হলে অন্ধকার হয়ে যাবে।

চাষের ক্ষেতগুলি পার হয়ে আবার পাহাড় ও জঙ্গলের পথ। এই পাহাড়েরও মাথার শেষে চলে এসেছি শুনি। চতুর্দিকে শুকনো গাছ। মাঝে মাঝে কাঠ কয়লা তৈরির জন্যে ভাটি বা চুল্লি। কাটা কাঠের স্তূপ। আশপাশে পোড়া কাঠ ও ছাই ছড়ানো। শ্মশানভূমির মত দেখায়। লোকজন কোথাও কাউকে দেখি না।

মাইলখানেক আরও যাবার পর পথ ক্রমশঃ নেমে চলে। বনের মধ্যে দিয়ে নামে। আরও এক মাইলটাক যাবার পর পাহাড়ের ধারে পেঁছুই।

এইবার অকস্মাৎ দেখা যায় সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃশ্য। কোথায় সেই বিবর্ণ, বিশুষ্ক, ধূলিধূসর প্রকৃতির বৈধব্যবেশ! দিগন্তব্যাপী সমতল

প্রান্তরের রিক্ততার হাহাকার !

দেখ, সম্মুখে চারিদিক পাহাড়ে-ঘেরা বিরাট 'বেসিন্'—'Basin' প্রায় হাজারখানেক ফুট নীচে। গোলাকৃতি এক দিকের পাহাড় থেকে অপর দিকের দূরত্ব মাইল-দুই। গভীর অরণ্য-সঙ্কুল। যেন গাঢ় সবুজ রঙ গুলে রাখা অতি-বিশাল এক কটাহে। বহু নীচে দূরে সেই গহন বনের অপর অংশে পাহাড়ের পায়ের কাছে দেখা যায় এক শ্বেতবিন্দু। স্নিগ্ধ ঘন সবুজের মধ্যে যেন রূঢ় উদ্ধত অসঙ্গতি। ত্রিবেণী বলে, ঐখানে ধর্মশালা ও সরকারী বাংলো। গুপ্‌তার গুহাও ঐ পাহাড়ের গায়ে। আর দেরি করবেন না এখানে দাঁড়িয়ে। পাহাড় বেয়ে নামবার পথ খারাপ। এইখানেই যাত্রীদের যা ভয়ের কারণ। নীচের বনের মধ্যে গিয়ে সন্ধ্যার আগে ধর্মশালায় পৌছনো চাই-ই। এ অঞ্চলে বড় বড় বাঘের বাস।

আশ্চর্য হবার নয়।

পাহাড় বেয়ে নেমে চলি। কালো পাথরের গা কেটে সরু পথ। এক জায়গায় হাত-দুই মাত্র চওড়া। সেখানে ধারে লোহার তার দিয়ে রেলিঙ মত। পাশেই খাদ। খাড়া পাহাড়ের গা সোজা দু'তিনশ ফুট নেমে গিয়েছে। সেদিকপানে নীচে তাকালে ভয় পাওয়ার সম্ভাবনা। অনভ্যস্ত অনভিজ্ঞ যাত্রীর মাথা ঘোরাও বিচিত্র নয়।

শেষাকিরণের মনে স্ফূর্তি জাগে। উল্লসিত হয়ে বলে, বাঃ, এতক্ষণে যেন হিমালয়-পথের একটু স্বাদ পাওয়া গেল। দুর্গমতার রোমাঞ্চই তো পাহাড়ী-পথে হাঁটার একটা আনন্দ। তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলে, যেমন তরকারিতে লংকার ঝাল।

আমি বলি, সামনে পথ দেখে সাবধানে চলো,—নামবার মুখে হঠাৎ থেমো না। হিমালয়ে এর চেয়ে অনেক দুর্গম পথে চলতে কিছু অঘটন ঘটেনি,—এইখানেই শেষে পা না পিছলায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে চল।

সে মনের আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে নামে। পাথর থেকে পাথরে লম্বা পা বাড়িয়ে। সন্তর্পণে নামি আমি। লাঠিতে ভর দিয়ে। ছেষাট্টি বছর বয়স,—এখন আর যৌবনের সে তেজ নেই। অকারণ সাহসের তীক্ষ্নতাও হারিয়েছি। তবু সামান্য এই পথটুকুর স্পর্শ মনের মধ্যে হিমালয়ের সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। আনন্দে মন ভরে। যেন অপরিচিত কার মুখে অতি প্রিয়জনের মুখের আদল দেখি।

হুড়হুড় করে নেমেই চলি। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় দুটো পথের রেখা। যেটাতে লোক-চলাচলের চিহ্ন বেশি, দুজনে সেদিকে এগিয়ে যাই। ত্রিবেণীরা দেখতে পেয়ে ফিরতে বলে। তখন শুনি, ও-পথ দিয়ে ধর্মশালা যেতে দূর হয়। উৎরাই নেমে প্রথমে একটা ঝরণা ও কুণ্ডের পাশে নিয়ে যায় ঐ পথ। যাত্রীদের সেখানে তীর্থস্নানের বিধি। তারপর ঘুরে যায় ধর্মশালায়। ওদিকে যে ঝরণা ও জল আছে পাহাড়ের গা দেখেই অনুমান হয়। পাহাড়ের মাথার উপর থেকে সোজা খাড়া পাথর নেমে গিয়েছে নীচে

জঙ্গল পর্যন্ত। পাথরের সারা গা কালো চকচকে। যেন জলশয্যা ছেড়ে সবেমাত্র ওঠা মহিষের ভেজা দেহ। বেশ বোঝা যায়, বর্ষাকালে পাহাড়ের মাথা থেকে ঐ পথে বিপুল জলধারা লাফিয়ে নীচে পড়ে,—সুন্দর এক জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। এখন পাথরের বুকে শুষ্কপ্রায় ক্ষীণ জলের রেখা। নীচে এক কুণ্ড। সেখানে জল জমে থাকে। ছোট এক নদীও জন্ম নিয়ে নেমে চলে।

পরদিন ফেরবার পথে সেই সব দেখে ঐ পথে ফিরি।

এখন সন্ধ্যা নামার দেরি নেই। সোজা পথ ধরে নীচে জঙ্গলে নামি। আদিম অরণ্য। বিশালকায় সব গাছের সমাবেশ। সারা বনভূমি যেন ডালপালা ও লতাপাতার সামিয়ানায় ঢেকে রাখা। মনে হয় গাছগুলির তলায় রাতের আঁধার পেতে বসে আছে। মাইলখানেক যাবার পর খোলা জায়গা। ছোট নদী। জনশূন্য। অপর পারে গাছের তলায় চারিদিকে চালাঘর। দেওয়াল নেই। বাঁশের খুঁটির উপর লতাপাতার ছাউনি। এখানে-ওখানে গাছতলায় পাথর সাজিয়ে উনান পাতা। পোড়া কাঠ। ভাঙা টিন। শুকনা শালপাতা, খালি ঠোঙা, কাগজ ছেঁড়া, কোথাও বা খানিকটা হলুদ গুঁড়া, শুকনা কয়টা লঙ্কা। গত সপ্তাহের ভাঙা মেলার অজস্র চিহ্ন। বোঝা যায় কয়েক হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয়েছিল। শৌর্যাকরণ বলে ভাগ্যে সেই ভিড়ে আসিনি।

শূন্য চালাগুলি ছাড়িয়ে এসে বাঁদিকে জেলের পাঁচিলের মত ঘেরা। বড় একটা দরজা। শনি দেবতার গোশালা। বাঘের ভয়ে বড় পাঁচিল তোলা। নিকটে পাতকুয়া। সেই জলই সব কাজে ব্যবহার হয়। আরও অল্প গেলেই ধর্মশালার দুটো বাড়ি। পাহাড়ের একেবারে গায়ে। সামনে খোলা মাঠের অপর দিকে গভর্ণমেণ্টের ইনস্পেকশন বাংলো। মেলার সময় অফিসার আসেন। দূর থেকে দেখা সাদা রঙের সেই ছোট বাড়িটা।

নতুন ধর্মশালাটি দোতলা। পাথরের বাড়ি। তারই একতলায় বারান্দা ও দুটো ঘর কোনরকমে পরিষ্কার করে নিয়ে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হয়। পাশেই পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি-কাটা। কয়ধাপ উঠেই দোতলা। সেখানে একটা ঘরে স্থানীয় মোহন্তের স্থাপন করা মন্দির ও বিগ্রহ। আর একটা ঘরে মোহন্ত থাকেন। পূজারী ও মন্দিরের এক সেবকও আছে। দুটি বিহারী যাত্রী ও একজন পরিব্রাজক ব্রহ্মচারীও দু'দিন হলো এসেছেন।

উপরে আরও একটা ঘর আছে। সেবকটি জানায়, ওখানেও রাত কাটাতে পারি, কিন্তু তখনি আবার বলে, তবে সে-ঘর পরিষ্কার করতে আপনাদের অসুবিধে হবে। বড্ড নোংরা হয়ে আছে। মেলার যাত্রীদের জন্যে নয়। গুপ্তেশ্বরের ভক্তদের জন্যে।

ত্রিবেণী হেসে বলে, বুঝছেন না? বড় বড় হনুমান আছে—তাদেরই সব দুষ্কর্ম।

দোতলায় ঘরের সামনে পাহাড়ের কোলে খানিকটা খোলা জায়গা। তার

মধ্যখানে বাঁধানো হোমকুণ্ড। সামনে পাহাড়ের বুকে বিরাট গুহা। গুপ্তেশ্বরের গুহা।

কাল সকালে ভিতরে দর্শনে যাওয়া হবে।

নীচের ঘরেই খাওয়াদাওয়া সেরে রাত কাটাই। কম্বলশয্যায়। সারাদিনে মাইল-কুড়ির উপর হাঁটা। অনভ্যস্ত দেহে অপরিসীম ক্লান্তি বোধ হয়। রাত্রে কনকনে শীতও লাগে।

সকালে উঠে গুহার মধ্যে গুপ্তেশ্বর-দর্শনের জন্যে প্রস্তুত হই।

মন্দিরের সেবক এসে বলেন, জামা খুলে ফেলুন। গুহার ভেতর রীতিমত গরম। শুধু গেঞ্জিটা গায়ে রাখতে পারেন। প্যান্টও ছাড়ুন। ছোট কাপড় বা পাজামা হলেই ভাল,—ও সব জলে ভিজবে। পা তো খালি থাকবেই। বলতে হবে না। টর্চ এনেছেন নিশ্চয় ?

শেষকিরণ দেখিয়ে বলে,-এই যে বার করে রেখেছি—একটা দু-সেল, আর এইটে পাঁচ-সেল।

সেবক মুচকে হাসেন। বলেন, ঠিক আছে। কিন্তু বড় টর্চ হলেও দেখবেন, ভেতরে যা অন্ধকার, মনে হবে জোনাকির আলো। আপনারা তৈরি থাকুন, ডাকব সময় হলেই। আজ সোমবার, শিবপুজোর প্রশস্ত দিন, আজ সকালেই যাব ভেতরে একসঙ্গে। কিন্তু তার আগে গুহার বাইরেও নিত্যপুজো আছে, সারা হোক।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। সামনে চক্রাকারে চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। মাইল-দুই দূরে সামনের পাহাড়ের নীচের দিকে ঘন কালো পাথর। সেবক বলে, ঐ জায়গায় প্রকাণ্ড দুটো ডুরে-কাটা বাঘের বাস, হঠাৎ কখনও এদিকেও ঘুরতে আসে। কারও ক্ষতি কখনো করেনি। চিতাবাঘ অনেক আছে এ জঙ্গলে।

শেষকিরণ বলে, এ বনেও যদি না থাকে, থাকবে কোথায় ?

সেবক বলে, আপনারা এলেন দর্শন করতে অনেক ঘুরে,—জাপুলা থেকে এলেন বলে। এখানে আসার সোজা পথ জানেন তো ? সাসারাম স্টেশন থেকে এখন বাস চলে চুনারি পর্যন্ত। গুপ্তো সেখান থেকে বারো মাইল। যাত্রীরা হেঁটেই আসতো,—এইবার জীপ-এর রাস্তা হয়ে গেল, পাহাড়ের ওদিক থেকে নেমে এসেছে। হাঁটতে এখন অল্পই হবে—অবশ্য জীপ-এর ব্যবস্থা যদি কেউ করতে পারে।

শেষকিরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করে, হয়ে গেল! বদরীনাথেও মন্দির পর্যন্ত বাস,—এমন বনজঙ্গলে পাহাড়ের মধ্যে গুপ্তেশ্বরের গুপ্ত বাস—তাও ঘুচতে চলল। ভাগ্যে তার আগে ঘুরে যাচ্ছি!

কিছুক্ষণ পরে পুজারী ডাকেন। গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সবাই তৈরি। ন'জন। পাঁচটা টর্চ। শুধু রামলছমন যাবে না। আমাদের রান্না চাপিয়েছে। বলে, আপনারা ঘুরে আসুন। আমার তো কয়েকবারই দর্শন হয়েছে। পুজারী জিজ্ঞাসা করেন, এখানকার মাহাত্ম্য শুনেছেন ?

ভস্মাসুর বধের কাহিনী বলেন।

কঠোর তপস্যা করে ভস্মাসুর শিবকে তুষ্ট করেন। বর চান,—যার মাথায় হাত দেব, তখনি ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

ফলাফল না ভেবেই ভোলানাথ 'তথাস্তু' বলেন।

তারপর তাকে আর পায় কে? ভস্মাসুরের জয়যাত্রা শুরু হয়। দেবতারাও ভয়ে তটস্থ। একদিন ভস্মাসুরের দৃষ্টি পড়ে পার্বতীর উপর। বিবাহের লালসায় তাঁর পিছু পিছু ঘোরে। সাধ্য কার তাকে নিবৃত্ত করে? স্বর্গে দেবতা মহলে উৎকণ্ঠা জাগে। ভোলানাথের কীর্তি,—এখন সামলায় কে? নারদ গিয়ে শিবকে জানান। মহাদেবের এবার টনক নড়ে; তাই তো। পার্বতীর অবলাঞ্ছনা! নারদই বোধ হয় পরামর্শ দেন। পার্বতীর রূপ ধারণ করে শিব ভস্মাসুরের সামনে আসেন। বলেন, তোমাকে আনন্দ দিতে নৃত্য করব, দেখ! পার্বতী-বেশী শিব নাচতে থাকেন। নৃত্যের তালে ভস্মাসুরেরও মনে ছন্দের উন্মাদনা জাগে, নিজেও নাচতে থাকে নকল পার্বতীর সঙ্গে, তাঁর অঙ্গভঙ্গিরও অনুকরণ করে। 'পার্বতী' এক হাত কোমরে, অপর হাত নিজের মাথায় রেখে মৃদু হেসে ঘুরে ঘুরে নাচেন। ভস্মাসুরও আপন মাথায় হাত দিতেই চক্ষের পলকে ভস্মীভূত হন।

পূজারী দেখান,—এই সেই স্থান। গুহার মুখেই এই ছাই-রঙের পাথরটা সেই অসুরের দেহাবশেষ।

বিরাট গুহা। প্রবেশ পথও বিশাল। যেন প্রাচীন কালের সেই ইজিপ্টের অতিকায় দেবমূর্তির মুখবিবর। মনে হয় আঠারো (১৮) ফুট × বারো (১২) ফুট গুহামুখ। গুহার বাইরে সামনের দিকটা বাঁধানো খিলান গাঁথনি। প্রবেশ করেই খানিকটা নীচে নামা—পাথরের গা কেটে কয়েকটা ধাপ। নীচে নেমে সমতল সুড়ঙ্গ-পথ। যেন, 'রেলওয়ে টানেল'। তেমনি প্রশস্ত। গুহার ছাদ অনেক উপরে। কোথাও সমান, কোথাও বা এবড়ো-খেবড়ো, পাথর ঝোলে। বাইরের দিনের আলো গুহার ভিতরে খানিকদূর আসে, মনে হয় যেন ম্লান চাঁদের আলো। রাতের আঁধারে তরল হয়ে ভোর হয়-হয় ভাব। কিন্তু মিনিট তিন-চার যাবার পরই সে-আলোও অন্ধকারের বুকে হারিয়ে যায়। তখন চারিপাশ থেকে জমাট কালো অন্ধকার যেন চেপে ধরে। সবাই টর্চ জ্বালে। আলোক-বাণের ফলক ছোটে। কিন্তু অন্ধকারের বুকে বেঁধে না। সামান্য দূর গিয়েই সে-আলো মিলিয়ে যায়। শেষকিরণের হাসি শুনি, বলে, দেখছেন মসীকালো ভস্মাসুর মুখ হাঁ করে আগুনের বাণ কেমন বেমালুম গ্রাস করছে! একেই বলে, সূচীভেদ্য আঁধার।

খালি পায়ের নীচে ভিজে মাটি ও পাথর। প্রায়ই অতি পিচ্ছিল। সাবধানে পা ফেলি। শেষকিরণ পাশে এসে বলে, দেখবেন তাড়াতাড়ি করবেন না,—খুব সাবধান। হাত বাড়িয়ে ধরে।

শুধু পিছল হলে কথা ছিল না। তার উপর আবার অসমতল মেঝে। পায়ের তলায় হঠাৎ সূচাল পাথর যেন হুল ফোটায়। আশপাশেও মাঝে মাঝে

বড় বড় পাথর, মাটির ঢিবি। পাশ কাটিয়ে বা ওঠানামা করে এগিয়ে চলা। হাতের ভর দিয়ে বা পাশের দেওয়ালে হাত দিয়ে ধরেও কোথাও নামা। দু'একবার পিছল পাথরের উপর থেকে বসে-বসেও নামতে হয়। চারিপাশে টপটপ শব্দ। জলের ফোঁটা পড়ে। মাথার উপর থেকে, পাহাড়ের গা বেয়েও। কোথায় পা ফেলি, অনেক সময় তাও জানা যায় না। টর্চের আলো একটু আঁকা-বাঁকা হলেই পাথরের জটলায় হারিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় কোন্ দিকে চলি তাও বুঝি না। তবুও মনে ভয় বা ভাবনার ছায়ামাত্র নেই। এতো ঘনীভূত অন্ধকার, . . . স্পন্দন-ভরা উজ্জ্বল আনন্দ, সাগ্রহ কৌতূহল।

ধীরে ধীরে সকলে এগিয়ে চলি। সারি বেঁধে চলা। একসঙ্গে। কেউ পেছিয়ে গেলে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। নানান্ দিকে গুহার আরও অন্যান্য পথ। সেগুলিও কোনটা বড়, কোনটা ছোট। যেন অতি বৃহৎ অকটোপাস-এর ছড়ানো হাত-পা। পূজারী বলেন, ঠিক যেদিকে চলেছি, তাই দেখে চলে আসুন—কোন ভাবনা নেই—জয় শিবশম্ভো বলে হাঁক ছাড়েন। সারা গুহা যেন ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে কেঁপে ওঠে। পূজারী স্তব ধরেন। যাত্রীরাও থেকে থেকে 'হর হর মহাদেও' 'জয় শিবশঙ্কর—প্রভো-ও-ও' বলে প্রাণ খুলে ডাকতে থাকেন। ভক্তির ও আনন্দের উত্তেজনায় সেই বিরাট গুহা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

এক জায়গায় গুহার আয়তন অল্প-পরিসর। তাহলেও তেমন কিছুই ছোট নয়। পূজারী জানান, তবুও এই জায়গাতে ভিড়ের সময় কোন কোন যাত্রীর শ্বাসকষ্ট হয়। দু-একজন জ্ঞানও হারায়। দুশো-তিনশো লোক এক সঙ্গে ভেতরে ঢুকলে হবেই তো। তখন আসেননি ভালই করেছেন, লোকেরা তখন স্বেচ্ছামত এগুতে পারে না, ভিড়ের চাপে আপনা থেকেই চলতে থাকে।

আমাদের দল ছোট। বায়ও কোনই অস্বস্তি বোধ হয় না। শীত তো নেই-ই। বরং অল্প গরম ভাব। বাতাস চলাচল বোঝা যায় না। বাতাসের অভাবও বোধ হয় না।

প্রায় মিনিট দশ যাবার পর—কতো শত ফুট এগিয়ে গিয়ে হিসাব থাকে না—গুপ্তেশ্বর শিবের নিকট পৌঁছুই।

গুহার মধ্যখানে মেঝের উপর শিবলিঙ্গের মত এক অভিনব আকৃতি। প্রায় মানুষসমান উঁচু। দেখেই বোঝা যায়, Stalagmite-এর সংগঠন। পূজারী বলেন, ওপরদিকে টর্চের আলো ফেলুন, দেখুন কি ঝুলছে ওখানে। দেখা যায় গুহার ছাদ থেকে ঝুলে আছে—stalactite। যেন, রাজপ্রাসাদ-কক্ষের 'সিলিং' ceiling থেকে ঝোলে প্রকাণ্ড বেলোয়ারী ঝাড়লণ্ঠন, —Chandelier। উপরের সেখান থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ে নীচে শিবের মাথায়। পূজারী বলেন, ওপরে ওটা শিবের জটা। জটা বেয়ে জল ঝরে।

গুহার ঐখানে আর এক পাশে দেওয়ালের গায়ে—পাথরকাটা তাক মত। তারও উপর ছোট ছোট Stalagmite-এর গঠন। পূজারী দেখিয়ে বলেন, ইনি দেবী পার্বতী, এপাশে অন্যান্য দেবতারা।

অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখি। পাহাড়ের আরও গভীরদেশে গুহা এগিয়ে যায়। পূজারী জানান, কতো দূরে এভাবে চলে গেছে জানা নেই। এর নাকি শেষ পাওয়া যায় না। বেশিদূর ভেতরে এগুনো সম্ভব নয়। শোনা যায় একবার দু'জন দুঃসাহসী লোক আলো নিয়ে ঢোকে, কিন্তু আর ফেরেনি। এখানে আসবার সময় আশপাশে আরও যেমন অলিগলি—ছোট-বড় গুহা দেখেছেন, তারও অনেকগুলির নাকি শেষ নেই।

ভাবি, প্রকৃতির কি পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি। অদ্ভুত, অপরূপ,– অথচ অতীব সুন্দর। Christopher Fry-এর নাটকের একটি লাইন মনে পড়ে:

"Curious crooked beauty of the earth. Fascinating."

পূজারী সবাইকে ডাকেন। পূজা শুরু হয়। ধূপ দীপ জ্বলে। মন্ত্র উচ্চারিত হয়। গুহার মধ্যে সুরের প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়ায়। পূজারী সকলের হাতে ফুল-বিল্বপত্র দেন। শেষাকিরণ সযত্নে আনা বনফুল, বিল্বফল ও পত্র বার করে। ভক্তিভরে সকলে অঞ্জলি দেন। শিবের মাথায় জল চড়ান। ঘৃতের প্রলেপ লাগান। পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি হয়। দীপের আলোক শিখায় গুহার ঘনান্ধকার যেন রক্তিম রেশমী ওড়নায় মুখ লুকায়। থরথর করে প্রদীপ-শিখা কাঁপে। জলসিক্ত পিঙ্গল stalactite-এর অসংখ্য অংশে আলোর দ্যুতি ফোটে। মনে যে রাতের অপার্থিব স্বপ্ন, তারই চমক জাগে।

ভাবি, এই তো আদিম যুগের প্রকৃতিপূজক, প্রকৃতির সৃষ্ট এই গুহা-মন্দির, তাঁরই হাতে-গড়া শিবসুন্দরের লিঙ্গমূর্তি। ক্ষুদ্র মানব ভক্তি ও কল্পনার আলপনা এঁকে বিবরের [illegible]

আর এক দিকে বৈজ্ঞানিকও জ্ঞান ও বিদ্যার বলে এই stalactite ও stalagmite-এর রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

এই ধরনের চুনা-পাহাড়ের গুহার মধ্যে ছাদের (ceiling) পাথরে ফাটল থাকে। তারই মাঝ দিয়ে জল ঝরে। সেই জল পাথরের অন্তরাল পথে গড়িয়ে আসার সময় carbonate of lime এ অভিষিক্ত হয়। গুহাভ্যন্তরের বদ্ধ বাতাস ও ভূগর্ভ থেকে যে carbon dioxide গ্যাস ওঠে, জলও সেই গ্যাস গ্রহণ করে এবং তারই ফলে সেই carbonate of lime দ্রবীভূত হয়ে জলে মিশে থাকে। গুহার ছাদের ফাটলের মুখে পৌঁছে সেই জল নীচে ঝরে পড়বার সময় গ্যাস জলের আশ্রয় ছেড়ে আবহাওয়ায় মিশে যায়, তখন শুধু carbonate of lime-এর থিতানো অংশ (deposits) ছাদের উপর থেকে জমে ঝুলতে থাকে। দেখায় যেন হিমরাজ্যে তুষারগুহায় বরফের ঝুরি জমে উপর থেকে ঝোলে। এই কারণেই stalactites-এর সব সময়ে উপর থেকেই ঝুলে থাকা প্রাকৃতিক রীতি। কখন কখন stalactite-এর মুখ থেকে অতিমাত্রায় জল ঝরে পড়ে গুহার মেঝেতে তখন মেঝের উপর উল্টামুখে উপরের ঝোলা অংশের মত আকৃতির গঠন হতে থাকে। দেখায় যেন উই-এর ঢিবি। মাটির উপর এই গড়নগুলিকে বলে,—stalagmites, এইভাবে যদি উপরে ও নীচে দুদিকেই অনেককাল ধরে গড়ন হতে থাকে, তখন কালক্রমে দু' অংশ মিশে যায়,

দেখায় যেন গুহার মধ্যে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রকাণ্ড স্তম্ভ।

এই stalactite ও stalagmite-গুলির যেমন বিচিত্র বিভিন্ন গঠন, তেমনি দেখতেও অতি মনোহর। রাসায়নিক বস্তুর গুণে দেখায় স্ফটিকের দানার মত—semi-crystalline, আকার হয় সাধারণতঃ conical-শাঙ্কব, বা কদলী-মঞ্জরী (মোচা)র মতন, কখন বা cylindral বেলনাকার।

গুপ্তেশ্বর গুহার বিশদ বিবরণ বিশেষজ্ঞরা কিছু কিছু লিপিপদ্ম করে গেছেন। তা থেকে জানা যায়, গুহায় প্রবেশ করে প্রথম কক্ষটি প্রায় ৩৬০ ফুট পূর্বমুখী যায়। এরই মাঝপথে দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে আর একটি শাখা-সুড়ঙ্গ বার হয়ে গেছে। প্রায় ৯০ ফুট ঘুরে এসে সে-পথ এই প্রধান সুড়ঙ্গে আবার যুক্ত হয়। এর পর আবার একটি সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ মূল কক্ষটির মত আর এক দ্বিতীয় বৃহৎ কক্ষের সঙ্গে সংযোগ ঘটায়। সে-কক্ষ প্রায় ৩৭০ ফুট লম্বা। তারই পশ্চিম কোণ থেকে প্রায় ১৭০ ফুট দূরে আর এক সুড়ঙ্গ আড়াআড়ি ভাবে এসে এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায়। সেই সুড়ঙ্গের দক্ষিণ অংশও প্রায় ২৪০ ফুট লম্বা। এ ছাড়া বহু ছোট ছোট সুড়ঙ্গপথ চারিপাশে ছড়িয়ে আছে। সেগুলির অধিকাংশই কাদায় ও জলে ভরা। তার ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। জনপ্রবাদ, এই গুপ্তেশ্বর গুহার সঙ্গে একদিকে বারাণসীর ও আর একদিকে গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের যোগাযোগ আছে।

গুহাভ্যন্তরে চারিপাশেই stalactite ও stalagmite-এর বিচিত্র গঠন সমষ্টি।

পৃথিবীর নানান্ দেশে প্রাকৃতিক এই বিস্ময়কর ও অপরূপ সৃষ্টির নিদর্শন দেখা যায়। তন্ময় হয়ে আমিও এখানে দেখি।

শৈর্ষকিরণের ডাকে চমক ভাঙে, চুপ করে ভাবছেন কি? পূজারীজি ডাকছেন যে, গুহার অন্যদিকেও আরও কি সব দেখবার আছে, চলুন?

আবার দল বেঁধে এগিয়ে চলা। পায়ের কাছে কোনমতে আলো ফেলে দেখা। সেই উঁচুনীচু পিছল পথ। পাথরের বাধাবিঘ্ন। হাতে-পায়ে ভর দিয়ে ওঠানামা। অন্ধের মত অন্ধকারের মাঝে অজানা কোথায় হাতড়ে যাওয়া।

কোথা দিয়ে ঘুরে নতুন এক জায়গায় পেঁছুই। গুহার মাথা অনেকখানি উঁচু। সামনে লম্বা সোজা চলে গেছেও অনেক দূর। আলো ফেলেও বোঝা যায় না কতখানি। পূজাবী বলেন, ওদিকের শেষ নেই। এটা ঘোড়দৌড়ের জায়গা। দেখুন না মাটিতে ঘোড়ার পায়ের ছাপ। দেবতারা এখানে ঘোড়া ছোটাতেন।

আলো ফেলে পায়ের কাছে দেখি,—মাটিতে প্রায় হাতখানেক পরিধি, বিঘতখানেক গভীর গোলাকার গর্ত। সারি সারি এগিয়ে গেছে। দেবতার ঘোড়া—আকার বড় হবারই কথা।

আবার ঘুরিয়ে অন্যত্র এক জায়গায় নিয়ে চলেন। সেখানে প্রকাণ্ড

গোলাকৃতি হল্-এর মত। উপরেও যেন গম্বুজ। শুনি, এটা দেবতার নাচঘর।

ভাবি, ভস্মাসুর ও পার্বতী-বেশী শিবের নৃত্য এইখানেই বুঝি হয়েছিল!

আবার গুহার আর এক স্থানে। দেওয়ালের এককোণে গুহাতলে প্রকাণ্ড গহ্বর। পূজারী বলেন, এগিয়ে আলো ফেলে দেখুন—কিন্তু খুব সাবধান। বেশি ধারে যাবেন না যেন,—দেবতাদের জলাধার, কূপের মত। সব সময়েই জল থাকে, গভীর কতোখানি কেউ জানে না।

ঘুরে ঘুরে দেখি আর ভাবি, এ কোন্ রাজ্যে আছি!

এক প্রান্তে বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত রহস্য। অপর প্রান্তে ক্ষুদ্র মানবের অসীম বিশ্বাসের উদ্দাম কল্পনা। জানে, ভগবানের অনাদি অনন্তরূপ। তবু আবার তাঁরই উপর আরোপ করে—মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধরনধারণ,—আহার, বিহার, শয়নস্বপন, নৃত্যগীত, সুখ-দুঃখের যেন ঐহিক জীবন!

গুহা ছেড়ে বাইরে আসি। দিনের আলো চোখে ধাঁধা লাগায়। গুহাভ্যন্তরের উত্তাপের পর নগ্নদেহে আবার পাহাড়ী শীতের হিমস্পর্শ অনুভব করি। গুহার সুমুখে চত্বরে হোমকুণ্ডে আগুন জ্বলে। পূজারীর আমন্ত্রণে সেই ধুনি ঘিরে সবাই বসি। আরাম পাই। চারিদিকে তাকিয়ে ভাবি, যেন হারিয়ে-যাওয়া ছেলে আবার মায়ের কোলে ফেরে। পূজারীর সেবক প্রকাণ্ড লোটায় দুধ আনে। ধুনির আগুনে সেই দুধে চা ফোটে। আরও কি কি মশলা ছাড়েন। প্রস্তুত হলে দেবতাকে পূজারী উৎসর্গ করেন। গেলাস, বাটি, মগ—যার যা আছে আনেন, সবাই পরমপরিতৃপ্তি-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করি।

পূজারী এগিয়ে এসে জানান, ধর্মশালার সংস্কার প্রয়োজন, নিত্য দেবসেবারও খরচ আছে। যাত্রীদের উপরই সব নির্ভর, আশা-ভরসা।

ওদিকেও শুনি, শেষকিরণের কাছে ব্রহ্মচারী যাত্রীটিও নিবেদন জানান, পরিব্রাজক সাধু, এবার এখান থেকে যাত্রার ইচ্ছা জগন্নাথধামে, সেখান থেকে রামেশ্বরে, তারপর দ্বারকা হয়ে বদরীনারায়ণের পথে,—জয় শিবশঙ্কর—বলে হাত পাতেন।

গুপ্তেশ্বরের গুহার ভিতরে কাটানো সেই কয়েক ঘণ্টা কাল,—এখন মনে হয়—সে-যেন কোন্ আর এক যুগ,—অপরূপ এক স্বপ্নরাজ্য। এখন মানুষের আবেদন কানে আসে, রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষ আবার পৃথিবীর ডাক শোনে।

সাতশো পাহাড়ের দেশ—সারাণ্ডা

॥ ১ ॥

শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গল্প হচ্ছিল। তাঁর অমর সাহিত্যকীর্তি 'আরণ্যক' মনে কী গভীর অনুভূতি ও আনন্দ জাগায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করি। হঠাৎ তিনি প্রস্তাব করেন, পাহাড়ে পাহাড়ে আপনিও তো ঘোরেন। একসঙ্গে একবার সেদিকে যাবার খুব ইচ্ছা হয়, কিন্তু ও আর আমার হবার নয়। আপনি বরং চলুন বেহার বা সি পি'-র জঙ্গলে,—নিজের চোখে দেখে আসবেন গভীর বনের সে কী রূপ! কি যেন ক্ষণিক ভেবে আবার বলেন, চলুন, নিয়ে যাবো সারাণ্ডার জঙ্গলে।

তখনি সাগ্রহে জানাই, খুব রাজী। একখানা পোস্ট কার্ড লিখে জানিয়ে দেবেন, কবে কোথায় কখন আপনার সঙ্গে যোগ দিতে হবে। দেখবেন, ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছি।

মধ্যভারতের গভীর জঙ্গলে ঘোরা। বিভূতিবাবু সঙ্গী! ভাবতেই মন আনন্দে নেচে ওঠে।

কিন্তু, তাঁর আহ্বান আর আসে না। অকস্মাৎ আর এক ডাকে সাড়া দিয়ে তিনিই চিরতবে চলে যান। বঙ্গবাণীর স্বর্ণমুকুট থেকে একটি উজ্জ্বল রত্ন ঝরে পড়ে।

আমার অন্তরের গোপন কোণে বন্ধুর হাতে জ্বালিয়ে-দেওয়া সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার দীপখানি হঠাৎ-ওঠা এক ঝড়ের হাওয়ায় নিবে যায়।

সারাণ্ডায় যাওয়ার কথা আর মনেই রাখি না। কিন্তু, তখন কি আর জানি, বহু বছর পরে সেই বেদনামলিন প্রদীপ-খানিতে আবার অকস্মাৎই আশার আলোক-শিখা জ্বলে উঠবে।

বন্ধুই যেন মনে রেখে দূত পাঠান।

॥ ২ ॥

সাঁওতাল পরগণা। নিভৃতে একাকী দিন কাটে।

হঠাৎ আলাপ করতে আসেন স্থানীয় নবাগত এক গভর্ণমেণ্ট অফিসার। তাঁর পরিচয় আগেই কানে আসে। কর্মক্ষমতার খ্যাতিও শুনি। নিজে থেকে এসে প্রাণখোলা-হাসিমুখে বলেন, চলে এলাম আলাপ করতে,—এমনিই,—কোন কাজকর্মে আসা নয়, নিছক গল্প করাই উদ্দেশ্য। আপনার যদি নেহাত আপত্তি না থাকে, সময় পেলেই চলে আসবো, সরকারী কাজ সে তো করছিই,—কিন্তু বাকি সময়টা যে কাটতেই চায় না।

নিজে থেকেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। দালানের কোণে স্টোভের উপর কেট্‌লি চাপানো দেখে উৎসাহে বলেন, চা হচ্ছে নাকি? তা'হলে তো ভালই জমবে।

পরনে বুশ্ শার্ট, ফুল প্যান্ট। দেহের বর্ণ শ্যাম। গড়নে লম্বা নন, তাই অল্প মোটা দেখায়। চালচলনে সজাগ সক্রিয়। দেখেই মনে হয় কর্মিতকর্মা। হাতে ছোট বেটন্। গোল মুখে প্রয়োজনমত যেমন হাসির ঝলক, তেমনি গুরুগম্ভীর রাশভারী ভাব।

এসেই সঙ্গের লোকটিকে হুকুম দেন, ঠিক আছে তুমি এখন গাড়ি যাও। বলে দিও আমি এখানে আছি, ফিরতে একটু দেরি হবে।

কয়দিনেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিহারপ্রবাসী বাঙালী। উপাধি চট্টরাজ। হিন্দী জানেন খুব ভালই। চাকরি-জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার অনেক রকম গল্প করেন। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে, এই কংগ্রেসী রাজত্ব পর্যন্ত। খ্যাত অখ্যাত নেতাদের কাহিনী। তাঁদের কারও বা নানান সদ্গুণের সুখ্যাতি, আবার কারো দুর্বল স্বভাবের রসাল বিবরণ।

মাছধরার দারুণ শখ। পুকুরের সন্ধান ও ছুটির যোগাযোগ হলেই ছোটেন। হাতে নাকি মাছও ওঠে খুব। অর্থাৎ মাছের দুর্ভাগ্য তাঁর সৌভাগ্য। হেসে বলেন, নিজের হাতে ধরা মাছ, যেমন খেয়ে সুখ, তেমনি বিলিয়েও আনন্দ। বুঝলেন,— লোকে বলে আমার নাকি খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে একটু দুর্বলতা আছে। নেহাত মিথ্যে নয়। তা খাওয়া-দাওয়া ভালরকম পেলে ভাল লাগবে, আশ্চর্য কি?—বলে হো হো করে হাসেন।

পরে দেখি, নিজে খেয়ে যেমন আনন্দ পান, অপরকে খাওয়াতেও তেমনি উৎসাহী।

যেমন ভোজন-বিলাস তেমনি আবার সাহিত্য রস-পিপাসু। এখনও নতুন বই পেলেই পড়েন। বলেন, হাতে একটা বই না নিয়ে রাত্রে শুলে চোখে ঘুম নামে না।

নিজেও ইংরেজিতে প্রবন্ধাদি লেখেন। বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদও করেন। পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। নিজে গল্প শোনাতে বিপুল আগ্রহ, আবার অপরের মুখে গল্প শুনতেও প্রচুর উৎসাহ। হেসে, হাসিয়ে, জমিয়ে একটানা গল্প করেন, আবার স্থির হয়ে বসে একমনে অপরের গল্পও চুপ করে শোনেন।

ভাবি, ভালো বক্তার এই-ই তো লক্ষণ। নিজে ভালো শ্রোতাও হতে হয়। দেওয়া-নেওয়া—একই গুণের দুইটা দিক।

তিনিই একদিন কথাটা অকস্মাৎ পাড়েন। হিমালয় পথের গল্প শুনে বলেন, পাহাড়ে অতো ঘোরেন, চলুন না একবার সারাণ্ডার জঙ্গলে।

শুনে চমকে উঠি। পূর্বস্মৃতি মনে জেগে ওঠে। উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করি, সারাণ্ডায়? কেন বলুন তো?

আশ্চর্য হয়ে তিনি বলেন, বাঃ! আপনি তো খাসা প্রশ্ন করলেন? বিভূতিবাবুর বর্ণনা ভুলে গেলেন নাকি? আমাকেও যে দু-দুবার যেতে হয়েছিল ঐ অঞ্চলে,—সরকারী কাজে। আবার সুযোগ পেলেই যেতে রাজী আছি। গভীর বনের সে কী আশ্চর্য রূপ!—চলুন, ব্যবস্থা করি।

বিভূতিবাবুর সেই উৎসাহ-বাণী সাগরের সুদূর ওপার থেকে কানে যেন ভেসে আসে!

বহু বছর আগেকার সেই সংকল্পের কাহিনী এঁর কাছে প্রকাশ করি।

চট্টরাজ বলেন, ডিসেম্বর মাসেই একবার টাটানগর যেতে হচ্ছে, সরকারী কাজে। বলেন তো সেই সময় দু'দিনের ছুটি নিই। একটা জীপ-এর ব্যবস্থা হয়ে যাবে, পেট্রোলটাই শুধু কিনে দিতে হবে। টাটানগর থেকে প্রায় ১১০ মাইল। একদিনেই চলে যাবো। সারাণ্ডার সলাই ফরেস্ট বাংলোতে রাত কাটিয়ে, পরের দিন জঙ্গলে কিছু ঘুরে আবার ফিরে আসা। রাজী তো?

শুনে বলি, যেতে সব সময়েই প্রস্তুত; কিন্তু যে প্রোগ্রাম বলছেন তাতে রাজী নই।

চট্টরাজ চিন্তিত হন, আমার যে সে-সময়ে দু-তিন দিনের বেশি ছুটি পাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে?

আশ্বাস দিয়ে বলি, আপনার থাকার কথা বলছি না। আমাকে রেখে চলে আসবেন। আট-দশদিন পরে যাতে ফিরে আসতে পারি, তার যানবাহনের যা হোক একটা ব্যবস্থাও করে দেবেন, তা'হলেই হলো। অভিমন্যুর ব্যূহভেদের দুরবস্থা না ঘটে!

চট্টরাজ বলেন, একা সেই বনে থাকবেন? আশ্চর্য! ভালো, তাই যদি চান, সেইমতই আয়োজন করা যাবে। কিন্তু ভীষণ জঙ্গল। এ-সব বন কী ভয়ংকর, তার এক গল্প শোনাই। গল্প নয়, সত্যিকারের ঘটনা। বিলেত থেকে সদ্য-পাস-করা এক সাহেব আই. সি. এস. অফিসার এলেন। ছোকরা মানুষ। খেলাধুলো শিকারে প্রচণ্ড উৎসাহ। আনকোরা খাস সাহেব, কিন্তু এদেশের বনজঙ্গল সম্পর্কে নিরেট মুর্খ। একবার গেলেন বাঘ শিকারে সেই গভীর জঙ্গলে। সঙ্গে লোকজন অন্য শিকারীও আছে। গাছের ওপর মাচা বেঁধে শিকারের ব্যবস্থাও হয়েছে। বাঘও শেষ পর্যন্ত দেখা দিল। সাহেবও গুলি ছুঁড়লেন। হয়ত বাঘের কোথাও লেগেও যায়, বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার তুলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়। ভোরে সাহেবের জেদ চাপে—রক্ত বা 'পাগ্ মার্কস' দেখে বনের মধ্যে এগিয়ে যাবেন। অল্প দূরেই যে নালাটা তার আশপাশে একটু খুঁজলেই নিশ্চয় পাওয়া যাবে। হুকুম দেন, চলো, ঐ দিকটা দেখে তবে ফিরব।

সবাই নিষেধ করে, জলের পাশে ঝোপজঙ্গল, কোথায় বসে আছে কে জানে, জখম হয়ে থাকলে তো কথাই নেই, অমন ভাবে হেঁটে এগিয়ে যাওয়া,—কখনই উচিত নয়। সাহেব কথা শোনেন না। এ-দেশের জঙ্গলের জানোয়ারের কী ভীষণ হিংস্রতা তার খবরও রাখেন না। রাইফেল হাতে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলেন। এ দেশের লোক সব ভীরু—মুখ টিপে হেসে জানিয়ে যান।

অগত্যা সঙ্গীরাও পিছু পিছু সাবধানে চলেন। নালার কাছে একটা বাঁক। সাহেব সেইদিকে ঘুরে চোখের ক্ষণিক আড়ালে যেতেই বাঘের বিকট শব্দ। ছুটে সবাই এগিয়ে গিয়ে দেখে ধরাশায়ী সাহেবের মাথা বাঘের মুখের মধ্যে।

রাইফেল ছোটে। বাঘও মরে। কিন্তু সাহেবের মৃতদেহ দেখে আর চেনবারও উপায় নেই।

গল্প শুনে বলি, শিকারে তো আমি যাচ্ছি না, তাই ভয় নেই আপনার।

চট্টরাজও হেসে জানান, যে-দিকে যাব আমরা, সেটা হাতির জঙ্গল। বড় বাঘ ওখানে কমই দেখা যায়। যাত্রার প্রোগ্রাম তা হলে ঠিকই রইলো।

॥ ৩ ॥

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বিকালবেলা ট্রেনে টাটানগরে পৌঁছুই। স্টেশনে চট্টরাজ হাজির। সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক। তাঁকে দেখিয়ে বলেন, ইনি মোটর নিয়ে এসেছেন। আপনি নাকি এঁকে দেখলেই চিনতে পারবেন, বলছেন। এঁর নিজের বাড়িতে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমি বলেছি, কি জানি? রাজী হবেন কিনা। তাই ডাক-বাংলোতেই ওঠবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবে খাওয়া-দাওয়াটা ওঁর ওখানেই হবে।

দেখেই চিনতে পারি। আইন কলেজে কয়েক বছর আগেকার আমার ছাত্র। খেলাধুলাতেও বিপুল উৎসাহ ছিল। চেহারাও ছিল স্পোর্টস্ম্যানের মত। এখন দেখি একটু হৃষ্টপুষ্ট, রাশভারী। নিজেই হেসে বলে, স্যার, খেলাধুলো সব বন্ধ, ভুঁড়ি দেখা দেবে না? বসে বসে শুধু কাজ করা?

শুনি, এখানে ওকালতিতে বেশ সুনাম হয়েছে। মানুষ হিসাবেও সকলের প্রশংসা পেয়েছে।

তাকে দেখে সত্যই আনন্দ পাই। তার বাড়িতে উঠছি না বলে দুঃখ জানায়। বলি, এক রাত্তিরের তো ব্যাপার! কাল সকালেই রওনা হবার কথা। তোমার আতিথেয়তা তো ভোগই করব—খাওয়ানোর ব্যবস্থা যখন করছই।

তার আনন্দমুখর গৃহে আন্তরিক আদরযত্নে মুগ্ধ হই। ভূরিভোজনে চট্টরাজও মহাখুশী।

পরের দিন জীপ-এ যাত্রা।

চট্টরাজ বলেন, প্রায় ১১০ মাইল পথ। এমন কি আর সময় নেবে? বেলা থাকতেই পৌঁছে যাব। দুপুরের খাওয়ার পর্বটা এখানেই তাড়াতাড়ি শেষ করে বেরুনোই ভালো। সঙ্গে আমার এক বন্ধুও যাবেন। মিঃ সেন। ভালো শিকারী। লোকও চমৎকার। বন্দুক নিয়ে চ'লছেন

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দেন। সব কিছু আয়োজন করে রওনা হতে ঘণ্টা দুই বিলম্বই ঘটে। সাড়ে দশটা বেজে যায়।

জীপ-এ যাত্রী আমরা পাঁচজন,—চট্টরাজ, মিঃ সেন, তাঁর নেপালী আরদালী—বাহাদুর, ড্রাইভার ও আমি।

টাটানগর থেকে চাঁইবাসা প্রায় চল্লিশ মাইল। সেখানে পৌঁছে আবার খানিক সময় যায়। বনবিভাগের রেস্ট হাউস-এ থাকবার অনুমতিপত্র চাঁইবাসার দপ্তর থেকে নেওয়ার কথা। গিয়ে শোনা যায়, যাঁর কাছে আছে,

তিনি তখন অফিসে নেই। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

চাইবাসা থেকে হাটগামাবিয়া ২২ মাইল। তারপর আরও মাইল কুড়ি গিয়ে বরাইবুরু। অর্থাৎ পাহাড়ও শুরু। বুরু অর্থেই পাহাড়। সেই পাহাড়-পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে আরও প্রায় ২৭ মাইল। তবে পাওয়া যাবে সলাই ফরেস্ট বাংলো। কিন্তু এদিকে বরাইবুরুর নীচে এসে যখন পৌঁছুই, সূর্যদেব তখন পাটে নামেন। সামনেই পাহাড়ের সারি। পথ-রোধ করে দাঁড়িয়ে। আবছা আলোর রহস্য-ভরা। কেমন যেন থমথমে একটা ভাব।

চট্টরাজ একটু গম্ভীর হন। বলেন, তাই তো! এত দেরি হয়ে যাবে বোঝা যায়নি। একটু পরেই তো একেবারে—অন্ধকার হয়ে যাবে,—আর বন শুরু হলে—এখনি তো হবে—সে কী ভীষণ জমাট অন্ধকার—রাস্তা চেনা যাবে তো? তা'ছাড়া, এই জঙ্গলের জানোয়ার—

হেসে বলি, বনে জানোয়ার তো থাকবেই, তার কথা ছাড়ুন। ড্রাইভার পথ চেনে তো? হেড্‌লাইট দুটোও ঠিক আছে? আজ আবার চাঁদিনী রাত,—ভাগ্য ভালোই।

সেন বলেন, বন্দুকটা গুলি ভরে ঠিক করে রাখি।

শুনে আশ্বস্ত হই, ড্রাইভার, আরদালি কেউই এ-পথ চেনে না। চট্টরাজও এর আগে আসেন অন্য এক পথে। সবাই নতুন। রীতিমত অ্যাডভেনচারের সূচনা!

চট্টরাজ বলেন, সামনের পাহাড়ের ওপরে ঐ একটা বাড়ি না? নিশ্চয়ই বরাইবুরু ফরেস্ট বাংলো। নামা যাক ওখানে। চৌকিদারের কাছে খবরাখবর পাওয়া যাবে। তেমন যদি দরকার হয়, ওখানেই রাত কাটানো যেতে পারে। কি বলেন?

বলি, চলুন, দেখা যাক। তবে এমন রাত্রে বনের মধ্যে মোটর করে বেড়াবার এই রকম সুযোগ। হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবেন? খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে আপনার দুর্বলতার কথা নিজেই স্বীকার করেন। এমন সুখাদ্য বাঘদের মুখে তুলে দেওয়া—এ সৌভাগ্য কি আর আসবে?

ঘুরে ঘুরে পথ পাহাড়ে খানিক ওঠে। বাংলোতে আলো জ্বলে, দেখি। লোকজনও ঘোরে।

নেমে খবর নিয়ে চট্টরাজ ভরসা পান। এ অঞ্চলের ফরেস্ট অফিসার স্বয়ং ওখানে রয়েছেন। চট্টরাজের সঙ্গে জানাশোনা। অমায়িক বাঙালী ভদ্রলোক। সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু প্রথমেই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনাদের প্রোগ্রাম তো জানি। আজ সলাই বাংলোতে থাকবেন। অথচ অত দেরি করে এইখানে পৌঁছুলেন? এই তো সবে পাহাড় শুরু। বনের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে,—তাছাড়া—

চট্টরাজ সাগ্রহে জানান, সেই জন্যেই তো আপনার পরামর্শ চাই, কি করা উচিত এখন?

তিনি বলেন, আগে চা খেয়ে নিন, সব তৈরি রয়েছে। আজ আমাদের বড়সাহেব এখানে এখনি আসছেন। এইখানেই আজ তাঁর প্রোগাম। তাই তো এসে অপেক্ষা করছি।

চট্টরাজ চুপিচুপি আমাকে বলেন, এখানে রাত কাটানোর আশা তাহলে গেল!

সোপচারে চা পরিবেশন হয়। চট্টরাজও উৎসাহ ফিরে পান।

ফরেস্ট অফিসার বলেন, আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন। আজ চাঁদ্‌নী রাত—মাঝে মাঝে আলো পাবেন। তবে, একটা স্লিপ্‌ লিখে দিই, নিয়ে যান। পথের ওপর নাকা—মানে, চেক্‌পোস্ট পাবেন, বনে ঢুকতেই। সন্ধ্যেবেলা পথের গেট বন্ধ হয়ে যায়। ফরেস্ট রোড,—বাংলোর পারমিট থাকলেও, বনের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। স্পেশাল অর্ডার একটা লিখে দিই।

চট্টরাজ জানান, আমরা কিন্তু সবাই এদিকে নতুন। রাস্তা ভুল হবার ভয় নেই তো?

অফিসার বলেন, তাই নাকি? তাহলে সঙ্গে একটা লোক দিলে হতো। কিন্তু—আজ তো আর কাউকে স্পেয়ার করা সম্ভব নয়,—খোদ বড়সাহেব এখনি এসে হাজির হবেন। তবে—জঙ্গলের পথ হলেও রাস্তা খুব সোজা,—ভুল হবে কেন? আমরা তো হরদম যাতায়াত করছি। বড় রাস্তা,—মাঝে মাঝে সাইনপোস্টও আছে। তবে,—হাঁ কোথাও কোথাও দু-তিনটে অন্য রাস্তাও পাবেন, তাতে ভাবনার কিছু নেই, সব সময়েই ডাইনের পথটা ধরবেন,—মনে রাখবেন দক্ষিণ দিকেই আপনাদের গন্তব্য। সোজা পথ,—ভয় নেই। কিন্তু আর দেরি নয়, এখনি যাত্রা করুন।

কথাগুলি শুনে মনে পড়ে, কাশীতে বাঙালীটোলার প্রসিদ্ধ গলির মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দা যেন নবাগত একজনকে সেই গলিপথের গোলকধাঁধার সরলতা বুঝিয়ে দেন।

চট্টরাজ গাড়িতে উঠে বলেন, দক্ষিণ দিকের পথ,—কতো সহজ বুঝলেন তো?

খানিক এগিয়েই নাকা। গেট বন্ধ। ভাগ্যে সই-করা অর্ডার ছিল, চৌকিদার ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে আসে, গেট খুলে দেয়।

পাহাড়ের উপর ঘুরে ঘুরে পথ উঠে চলে।

॥ ৪ ॥

দিনশেষের ধূসরতা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোর মাঝে কখন মিলিয়ে যায়, বুঝতে পারি না। বড় বড় গাছের বন এবার এগিয়ে আসে। চাঁদের আলোয় তাদের ঘন ছায়া পড়ে। পাহাড়-পথে গাড়ি উঠতে থাকে। সামনে দুইটা পথ। দুদিকে গেছে।

চট্টরাজ বলেন, দক্ষিণ হাত,—মনে রাখবেন।

হেসে বলি, ডান হাতের ব্যাপার আপনার কি ভোলবার জো আছে!

আবার অল্প পরে আরও দুইটা পথ। চারদিকেই বড় বড় গাছ। ডান দিকের রাস্তা পাহাড়ের আরও উপর দিকে উঠে গেছে, অপর পথ বাঁদিকে ঘুরে চলে।

চট্টরাজ বলেন, সন্দেহ করে লাভ নেই। ডান হাত—ছাড়বেন না।

ঠিক কথাই। সেইমতই এগিয়ে চলা হয়। কিন্তু আঁকা-বাঁকা সড়ক,—পাহাড়ের বেশ উপর দিকেই তুলতে থাকে। হেড-লাইটের আলোতে রাস্তার চেহারাও যা ধরা পড়ে, তাতে এ-পথে গাড়ি বিশেষ চলে বলে মনেই হয় না। ঝরা-পাতায় ছাওয়া। কিন্তু, চওড়া বড় রাস্তা, সন্দেহ নেই। ডান দিকেও ঠিক এসেছি। অথচ, এমনভাবে পাহাড়ে উঠতে হবে, সে-কথা কেউ তো বলে নি। সাইনপোস্টও কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। দু'পাশেই শুকনো খসখসে গাছপালার নিবিড় বন। আকাশের তারাও একটা দেখা যায় না। ডালপালার কালো কম্বল মাথার উপর থেকে ছড়িয়ে ফেলে কে যেন চেপে ধরতে চায়।

এদিকে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে গাড়ি এগিয়েই চলে। সকলেরই মনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু, করাই বা কি যায়? লোকালয় নয়, যে কাউকে জিজ্ঞাসা করব। আবার ফিরে গিয়ে সেই অপর পথ ধরা? সেই পথই যে ঠিক, তাই বা কে বলে? হাসিঠাট্টা করে সবাই সাহস রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু, মনের কোণে ভাবনা থাকেই,—যদি ভুল পথই ধরে থাকি!

চট্টরাজ বলেন, দেখুন, সামনে আবার হাতির দল না দেখা দেয়,—দু-এক জায়গায় যেন পথে নাদ দেখলাম গাড়ির আলোয়।

সেন বন্দুক ধরে বসে থাকেন। চট্টরাজ সাবধান করেন, মশাই, ফস্‌ করে বন্দুক ছুঁড়বেন না যেন!

পথে একটা বাঁক ঘুরতেই সবাই দেখে উৎফুল্ল হই। হঠাৎ চোখে পড়ে—একটা আলো। জানোয়ারের চোখ-জ্বলা আলো নয়। পাহাড়ের কোলে খানিকটা খোলা মাঠ। জ্যোৎস্নায় দেখা যায়,—বড় বেড়া দিয়ে ঘেরা। অদূরে কাঠের কয়েকটা ছাউনি। তারই ফাঁকে মিট্‌মিট্‌ করে আলো জ্বলে।

চট্টরাজ জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, যাক্‌, ভরসা পাওয়া গেল। ড্রাইভারজী, গাড়ি রোখো। বাহাদুর, যাও তো বাবা, একবার নেমে খবর করে এসো,—ঠিক পথে চলেছি কিনা, যে আছে ডেকে আনো বরং এইখানে।

গাড়ির হর্ন দেওয়া হয়। বাহাদুরও পেছন থেকে নামে। দু-এক পা গিয়েই 'শের' 'শের' বলে ভয়ে চীৎকার করে লাফিয়ে গাড়িতে উঠে কাঁপতে থাকে।

সবাই হেসে উঠি। কেননা, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ডাক শুনতে পাই। গাড়ির কাছে এসে চেঁচাতে থাকে।

ছাউনি থেকে একজন গুর্খা দরোয়ান বেরিয়ে আসে।

তখন জানা যায়, ভুল পথই আমরা ধরেছি। ডানদিকে না এসে বাঁদিকের পথেই যাওয়া উচিত ছিল,—কুম্‌ডির রাস্তায়। এটা মিশ্‌রিলালের খাদান।

জমা-নেওয়া গাছ কেটে এখানে রাখে, সেই কাঠ নিয়ে যেতে কখনো-সখনো তার ট্রাক এপথে আসে।

চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করেন, বাপু, জানোয়ার-টানোয়ার এদিকে—

সে তাচ্ছিল্যভবে জানায়, ও তো হরদমই মেলে।

ভাল করে পথের আবার সংধানাদি নিয়ে গাড়ির মুখ ফেরানো হয়।

॥ ৫ ॥

এবার ঠিক পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে চলে। ডাইনে খাড়া পাহাড় উপর দিকে ওঠে, বাঁয়ে ঢালু গা নীচে নামে। মাঝে মাঝে দুদিকেই গাছের সারি। যেন, অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ। হঠাৎ আবার কোথাও গাছ সরে যায়। যেন, স্টেজের পর্দা ওঠে। জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, বহুদূরে নীচে, বোধ হয় সমতল-ভূমিতে,—অনেকগুলি আলোকবিন্দু। জোনাকির মত জ্বলতে থাকে। বহুদূরের আলো, তবু এই নিবিড় নির্জন জঙ্গলের অন্ধকারে মনে যেন মানুষের সাড়া আনে, সাহস জাগায়।

চট্টরাজ বলেন, আলোগুলো বোধ হয় উড়িষ্যার বরাবিল খনির,—উড়িষ্যা গভর্নমেণ্টের আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ মাইনস।

আবার দু'দিকেই গাছের সারি। মাথার উপরও গাছের ডালপালা। আলো ফেলে গাড়ি ছোটে। নিস্তব্ধ বনের শান্তি ভাঙে। এঁকেবেঁকে ঘুরে সামনের পথ যেন এগিয়ে আসে।

উন্মুখ হয়ে সবাই তাকিয়ে থাকি। এই বুঝি বা পথের ঐ বাঁক ঘুরেই দেখব,—ডোরা-কাটা বাঘ হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মুখ তুলে পথ জুড়ে বসে,—টর্চ এর মত চোখ জ্বলে। কিংবা, হয়ত, বিরাট হাতি! পথের উপর দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়ে কুলোর মত কান দোলায়।

কিন্তু, কোথায় সব তারা? কারুরই দর্শন নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা খরগোশ রাস্তার একদিক থেকে অপরদিকে ছুটে পালায়।

আবার পথের পাশে গাছের ভিড়। আশপাশে কালো কালো পাথর। অন্ধকারে বীভৎস দেখায়। যেন সব বিকট দানবদল। গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। লম্বা গাছগুলি সঙ্গিন-কাঁধে নিশ্চল হয়ে পাহারা দেয়।

জীপ আবার একটা বাঁক ঘোরে।

চট্টরাজ চাপাগলায় বলেন, চুপ! ড্রাইভারজী—সামনে—গাড়ির স্পীড কমে।

সবাই তাকিয়ে দেখি, অল্প দূরেই—গাছের ছায়ায়—আর সন্দেহ নেই—হাতি! কালো শরীর, কানও নাড়ে!

সবাই উদ্‌গ্রীব। সেন বন্দুক ধরেন। চট্টরাজ নিষেধ করেন।

কিন্তু পথের উপর তো নয়। পাশে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে লাভ কি? জোরে বেরিয়ে যাক।

তাই যায়ও। কিন্তু, এ কী! কোথায় হাতি? কালো পাথরে ও

গাছের ডালপাতায় এমনি করেই বোকা বানায়।

সবাই হেসে উঠি।

এইভাবেই বাঁক পথটুকুও কাটে। মনের আশা মনেই থাকে। রাতের আঁধার, চাঁদের আলো, বনের ছায়া, পাহাড়ের মসীকালো অঙ্গে মায়ামরীচিকার নানান লীলা দেখায়।

বরাইবুরুর পাহাড় শেষ হয়। পথ নামতে থাকে। পাহাড়ের তলায় দেখা যায় খোলা মাঠ। ছোট গ্রাম।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেন বন্দুক থেকে গুলি বার করে পকেটে রাখেন।

সেনের দুর্ভাগ্য। নীচে মাঠের মধ্যে নামতেই গাড়ির সুমুখে হরিণ!

আচমকা গাড়ির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। একদৃষ্টে মুখ তুলে দেখতে থাকে।

চট্টরাজ চাপা গলায় বলেন, সেন! বন্দুক!

গুলি ভরতে হবে যে!

হরিণ সজাগ হয়ে লাফিয়ে ছোটে।

সখেদে সেন বলেন, এঃ! এমন সুযোগ ফসকে গেল,—স্পট লাইট ফেলে খাসা মারা যেত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ভাগি অসহায় জীবের অসীম সৌভাগ্য।

মাঠ নয়। চারদিকে মড়ুয়ার ক্ষেত। মোটরের হর্ন শুনে ঘর থেকে লোক বেরিয়ে আসে। সলাই বাংলো আর বেশিদূর নয়। আপাততঃ পাহাড়-পথ শেষ। জঙ্গল তো থাকবেই। তবে, পথ সোজা। বড় রাস্তায় সাইনপোস্ট পাওয়া যাবে, বাংলোয় পৌঁছুবার পথ সেইখানে বেঁকে গেছে।

চট্টরাজ বলেন, শুনলে তো?

সে বলে হ্যাঁ।

সবাই বলি, তা তো হবেই।

পিছনে ছেড়ে-আসা পাহাড়ের শ্রেণী দুর্গপ্রাচীরের মতো মাথা তুলে দিগন্ত ঘিরে থাকে। তারই উপর এক জায়গায় আকাশের গায়ে দেওয়ালির যেন আলোর মালা জ্বলে। শুনি ওখানে গভর্নমেন্টের কিরিবুরু লোহার খনি—সারাণ্ডার মধ্যে।

গাড়ি আবার ছুটে চলে। ক্ষেতের আশপাশে ময়ূরের কর্কশ কেকাধ্বনি ওঠে।

॥ ৬ ॥

রাত সাড়ে নয়টা। সলাই বাংলোতে পৌঁছুই। ডিসেম্বরের কনকনে শীত। গহন বন। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। নিঝুম নিস্তব্ধ। মনে হয়, কত গভীর রাত্রি। বনের মাঝখানে অনেকখানি খোলা জায়গা। বেড়াঘেরা এলাকা। চাঁদের আলোতেও দেখা যায়, সাজানো বাগান। মধ্যে সুন্দর বাংলো। যেন

রূপবতী রাজকন্যা দৈত্যপুরীর মুক্ত অঙ্গনে একাকিনী বসে সুখস্বপ্নের জাল বোনে।

বাংলোর বারান্দায় উঠে চট্টরাজ চৌকিদারকে ডাক দেন। গাড়ির হর্নও বাজানো হয়। ঘুমন্ত পাহাড় যেন চমকে কেঁপে ওঠে। কিন্তু, কোথায় চৌকিদার? সাড়া-শব্দ নেই। দরজায় তালা লাগানো। বারান্দায় টাঙানো নোটিশবোর্ড। টর্চের আলো ফেলে চট্টরাজ উল্লসিত হয়ে বলল, এই তো রিজার্ভেশন অর্ডার এসে গেছে,- নাম লেখা রয়েছে। কিন্তু, খবর পেয়েও ব্যাটা গেল কোথায়? বাকির হয়ে গেছে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হলেই শুয়ে পড়া যায়,— যা দারুণ শীত!

বাংলো চারদিক থেকেই বন্ধ। পাশেই রান্নাঘর,- অর্থাৎ বাবুর্চিখানা। দরজা খোলা।

সেন বলেন, বাহাদুর। দেখ তো, ঐখানে আগুন জেবলে নিশ্চয় আরামে শুয়ে আছে।

কিন্তু, কোথায় কে? হাঁকডাকে খোঁজাখুঁজিতে কিছুই ফল হয় না।

আমি বলি, এই বারান্দাই তো চমৎকার। বিছানা খুলে এইখানেই রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কাল সকালে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চট্টরাজ বলেন, খাসা প্রস্তাব করলেন! এত প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে? আর, বাড়ির দরজার গোড়ায় পৌঁছে না খাওয়াদাওয়া করে বিছানা নেওয়া?

ড্রাইভার এসে খবর দেয়, আধ ফার্লং টাক দূরে এলাকার মধ্যেই আর একটা ছোট বাড়ি যেন দেখা যায়।

সেন হুকুম দেন, বাহাদুর! গিয়ে দেখে এসো—ঐখানে নিশ্চয় পাবে।

বাহাদুর থমকে বলে,—এ-কে-লা?

ওঃ! ড্রাইভারও সঙ্গে যাচ্ছে।

খানিক পরে চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

শক্তিশালী সাহসী পুরুষ বটে। বাহাদুর নয়—চৌকিদার। প্রৌঢ় লোক। এসে দাঁড়ায়,—গায়ে কেবলমাত্র একটা সাদা সুতির গেঞ্জি! এই প্রচণ্ড শীতে। অথচ দেহে শীতের কাঁপুনি বা জড়সড় ভাবও নেই। কাছে এগিয়ে আসে না। একটু তফাতে দাঁড়ায়, যেন বিনয়ে মাথা নত।

ভাবি, হিমালয়ে দেখা যায় বরফের মধ্যেও বিবস্ত্র সাধুসন্ন্যাসী। কিন্তু এখানেও এই শীতে সাধারণ একটা মানুষের কি সহনশীলতা!

চট্টরাজ ডাকেন,—এই। ইধার আও।

লোকটা মুখে হাত দিয়ে এক পা এগিয়ে আসে।

চট্টরাজ হাসেন। বলেন, ব্যাপারটা বুঝছেন না? একেবারে চুর হয়ে আছে। তাই তো শীতবোধ নেই।

লোকটাকে দিয়ে কোনমতে দরজা খোলানো হয়। জল ও কাঠের ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। আলো বার করিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর কোন কিছু কাজে তার সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়।

চট্টরাজ এবার বলেন, সঙ্গে কিছু রসদ থাকলেও, গরম যা-হোক-কিছু একটা হলে কি রকম হয় ? কি হে সেন ! তোমার বাহাদুরকে একটু বাহাদুরি দেখাতে বলো না। এটা তো ঘরের ভেতর, রান্নাঘরে।

আমি বলি, রাত দশটা বেজে গেছে, এখন আবার রান্না ? ও-বেচারীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া। চান তো, চাল, ডাল সঙ্গেই রয়েছে, খিচুড়ি চাপানো যাক। তাতেই আলু, কপি, কড়াইশুঁটি ছেড়ে দেওয়া যাবে। ভাল ঘিও রয়েছে। সহজে এখনি সব হয়েও যাবে।

এক কথায় সবাই রাজী।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার সাঙ্গ করে আরামে শয্যাগ্রহণ।

একটা ঘরে আমি একা। অপর ঘরে সেন ও চট্টরাজ। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে-ঘর থেকে শব্দ ভেসে আসে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার ? এতক্ষণে বাঘ এলো নাকি ? কার ধ্বনি ?

সেন বলেন, চট্টরাজের। আবার কার ? ওঁর তো বিছানায় লম্বা হতেই যেটুকু দেরি। তারপরেই একটানা শব্দে রাত কাবার।

॥ ৭ ॥

ভোরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, বাংলোর সামনে সুন্দর বাগান। ফুল ফুটে আলো করে আছে। বিভিন্ন রঙের গোলাপ। প্রচুর ক্রিসেনথিমাম্। টকটকে লাল ক্যানা। গাছভরা চামেলি। টগর, গন্ধরাজ। বড় বড় গাঁদা। লাল পাতাবাহার। করবীগাছে ফুল নেই। বারান্দার ধারে মাটিতে রাখা ও উপর থেকে ঝোলানো টবে নানাজাতীয় ক্রোটন ও ক্যাকটাস্। দেওয়াল বেয়ে ওঠে বেগুনবেলিয়া,—লাল, গোলাপী ও বেগুনী। দেখে চোখ জুড়ায়, মনে আনন্দ হয়। আশপাশে ঘুরতে বার হই।

সামনে অদূরে পাহাড়শ্রেণী। দূরে দূরেও চারিদিকেই পাহাড়। সবুজ গাছে ভরা। বাংলোর এলাকা মোটা কাঠের মজবুত বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাংলোর পিছন দিকে—পূর্ব ও উত্তর দিক ঘুরে বয়ে চলে কইনা নদী। দুই তীরের গাছের ডালপালা জলের উপর ঝুঁকে পড়ে ছায়া দেখে। পশ্চিমে সোকরা কোচা,—নদী নয়, নালা। পাথর ভরা। দু'পাশে ঝোপঝাপ।

বাংলোর উত্তরে রাস্তা। নদী পার হয়ে অপর পারে যায়। বোর্ডে লেখা.—পাটুং আট মাইল। কইনা নদীর এপার থেকে সারাণ্ডা ডিভিশন শুরু। অপর পারে কোলাহান্ ডিভিশন।

চট্টরাজ বাগান ঘুরে এসে বলেন, গাছে কমলালেবু, পেঁপে, করমচা হয়ে রয়েছে।

সেন বলেন, তাই নাকি ? ব্রেকফাস্টে একটা নতুন খাবার কবে তাহলে খাওয়াব। পেঁপের হালুয়া ! খেয়েছেন কখনো।

আমরা দুজনেই অভিনবত্ব স্বীকার করি, খাওয়া দূরের কথা, হয় যে তাই শুনিনি !

পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে জীপ-এ ঘুরতে বার হওয়া।

চট্টরাজ বলেন, চলুন চিড়িয়ায়। মোটরে বসে ইতিমধ্যে আপনাদের একটু 'আইডিয়া' দিই সারাণ্ডার অবস্থিতিটা কোথায়। ভারতবর্ষের কটিদেশ ঘিরে একটা বিশাল বন—একটু কাব্য করেই বলা যাক—মেখলার মত—উড়িষ্যা থেকে শুরু করে বেহার, মধ্যপ্রদেশ হয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। উড়িষ্যার যে দণ্ডকারণ্যের কথা খুব শোনেন,—এও তারই একটা অংশ। বেহারে এই জঙ্গল চার ডিভিশনে ভাগ করা—সারাণ্ডা, পোরাহাট, কোলাহান আর চাঁইবাসা। এ-সবই সিংভূমে। সারাণ্ডা কথাটার মানে নাকি,—সাতশো পাহাড়ের দেশ। গভর্নমেণ্টের এটা রিজার্ভড ফরেস্ট—প্রায় তিনশো বর্গমাইল জুড়ে। এখানকার শালগাছ—(Shorea robusta)—বিখ্যাত। ভারতে এর চেয়ে বড় শাল আর কোথাও হয় না। তরাই-এর জঙ্গলও একে হারাতে পারে নি। এক একটা শাল গাছ উঁচু হয় কত শুনবেন? আড়াইশো ফুট। 'গার্থ'—মানে পরিধি দশ-পনেরো ফুট হয়ই।

জিজ্ঞাসা করি, কত বছর লাগে পূর্ণতা পেতে?

তা প্রায় ১২০ বছর। এ-ছাড়া জঙ্গলের অন্যান্য প্রধান গাছ হোল,—আসান, সেগুন, কারাম বা হালদু—কাঠও হলুদ রঙের, আর বিজা বা পিয়েশাল। অন্য সব সাধারণ গাছ তো আছেই;—আম, জাম, কাঁঠাল, মহুয়া, নিম, কাপাস, কেরাঞ্জি, লোলা, কুসুম—এ থেকে আবার তেল হয়,—আরও কত কি! এক রকম ঘাসও এ অঞ্চলে হয়--'সবাই' (Sabai)। পাকিয়ে দড়ি তৈরি করে,—খুব মজবুত। কাগজ তৈরির কাজেও ব্যবহার হচ্ছে। তাকিয়ে দেখুন একবার গাড়ি থেকে মাথা বার করে—এই ড্রাইভারজী একটু আস্তে চলো— মুখ তুলে দেখতে পাচ্ছেন গাছগুলোর মাথা?

বিরাট সব শালগাছ। মনুমেণ্টের মতন সোজা ওঠে আকাশের দিকে। গাছের নীচে আগাছা নেই, কোথাও কোথাও ছোট শালের চারা। ঝরা পাতা, শুকনা জমি। হিমালয়ের পাইনবনের কথা মনে জাগায়।

সেন গম্ভীর মুখে বলেন, এই সব বনেই হাতি থাকে।

চট্টরাজ বলেন, তার প্রমাণ তো দেখছেনই পথের ওপর—ময়লার স্তূপ সাজিয়ে গেছে।

আবার মাঝে মাঝে অন্য গাছের জঙ্গল। নানান আকারের গাছ। ঝাঁকড়া ডালপালা ছড়ানো। আগাছা, লতাপাতায় চারদিকে যেন জাল পাতা। কোথাও বা বিরাট বট,—সাপের মত ওপর থেকে ঝুরি নামে! কোন কোন গাছ পাথর বেয়ে ওঠে, এঁকে বেঁকে অষ্টাবক্র ঋষির মতো। পৃথিবীর বুক থেকে রসগ্রহণ করে না, আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকে প্রকাণ্ড একটা পাথরকে—যেন অক্টোপাসের সহস্র পায়ের বাঁধনে। গাছগুলোর পাতার রঙ্ কচিৎ সবুজ, প্রায়ই হলদে ও লালচে। বেশির ভাগই এই শীতের সময় শুকনা ডালপালা,—যেন তেল-না-মাখা বৃদ্ধের কোঁচকানো গায়ের চামড়া, খটখটে, মরামাস-ওঠা।

হঠাৎ আবার জঙ্গলের রূপ বদলে যায়। নিবিড় বন। বিশাল গাছ।

নীচে ঘন ঝোপঝাড়। তারি মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে জলের নালা। পাহাড়ী ঝরণা। বালির উপর ক্ষীণ ধারা। চারিদিকে ছড়ানো পাথর বোল্‌ডার্‌স্‌, যেন বিরাট আকার কচ্ছপের দল। তারই কাছে কিছু জমা জল,—গাঢ় সবুজ রঙ্‌।

সেন আবার গম্ভীর হয়ে বলেন, এইসব জায়গায় বাঘের বাস।

বনের এই অংশ স্যাঁৎসেঁতে। থম্‌থমে ভাব। মোটরের পথ যখন সেই ধরনের বনের মধ্যে দিয়ে ছোটে, তখন মনে হয়, সুড়ঙ্গপথ ধরে চলি। গাছের পাতা থেকে টপটপ করে জল ঝরে। পথও ভেজা।

চট্টরাজ জানান, বনের এই ধরনের রাস্তাকে বলে,—অজগর-পথ।

জিজ্ঞাসা করি, কেন? এখানে পাইথন্‌ থাকে নাকি?

চট্টরাজ বলেন, সারাণ্ডায় পাইথন্‌-এর কথা শুনি নি। কেরেত, ভাইপার্‌—এদের উপদ্রব খুব। কিন্তু, নাম সে-সব কোন কারণে দেওয়া নয়। পথের চেহারা দেখে নাম দেওয়া। জঙ্গলের এ-সব জায়গায় কস্মিন্‌কালেও এক ফোঁটা রোদ পড়ে না। তাই সব সময়েই ভিজে ভিজে চকচকে ভাব। কাল্‌চে হড়্‌হড়ে মাটি। পথও চলে ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে—বিরাট সাপের মত।

প্রশ্ন করি, চিড়িয়ায় যে যাচ্ছি, ঐখানে আগে আপনি এসেছিলেন না?

চট্টরাজ বলেন, হাঁ। ঐখানে বাই-ইলেকশনের একটা বুথ হয়, তারই প্রিসাইডিং অফিসার হয়ে। টাটানগরের পর বড় স্টেশন চক্রধরপুর। তারপরে রউরকেলা। চক্রধরপুর ও রউরকেলার মধ্যে ছোট স্টেশন গোয়েলকেরা ও মনোহরপুর। তার যে কোন একটায় নেমে সারাণ্ডায় আসা যায়। গোয়েলকেরা থেকে থাল্‌কোবাদ বাংলো ১৬ মাইল। আবার মনোহরপুর থেকে সলাই বাংলো-ও ১৬ মাইল। অবশ্য যান-বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। সে-বছর চাঁইবাসা-গোয়েলকেরার রাস্তা ধরে আসি। সেদিকে পাহাড় বামিয়াবুরু। পার হয়ে আসি পাটুং-এ, তারপর এই সলাই-এ। ওদিকে পথে পড়ে কারো নদী। সেখানেও সুন্দর দৃশ্য। এ-অঞ্চলের পাহাড়গুলির নাম বেশ,—বরাইবুরু, মারাংবুরু, বামিয়াবুরু, কিরিবুরু—সবারই নামের শেষে বুরু। ডাকবাংলোও চমৎকার জায়গায় করা। সলাই তো দেখছেনই, থাল্‌কোবাদও দেখবেন, কাল বরাইবুরুর বাংলো পথে পেয়েছেন। এ-ছাড়া আছে—পাটুং, আন্‌কুয়া, ছোটনাগরা গোয়েলকেরা, কারোভিউ। —ড্রাইভারজী, আস্তে,—সামনে রেলের লাইন।

বনের মধ্যে যেন খেলাঘরের লাইন পাতা। কোথা থেকে এল?

চট্টরাজ বলেন, ওঃ! সে-কথা বুঝি বলা হয় নি। চিড়িয়ায় বার্নপুরের ইণ্ডিয়ান্‌ আয়রন্‌ অ্যাণ্ড স্টিল্‌ কোম্পানির লোহার খনি। সেইজন্যই চিড়িয়ার 'ইম্‌পর্টান্স'। রেলের ছোট ছোট ওয়াগনে ভরে মনোহরপুরে নিয়ে যায়। সেখানে বড় ট্রেনে তোলে। এ-সব পাহাড়গুলো সত্যই রত্নগর্ভ। চিড়িয়ায়—আয়রন ওর; কাল রাত্রে দূর থেকে আলো দেখেছেন—পাহাড়ের মাথায় কি[illegible] লোহার খনির, আবার ওদিকে [illegible]বুরুর ওপর থেকে দূরে

বরাবিল আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজ মাইন্‌স্‌-এর। গুয়ার কাছে—পর্তুগীজ গোয়া নয়, সারাণ্ডাতেও একটা গুয়া আছে—ম্যাঙ্গানিজ-এর খনি আছে।

জীপ্‌ লাইন পার হয়। পথের বাঁ দিক থেকে এসে ডাইনে পাহাড়ের ঢাল্‌ গায়ে সোজা লাইন গড়িয়ে নামে—দ্‌'দিকের জঙ্গল ভেদ করে। যেন, ঘনকালো চুলের মাঝখানে সিঁথিকাটা।

চট্টরাজ বলেন, ভাল কথা। আপনার ফেরবার সময় সম্ভবতঃ ফরেস্ট অফিসারের জীপ্‌ পেয়ে যাবেন, কদিন পরেই এদিকে ইন্‌স্‌পেক্‌শনে আসার প্রোগ্রাম আছে বলেছিলেন। নেহাত যদি সেটা না পান, এই ট্রেনের ওয়াগনে চেপে মনোহরপুর গিয়ে ট্রেন ধরতে পাবেন। আমি এদের কর্তাদের বলে রাখব।

আমি বলি, বলে তো রাখবেন,—তা পর দেখা যাবে।

চিড়িয়া পৌঁছুই। সলাই বাংলো থেকে মাত্র ছয় মাইল।

চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা খানিকটা সমতলভূমি। একদিকের পাহাড় কিছু উঁচু। সেইখানে খনি। পাহাড়ের কোলে ছোট নদী। অনেকগুলি বাড়িঘর ছাউনি। এখানে ওখানে ছড়ানো। তিন-চারটি টিলার উপর সুন্দর বাংলো। বাগান। মাইন্‌-এর কত বড় কর্মচারী, কুলি-মজুর থাকবার বিভিন্ন ব্যবস্থা। আবার সরকারী দপ্তরও আছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাই স্থানটি সুন্দর দেখায়। কোলাহল-মুখর। যেন, শান্তবনে হঠাৎ-ওঠা শহরজীবনের দম্‌কা হাওয়া। তার উপর সেদিন হাটবার। নদীর ধারে ময়দানে দোকানপাট বসে। ঝুড়ি মাথায়, বাঁক কাঁধে আদিবাসী হেটেলরা আসে। শহর থেকে আনা সস্তা শৌখিন জিনিসও বিক্রি হয় মনিহারী দোকানে। তারা বাইরে থেকে আসা ব্যবসাদার। কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালার চাহিদা খুব। আদিবাসী মেয়েরা সেখানে ভিড় জমায়,—গহনা বাছে, খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে। ছেলেপুরুষ চা ও পানবিড়ির দোকানে জটলা পাকায়।

ঘুরে ঘুরে আমাদেরও হাট করা হয়। চট্টরাজ ঠিক করেন, আজ রাত্তিরটাও সলাইতে কাটানো যাক। কী বলো, সেন? কাল ভোরে বেরুলেও কাজের ক্ষতি হবে না, সময়মত টাটানগরে পৌঁছে যাব।

বলার অবশ্য অন্য কারণও আছে। মুর্গী সস্তা। তাঁদের জন্য কেনাও হয়।

কপি, কড়াইশুঁটি, বেগুন, শিম ও টম্যাটোর ছড়াছড়ি। তাও সওদা হয়। আবার এক সপ্তাহের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা। গরম গরম ফুলুরি ও জিলাপীরও সেইখানে বসেই সানন্দে সদ্‌ব্যবহার চলে।

স্থানীয় অফিসারদের বাংলোতে গিয়ে চট্টরাজ আলাপ জমান। সকলেই সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কেউ বা এই জঙ্গলেও ভালো চা-বিস্কুট খাওয়ান। চাকরির দায়ে বনে থাকা,—হঠাৎ-আসা আগন্তুকদের পেয়ে বাইরের জগতের ক্ষণিক আনন্দের স্বাদ উপভোগ করেন। যেন, রুদ্ধ ঘরের হঠাৎ

জানালা খোলা।

এখানেও দেখি, শহরের মতন সর্বভারতীয় সমাবেশ। ডাক্তার বাঙালী। রেলওয়ে অফিসার—ফিরিঙ্গী। মাদ্রাজী—অ্যাকাউণ্টস্‌ অফিসার। বম্বেবাসী—ম্যানেজার। লেবার অফিসার—বিহারী। মনে পড়ে, 'পথের দাবী'র সেই সর্বভারতীয় জামাতাগোষ্ঠী।

মালগাড়িতে আমার ফেরবার ব্যবস্থা করতে চট্টরাজ ভোলেন না। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে জানাই, প্রয়োজন হলে সময়মত খবর পাঠাব।

॥ ৮ ॥

দুপুরে সলাই বাংলো থেকে আবার রওনা। ছোটানাগরা হয়ে থাল্‌কোবাদ। পঁচিশ মাইল পথ।

আবার গভীর বন। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে ওঠা। কখন বা হঠাৎ খানিক সমতলভূমি। মুখের আবরণ সরিয়ে বনদেবীর যেন একটু হাঁফ ছাড়া।

ছোটানাগরায় ছড়ানো ঘরবাড়ি। লোকবসতি। বড় বড় মোটা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা সব বাড়ির এলাকা। বন্যজন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায়। সব গ্রামেই এই ব্যবস্থা। গ্রামগুলি ছবির মত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও নোংরা নেই। নিকানো উঠান। যেন কালো মার্বেল পাতা। ঘরের দেওয়ালে কত রকম রেখাচিত্র। জীবজন্তুর ছবি। কখনও বা দেওয়ালে সাদা, কালো, লাল রং করা।

ছোটানাগরার নিকটে জঙ্গলের ধারে একটা ছোট মন্দির। প্রাচীন কিছু নয়। এ অঞ্চলে তবু প্রসিদ্ধির কারণ, এক সাধু থাকতেন এইখানে পাহাড়ের গুহার মধ্যে। আকারে বামন। লোকের বিশ্বাস, সিদ্ধপুরুষ, শতাধিক বছর বয়স হয়েছিল। এখন দেহরক্ষা করেছেন। মন্দিরের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি—গণেশ, ময়ূরবাহন কার্তিক, শিব ও দেবী।

থাল্‌কোবাদের পথে এ-অঞ্চলের সব চেয়ে বিশাল বন। প্রতিটি শালগাছ যেন আকাশচুম্বী বর্মী প্যাগোডা।

চট্টরাজ বলেন, এই জঙ্গলই বিশেষ করে সারাণ্ডার গৌরব।

ছোট নদী। পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই। ঘুরে ঘুরে মোটর ওঠে। অনেকখানি উঠে থাল্‌কোবাদ। প্রশস্ত মালভূমি। পাহাড়ের হাজার চারেক ফুট উঁচুতে। হিমালয়ের তুলনায় কিছুই নয়, কিন্তু এই অরণ্যরাজ্যের গিরিরাজ। প্রকাণ্ড বাংলো। সাজানো-গোছানো। সলাই বাংলোর চেয়ে বড়। ফুলের সুন্দর বাগান। মাঝে মাঝে বসবার জায়গা। এককালে বড় বড় সাহেবরা—লাট সাহেবও আসতেন। বিহার ও বিশ্রাম তো হোতই, সঙ্গে সঙ্গে শিকারও। বাগানের একপাশে shooting platform। পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো বারান্দার মত। হাত পঁচিশ-ত্রিশ নীচে খোলা সমতলভূমি,—ফুটবল খেলার মাঠ যেন। প্ল্যাট্‌ফরম,—খাড়া গ্যালারির উপর অংশ। মাঠের তিন দিকে গভীর বন। বাঘের বাস। মাঠে গরু মহিষ বা ছাগল বাঁধা

হোত। আহারের লোভে বাঘ এলে প্ল্যাটফরমে বসে—বীর শিকারীরা মারতেন। এখনও ঐ মাঠে বন্য জন্তু রাত্রে দেখা যায় শুনি।

চট্টরাজ বলেন, কী হে সেন। দুদিন এখানে থাকলে বাঘ শিকারের সুযোগ পেয়ে যেতে। বাংলোটা এমন চমৎকার জায়গায়, আর জঙ্গলটারও এমন সুনাম যে দেরাদুন ফরেস্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা প্রতি বছর এখানে ট্রেনিং-এ আসে,—অবশ্য শিকারে নয়, গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করতে।

সেই জঙ্গলের ধার দিয়ে খানিকটা মোটরে করে, বাকিটা হেঁটে, পাহাড়ের অনেকখানি উপরে উঠি। প্রায় মাথার কাছাকাছি। বাংলো থেকে মাইল তিনেক দূরে। Lyall's View Point। সারাণ্ডার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। চার হাজার ফুট-এরও অধিক উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে বহু নীচে দেখা যায়,—সামনে দক্ষিণে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে, ঘন সবুজ তরঙ্গের খেলা। যেন পটে আঁকা। নিশ্চল, নিষ্কম্প। দিগন্তবিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। ছোট, বড, অসংখ্য। ধরণীর উদার উন্মুক্ত কোল জুড়ে ঘুমন্ত শিশুর দল। বিরাট নিঃশব্দতা। সুগভীর প্রশান্তি। স্থির হয়ে বসে দেখতে মনপ্রাণ সেই অসীমতায় হারিয়ে যায়।

চট্টরাজ বলেন, সামনে নদিবের জঙ্গল উড়িষ্যাতে,— মাত্র মাইল ছয় এখানে থেকে। প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে উড়িষ্যার বোনাইগড়ের বনও নাকি দেখা যায়।—তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, আপনার হিমালয় থেকে ও দৃশ্য, সেও কি এই ধরনের ?

বলি, তুলনা শুনে লাভ নেই। হিমালয়ের রূপ সেখানে গিয়ে দেখবেন। এখন এখানে এখানকারই সৌন্দর্য উপভোগ করা যাক।

কিন্তু আবার সলাই বাংলোতে ফিরতে হবে, তাই ড্রাইভারের তাগাদা থাকে। তার উপর সঙ্গের চৌকিদার জানায়, এ জায়গাটা সন্ধ্যার পর ভাল নয়। বড় একটা বাঘ, —নিকটেই থাকে।

চট্টরাজ জিজ্ঞাসা করেন, দেখেছিস্ তাকে ?

দেখি নি। রোজ ডাক শুনি। সমস্ত জঙ্গল কাঁপতে থাকে। দেখা হলে কি আর এখনও থাকতাম ?

থালকোবাদে নেমে ফিরতি পথে যাত্রা করতে সূর্যাস্ত হয়। ভাবি, ভালই হোল। সন্ধ্যার ঝোঁকে যদি কারও পথে দেখা মেলে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ে না। বরং আসার সময় অচেনা পথের যে রোমাঞ্চ থাকে, ফেরবার চেনা পথ সে-আকর্ষণ হারায়।

পরদিন ভোরে চট্টরাজ ও সেন সদলবলে জীপ্-এ ফিরে যান। সদাপ্রফুল্ল-চিত্ত চট্টরাজ বিমর্ষ হন। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এলাম একসঙ্গে এমন আনন্দে কাটল,—এখন এইভাবে একলা ফেলে রেখে যেতে ভাল লাগে না।

চৌকিদারকে বলেন, বাপু, একটু হুঁশিয়ার থাকিস। নিজের ঘর ছেড়ে এখানে তো থাকতে পারবি না, জানি। একটা বিশ্বাসী আদমী ঠিক করে

দিস, রাত্রে এইখানে শোবে। এখানকার বাসনপত্র ঐ রইলো সব, মিলিয়ে ঠিক তুলে রাখিস।

আমাকে বলেন, আপনার যা কিছু দরকার হবে, ওর কাছে সব চেয়ে নেবেন। ব্যাটা যেরকম দুদিন চুর হয়ে রইলো,—আপনার অসুবিধে না হয়। ফিরে গিয়েই একটা রিপোর্ট করতে হবে ব্যাটার নামে।

শুনেই নিষেধ করি, এবারকার এ-যাত্রায় নয়। কোনমতেই কারও ক্ষতির কারণ হতে চাই না। তা ছাড়া একে নিয়েই তো কদিন ঘর করতে হবে। ওকে ঠিক সামলে নেবো, ভাববেন না মোটেই।

শব্দ করে জীপ বেরিয়ে যায়। ওঁরা হাত নাড়েন। বনের অন্তরালে গাড়ি অদৃশ্য হয়।

বাসন মেলাতে গিয়ে দেখা যায়,—বড় ছুরি একটা নেই। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। চৌকিদারকে বলি, ভুল করে ওঁদের বাসনপত্রের সঙ্গে চলে গেল না তো?

উদারহৃদয়ে সে বলে, তা না-ও হতে পারে। কাল সারাদিন আপনারা বাইরে ছিলেন। শহর থেকে মিস্ত্রী এসেছিল বাংলো মেরামতের কাজে। অজানা বাইরের লোক। সে-ই সরালে কিনা কে জানে? যাক, আপনি এ নিয়ে ভাবনা করবেন না। আপনার যা যা দরকার দেখে রাখুন।

জিনিস হারায়, তবু নির্বিকার, নিশ্চিন্ত!

॥ ৯ ॥

গত দু'দিন কেটেছে সঙ্গীদের সঙ্গে হাসা-পরিহাসমুখর কলকোলাহলে। তারুণ্যময় প্রাণের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের তরঙ্গরোলে। উদ্বেল জীবনের সরব সাগরসৈকতে।

এইবার নিস্তব্ধ প্রশান্ত পরিবেশ। জনহীন পুরী। মনেরও এক ভিন্ন জগৎ।

বিকালে ভাবি, বনপথে একা একা বেশ খানিক ঘুরে আসি।

ঘরের বাইরে এসে তালা দিতে যাই। দেখি দরজার কবজায় আর একটা তালা এমনিভাবে ঝোলে, নতুন তালা লাগাবার উপায় নেই।

চৌকিদারকে ডাকি। তালা খুলে নিতে বলি। সে জানায়, এর চাবি তো সাহেবরা কাল চেয়ে নিয়ে নিজেরাই বন্ধ করেছিলেন, আর তো ফেরত দেন নি।

বুঝতে পারি, সে নিজেও চেয়ে নিতে ভুলেছে। তাঁদের সঙ্গে চাবিটাও চলে গেছে। অথচ, এ ঘরটা বাইরে থেকে বন্ধ করার অপর কোন উপায় নেই।

তাকে বলি, টাটানগরে এখনি চিঠি লিখে দিই, কারও হাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করো, চাবি এসে যাবে।

সে এতেও দেখি নির্বিকার। বলে, যাহোক ব্যবস্থা পরে একটা করে

নিলেই হবে। সাহেবদের এই সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত করে লাভ নেই।

ভাবি, তার এই শান্ত, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ভাব,—আদিম অরণ্যদেবের যেন সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস।

অগত্যা, দরজা ভেজিয়ে রেখে বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারি করি। নিজের হারাবার বিশেষ কিছু নেই। তবে, খোলা ব্যাগে অপর আর একজনের দামী নতুন ক্যামেরা সঙ্গে আছে। হারালে ক্ষতি তো বটেই, লজ্জারও একশেষ। ভাবি, যে চুরি করে তার দোষ কি? নিজের অসাবধানতা ও পরকে প্রলুব্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়াই তো অপরাধ।

তাই সোজা রাস্তার উপর এদিক থেকে ওদিকে যাই, আবার ঘুরে আসি। সব সময়েই চোখ থাকে দরজার উপর, পিছন ফিরলেও ফিরে ফিরে তাকাই। ভাবি, মনের এ কী অশান্তি।

মাঝে মাঝে পথ দিয়ে মেয়ে-পুরুষ চলে। সবারই গায়ের নিকষ কালো রঙ। যেন কালো পাথর কেটে খোদাই করা দেহ। চকচকে পালিশ করা। নিটোল স্বাস্থ্য। পুরুষদেরও কোঁকড়ান ঝাঁকড়া চুল। কারও কারও গায়ে হাত-কাটা শার্ট, পরনে হাফপ্যান্ট। প্রশ্ন করে জানি, খনিতে চাকরি করে। কেউ বা বন বিভাগে।

সকলেই আদিবাসী। হো-জাতি। ভাষার নামও হো। 'হো' মানে মানুষ। পৃথিবীর বহু স্থানেই আদিবাসী আপন ভাষায় নিজেদের 'মানুষ' নামে পরিচয় দেয়। এদের ধারণায় জগৎ তিন ভাগে ভাগ করা,—উদ্ভিদ-জগৎ ও প্রাণী-জগৎ,—এই দুই জগৎ থেকে পৃথক আর এক জগৎ,—মানুষ-জগৎ। পাহাড়, বনজঙ্গলের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে এদের সারাজীবন কাটে। তার বাইরে আর যেন অন্য জগৎ নেই, অন্য মানুষও নেই। তাই বাইরের মানুষেরা 'হো' নয়, তারা 'ডিক্কু', 'বিদেশী', ভিন্ন আর এক জাতি। 'হিন্দু' থেকেই হয়ত 'ডিক্কু'। কেননা হো-দের চোখে বাইরে থেকে আসা হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বেশভূষা, এমন কি চেহারাও সবই পৃথক। তাই তাদের সঙ্গে কোন লেনদেন যোগাযোগ চলে না।

কিন্তু এখন সেই দুই জগতের মধ্যের বেড়া প্রায় ভেঙে আসে। তাই হো-দেরও গায়ে জামা ওঠে, চুলও ছোট হয়।

মেয়েদের কিন্তু প্রায় সকলেরই খালি গায়ে কাপড় জড়ানো। এই দারুণ শীতেও জামা নেই। পরনে মোটা সুতির সাদা কাপড়। টকটকে লাল পাড়। দেহের কালো রঙের উপর সাদা কাপড়, তারি মাঝে ঘিরে থাকে পাড়ের রক্তরাঙা মোটা লাইন। আঁকা ছবির মত দেখায়। তার উপর আবার কুচকুচে কালো চুল। খোঁপায় গোঁজা লাল জবাফুল, কারও বা হলদে গাঁদা। মাথায় কাপড় কেউই দেয় না। মুখে খিলখিল হাসির ধ্বনি। যেন পাহাড়ী ঝরনা। অবিরল বয়ে চলে। কাজ করতেও গান, পথ চলতেও গান। দল বেঁধে যখন আসে, সারি বেঁধে পরস্পরের কোমর ধরে, দেহ দুলিয়ে, কণ্ঠ মিলিয়ে একটানা একই সুরে গান গেয়ে,—সেও এক জীবন্ত ছবি। প্রাণময়,

উচ্ছ্বাসময়। সুর শুনে মন উদাস হয়। মনে হয়, পাহাড়, বন, বিশ্বপ্রকৃতি সজীব হয়ে নৃত্যচ্ছন্দে সঙ্গীত ধরে।

মেয়েরা গান গাইতে গাইতে কাছে আসে। আচমকা আমায় দেখে থমকে যায়। যেন ঝরনার স্রোতের মুখে পাথরের বাধা পড়ে। পাশ কেটে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে কলহাস্যে আবার গান ধরে এগিয়ে চলে।

আবার জনশূন্য পথ। একা একা ঘুরি। মেয়েরা দৃষ্টির বাইরে যায়, তবু বহুক্ষণ চোখে ভাসে সেই বর্ণময়, ছন্দোময়, নৃত্যদোদুল রূপ। কানে বাজে কোমলমধুর সঙ্গীতের করুণ সেই রেশ।

ক্রমে পাহাড়ের পিছনে সূর্য হেলে পড়ে। শীতের সন্ধ্যার ছায়া নামে।

হঠাৎ দূর থেকে দেখি, একা একটি মেয়ে আসে। কেবলি ফিরে ফিরে বাংলোর দিকে তাকায়। গেট-এর কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়। দু'পা এগিয়ে আবার দাঁড়ায়, একমনে দেখে।

ভাবি, অমনভাবে দেখে কি?

তখন নজর পড়ে, ঘরের দরজা বাতাসে খুলে গেছে। জনপ্রাণী নেই। সন্ধ্যার আবছায়া। মনে সন্দেহ জাগে। দূর থেকে নজর রাখি। মেয়েটা নড়ে না, একভাবে ঘরের দিকে তাকিয়েই থাকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসি গেটের নিকটে। মেয়েটা দেখে চমকে ওঠে। প্রশ্ন করি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি দেখছ?

খিলখিল করে হাসে। কথা বোঝে কিনা জানি না, তবে প্রশ্নের মর্ম বোঝে বুঝতে পারি।

বাংলোর পিছনে দূরে উঁচু পাহাড়টার মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলে,—বুরু জেটে—

বলে ধীরপদে এগিয়ে যায়, আবার ফিরে ফিরে সেই দিকে তাকায়।

এতক্ষণে মুখ তুলে আমিও সেই দিকে দেখি, পাহাড়ের মাথায় গাছের লাল পাতা ও হয়ত লাল ফুলের উপর অস্তমান অদৃশ্য সূর্যের শেষ আভার স্পর্শ লাগে। নীচের ঘন বনের সীমান্তে উজ্জ্বল সিন্দুরেখা। বনভূমির অপরূপ সান্ধ্যশোভা।

অশিক্ষিতা নিষ্কলুষ আদিবাসী মেয়ে। মনভরা নির্মল আনন্দ নিয়ে সে ধীরে চলে যায়।

সন্দিগ্ধ মনের লজ্জা নিয়ে আমি ঘরে ফিরি।

॥ ১০ ॥

বাংলোর ড্রয়িংরুম বেশ বড়। সাজানো-গোছানো। কার্পেট পাতা। চেয়ার, টেবিল, আরামকেদারা। ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলে। চেয়ার টেনে পাশে বসে আগুন পোহাই।

জোয়ান এক ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে চৌকিদার ঢোকে। চেহারা দেখে বোঝা যায় আদিবাসী। কিন্তু পরনে রঙিন ডুরেকাটা শার্ট। মাথায় টেরি।

চালচলনে শহরের ছাপ।

চৌকিদার জানায়, সাহেবরা বলে গেছেন রাত্রে একজন লোক রাখতে। একে তাই এনেছি।

বলে দুজনে কার্পেটের উপর বসে।

আমি বলি, দরকার ছিল না। থাকে থাকবে। তোমার গ্রামের লোক নাকি?

চৌকিদার বলে, আমার গ্রাম এখানে নয়। বুলুন্দায়। সেও সিংভূমে। মনোহরপুর থেকে দক্ষিণে। সেখানে চাষবাস ছিল, কাপড়ও বুনতাম। চাকরি পেয়ে চলে আসি এখানে। নগদ টাকা। তাই।

চৌকিদারের নাম মুটু ববাইক। ছেলেটির নাম ডবরু। এখান থেকে অল্প দূরে তার গ্রাম।

তিনজনে কিছুক্ষণ গল্প করি। চৌকিদার বলে, এবার আমি ঘরে যাই। ডবরু রইলো। ঘণ্টাখানেক পরে আমার কাছে খেয়েদেয়ে এসে রাত্রে এখানে শোবে।

ডবরুকে বলি, তুমি শোবে কোথায়? বিছানা আছে?

সে বলে, আগুনের কাছে এইখানে কার্পেটে শোব। গরম থাকবে। চৌকিদার একটা কম্বল দেবে বলেছে।

ছেলেটা চালাকচতুর। হিন্দী-ইংরেজী একটু লিখতে পড়তে শিখেছে। বলে, লেখাপড়া করার তাদের সবারই খুব আগ্রহ, কিন্তু সুযোগ কই? সুযোগ আছে পাখী শিকারের, তাই নিয়েই সকলে মেতে থাকে। দেখেন নি, —সকলেরই হাতে তীরধনুক? তীরে এমন বিষও লাগায় বাঘশিকারও চলে।

আর হাতি? এ জঙ্গলে তো শুনি হাতিরই রাজত্ব!

হাতি মারবো কেন? ওঁরা তো এই বনের রাজা। পথে দেখলে, হাতজোড় করে তাদের প্রার্থনা জানাই! মনে কোন ভয় না রেখে। তারা আবার মনের কথা ঠিক জানতে পারে কিনা। ভয় পেলেই সর্বনাশ। ভক্তি করে পুজো করলেই পথ ছেড়ে চলে যায়। তাই তো হাতি দেখে কেউ ভয় করে না, হাতিও প্রাণের ক্ষতি করে না।

ফসল হলে ত ক্ষতি করে?

সে স্বীকার করে, ক্ষেতে ফসল পাকলে তখন অবশ্য ওরা দল বেঁধে নামে। আমরাও তখন মাদল, টিন বাজিয়ে শব্দ করে ওদের তাড়াই। সে যেন দু'দলের খেলাধুলো।

ডবরুর কাছে তাদের সামাজিক জীবনের নানান গল্প শুনি।

এদের বড় পর্ব মাঘ মাসে। তিনদিন ধরে নাচগান খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-উৎসব চলে।

মৃত্যুর পর কবর দেওয়ার প্রথা। কোথাও বা শবদেহ দাহও করে। অস্থি বা চিতাভস্ম এনে একটা পাত্রে মাটিতে পুঁতে রাখে, সে জায়গাটাকেও শ্মশান বলে। উপরে পাথর সাজিয়ে সে-সব স্থানে 'নিশান' করে রাখে। গ্রামের শ্মশানে সাধারণতঃ বড় বড় গাছের ছায়া থাকে।

এক স্বামীর দুই-তিন পরিবার গ্রহণ করার বাধা নেই। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের বাধানিষেধ আছে। সেই জন্যে হো-রা নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বা 'কিলি'তে ভাগ করে।

শুনে ভাবি, এই 'কিলি' শব্দের সঙ্গে 'কুল' শব্দের কোন যোগাযোগ আছে নাকি ?

সম'কিলি'তে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। করলে একঘরে হতে হয়। জরিমানা দিয়ে তবে আবার সমাজে ফেরা। জরিমানার টাকায় সামাজিক ভোজ হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদেরও সহজ নিয়ম। বিবাহের প্রথা পণ দিয়ে মেয়ে কেনা। অবস্থা অনুযায়ী পণমূল্যের কমবেশি হয়। কখনও হয়ত নগদ একশো টাকা, একগোলা ধান, এককুড়ি গরু-মহিষ ; আবার কখনও বা কুড়ি টাকা, চার-পাঁচটা গরু। কিন্তু পণ দিতেই হবে। তাই অনেক ছেলের বিয়ে হয় না। এক বাড়িতে কয় ভাই থাকলে সবারই বিয়ে দেওয়া বাপের পক্ষে সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন করি, নিজেদের মধ্যে ভালবাসা হলে ছেলেমেয়ে আপনা থেকে বিয়ে করতে পারে না ?

ডবরু বলে, সেরকম ঘটলে, পরস্পরকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। পণও আদায় করা হয়।

তারপর একটু গর্বভরেই ওদের বিবাহের আর এক প্রথার বিবরণ দেয়। হাট বা লোকালয় থেকে জোর করে কুমারী মেয়ে হরণ করার পৌরুষ আছে। কিন্তু সেভাবে নিয়ে যাওয়ার অর্থ, পাত্র বিবাহের জন্য প্রস্তুত, পণ দিতেও রাজী। একটু চুপ করে থেকে জানায়, তার নিজের বিয়েও ঐভাবেই হয়। মেয়ের বাপের মত ছিল না। মেয়ে অবশ্য ভেতরে ভেতরে রাজী ছিল। তাই জোর দেখিয়ে তাকে একদিন ধরে নিয়ে পালায়। ধার করে পণের টাকাও অবশ্য দেয়। তারপর বৌকে নিয়ে শহরে যায়। চাকরি করে ধার শোধ করে। নিজের চেষ্টায় সেইখানেই তখন সামান্য লেখাপড়া শেখা। কিন্তু শহরের আবহাওয়া! প্রাণ কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। গ্রামে তাই ফিরে আসে। কিন্তু এখানে এসেও আবার ভাল লাগে না। বলে, চাকরি পেলে আবার পালাই।

গল্প শুনতে শুনতে সময় বেশ কাটে। তবু বলি, আর গল্প নয়। সাতটা বাজে। খেয়ে এসো। কতক্ষণে ফিরবে ?

সে বলে, আটটার মধ্যে তো নিশ্চয়। যাব আর আসব—খেতে যেটুকু সময়।

আমিও খাওয়া সেরে অপেক্ষা করি। আগুন নিভে আসে। আবার কাঠ দিই। গনগন করে জ্বলে ওঠে। আবার কমে। কাঠও যোগাই। স্তূপীকৃত কাঠ সাজানো পাশে।

আটটা বেজে যায়। নয়টাও বাজে। তার দেখা নেই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। অগত্যা সেজ-এর আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

চোখে ঘুমও নামে। কিন্তু মনে দুশ্চিন্তা থাকে, লোকটা এলে, আবার উঠে দরজা খুলতে হবে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙে কিসের শব্দে। গাঢ় অন্ধকার ঘর। সন্দেহ জাগে, ঘুমের ঘোরে ভুল শুনি নি? আবার সুস্পষ্ট শব্দ। দরজায় করাঘাত। কার জড়িত কণ্ঠের ডাক।

টর্চ জ্বালি। ঘড়ি দেখি: রাত দুইটা। এ কী কাণ্ড! তবু, দরজা খুলতে এগিয়ে যাই। হঠাৎ মনে হয়, এই গভীর রাতে কি অবস্থায় তাকে ঘরে আসতে দেখব, কে জানে? আসার দরকার বা কি

চেঁচিয়ে বলি, এতক্ষণ যেখানে কাটালে সেইখানেই বাকি রাতটুকু কাটাও গে। এখানে আর দরকার নেই।

বাইরে বিড় বিড় করে লোকটা বলে শুনি, আপনি একা থাকবেন--

কথা আর না বলে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ি,—নিশ্চিন্ত মনে।

॥ ১১ ॥

ভোরে উঠে বারান্দায় আসি। চমকে উঠি বাইরের চেহারা দেখে। ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। পাহাড়, বনজঙ্গল, রাস্তা—এসব দূরের কথা, বাড়ির গেটও নজরে পড়ে না। এমন কি বারান্দার নীচেই পাঁচ-ছয় হাত দূরের ফুলগাছগুলিও অতি অস্পষ্ট দেখায়। জগতে যেন এই বাংলোটুকু ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। মহাশূন্যে একাই শুধু ভাসে। এখানেও এমন গাঢ় ফগ্! সেদিন চটুরাজকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনার কথা তুলতে দিই নি। সেই কথা শুনেই কি সারাণ্ডার বনদেবতা তার ফগ্-এর ভাণ্ডার খুলে নিজের ঐশ্বর্যের প্রকাশ করেন? শীতও কী প্রচণ্ড! কে যেন এই ভোরে বরফজলে গা-মুখ ভিজিয়ে দেয়।

ঘরে ঢুকি। দরজা বন্ধ করি। ফায়ারপ্লেসে মোটা একটা গুঁড়ির কাঠে তখনও নিবন্ত আগুনের ম্লান আভা। শুকনো ছোট কাঠ তার উপর রেখে ফুঁ দিই। উজ্জ্বল হতে হতে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কেটলি করে সেইখানেই চা-এর জল চাপাই। চেয়ার টেনে বসি আগুনের পাশে।

মনে পড়ে, বাল্মীকির রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে হেমন্ত ঋতুর অপূর্ব বর্ণনা।

পঞ্চবটী বন। শীতের আবির্ভাব। "জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ",—জল এখন অনুপভোগ্য--অব্যবহার্য, অগ্নি এখন সুখ-সেব্য।

চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত ধূসর বরণ,—দেখায় যেন নিঃশ্বাসে মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণ —"নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।"

আবার, "জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে। সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে॥" চন্দ্রকিরণ হিমাচ্ছন্ন,—তুষারমলিন। যেন, আতপ-শ্যামা রৌদ্র-বিবর্ণা সীতাদেবী,—আছেন কিন্তু শোভাহীনা।

স্থির হয়ে বসে ভাবি। সময় কাটে। কিন্তু বাইরের ফগ্ কাটে না।

পাতলা হয় মাত্র।

বেলা দশটায় চৌকিদার আসে। বাইরে এতক্ষণে দেখি ফগ্-এর মধ্যে রোদের অল্প আভা। ছেঁড়া হাল্কা মেঘের মতন। তারই মাঝে মাঝে দূরের পাহাড় এক-একবার উঁকি মারে। যেন সিল্কের উপর আঁকা জাপানী ছবি।

চৌকিদার কাছে এগিয়ে আসে না। মাথা হেঁট করে বলে, কাল রাত্তিরে ডবরু—

আমি তখনি জানাই, তাকে আর দরকার নেই। একা বেশ থাকতে পারব।

সে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পরে আস্তে বলে, আজ আমি আপনার রান্না করে দিই।

আমি বলি, সামান্য রান্না,—আমি করে নেবো।

সে চুপ করে অপেক্ষা করে। বুঝিয়ে বলি, দু-চার দিনের জন্যে এখানে আমার আসা। রাঁধতে আমার অসুবিধে নেই। আর কাউকে কোন কষ্ট দিতে চাই না। তুমি শুধু কাঠ আর জলের যোগাড়টা করে রেখে যেয়ো।

এতক্ষণে মুখের পানে তাকায়। কি যেন মনে হয় আমার। বলি, আচ্ছা, এক কাজ করো। উনুন ধরিয়ে ডালটা চাপিয়ে নিজের কাজে যাও। রাগ করে কোন কথা বলছি না,—বলে হাসি।

সে চলে যায়। উনুন ধরায়। ডাল রাঁধে। কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে দুধও যোগাড় করে আনে।

এরপর যে-কদিন ওখানে থাকি, সাহায্য করতে সদাই তাকে উন্মুখ দেখি। তার সেবাযত্নে আনন্দ পাই। অবশ্য, দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে তাকে দেখলেও সন্ধ্যার পর কোনদিনই তাকে দেখা যেত না। তার থাকবার কথাও নয়। অথচ, একদিনও আর তাকে নেশার প্রভাবে আচ্ছন্ন দেখি নি।

আমারও দিনগুলি কাটে পরম আনন্দে। সুগভীর শান্তিতে। নিঃসঙ্গ। একা,—কিন্তু একাকিত্ব বোধ নেই। অন্তরে সারাক্ষণই অজানা কী এক গুঞ্জরণ। বিরামবিহীন মধুর সঙ্গীতের যেন সুর বাজে। বাইরের পাহাড় বন প্রকৃতির শান্ত শোভা মনের গভীরে স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে।

রোদ উঠলে বনেজঙ্গলে একা একা ঘুরি। নদীর ধারে নামি। দেখি, মেয়েরা আসে, তেমনি হাসে, গাগরী ভরে জল তোলে। গান গেয়ে ফিরে চলে।

ছেলের দল তীরধনুক নিয়ে চলে। পুরুষদেরও হাতে টাঙ্গি ও বল্লম।

বনের ধার থেকে ছোট ছেলে একটি ছুটে আসে। কি যেন বলে, আঙুল তুলে দেখায়। এগিয়ে গিয়ে দেখি, দুটি বনমোরগ। নধর দেহ দুলিয়ে, রঙিন লেজ তুলে খুঁটে খুঁটে কি খেয়ে বেড়ায়। ছেলেটি ইশারা করে, বন্দুক আনো, গুলি করো।

বলি, অস্ত্র নেই। ওদের মেরো না কখনও। ওরা পোষা-পাখী,—বলে হাসি।

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

বড় রাস্তা দিয়ে লোক আসে। সঙ্গে প্রকাণ্ড মহিষ। কালো কুচকুচে রঙ্। গলায় লম্বা একটা কাঠ ঝোলে। মাটিতে লাগে। বেচারী পশুর চলতে অসুবিধা হয়। জিজ্ঞাসা করি ওটা বেঁধেছ কেন ?—শুনি, নতুন মোষ, সবে কেনা, কাঠটা থাকায় ছুটে পালাতে পারবে না।

মানুষের বুদ্ধি বটে !

আর একদিনের ঘটনা। ত্বরিত গতিতে গ্রামের এক লোক আসে। ডাকে, জল্‌দি এসো। দু'মাইল দূরে—এই ওখানে পাহাড়ের নীচে, মাঠের মধ্যে হাতির দল নেমেছে। দেখবে এসো।

তাও যেতে মন চায় না। হিমালয়ের তরাই-এ বুনো হাতির দল,—আমার দেখা। তাই, নতুনত্বের উৎসাহ নেই।

ঘুরে বেড়াই আপন মনে ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায়। পাতায় পাতায় মর্মর-ধ্বনি ওঠে। ঝিঁঝিপোকার বাদ্য বাজে। বসে থাকি আনমনে নদীর ধারে পাথরের উপরে। জলতরঙ্গের সঙ্গীত শুনি। দূরে কোথায় মাদল বাজে। অরণ্যদেবের যেন হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করি।

ঘরের ভিতরেও ফায়ারপ্লেসে অনির্বাণ অগ্নিশিখা। চৌকিদার স্তূপীকৃত শুকনো কাঠ সাজিয়ে রাখে। চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ভিতরে সারাক্ষণই আগুনের আমেজ। ভাবি, সারাণ্ডাতেও শীতের এমন দুর্দান্ত প্রকোপ ? এ যে হিমালয়ের বরফের ঠাণ্ডার দোসর হতে চায়।

অত শীতবোধের কারণ তখন বুঝি না। পরে সারাণ্ডা থেকে ফিরে জানি, সে-বছর ডিসেম্বরে সারা ভারতে—বিশেষতঃ বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে শীতের অস্বাভাবিক প্রাবল্য হয়,—বহু বছর অমন শীত নাকি দেখা যায় নি। গ্রামে ও শহরের পথে শীতের প্রকোপে কয়েকজনের মৃত্যুও ঘটে।

সারাণ্ডা যেন এ জগতের বাইরে। কোন কিছুই খবর আমার জানা থাকে না। জানবার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না।

ফায়ারপ্লেসের আগুনের পাশে সময় কাটে। দুবেলা সেই আগুনেই রান্না করি। ঐখানে বসেই আহারও সারি। দুধ দিয়ে কফি বানাই। ইচ্ছামত চা-ও করি। তাকিয়ে থাকি আগুনের শিখাগুলির দিকে। ভাবি, অগ্নিপিন্ড থেকেই এই পৃথিবীর জন্ম। ক্রমে জড়জগতের উৎপত্তি। প্রাণের সঞ্চার। জলচর জীব ও পরে পশুপক্ষীর বিবর্তন। ক্রমে মানুষের প্রকাশ। তেজোময় এই জগতের সৃষ্টি। সেই মানুষই আবার বুদ্ধিবলে অগ্নির আবিষ্কার করে। ইচ্ছামত এখন নিজের কাজে ব্যবহারে লাগায়। মানুষেরই হাতে সেই আগুন এখন যেমন সৃষ্টির সহায়, তেমনি ধ্বংসেরও সাধক।

শুকনো কাঠ শব্দ তুলে জ্বলতে থাকে। আগুনের ফুলকি ছোটে। লেলিহান শিখাগুলি লাফিয়ে ওঠে। নানান্ আকারে। সর্পিলভঙ্গিতে। যেন অনন্তনাগের সহস্র ফণা ক্রোধে জ্বলে উঠে দুলতে থাকে। বর্ণেরই বা কতো ছটা ! সোনার বরণ, রক্তরাঙা, আবার কোথাও বা নীল-সবুজ আভা।

তন্ময় হয়ে দেখি আগুনের খেলা। মনে মনে প্রণাম করি, অগ্নয়ে বিদ্মহে দীপ্তিরাজায় ধীমহি। তন্নঃ অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

অগ্নির বর্ণনা করে ঋগ্বেদের শুরু, আবার অগ্নির স্তুতি করে ঋগ্বেদের সমাপ্তি।

কিন্তু থাক্ ও-সব কথা,—আমার অন্তরের গভীর গোপন-পুরে, সেই নিভৃতবাসের শান্ত-মধুর অনুভূতির অবর্ণনীয় কাহিনী।

॥ ১২ ॥

সারান্ডা-বাসের দিন ফুরায়। যেন সুখ-স্বপ্নে এক ঘুমে রাত পোহায়।

চৌকিদার বলে, দপ্তরের জীপ এদিকে আসার এখন সম্ভাবনা নেই। লোহা-ভর্তি মালগাড়ির ওপর বসে যাওয়া,—কষ্ট পাবেন। তা ছাড়া রেল কবে কখন চলে,—বাঁধাধরা টাইম-ও নেই। বরং কনট্রাক্টারের লরিতে চলুন। ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে দেবো, মনোহরপুরে পৌঁছে দেবে। পাহাড়ের ওপর দিকে কাঠ আনতে ট্রাক যখন যাবে, তাদের কাউকে বলে রাখব করে যাবেন।

রাজী হই। সেইমত ব্যবস্থাও হয়। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বড় রাস্তার উপর ট্রাকের অপেক্ষায় থাকি। গাছের ছায়ায় বসে চারিদিকের পাহাড়, বনের গাছপালা, বাংলোর দিকে বার বার তাকাই। মনে হয়, কত পরিচিত বন্ধুবান্ধব! ছেড়ে যেতে মনে বেদনা জাগে। শকুন্তলা-কাব্যের সেই অমর চিত্র,—আশ্রমের তরুলতার নিকট সকরুণ বিদায়-যাচ্ঞা,—চোখের উপর মূর্ত হয়ে ওঠে।

চৌকিদার কয়টা কমলালেবু আনে। বলে, একদিনও পেড়ে খেতে দেখি নি। নিয়ে যান এগুলি, পথে খাবেন।

বোঝা বাড়ার ভয়ে নিতে চাই না। সে জোর করে। অগত্যা চারটা লেবু হাত-ব্যাগের মধ্যে পুরে নিই। সে খুশী হয়।

ট্রাক আসে। পিছনে বোঝাই প্রকাণ্ড লম্বা গাছের গুঁড়ি। চৌকিদার তারই উপর আমার মালপত্র তুলে দেয়। কাঠের উপর দুজন লোক বসে। তারাই দেখবে যাতে না পড়ে।

চৌকিদার জানায়, ড্রাইভারের পাশে মালিক নিজেই বসে আছেন। তাঁকে জানিয়েছি, ওঁর পাশে উঠে বসুন।

কিন্তু উঠব কি করে? পাশে রাখা লম্বা কাঠে দরজার মুখ বন্ধ। জানালা দিয়ে কোনমতে শরীর বেঁকিয়ে ঢুকি। বসতে না বসতেই ট্রাক ছাড়ে। চৌকিদারের গলা শুনি, বাবুজী, জরুর আসবেন।

সারান্ডার বনভূমি যেন কথা বলে নিমন্ত্রণ জানায়।

গাড়ির মালিককে এইবার তাকিয়ে দেখি। বাঙালী। বছর ত্রিশ বয়স। জিজ্ঞাসা করি, এ বুঝি আপনারই ট্রাক?

আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকান। পরনে আমার গরম প্যান্ট-কোট।

মন্তব্য করেন, আরে! আপনি বাঙালী? কোন্ ডিপার্টমেণ্টে? ফরেস্টের নিশ্চয়?

হেসে বলি, না—কোন দপ্তরেরই নই।

তবে নিশ্চয় শিকারে এসেছিলেন? কিন্তু কই বন্দুক রাইফেলও তো সঙ্গে দেখছি না?

আবার হাসি। বলি, নেই। কেননা শিকারে আসি নি।

তিনি আরও আশ্চর্য হন,—তবে এই বনের মধ্যে করছিলেন কি?

এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। খাসা দিন কাটছিল। এখন ছেড়ে যেতে পিছু টানছে।

অবাক হয়ে বলেন, চাকরি নয়, কাজকর্ম-ব্যবসাও নয়, শিকারের নেশাও নয়,—নিছক ঘুরে বেড়ানোর জন্যে আসা— তাও আবার একা! আশ্চর্য!

দুজনের আলাপ জমে।

গাড়ি চলে ঘড়ঘড শব্দ তুলে। ঘুরে ঘুরে পাহাড-পথে। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে।

হঠাৎ মনে পড়ে, হাতব্যাগের মধ্যে সেই দামী ক্যামেরা আছে!

একটু সঙ্কোচ করে ভদ্রলোককে জানাই। তিনি বলেন, ওপরে আমার নিজের লোক। তবু দরকার কি? ব্যাগটা চেয়ে নিচ্ছি, পায়ের কাছে এইখানে রেখে দিন।

তাই করা হয়। রাখবার সময় বাইরে থেকে হাত দিয়ে অনুভব করি ক্যামেরা ঠিকই আছে।

ভদ্রলোকের নাম 'রায়' বলেই এখানে পরিচয় দিই। দুই পুরুষ ধরে কাঠের এই কনট্রাকটারির ব্যবসা। কলকাতায় বাড়ি। বি. এ. পাস। একটু গর্ব করেই জানান, ভাইরা সবাই গ্র্যাজুয়েট। তবু কেমন এই ব্যবসা চালাচ্ছি বলুন! বাবা আগে সব কাজকর্ম এইখানে থেকে দেখতেন। আমরা কলকাতায় থাকতাম, পড়াশুনা করতাম, মাঝে মাঝে আসতাম। এখন বয়স হয়েছে, তিনি থাকেন কলকাতায়। আমরা এখানে দেখাশুনা করি। মাসে অন্ততঃ একবার কলকাতায় ঘুরে আসি।

বনজঙ্গলের জীবন তাঁরও খুব ভাল লাগে। ব্যবসাও বেশ লাভজনক। বনের অংশ জমা নিয়ে সেখানকার গাছ কেটে চালান দেওয়া। বলেন, লাভ-লোকসান খানিক নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। পোকায়-খাওয়া উই-ধরা গাছ কিছু থাকেই। বেশি থাকলেই লোকসান। কিন্তু আসল ভয় থাকে আগুনের। এ-সব বনে—বিশেষ করে গরমের সময়—কখন আগুন লেগে যায় কেউ জানে না। শুকনো কাঠে ঘষা পেয়ে জ্বলে ওঠে। লোকজনের অসাবধানতাতেও কখনো হয় না যে, এমন নয়। কিন্তু একবার লাগলে সর্বনাশ!—গাছ পোড়া তো নয়, যেন কাগজের নোটের তাড়ায় আগুন ধরে!

মনে পড়ে যায়, হিমালয়ে দূর থেকে দেখেছি, আগুন লেগে বন জ্বলে। রাত্রের অন্ধকার। তারই বুক চিরে পাহাড়ের গায়ে আগুনের জ্বলন্ত শিখা

বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণা রাক্ষসী রক্তমাখা লেলিহান জিহ্বা মেলে বনের গাছপালা গ্রাস করে। ভয়াবহ দৃশ্য, কিন্তু দূর থেকে দেখায় অপরূপ সুন্দর।

রায়কে অবশ্য সে-কথা জানাই না। রায় গল্প করেন, এখানকার কাঠের কার্যকারিতা সম্পর্কে। বেশী ব্যবহার হয় রেলওয়ে স্লিপারস্-এর জন্যে। ঘরবাড়ি আসবাবপত্র তৈরির কাজে তো লাগেই। বাঁশঝাড়ের পাল্প থেকে কাগজও তৈরি হচ্ছে।

মনে পড়ে, J. W. Nicholson-এর লেখা Bihar—The forests from within (1959 Ed. Revised by J. N. Sinha) বইখানির কথা। তাতে পড়ি, বাড়িঘর ফার্নিচার তৈরির কাজে সারা বছরের গড়পড়তা প্রতি মানুষপিছু কাঠ ব্যবহার হয়—ভারতে মাত্র ছয় সের, আমেরিকায় ত্রিশ মণ। জ্বালানি কাঠ পোড়ে—ভারতে ষোল সের, আমেরিকায় সাড়ে পাঁচ মণ, সুইডেনে সাতাশ মণ! পাল্প উড—ভারতে আধ সের মাত্র, আমেরিকায় তিন মণ।

ভারতের বনসম্পদ বিপুল, অথচ দেশবাসী নির্ধন।

রায় আদিবাসীদের কথা তোলেন। প্রশংসায় শতমুখ। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, এদের অশিক্ষিত বর্বর ভাবি, কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছি, এখন এদের নিয়ে কাজ করছি, সঙ্গেও মিশছি,—কত সদ্গুণ এদের, দেখলে মনে শ্রদ্ধা হয়। এদের গ্রাম কি রকম পরিষ্কার দেখেছেন নিশ্চয়। স্বভাব-চরিত্রও তেমনি নির্মল। ব্যবহারও কত সরল। সাধারণ লোকের ধারণা এদের loose morals। একেবারে ভুল। চরিত্রবল এদের অতি দৃঢ়—যাকে বলে strict morality। এমনি দেখতে ভালমানুষ, আচরণেও নিরীহ। কিন্তু দুশ্চরিত্রতা ঘটলে প্রাণ নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। একবারের ঘটনা বলি। আমার নিজের জানা। এক ব্যবসাদার এলেন এখানে কাজ নিয়ে। কথাবার্তায় ব্যবহারে লোকটি ভালই, কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতা একটু ছিল। আদিবাসী একটি মেয়ের মোহে পড়ে গেলেন। আমি জানতে পেরেই তাঁকে সাবধান করি। কথায় কান দেন না। বলেন, তোমরা যত সব 'কাওয়ার্ড'। একদিন জোর করে মেয়েটাকে সরাবার চেষ্টা করেন। দুদিন পরেই দেখা যায়, বনের ধারে লোকটির মৃতদেহ! এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটেছে।

রায় গল্প করে চলেন, অথচ দেখবেন এদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মিলন,—একসঙ্গে হাসি ঠাট্টা নাচ গান,—তবু প্রেমঘটিত ব্যাপার বড় একটা ঘটেই না। প্রেম যদি হয়, বিয়ে করো। টাকা দিয়ে মেয়ে কিনে নাও,—সোজা কথা।

বলি, সে আমি শুনেছি।—ডবরুর কথা তাঁকে শোনাই।

রায় বলেন, ছোকরা ঠিকই বলেছে। ঐ এখানকার প্রথা। এই দেখুন না, কুলিমজুর নিয়ে আমার কারবার। বনের মধ্যে যেখানে কাজ চলে, আমাদের চালা বেঁধে দিতে হয়। কুলিকামিন থাকে। আমিও কত রাত্রি কাটাই।

অতগুলো ছেলেমেয়ে—জোয়ান, যুবতী—একসঙ্গে থাকা, কাজ করা,—অথচ কোনদিন কোন ঘটনা ঘটে না। আবার কাজেও ফাঁকি নেই। ছলচাতুরীও জানে না। ওদের সুখ্যাতি করতে গিয়ে আমাদেরই কদর্য রূপটা প্রকাশ হয়ে যায়। তা হোক। একবারের ব্যাপার বলি, শুনুন। এক কনট্রাক্‌টারের কর্মচারী অপর আর এক কনট্রাক্‌টারের কুলিদের কয়েকজনের কাছে চুপিচুপি প্রস্তাব করে, দেখ, আমাদের খাতায় তোদের নাম লিখে রাখি, কোন কাজ করতে হবে না। রোজ সাড়ে তিন টাকা রেট। সপ্তাহের তিনদিনের টাকাটা তোরা পাবি—বুঝছিস তো? কোন কাজ না করেই,—আর বাকি চারদিনের টাকাটা আমার থাকবে। তোরা শুধু রোজ টিপসইটা খাতায় দিয়ে যাবি। কুলিরা হেসে উঠে। বলে, কাজ নেই আমাদের টাকায়,—ও আমরা পারব না।—একেবারে খাঁটি সোনা!

গল্প শুনতে শুনতে পাহাড়-পথ শেষ হয়। সমতলভূমিতে গাড়ি নামে। সন্ধ্যার আগে মনোহরপুরে পৌঁছে যাই।

রায় বলেন, আপনার ট্রেন তো কাল ভোরে। রাতটা আমার বাড়িতে কাটাবেন।

আমি জানাই, ফরেস্ট বাংলোতে থাকব। সঙ্গে চিঠি আছে। খুব সকালে ট্রেন, ঐখান থেকেই ধরা সুবিধা হবে।

তিনি ঘোরতর আপত্তি জানান, বাংলো স্টেশন থেকে দূরে। অত ভোরে লোক পাবেন না মালপত্র নিয়ে যেতে। এখন খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা হবে কিনা সন্দেহ। চৌকিদারও হয়তো এখন নেই, ঘর খোলাও পাবেন না। চলুন আমার ওখানে। স্টেশনের সামনেই বললে হয়,—দুমিনিটের পথ। আমার লোকজনও সারাক্ষণই থাকে, ভোরে ট্রেনে মাল তুলে দেবে। বাড়িতেও এখন আমি একা পুরুষ,—ভাইরা সবাই বাইরে।

কথাগুলির মধ্যে অকাট্য যুক্তি থাকলেও আমি যেতে সংকোচ জানাই। তিনি ছাড়েন না। জোর করেই বাড়িতে তোলেন।

একতলা বড় বাড়ি। সত্যই স্টেশনের অতি নিকটে।

প্রবাসী বাঙালী পরিবার। আদর যত্ন-আপ্যায়নের কোনই ত্রুটি নেই। পৌঁছেই হাত-মুখ ধোওয়ার জল পাই। গরম গরম লুচি, কপি-আলু ভাজা, হালুয়া আসে। সঙ্গে টি-পটভরা চা, বিস্কুট। দেখে বলি, এসব এখন চলবে না। শুধু চা-টাই খাই। এখন এত খেলে রাত্রে আর খেতে পারব না। কাল আবার ভোরে উঠে ট্রেন ধরা আছে।

রায় মানতে চান না। বলেন, এন আর কি? সামান্য বিকেলের জলখাবার। শুরু করুন, আরও লুচি ভাজা গরম গরম আসছে। রাত্রের খাওয়া এখন অনেক দেরি। দেখবেন, তখন আবার ক্ষিধে পেয়ে যাবে। আর দেরি নয়,—আরম্ভ করুন।

বাধ্য হয়ে কিছু খেতেই হয়। ভদ্রলোক বেশ খেতে পারেন দেখি। বয়স কম, স্বাস্থ্য ভাল, তার উপর সারাদিন বনে ঘোরাঘুরি,—ক্ষুধার তাড়না

হবারেই কথা।

খাওয়া সেরে রায় আমার শোবার ঘর দেখান। একপাশে ছোট একটা কামরা। চৌকি পাতা। কোণে একটা চেয়ার টেবিল। মধ্যে দরজা বন্ধ করলে বাড়ির কারও সঙ্গে সংস্রব থাকে না। আমার পক্ষে ভালই। জিজ্ঞাসা করি, ভোরে উঠে জল ইত্যাদির ব্যবস্থা পাব কোন্ দিকে?

ঘরের অপর দিকে একটা দরজা। খুললেই ছোট গলি। সেই দিক দিয়ে বাইরে বার হয়ে আর একটা ঘরে ঢুকে, তবে উঠান জল ইত্যাদি।

রায় জানান, ঐ ঘরে রাত্রে আমার একটা লোক শোয়। ভোরে তাকে ডাকলেই দরজা খুলে দেবে। আমিও খুব ভোরে উঠি, আপনি উঠবার আগেই হয়ত হাজির হব। কিন্তু অত ব্যস্ত কেন? আমি অবশ্য একটু কাজে ঘণ্টাখানেকের জন্যে বার হচ্ছি, ফিরে এসে আবার গল্প জমানো যাবে। রাত্রের আহারেরও আজ বেশ ভাল করেই আয়োজন হচ্ছে।

আমি বলি, রাত্রে কি আর খেতে পারব? যা খেলাম, তাতেই চলে যাবে।

তিনি হেসে বললেন, ঐ সামান্য ক'টা লুচিতে? আপনি তো খেলেনই না। রাত্রে জোর করে বসাবই খেতে। যাক, ঘুরে তো আসি। আসছি এখনি।

বলে চলে যান।

তাঁর অকৃত্রিম ব্যবহার ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হই। শিক্ষিত, ভদ্র, তরুণ বাঙালী। বন-জঙ্গলে ব্যবসাসূত্রে দিন কাটে। মনভরা অনাবিল আনন্দ।

বিছানা খুলে পাতি। চেয়ার টেনে বসি। বন্ধ ঘর। ভাবি সময় কাটাই কি করে? বরং এই সময়ে আজকের ঘটনাগুলি লিখে রাখি। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে কাগজ কলম বার করতে গিয়ে দেখি, এ কী! ফাউণ্টেনপেনটা গেল কোথায়? সব জিনিসপত্র নামিয়ে ভালো করে খুঁজি। কোথাও নেই। অথচ রেখেছিলাম যে কোনই সন্দেহ নেই। হঠাৎ তখন নজরে পড়ে চৌকিদারের দেওয়া সেই চারটে কমলালেবুর মধ্যে দুটো মাত্র পড়ে আছে,—আর দুটি অদৃশ্য।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেই যে সামান্য সময়টুকু রায়ের লোকের কাছে ট্রাক-এর উপর ব্যাগটা ছিল, তারি মধ্যে এগুলি উধাও হয়েছে!

যাক, তাতে দুঃখ নেই, কলমটা অতি সাধারণ দু'টাকা দামের। ক্যামেরাটা ভাগ্যে যায় নি!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করি। রায়ের আর দেখা নেই। দেওয়ালের অপর পাশ থেকে মাঝে মাঝে মেয়েদের গলার শব্দ শোনা যায়। রাত দশটা বেজে যায়। তবু রায় আসেন না। খেতে ডাকা তো দূরের কথা, কেউ কোন খবর নেয় না। ঘরে এক ফোঁটা খাবার জলও নেই। অবশ্য আমারও রাত্রে দরকার হয় না। সাড়ে দশটার পর অগত্যা শুয়ে পড়ি। শেষরাত্রে আবার ওঠা আছে। মনে পড়ে, ডবরুর কথা। রাত দুইটায় এসে দরজায় ধাক্কা! এখানেও কি তাই হবে?

না, কোন কিছু এখানে ঘটে না। রাত শেষ হয়ে আসে। গলির দরজা

খুলে বার হই। দেখি, ডান হাতে বড় রাস্তা যাবার পথে গলির মুখে একটা লরি ঢুকিয়ে রাখা। যেন বোতলের মুখ বন্ধ করে চেপে ছিপি বসানো। যাক, ওদিকে তো যাচ্ছি না। বাঁদিকে সেই ঘর। দরজায় আঘাত করি। তার পর ডাক দিই। কোন সাড়াশব্দ নেই। ভাবি, দেখি ভদ্রলোক যদি উঠে থাকেন, খুব ভোরে ওঠেন বলেছিলেন তো। ঘুরে বাড়ির সামনে আসব, দেখি গলিতে লরির পাশে লোক চলাচলের জায়গা নেই। ইঁদুরকলে ধরা পড়া যেন। লরির পিছন দিয়ে উপরে চড়ে সামনে নামি। ভোরে উঠে এ এক ভাল ব্যায়াম বটে! সামনে জনমানবহীন বড় রাস্তা। বাড়ির সামনে এসে সসঙ্কোচে ডাক দিই। কোন উত্তর পাই না। ডিসেম্বরের ভোরের শীত। লেপ মুড়ি দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাচ্ছেন নিশ্চয়। তারপর আরম্ভ হয়, একবার সেই পিছনের ঘরে আসা, নিষ্ফল ধাক্কা দেওয়া, আবার লরি ডিঙিয়ে বাড়ির সামনে এসে ডাকাডাকি! তারই মধ্যে এক ফাঁকে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানা জিনিসপত্র বেঁধে রাখি। ঘাড় তো আর বসে নেই! সকালের আলো ফোটে। ট্রেন আসতে আর আধঘণ্টাও নেই। মুখ ধোওয়া প্রাতঃকৃত্য সারা—সে-সব মাথায় ওঠে। তা যাক, কিন্তু এসব মালপত্র একা স্টেশনে নিয়ে যাই কি করে? ট্রাঙ্ক ও বেডিং একটু ভারী-ই আছে, গলির মধ্যে ট্রাকের উপর দিয়ে একা এগুলি পার করানো সম্ভব নয়। অথচ ট্রেন যে ধরাই চাই। টাটানগরে পৌঁছে সেইদিনই অমরকণ্টক রওনা হবার প্রোগ্রাম।

শেষ চেষ্টা করি। দরজায় খুব জোরে অনবরত ধাক্কা দিই, চীৎকার করে ডাকি। নিজের কানে সে-শব্দ শুনে নিজেই লজ্জা পাই। অবশেষে ফল ফলে। অপরিচিত একজন ঘুমচোখে দরজা খোলে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি চাই কী?

বলি, তোমার বাবুকে এখনি একবার ডাকতে হবে। ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, মালপত্র নিয়ে যাবার কে-লোক আসার কথা ছিল। সে ইতস্ততঃ করে। আমার তাগাদায় রায়কে ডাকতে যেতে বাধ্য হয়।

কর্তা আসেন। মুখ-ভরা বিরক্তি ভাব। গতকাল দেখা-না-হওয়ার কোন কারণই উল্লেখ করেন না। গম্ভীর মুখে বলেন, ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে বুঝি? এই ভোরে মাল নিয়ে যাবার লোক পাবেন কোথায়? নিজেই একটা ব্যবস্থা দেখুন। আমি কি করতে পারি? আমাকে ডাকাডাকি কেন?

অবাক হয়ে তাঁর মুখপানে তাকাই। হাঁ, কালকের সেই রায়-ভদ্রলোকই বটে। কোন ভুল নেই। কিন্তু দেরি করে কোন লাভও নেই। মুখে হাসির রেখা টেনে বলি, না, আপনি আর কি করবেন? ঐ ট্রাকটা রয়েছে কিনা, মালগুলো বড় রাস্তায় বার করব কি করে, তাই ভাবছি। কেউ যদি একটু সাহায্য করত তুলে দিতে—

ভদ্রলোক তাঁর লোকটিকে বলেন, দেখ তো—ট্রাক-এর ওপর ওগুলো তুলে ওদিকে রাস্তায় নামিয়ে দাও দিকি।

বৈতরণী পার হই। সেই লোকটার বোধ হয় দয়া হয়। কর্তা বলেন না,

সে-ই নিজে থেকে বলে, এতগুলো মাল একা আপনি নিয়ে যাবেন কি করে? বোঁডিং আর ট্রাঙ্কটা আমি নিচ্ছি, খুচরা মালগুলো আপনি নিন।

অকূলে কূল পাই। রায় বলেন, চলুন, এই তো স্টেশন, এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি বলি, আপনি আর কষ্ট করবেন কেন?

তিনি তবুও সঙ্গে চলেন। কিন্তু ব্যাগ, ঝোলা, ফ্লাস্ক—তিনটে জিনিস একা বই। তিনি একবারও বলেন না, আমার হাতে বরং একটা দিন।

অথচ গতকালেরই সেই মানুষ!

পরম আশ্চর্য লোকচরিত্র। সংসার-রঙ্গমঞ্চে একই নটের নানা সাজে বিচিত্র রঙ্গলীলা!

ভাবি, বনজঙ্গল, আদিম মানুষ ছেড়ে সভ্যজগতে আবার ফিরছি বটে।

ট্রেন তখনি এসে যায়। উঠে পড়ি। যাত্রীর ভিড়। বসবার স্থান নেই। দরজার ধারে কোনমতে দাঁড়াই। বাইরে তাকিয়ে থাকি। ট্রেন ছুটে চলে। দূরে দেখা যায়, বনজঙ্গলে ঢাকা সারাণ্ডার সাতশো পাহাড়ের দেশ। ক'দিনের কত মধুর স্মৃতিমাখা।

দিগন্তের আঙিনা থেকে নীল উত্তরীয় দুলিয়ে অতি-প্রিয়জন যেন বিদায় জানায়।

কাবেরী-কাহিনী

সেই কোন্ কালে যৌবনের গণ্ডী পার হয়েছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা, তাও কবে ডিঙিয়ে এসেছি। এখন চলে বার্ধক্যের ধীর-মন্থর চাঞ্চল্যবিহীন দিনগুলি। এ যেন ছড়িয়ে পড়া নদীর সাগর-কূলে এগিয়ে আসা। তবু, এই বয়সে হঠাৎ যে এমনি ভাবে কাবেরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। এ অঘটন ঘটল কেমন করে, তাই বলি। কেন না, দেখি, কাবেরী আমার একার নয়,—সবারই।

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল,—কাবেরী নদী। আর, আমি? নগণ্য এক পর্যটক। ঘুরে বেড়াই আপন মনে এখানে সেখানে। হিমালয়ের পথে পথে। কীসের সন্ধানে? কে জানে?

ঘুরতে ঘুরতে এ বছর—১৯৭১ সালে—হিমালয় ছেড়ে চলে আসি মহীশূর প্রদেশে। পঞ্চাশ বছরেরও আগে মহীশূর, বাঙ্গালোর, উটকামণ্ড ইত্যাদি শহর দেখা। মনের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখা সে-সব স্বর্ণ-স্মৃতিকণা। এবার চলি মহীশূর দেশের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে। আমার না-দেখা নতুন দেশে। গুজরাটী এক বন্ধু—কান্তি সেন শ্রেফ্—সস্ত্রীক মোটরে ঘোরেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। এ তাঁদের বহুদিনের অভিলাষ। কেন,—সে কথাও শোনাই।

কান্তির সঙ্গে পরিচয় হয় অদ্ভুতভাবে। আজ নয়। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে।

সে-বছর বেড়াতে যাই রাজপুতানা অঞ্চলে। আবু পাহাড়ে পৌঁছেচি। নাক্কিলেকের ধারে নিরালা এক কোণে দেখি একটি ছেলে একমনে স্কেচ আঁকে। পরনে হাফ প্যাণ্ট। খালি পা। গায়ে হাত-কাটা সার্ট, পুল-ওভার। ফর্সা রঙ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। নিকটে গিয়ে দাঁড়াই। সুন্দর আঁকার হাত। দেখে খুশী হই। প্রশংসা করে আলাপ করি। বছর ষোল বয়স। বম্বেতে থাকে। সবে ম্যাট্রিক পাস করেছে। বাবা নেই। মা আছেন। বড় দাদা বৈজ্ঞানিক। নানান বিষয়ে গবেষণা নিয়ে মশগুল। তাঁর ইচ্ছা, ভাইও বৈজ্ঞানিক হয়।

ভাইয়ের কিন্তু আর্টিস্ট হওয়ার প্রবল বাসনা। টানা বড় বড় চোখ দুটি তুলে মুখের পানে তাকায়। বলে, বলুন তো, ছবি আঁকায় কত আনন্দ। ছেলেবেলা থেকেই নিজে নিজেই আঁকি।

হেসে প্রশ্ন করি, ভাই বুঝি পালিয়ে এসেছ একা, কাউকে না জানিয়ে ?

সে আশ্চর্য হয়ে বলে কই, না তো! মা-দাদার অনুমতি নিয়েই ঘুরতে বেরিয়েছি।

জিজ্ঞাসা করি, পায়ে জুতো নেই কেন ?

মুখ হেঁট করে গম্ভীর সুরে বলে, দেশের কত লোকই তো পরতে পায় না।

পায়ের বুড়ো আঙুলে ফেটি বাঁধা। পাথরে পা কেটেছে।

বলি, চল ধর্মশালায়, ওষুধ দিয়ে ষ্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দেব।

সসঙ্কোচে আসে। বলে, সামান্য আঘাত। কিছুই নয়।

বলি, ছোটকেও তুচ্ছ করতে নেই। ছোট থেকেই বড় হয়।

ধর্মশালায় পৌঁছে বলে, এইখানে তো আমিও উঠেছি।

এইভাবেই পরিচয় শুরু। তারপর আমাদেরই দলের সঙ্গে ঘুরতে থাকে। নিজের কোন পরিচয় দিই না। দেবার কোন কারণও থাকে না। বাংলা দেশ সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না দেখি। শুধু জানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। গুজরাটী ভাষায় তাঁদের বই কয়েকটা পড়েছে। আর নাম শুনেছে, আঁকা-ছবি দেখেছে,—অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলালের। একদিন বলে, জানেন শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়াই আমার জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।

উৎসাহ দিয়ে বলি, বম্বে ফিরে তোমার মা ও দাদার অনুমতি যদি পাও, শান্তিনিকেতনে তোমার ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে হয়ে যাবে। জানিয়ো আমাকে।

শুনে হাতে যেন স্বর্গ পায়।

বম্বেতে ফিরেই সুসংবাদ জানায়। শান্তিনিকেতনে চলেও আসে। কলাভবনে নন্দলাল, বিনোদবাবু, রামকিঙ্করের ছাত্র,—সে কী তার আনন্দ!

পরের বছরই ১৯৪২ সালের আন্দোলন শুরু। চারিদিকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। বিদ্যায়তনও সব বন্ধ। তাকেও ফিরে যেতে হয় বম্বে। ১৯৪২

ভ্রঃ অঃ ৩য়—শেরপাদের দেশে—২১

এর আন্দোলনে যোগও দেয়। কারাবাসও ঘটে। একা তারই নয়—তার দাদারও। জেল থেকে বেরিয়ে এল সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব নিয়ে। চিঠি লিখে জানায়, দাদার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, কর্মক্ষমতা দেখে মুগ্ধ। দেশে এখন বিজ্ঞানেরই দাবি বেশি। দাদার কাজেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করছি।

আমাদের উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের নিয়মিত আদানপ্রদান থাকে। দু'বছর পরে আবার বম্বে যাই। তাদেরই কাছে উঠি। দেখে আসি, ছোট একটা টিনের সেড, ছোট্ট ফ্যাক্টরী। দাদার সঙ্গে একমনে কাজ করে চলেছে। সেই হাফ প্যাণ্ট, হাত-কাটা সার্ট। হাতে তুলি নয়, কিন্তু রঙ মাখা। ছবি আঁকতে নয়। অ্যাসিডে রাঙন। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী। নিজেদের হাতেই সব গড়া। এমন কি মেশিনারী তৈরি করা পর্যন্ত। দাদার আদর্শ,—ভারতে যে সব রাসায়নিক পদার্থ বা বস্তু তৈরী হয় না, বিদেশ থেকে আমদানি হয়,—সে-সবই স্বদেশে একে একে প্রস্তুত করবেনই। আপন খরচায় বিদেশে যান, পদ্ধতি প্রণালী নিজে দেখে শিখে আসেন, গবেষণা করেন, এখানে কাজ শুরু করে দেন। ইনিই ভারতে প্রথম প্লাষ্টিক তৈরি করেন। ধীর, স্থির, শান্ত মানুষ। কথা বলেন কমই। কাজ নিয়েই সদাব্যস্ত। অথচ, দেখলেই মনে হয় সারাক্ষণই মন তাঁর গভীর চিন্তায় আমগ্ন। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণ করেন এ-দেশেও সব কিছুই হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষ সর্ব-রত্ন-প্রসূ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছোট্ট কারখানা বড় হয়ে ওঠে। ভারতে নানা স্থানে নতুন নতুন ফ্যাক্টরীরও প্রতিষ্ঠান হয়। যে আসে তাকেই আপন আবিষ্কৃত পদ্ধতি শেখান। ফ্যাক্টরীর অধিকাংশ কর্মী যোগাড়ও করেন বিচিত্র পদ্ধতিতে। ভিখারী ছেলে ভিক্ষা করতে এলে সাদরে ডেকে নেন, কাজ শেখান। এখন বম্বে ফ্যাক্টরীতে গেলে দেখা যায়, সেই সব ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশ ঘুরে এসেছে, ফ্যাক্টরীর শাখা-বিশেষের দায়িত্বভার নিয়েছে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত তাঁদের নিকট আসেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে, ভারতে একজোটে কাজ করার প্রস্তাব নিয়ে। দাদার সব কাজের দক্ষিণ হস্ত —কান্তিসেন। সেও এখন নাম-করা ফলিত-রসায়ন-বৈজ্ঞানিক।

শুধু কি আর্টিস্ট ভাইয়েরই এই পরিবর্তন? তাঁদের মায়েরও কথা বলি। প্রথম যখন তাঁকে দেখি, কথায়-কথায় বলেন, জগন্নাথ-দর্শনের তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। তাঁকে তখন জানাই, আমাকে লিখলেই পুরীতে থাকবার ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে।

তারপর কতবার তাঁর সঙ্গে বম্বেতে দেখা হয়। দেখা হলেই পুরী যাওয়ার কথাও তুলি। কিন্তু দেখি, তাঁর তীর্থযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। তিনি এখন থাকেন ফ্যাক্টরীর এলাকার মধ্যে। দুবেলা কর্মীদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার নিয়েছেন নিজের হাতে। তাই, হাসিমাখা মুখে বলেন, আমার শ্রীক্ষেত্র এখন এইখানেই, এই আমার আনন্দবাজার!

কান্তিসেনের সঙ্গেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। দেখাও হয় মাঝে মাঝে। বম্বেতে গেলে তাদের কাছেই থাকি। দেখা হলেই

হেসে বলি, বহু বছর আগে তোমার নামেই এক আর্টিস্ট ছিল, তার খবর রাখ নাকি—সে হাসে। মাত্র দু'বছর আগের কথা। কান্তিসেন তার চিঠিতে নিদারুণ দুঃসংবাদ জানায়, দাদা নেই। পরশু রাতে হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। এ যেন মাথায় বাজ পড়ল। জল-জ্যান্ত মানুষ, রোজই যেমন কাজ করেন, তেমনি করেছেন। রাত ন'টা পর্যন্ত ফ্যাক্টরীর কাজ সম্পর্কে লোকেদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। কদিন থবে ফ্যাক্টরীর মধ্যে গেস্ট-হাউসে রাত কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাতদুপুরে ভাইপোর ঘুম ভেঙে যায়। দেখে ঘরের সব জানলা খোলা, পাখা পুরোদমে চলে—এই জানুয়ারি মাসেও—তিনি তারই তলায় অস্বাভাবিক অবস্থায় নিঃশ্বাসের কষ্টে হাঁফান। টেলিফোনে খবর পেয়েই তখনি আমরা ছুটি, ডাক্তারও আসে। কিন্তু তার আগেই সব শেষ! লিখব আর কী? আসতে পারেন না এখনি?

চলে যাইও। তাঁদের মা তখনও বেঁচে। আশির উপর বয়স। দু'মাস পরে তিনিও গেলেন। ভাবি, বিধির এ কী বিচিত্র বিচার!

প্রথম দিকে কান্তিসেন মুষড়ে পড়ে। তারপর নতুন উদ্যম নিয়ে আবার কাজে লাগে। বলে, দাদা নেই, তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদের শেষ করতেই হবে।

এই কান্তিসেনই বম্বে গেলেই বলত, চলুন গোয়া দেখেননি, ঘুরিয়ে আনি।

কিন্তু কোনবারই তা হয়ে ওঠে না। এই বছর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই মোটরে যাত্রা। গাড়িতে উঠে বলে, ফ্যাক্টরী ছেড়ে বেরুলামই যদি, তবে শুধু গোয়া কেন? চলুন, আপনাকে নিয়ে আরো ঘোরা যাক। দিন কুড়ি বাইরে কাটাব, ব্যবস্থা করে এসেছি।—বলে নিশ্চিন্ত মনে আরামে গাড়ির গদিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে। পাশেই তার স্ত্রীর প্রতি কোমল দৃষ্টিতে তাকায়। মৃদু হেসে বলে, আমাদের প্রোগ্রাম করেছে চন্দা,—অবশ্য, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে। তার এ-সব অঞ্চলই দেখা।

চন্দার হাতে প্রকাণ্ড রুট-ম্যাপ। দুজনে কোলের উপর ছড়িয়ে পাতে। হেঁট হয়ে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকে কোথা থেকে কোথায় যাবে।

চন্দাও আর্টিস্ট। কান্তিসেনেরও সুপ্ত আর্টিস্ট মন জেগে ওঠে। প্রোগ্রামও হয় সেইমত। মোটরে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। প্রশস্ত রাজপথ ধরে সবেগে ছুটে চলে।

কান্তি ও চন্দা দুজনেই আপন অগ্রজের মতন আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমার সুখ-সুবিধা দেখতে সদাই উদ্‌গ্রীব। শুধু বোঝে না, পায়ে হেঁটে ঘোরাতেই আমার প্রকৃত আনন্দ। উল্কার মত মোটরে দেশ-দেশান্তরে ছুটে চলা, এর রোমাঞ্চ থাকলেও আমার নিকট তার আবেদন নেই। কিন্তু যে-সব জায়গায় নিয়ে চলে, অত অল্প সময়ে এত বিভিন্ন স্থান দেখা সম্ভবই হত না,—যদি না আসতাম মোটরে। অথচ, এ যেন স্থান থেকে স্থানান্তরে 'বুড়ি-ছুঁয়ে

ছোটা'। মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার আগেই বিদায় নেবার ঘণ্টা।

মোটর ছোটে বায়ুবেগে। দিনের পর দিনও কাটে। একে একে দেখা হয়,—

সুপ্রসিদ্ধ সেই বাদামীর গুহা-মন্দিরের ভাস্কর্য-সৌন্দর্য। এককালীন চালুক্য রাজ্যের ভগ্নাবশেষ।

বিমুগ্ধ হই, পট্টাদকল ও আইহোলের মন্দির-স্থাপত্য দেখে।

তুঙ্গভদ্রাতীরে হাম্পি বা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবময় বিশাল রাজধানীর এখন বিষাদময় ভগ্নস্তূপের শ্মশানভূমি মনে বৈরাগ্য জাগায়।

আবার, মাইল দশেক মাত্র দূরেই,—হসপেটের (Hospet) নিকটে—আধুনিক কালের মানুষের বিরাট কীর্তি,—তুঙ্গভদ্রার গতিরোধ করে পাহাড়ের মধ্যে সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড বাঁধ—Tungabhadra dam। ৭,৯৪২ ফুট লম্বা, ১৬০ ফুট উঁচু। নবযুগের মানুষের নবীন স্বপ্ন। একদিকে কালের করাল মূর্তি, এখানে আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকদীপ্তি।

মোটর ছোটে অবিশ্রাম গতিতে। নিত্য নূতন দ্রষ্টব্য স্থানেরও শেষ নেই। পৌঁছাই বেলুড়ে।

দশ মাইল দূরে দেখে আসি হালেবিদ-ও। ঘুরে ঘুরে স্তম্ভিত হয়ে দেখি, সেকালের মানুষের সেই আশ্চর্যময় সৌন্দর্যসৃষ্টি। মন্দির রচনার ও স্থাপত্যশিল্পের বিশ্ব-বিশ্রুত অপূর্ব চারুকলার নিদর্শন। অতি সূক্ষ্ম, সুনিপুণ কারুকার্য। যেন পাষাণে গাঁথা হরশালার অমরকীর্তির কাব্য-কাহিনী।

আবার মোটর ছোটে। অরণ্য প্রান্তর, গ্রাম শহর চোখের উপর ভেসে চলে। হাসান শহর ছাড়িয়ে চলে যাই শ্রবণবেলগোলায়। ছোট এক পাহাড়। সাগরবক্ষ থেকে ৩,০৫২ ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের শিখরের উপর গোমতেশ্বরের অতিকায় মূর্তি,—৭০ ফুটের উপর লম্বা। ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তৈরি।—পাহাড়ের মাথা কেটে একখণ্ড পাথরে-গড়া বিশাল বিগ্রহ। জৈনদের এক প্রধান তীর্থস্থান। পথের উপর মোটর ছেড়ে আধ-ঘণ্টাও লাগে না পাহাড়ের বুকে পাথর-কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে। নীচে থেকে মাত্র ৪৭০ ফুট ওঠা। তবু বহুদূর থেকে দেখা যায়, সেই বিরাট মূর্তি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যেন আকাশে মাথা ঠেকান। এও মানুষের হাতে-গড়া বিশ্বের আর এক বিস্ময়।

আবার ছুটে চলা। এবার কুরুগ্।

টুরিস্ট মহলে প্রচার, হিমালয়ে যেমন ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারতেও স্বর্গ-ভূমি তেমনি কুরুগ্। কথাটা,—কোডাগু (Kodagu)। পাশ্চাত্য ভাষায় রূপায়িত হয় -কুরুগ্। এই দেশই কাবেরীর জন্মভূমি।

কান্ত সেন বলে, আপনি ঘোরেন হিমালয়ে। আমাদের বম্বে থেকে সে দেশ অনেক দূরে। আমাদের কাছে এই কুরুগ্-ই হিমালয়। ঠিক মনে হয় না যেন হিমালয়ে এসেছি ?

চারপাশে ঢেউ-খেলানো পাহাড়। বনের মধ্যে আঁকা-বাঁকা ঘুরে চলা পাহাড়ী পথ। পথের একপাশে পাহাড়ের উঁচু গা। অপরদিকে নীচে নেমে যাওয়া ঢালু খাদ। দূরে আরও উঁচু পাহাড়ের নীল চোখের ইঙ্গিত। হিমালয়ের কথা মনে আনে, আশ্চর্য কি?

এও তো দক্ষিণ ভারতের এক সুবিস্তীর্ণ গিরিশ্রেণীরই অংশ। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে খাণ্ডেস জেলার কুন্ডাইবারি-গিরিপথ থেকে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত এই দীর্ঘ গিরিমালা। প্রায় এক হাজার মাইল এর বিস্তৃতি। ইংরেজ আমলে তার নাম হয় Western Ghats। ভারতীয় প্রাচীন নাম—সহ্যাদ্রি বা সহ্যাগিরি। সাগরবক্ষ থেকে গড়পড়তা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। সুদূর উত্তরে পুষ্পগিরি শিখর,—৫,২৬০ ফুট। দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শিখর ব্রহ্মগিরি—৫,২৭৬ ফুট। তারই কোন এক অংশে কোথায় বুঝি কাবেরীর উৎস। ভারতের পশ্চিম অংশে আরব্য উপসাগরের সমগ্র উপকূল ব্যেপে সহ্যাদ্রি যেন সুদীর্ঘ দুর্গপ্রাকার। প্রকৃতই এই পর্বতশ্রেণীর কোন কোন অংশের মাথার উপর শিলাস্তূপ দূর থেকে দুর্গের মতনই দেখায়।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সহ্যাদ্রির সাধারণতঃ রুক্ষ কঠোর রূপ। অজস্র শিলাবহুল। অথচ কুর্গ-এ দেখি, পাহাড়গুলির সুস্নিগ্ধ শ্যামল শোভা। তরুলতা-সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির আরণ্যক রূপ। স্বচ্ছ সুনীল পার্বত্য প্রবাহ। মানুষের শ্রম-লব্ধ শস্য-ক্ষেত। ফল-ফুলের বাগিচা। মাঝে মাঝে পরিচ্ছন্ন গ্রাম। ঘন-বিন্যস্ত কুটির রচনা নয়। প্রতি গৃহের স্বতন্ত্র এলাকা। পাহাড়, উপত্যকা, নদী, বন, সবুজ ক্ষেত,—এই নিয়েই গড়া এই দেশ।

কান্তিসেন উচ্ছ্বসিত হয়ে দেখায়,—পথের দুপাশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঐ যে প্ল্যানটেশন—ও-সবই কফির গাছ। আবার ঐ ওদিকে দেখুন,—ও-সব ছোট এলাচের চাষ।

মুখ ঘুরিয়ে দেখার আগেই মোটর সবেগে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে যায়। গ্রাম আসে।

কান্তিসেন বলে ওঠে, এবারে আশপাশে এ-সব কমলালেবুর বাগান। আসতেন যদি ফলের সময়, গাছ-ভর্তি সব লেবু দেখতেন।

কিন্তু দেখব কী? মোটর তেমনি ছুটে চলে। আবার কফির চাষ, ছোট এলাচের চারা, লবঙ্গ গাছের বন, রবার প্ল্যানটেশন,—এই সবই কুর্গ-এর বাণিজ্য সম্পদ। বাঙালীর চোখে যেন বিদেশী ফসল। নতুন রাজ্য।

কান্তিসেন জানায়, শুধু দেশেরই অভিনব রূপ নয়, অধিবাসীদেরও চেহারা নজর করবেন, কাউকে কাউকে দেখলেই মনে হবে যেন হিমালয় থেকে নেমে এসেছে, ভুটিয়াদের মত মুখ-চোখের ভাব। গোল মুখ, চ্যাপ্টা নাক একটু ফর্সা রঙ। অথচ সাধারণ কুর্গবাসী লোকেদের আকৃতি,—লম্বা-চওড়া, জোয়ান, টানা চোখ, লম্বা নাক, মাথাও আকারে বড়। এও এক বিচিত্র ব্যাপার। দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন অধিবাসীদের সঙ্গে এদের আকৃতিগত মিল নেই। কুর্গী ভাষাও কিছু আলাদা। কোথা থেকে, কী ভাবে, কোন্

কালে এই কুর্গীরা এখানে এসে বসবাস শুরু করে জানি না।

জানতাম না আমিও তখন। পরে বিশেষজ্ঞদের লেখা বই দেখে কিছু কিছু জানতে পারি।

কুর্গ্ এককালে মহীশূর রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র থাকলেও এখন স্বাধীন ভারতে মহীশূর প্রদেশের এক জেলা মাত্র। ১৫৯৩ বর্গমাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি। তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি। তাই এখানকার লোক-বসতি বিরল। সারা দেশের লোকসংখ্যা মহীশূর শহরের বাসিন্দাদের সমান হবে না। এখানকার প্রধান অধিবাসীদের নাম কোডাভা, বা কোডাগু। তাই থেকেই কুর্গ্। জগতের আর কোথাও এই কোডাভা জাতি দেখা যায় না। এদের উৎপত্তি নিয়ে নানান অভিমত। আদিম জাতি,—অতএব পৌরাণিক যুগে এর উৎপত্তির কাহিনীর প্রবাদ প্রচারিত হবে, আশ্চর্য নয়। পাণ্ডবরা নাকি এই অরণ্য অঞ্চলেই অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি কাটান। কোডাভারা সেই পাণ্ডবদেরই কার বংশধর। তাই, জাতিতে ক্ষত্রিয়। আকৃতিও আর্য-অনুরূপ।

নৃতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকরাও এদের সম্বন্ধে একমত নন। কেউ বলেন, এদের পূর্বপুরুষ Scythians। কারও মতে, আরব্য দেশ থেকে এরা আসে। আবার অনেকের অভিমত, সিন্ধু সভ্যতার যুগে এরা সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে আসে, এখানে বসবাস শুরু করে,—মূলে এরা ইন্দো-এরিয়ান্স। মোট কথা, এদের উৎপত্তি যাই হোক, দাক্ষিণাত্যের এই বিজন অরণ্য পর্বতের নিভৃত আশ্রয়ে এরা বহুকাল ধরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এদের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা,—সবই চারিপাশের অপর অধিবাসী থেকে পৃথক। অবশ্য কালের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এদেরও মধ্যে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়। সমীপবর্তী রাজন্যবর্গের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এদেরও স্বাধীনতা মাঝে মাঝে হরণ করে। তার মধ্যে লিঙ্গায়েত রাজাদের আধিপত্যই সর্বপ্রধান।

রাজনৈতিক এই সকল ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও কোডাভারা জাতিগত আপন বৈশিষ্ট্য অনেকখানি বজায় রাখে। আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনে জাতি হিসাবে এদের রণকুশল ও সাহসী করে তোলে। যোদ্ধারূপে এদের খ্যাতিও বাহির-জগতে ছড়িয়ে পড়ে। অস্ত্রপূজা কোডাভাদের এক প্রধান পর্ব। ঢাল-তরোয়াল হাতে রণনৃত্য উৎসবের এক বিশেষ অঙ্গ। এদের সামরিক দক্ষতার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় প্রধান সেনাধ্যক্ষ কারিয়াপ্পা কুর্গ্ সন্তান। জেনারেল থিমায়াও।

কিন্তু থাক এখন কোডাভাদের কথা। আমাদের যাত্রাকাহিনীর সূত্র ধরি।

বন-পাহাড়-গ্রাম অতিক্রম করে পৌঁছুই মার্কারাতে। কুর্গ্-এর প্রধান শহর।

ছোটখাটো সুন্দর হিল্-স্টেশন। ৩,৯০০ ফুট উঁচুতে, পাহাড়ের মাথায়। মার্কারা নাকি মহাদেশপেঠ নামের অপভ্রংশ।

কান্তিসেন বলে, চলুন, সার্কিট হাউসে জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখি। কদিন একটানা ঘোরাঘুরির পর এখানে দিন তিন চার আরামে সুস্থির হয়ে কাটানো যাক।

চন্দার দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হেসে বলে, পরামর্শটা অবশ্য চন্দারই। ওর দুশ্চিন্তা জেগেছে, আপনি হয়ত ক্লান্ত হয়েছেন।

শহরের বাইরে একান্তে সার্কিট হাউস। অতি শান্ত মনোরম পার্বত্য পরিবেশ। গেটে লেখা 'সুদর্শন গেস্ট-হাউস। শুধু নামেই নয় দেখতেও নয়নরঞ্জন। যেমন হাল-ফ্যাশানের সুদৃশ্য প্রকাণ্ড বাংলো, তেমনি সুন্দর সাজানো বাগানও।

কিন্তু চেষ্টা করেও জায়গা মেলে না। সর্বভারতীয় সরকারী বড় বড় অফিসারদের কি এক অধিবেশন চলছে ক'দিন ধরে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও কারা সব এসেছেন। বাইরে কার-পার্কে দাঁড়িয়ে সারি সারি বড় বড় মোটর। তকমা-লাগানো পোশাক-পরা ড্রাইভার-চাপরাসী। চারপাশে তাকিয়েই মনে হয়, যেন উৎসব-প্রাঙ্গণে আমরা অনাহূতের দল। তবুও মনে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞাসা করি, কুর্গ-এর এই মার্কারাতে এ কনফারেন্স কেন? মার্কারার কি ঐ সভার আলোচ্য বিষয়ে কোন বিশেষ প্রাধান্য আছে?

এ অফিসার হেসে বলেন, ব্যাপারটা তা নয়। কুর্গ-এর সম্পর্কে কোন ইন্টারেস্টই নেই। কুর্গ-এ ভি-আই-পিরা অনেকেই আসেননি অথচ জায়গাটার সুখ্যাতি শোনা যায়, তাই ঠিক হল সভার অধিবেশন এখানেই হোক। এই সুযোগে দেশটা দেখা হয়ে যাবে। এসেছেনও অনেকে কম দূর থেকে? সেই দিল্লী, সিমলা, অমৃতসর, নাগপুর, কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে—কোথায় নয়?

দেখি ঠিক তাই বটে। এর ফলভোগ তার পরেও চলে। কান্তিসেন ওখান থেকে নিয়ে যান ইন্সপেকশন বাংলোতে। বলে, দেখবেন, সেও সুন্দর জায়গা। গতবার এসে সেইখানেই উঠেছিলাম।

শহরের অপর আর এক প্রান্ত। পাহাড়ের একেবারে মাথার উপর। নিকটে গাছপালা নেই। চারিদিক খোলা। দিগন্তব্যাপী অবাধ দৃষ্টি চলে। বাড়িটিও সুন্দর ঠিকই। কিন্তু সেখানেও জায়গা পাই না। সেই মহারথীদেরই দলের ভিড়। অগত্যা শহরের মধ্যে চৌরাস্তার কাছে বিরাট যাত্রী নিবাস—Travellers' Bunglow তে নেমে আসা হয়। কিন্তু এখানে ঘর ভর্তি। বড়কর্তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারীরা উঠেছেন। অবশেষে স্থানীয় এক সজ্জন অফিসারের চেষ্টায় ও অনুকম্পায় একখানা ঘর কোনমতে পাওয়া যায়। ভাল লাগে না আমার এই ঘরের সন্ধানে ছোটাছুটি, শহরের হৈচৈ ভিড়, সাজানো সভ্যতার আবহাওয়া, সরকারী আমীর-উমরাহের উদ্ধত আচরণ।

কান্তি বলে, এবারই হঠাৎ এ-রকম দেখছি, নইলে শহর হলেও মার্কারা শান্ত জায়গা, প্রাকৃতিক শোভা আছে।

চুপ করে শুনি।

কোন রকমে রাত কাটে। পরের দিন সকালে চেয়ার টেনে লম্বা বারান্দায় বসি। প্রকাণ্ড বাড়ির দেওয়ালের পাশ দিয়ে পাহাড়ের একটা চূড়া উঁকি মারে। দু-একটা চেনা পাহাড়ী পাখির রবও শুনি, কিন্তু মোটরের হর্ন, পাশের ঘরের লোকজনের কলকোলাহল সে-শব্দ যেন ডুবিয়ে রাখে। তখনি, কেন জানি না, চকিতে কাবেরীর কথা মনে আসে। যেন, মেঘ-বিষণ্ণ আকাশে উষার আলোর হাসি ফোটে।—কাবেরী! ঠিকই তো, কুর্গ-এই না তার জন্ম? গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা—প্রসিদ্ধ সব নদীর জন্মস্থান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু কাবেরীর উৎস—এখনও তো অদেখা। এবার কি কুর্গ-এ আসা তবে কাবেরীরই টানে।

কান্তিসেনকে তখনি মনের কথা জানাই। সে বলে, কুর্গ-এই কাবেরীর উৎপত্তি ঠিকই; অথচ, পাহাড়ে কোন্ অঞ্চলে, জানবার চেষ্টা কখনও করিনি। খবর নেবো। কিন্তু মারকারা সুন্দর শহর, এখানে কটা দিন কাটালে হয় না?

বলি, খবরটা তো নিয়ে এসো এখনি।

অল্পক্ষণের মধ্যে সে ফিরে আসে। বলে, আমিই জানতাম না দেখছি, কিন্তু এখানে সকলেরই ও জায়গা জানা। তল-কাবেরী নাম। মাত্র ২৫ মাইল এখান থেকে। মোটরের ভাল রাস্তাও। ঘুরে আসবেন নাকি? কতক্ষণ আর লাগবে?

বলি ঘুরে আসা নয়। মালপত্র বাঁধো। এখনি বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের মধ্যে কাবেরীর উৎস—নিশ্চয় মনোরম স্থান হবে। কি হবে এইখানে থেকে?

অতএব সকালেই যাত্রা করা হয়। শহর ছাড়ার আগে চন্দা বাজার ঘুরে কিছু কিছু সওদা করে। থলে ভরে ছোট এলাচ, লবঙ্গ কেনে। একমুখ হাসি নিয়ে বলে, কী সস্তা এ-সব এখানে! আমাদের শহরে এ জিনিস এখন দুমূল্য—ঠিক চারগুণ বেশি দাম এখানকার চেয়ে। এত জন্মায় এখানে, অথচ বিদেশে চালান হয়ে যায়। আমাদের দেশের ফসল আমরাই ভোগ করতে পাই না। থলের মধ্যে বাঁধা, তবু কি ভুরভুরে গন্ধ! তাজা জিনিস তো! চন্দন কাঠও কিছু নিলাম, এখানকারই বনে হয়। আপনার জন্যেও একটা নিয়েছি।

সুরভিত মোটরে বসে কাবেরী-দর্শনে চলি। এ যেন পুষ্প-ধূপ-চন্দন সাজিয়ে মন্দিরের পথে।

ম্যাঙ্গালোরের পথ ধরা হয়। ম্যাঙ্গালোর শহর আরব-সাগরের তীরে! মারকারা থেকে সত্তর মাইলের উপর। সেদিকে আমাদের পরে যাবার কথা। এখন মাত্র দুমাইল এই পথে গিয়ে এ রাস্তা ছাড়তে হয়। মারকারা থেকেই পথ পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে। দুমাইল এসে রাস্তা ভাগ হয়।

ডানদিকে মাঙ্গালোরের পথ। আমরা বাঁদিকের পথ ধরি। পাহাড়ের কোল বেয়ে আরও নেমে চলি। এ পথে গাড়ি চলাচল কম। লোকজনও শুধু গ্রামের কাছে এলে দেখা যায়। দুপাশে ঘন গাছপালা। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য নয়। 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়'। তারই বুকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলি। আশপাশে কফি ও এলাচের চাষ,— plantation।

কফির সাদা সাদা ফুল, কি ফলের গুচ্ছ জানি না—বনভূমি আলো করে রাখে। চারাগাছের মত উঁচু। বড় বড় গাছের ছায়ার আশ্রয়ে লালিত হয়।

এলাচের ক্ষেতের উপরও বড় বড় গাছের ছায়া। এলাচ গাছের লম্বা লম্বা পাতা,—ক্যানাফুলের গাছের পাতার মতন। মাথার উপর বড় গাছের ডাল-পাতার যেন সামিয়ানা। আলো-বাতাস চাই, কিন্তু বেশি নয়। তাই বুঝে, মাঝে মাঝে বড় গাছ কাটা হয়। ঠিক যতটুকু আলো-বাতাসের প্রয়োজন, তাই যেন আসে, এমনি আচ্ছাদন। স্তিমিত আলোকে চির-শ্যামল পরিবেশে ছোট এলাচ গাছের লালন-পালন। যেন, আলালের ঘরের দুলাল। তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এলাচের সব চেয়ে ভাল ফসল হয়। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে চাষের কাজ শুরু। বড় বড় গাছ যা কাটবার কেটে, জমি সামান্য কুপিয়ে দিলেই নবীন ছোট চারাগুলি মাথা তুলে জেগে ওঠে। তিন মাসেই সতেজ হয়ে গুটি—capsules ধরে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পেকে ওঠে, ফসল তোলার সময় আসে। এক-একটা ক্ষেতে সাত বছর পর্যন্ত ভাল ফসল পাওয়া যায়। তারপর আবার বড় গাছ কেটে ক্ষেত তৈরি করা। তিন বছরের মধ্যেই নতুন চারার ফসল গজায়। দার্জিলিং অঞ্চলে দেখেছি, বড় এলাচের চাষ। সে-এলাচ হয় মাটির নীচে, শিকড়ে,— থোকা থোকা ধরে,—গাঢ় লাল রঙ, যেন জমাট রক্ত। তুলে শুকিয়ে রাখলে কালচে হয়। রূপ নেই, শুধু স্বাদ ও গন্ধ থাকে। ছোট এলাচের capsules ফলে গাছের উপর, ডালে ডালে। থোকা থোকা ঝুলতে থাকে—সাদা রঙ। যেন রূপার ঝুমকা দোলে। চারিদিক গন্ধে ভরে ওঠে। যেমন রূপ, তেমনি সুবাস, তেমনি স্বাদও। কুরুগ্ বনদেবী যেন অঙ্গসজ্জা করেন। অলঙ্কার দেহে ঝুলিয়ে চিরসবুজ সিংহাসনে বসেন। অদূরে চন্দন বনেও যেন অগুরুর সৌরভ ছড়ায়।

ভাবি, এলাম এ কোন্ দেশে? এ কি স্বপ্ন রাজ্য!

মোটরের পথ নেমেই চলে। পাহাড়ের জালে ঘেরা বিস্তীর্ণ এক উপত্যকায় পৌঁছুই। পথের উপর লোকজন দেখে বোঝা যায়, বড় গ্রাম নিকটেই। গ্রামে প্রবেশ করার আগেই ডানদিকে গাছের আড়ালে বাংলো চোখে পড়ে। যেন লাজুক গ্রাম্য মেয়ে সবুজ ঘোমটার ফাঁকে উঁকি মারে। কান্তিসেন বলে, মারকারা থেকে একুশ মাইল আসা গেল, নিশ্চয় ঐটে ভাগমণ্ডলের ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো। থল-কাবেরী আরও চার মাইল এখান থেকে। মারকারাতে বলেছিল, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা এইখানেই যেন করা হয়। এর পরে আর গ্রাম নেই। বাংলোর চৌকিদারকে খাবার তৈরী করতে বলে থল-কাবেরী

দেখে আসা যাক।

অতএব, বাংলো-এলাকায় গাড়ি ঢোকে। পুরনো বাংলো। তা হলেও পরিষ্কার করে রাখা। পাশেই চৌকিদারের ঘর। কিন্তু চৌকিদার নেই। ডাকাডাকিতে তার স্ত্রী বেরিয়ে আসে। সে আবার হিন্দি, গুজরাটী, মারাঠী বোঝে না। ইশারা করে খাবারের কথা বোঝানো হয়ত চলে, কিন্তু তাকে বলা দরকার, মাছ-মাংস-ডিম আমাদের চলে না, লঙ্কার ঝালও যেন না দেয়। যে-রকম সুপুষ্ট মুরগী চারপাশে ঘোরে, না বলে দিলে তাদেরই হয়ত কারও জীবনলীলা অকারণ সাঙ্গ হবে।

মুরগী দেখিয়ে বলা হয়, মেরো না যেন, খাই না। সে তখনি আঙুল তুলে আর একটার দিকে দেখায়,—তবে ঐটে?

ভাষা-বিভ্রাট যখন কৌতুকময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, এমনি সময়ে বছর পনেরো বয়সের সুশ্রী, সুবেশা এক বালিকা আসে। সমস্যারও সহজ সমাধান হয়। চৌকিদারেরই মেয়ে। স্কুলে পড়ে। হিন্দী জানে। ইংরেজিও কিছু বোঝে। মুখভরা হাসি নিয়ে কান্তিসেনের সঙ্গে কথা বলে। এক নিমেষে সব বুঝে নেয়। তার মাকেও বুঝিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে বলে, তোমরা ঘুরে এস। কোন ভাবনা নেই। খাবার তৈরি থাকবে। ঠিক কটায় চাই? বারোটায়? বেশ, তাই হবে।

কথা বলার ধরন দেখে বিশ্বাস জাগে, নিশ্চয় ঠিক থাকবে।

চন্দা কান্তিসেনকে গুজরাটীতে কি যেন বলে। দুজনে হাসে। কান্তি বলে, দাদাকে বলছি দাঁড়াও। চন্দা কি বলে জানেন? এখানে এসেই অগস্ত্যমুনি বুঝি কাবেরীকে দেখে মোহিত হন; চন্দা তাই সাবধান করছে আমাকে।

জিজ্ঞাসা করি, কাহিনীটা কি শুনি?

কান্তিসেন বলে, শুনে এলাম মারকারাতে। চলুন, থল-কাবেরীতে গিয়ে শুনবেন। কিন্তু তার আগে একটা কথা। থল-কাবেরী দেখে ফিরে এসে দুপুরে এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো হয়ে গেল। রাত্রিবাসও কি এখানেই হবে। জায়গাটি কিন্তু বেশ ভালই। অতি শান্ত তপোবনের মত। বাংলো থেকে দৃশ্যও সুন্দর। আশপাশে পাহাড়, ভ্যালি। খাতা পেনসিল নিয়ে ঐ ওখানে বসে স্কেচ্ করার মত। এক রাত্রি থাকলে হয়।

চন্দা মুখ টিপে হাসে।

আমি বলি, এখন চল তো থল-কাবেরী। এখানটায় ২,৮০০ ফুট উঁচুতে। থল-কাবেরী পাহাড়ের মাথায়, আরো অনেকখানি উঁচু হবে।

তখনই আবার মোটরে যাত্রা করা হয়।

অল্প এগিয়েই ভাগমণ্ডলের লোকালয়। পথের দুপাশে নতুন পাকা ঘর-বাড়ি। খাদি প্রতিষ্ঠানের একটা বড় কেন্দ্রও। চন্দা বলে, কুর্গ-এর মধুও বিখ্যাত। নিশ্চয় এখানেও তৈরি হয়। দেখা যাক না নেমে?

গাড়ি দাঁড়ায়। সঙ্গীরা মধুর সন্ধানে খাদিকেন্দ্রে যান। আমি পথের

আশপাশে ঘুরি।

গভর্নমেন্টের একটা কিসের ট্রেনিং-সেন্টারও পথের আর এক পাশে। লম্বা, দোতলা বড় বাড়ি। অপর দিকে বিদ্যালয়। গেট-দেওয়া বিরাট কম্পাউন্ড। ছাত্ররা ঘোরাফেরা করে। ডানদিকে বনের মধ্যে একটা পথ চলে যায়। সাইনপোস্টে লেখা—ঐদিকে ফরেস্ট রেস্ট-হাউস। বনের মধ্যে পাহাড়ের কোলে নিশ্চয় মনোরম স্থান হবে। পথের কাছে কয়েকটা দোকানপাটও। বাঁদিকে বাড়িগুলির পিছনে একটা পাহাড়ী নদীরও অংশ দেখা যায়। ছোট হলেও জল আছে। লোকে স্নান করে। স্নান সেরে এক ছাত্র ফেরে। কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, কোথা থেকে আসছি? থলকারেরী দর্শনে চলেছি বুঝি?

নদীর ঘাটের নাম শুনি, লক্ষ্মণতীর্থ।

ভাবি, এখানে আবার রাম-লক্ষ্মণ এলেন কোথা থেকে?

সে বলে, ভাগমণ্ডলও প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। ত্রিবেণী সঙ্গম। যাত্রীরা আসে তীর্থস্থানে।

ত্রিবেণী? তাহলে তিনটে নদী মেশে এখানে?

শুনি, ঠিক তাই-ই। কাবেরী, কনক ও সুজ্যোতি। যেমন প্রয়াগে—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী।

এ প্রয়াগের নামই লক্ষ্মণতীর্থ।

লছমনজির নামে হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি।

ছাত্রটি বলে, জানেন না বুঝি এখানকার প্রবাদ: রামের বনবাসের সময় এই কুর্গ-এ এসেও তাঁরা কিছুকাল ছিলেন যে। সেই সময়ে একদিন বনের মধ্যে একা ঘুরতে ঘুরতে লছমনজি চলে যান কিছু দূরে। আপন মনে চলেছেন, জানতেই পারেননি কখন কুর্গ ছাড়িয়ে কেরালা দেশে চলে গেছেন। জানেন নিশ্চয়, কুর্গ-এর একদিকের সীমানা হল কেরালা? আর এও জানা কথা, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে সদ্ভাব থাকে না। তাই কুর্গ-এর বা কেরালার লোকেরাও পরস্পরকে ভাল চোখে দেখে না। প্রবাদও সেইমত গড়ে ওঠে। কেরালায় ঢুকতেই লক্ষ্মণের মত অমন আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত পুরুষেরও মনের বিকার ঘটে। শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে হঠাৎ মনোভাব জাগে, বিমাতার কুপরামর্শ শুনে বাবা অন্যায় আজ্ঞা দিলেন, অমনি দাদা নির্বোধের মতন রাজ্য ছেড়ে চলে এলেন বনবাসে, আর আমিও বোকার মত ঘুরছি তাঁরই পিছু পিছু।—কথাটা মনে উঠতেই লক্ষ্মণ ভীত ও লজ্জিত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন, কুর্গ-এও আবার এসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবও আবার তখনি সুস্থ, স্বাভাবিক হয়। কিন্তু হলে কি হবে? মনেই এই ক্ষণিক বিকৃতির জন্যে লক্ষ্মণ নিজেকে ধিক্কার দেন, অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে। নাই বা জানতে পারল কেউ, মনে তো এই নীচ ভাব জেগেছিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেন। আগুন জ্বালান। আত্মাহুতি দিতে উদ্যত হন। শ্রীরামচন্দ্র দূর থেকে দেখতে পান। করে কী আমার লক্ষ্মণ ভাই! তখন

অদূরে ব্রহ্মগিরিতে বাণ নিক্ষেপ করেন। পাহাড় থেকে জলের ধারা চকিতে নেমে আসে। তারই নাম কনক নদী। আগুন নিবিয়ে দেয় তখনি। রামচন্দ্র এগিয়ে এসে লক্ষ্মণকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। হেসে সান্ত্বনা দেন, তোমার নিজের অপরাধ তো এতে কিছুই নেই, ভাই! না জেনে কেরালা ভূমি স্পর্শ করেছিলে, মনের এমন বিকার তো ঘটবেই!—সেই থেকে ভাগমণ্ডল পবিত্র ভূমি হয়ে গেল, সঙ্গমের নাম হল লক্ষ্মণতীর্থ।

ভাবি মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাসের নাম নিয়ে সঙ্কীর্ণচেতা মানুষের গুপ্ত মনোভাব কেমন কল্পনার রঙিন সুতোয় গল্পের জাল বোনে!

জিজ্ঞাসা করি, অপর নদীর কাহিনীও শুনি।

সে বলে, সে-নদীর নাম সুজ্যোতি।

কৌতূহলী প্রশ্ন করি, সে নদী কই? কোন্‌খানে মিশেছে?

সে হেসে ফেলে। বলে, ব্যস্ত হবেন না। তাকে দেখতেও পাবেন না। সুজ্যোতির অস্তিত্ব হল ঠিক যেমন প্রয়াগে শুনেছি সরস্বতী। গুপ্তধারা। চোখে দেখা যায় না—কিন্তু আপনার সঙ্গীরা কই, দেখছি না?

বলি, তারাও এখন তোমার ঐ সুজ্যোতির মতন লুপ্তধারা। ঢুকেছেন ঐ দোকানে। মধুর সন্ধানে। আসবেন এখুনি। গল্পটা শোনাও ততক্ষণ!

সে বলে, এসব এখানকার লোকের মুখে শোনা। মেলার সময় তীর্থ-মাহাত্ম্য বই পাওয়া যায়, তাতেও আছে। দেখব, আপনাকে এক কপি যোগাড় করে যদি দিতে পারি। কাহিনীটা বলছি, শুনুন। সুযজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ ঐ ব্রহ্মগিরিতে এসে বিষ্ণুর তপস্যা করেন। দেবতা তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল না। বিষ্ণু তাঁর এক কন্যা সুজ্যোতিকে তাঁকে দিলেন আপন সন্তানের মতন লালনপালন করতে। বললেন, কাবেরীর উৎপত্তিস্থলের নিকটেই ঐ অগ্নিপর্বত। ঐখানে কনক আছে, ইন্দ্রদেবের সে পরিচারিকা। তারই কাছে একে থাকতে দিও।

হঠাৎ থেমে ছাত্রটি বলে, একটা মজার মিল দেখেছেন? আগের কাহিনীতেও রামচন্দ্রের বাণ নিক্ষেপ ঐ ব্রহ্মগিরিতে—কনকের নদীরূপে বেরিয়ে আসা,—আবার এখানেও সেই ব্রহ্মগিরিরই কাছে অগ্নিপর্বত—কনকের সেখানে বাস।

বলি, সন্ধান নিয়ো অগ্নিপর্বত যখন নাম, পাহাড়ের ও-অঞ্চলে হয়ত তপ্তধারা আছে, যেখান থেকে ঐ কনক নদী বেরিয়েছে!

সে আশ্চর্য হয়, তা তো কখনও শুনিনি। খোঁজ নিলে হয়! তারপর শুনুন গল্পটা। কনক আর সুজ্যোতি একসঙ্গে তপস্যা শুরু করে দেয়। ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের বর দিতে এলেন। এলেন বর দিতে, কিন্তু সুজ্যোতির রূপ দেখে প্রেমে এমন মুগ্ধ হলেন যে নিজেই বর সেজে তাঁকে বিবাহ করেন। দেবতার রাজা,—তাঁর কাণ্ডই আলাদা! কিন্তু ওদিকে সুজ্যোতি বিষ্ণুর কন্যা, তার উপর নিজে সাধিকা। বিবাহিত জীবনে

কোন সুখবোধই নেই। প্রিয় সাথী কনককে বলেন, এ কী ঘটে গেল বোন? জন-কল্যাণ করাই আমার জীবনের ব্রত, শেষে এইভাবে বিয়ের বাঁধনে ধরা পড়লাম? চল, আমিও নদীর রূপ নিই, জলধারা হয়ে বইতে শুরু করি, পাহাড়ী দেশ উর্বর হবে, জগতের মঙ্গল আনবে।—দুই সখীতে গোপনে পরামর্শ চলে। ইন্দ্রদেব দেবতা। মনের কথা জানতে পারেন। রাগে জ্বলে ওঠেন। অভিশাপ দেন, স্ত্রী হয়ে স্বামীর অনুমতি না নিয়েই চলে যেতে চাও? মনের বাসনা তোমার ভাঙবে। জল তোমার শুকিয়ে যাবে,—নদী হতে চাও তুমি?

সুজ্যোতি গভীর অনুশোচনায় ও দুঃখে ভেঙে পড়েন। সত্যিই তো স্বামীকে না জানানো,—এ কী ভীষণ ভুল!—দু-নয়ন ছাপিয়ে কপোল বেয়ে অশ্রুধারা নামে। অপূর্ব সুন্দরী সুজ্যোতি,—শোকচ্ছায়ায় আরও সুন্দর দেখায়। ইন্দ্রদেবেরও মন টলে। রাগ ভাঙে। অনুকম্পা জাগে। বলেন, দুঃখ কোরো না, প্রিয়ে! চোখের জল মোছ। যাবেই যখন, যাও। তোমারই মনস্কামনা পূর্ণ হোক! কিন্তু, বলে ফেলেছিই যখন, আমার বাক্যও তো মিথ্যা হবার নয়। তাই এখান থেকে ভাগমণ্ডল পর্যন্ত জলহীন হয়েই থাকবে তুমি, তারপর সেখানে অলক্ষে কনক ও কাবেরীর সঙ্গ পেয়ে সাগরে মিলিত হতে যাবে।

হয়ও তাই। এই ত্রিবেণীতে সুজ্যোতিও সরস্বতীর মত গুপ্তধারাই থেকে যান। কিন্তু,—আপনার সঙ্গীরা ঐ এসে গেলেন—কাবেরীর কাহিনীটা শোনানো হল না, থল-কাবেরীতেই গিয়ে শুনবেন।

মোটরে উঠে আবার তখনি চলা। গ্রামের একটি লোকও সঙ্গে চলে। পথে নেমে যাবে। হেঁটেই চলেছিল। মোটর দেখে চড়বার শখ।

চন্দা শিশির মোড়ক খুলে আমাকে দেখায়, কী চমৎকার মধু দেখছেন? যেন গলানো সোনা! আপনার জন্যেও এক বোতল নিয়েছি।

বলি, আলাদা আবার আমার জন্যে কেনা কেন? যত বোঝা কমাতে চাই, তোমরা ততই ভার বাড়াও দেখি।

ভাগমণ্ডলের লোকালয় ছাড়িয়ে এসেই নদী। একটা পথ বাঁদিকে বেঁকে যায়, নদীর ধার দিয়ে। আমরা ধরি সোজা রাস্তা। নদীর উপর পুল। দুপাশে পাহাড়। মাঝে উপত্যকা। পুল পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই শুরু। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে মোটর ওঠে। নীচে কাছে-দেখা ঘরবাড়ী-নদী উপর থেকে ছোট দেখায়, নীচ থেকে-দেখা পাহাড়ের উপর গাছপালা কাছে এসে বড় হয়ে ওঠে। দুপাশে জঙ্গল। পথ ঘুরে যায়, নীচের দৃশ্যও হারায়। পাহাড়ের গায়ে পাক দিয়ে পথ উঠেই চলে—যেন প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে লতা ওঠে! হঠাৎ পথের বাঁকে গাছ-পালার ফাঁকে নীচের উপত্যকা আবার চোখে পড়ে। বহু নীচের বনভূমি এখন দেখায় ঘন সবুজ আবরণ, তারই বুকে নদীর বিশীর্ণ বালুরেখা,

আরও দূরে ঘরবাড়ির বিন্দু-চিহ্ন। পথের এই বাঁক-থেকে সুন্দর দৃশ্য। স্থানটির নামকরণও তাই, 'ভিউ পয়েণ্ট'। কাছেই বহু বোলডারস্—রাশীকৃত প্রকাণ্ড শিলা। সঙ্গের লোকটি এইখানেই নামে। পাথরগুলো দেখিয়ে বলে, ঐ হল 'ভীম-কল্লু'।

ভাবি, শুনে এলাম রাম-লক্ষ্মণের কথা। আবার ভীমসেন এলেন?

লোকটি জানায়, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় একদিন ভীমসেন খেতে বসেছেন, দেখেন খাদ্যের সঙ্গে এই পাথরগুলো মিশে আছে, বেছে সেগুলো এখানে ফেলে দেন। তাই লোকে নামও দিয়েছে ভীম-কল্লু, বহুকাল থেকেই।

শুনে হাসি পায়। কী উদ্দাম কল্পনা! সর্বত্রই রাম-লক্ষ্মণ, ভীম-অর্জুন। কিন্তু সেকালেও তাহলে ভাত-ডালে কাঁকর মেশানোর রেওয়াজ ছিল? এখন নতুন নয়? মোটর আবার উঠতে থাকে। চারমাইল মাত্র পথ ভাগমণ্ডল থেকে। কতক্ষণই বা লাগে? পাহাড়ের কাঁধের উপর উঠে পড়ি। ঘাস। নেড়া পাহাড়। এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ। পাহাড়ের উপর পথ এবার সোজা চলে। এ পাহাড়ের শিখরদেশ এটা নয়। অল্প এগিয়ে ডানদিকে চূড়া দেখা যায়। আরও দু-তিন শ' ফুট উঁচু হবে। মোটর-পথের চড়াই শেষে ডান হাতেই একটি সুন্দর নতুন বাড়ি। বিরাট এলাকা। গেট্। এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয় নি। লোকজন খাটে। গেরুয়া-ধারী এক স্বামীজীও ঘোরেন ফেরেন দেখা যায়। পরে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। তিরুভন্নমলাই থেকে এসেছেন। কোন্ মঠের মোহন্তজী। এখানেও একটা মঠ স্থাপনা করছেন। শান্ত জায়গা। একান্তে আসন নিয়ে দিন কাটাবেন। দেখি সদালাপী, মিষ্টভাষী পুরুষ। গরম কফি খাওয়ান। নিজেও পান করেন। গল্প করে আনন্দ পাই। কিন্তু ভাবি, সংসারত্যাগী, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, এখানেও আবার এত বড় বাড়ি করে সংসার সাজানো কেন?

সেই নতুন মঠেরই সামনাসামনি পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা সোজা এগিয়ে চলে। সম্মুখে খানিক দূরেই পথের শেষও দেখা যায়। সেইখানে মোটরও থামে। আরও একটা মোটরও দাঁড়িয়ে। সামনেই পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো লম্বা ধাপ বেয়ে যেন সরোবরের তটে ওঠা। তাই বটে। উঠেই দেখি থল-কাবেরীর কুণ্ড। হঠাৎ যেন নীল চোখ মেলে চায়। প্রকৃতির কোলে সদা-ফোটা ফুলের মত কোমল কচি শিশু। আলো ঝলমল সরল চোখের চাহনি।

পুলকিত হয়ে ভাবি, এই-ই উৎস কাবেরীর!

৪১৮৭ ফুট উঁচু থল-কাবেরী। তারই কোলে চারকোণা কুণ্ড। এক দিক ত্রিশ ফুট আন্দাজ লম্বা। চারিপাশে সিমেণ্ট-বাঁধানো ঘাট। ধাপ নেমে যায় জলের ধারে। পাড়ের তিন দিক রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। অপর পারে মন্দির আদি। সেদিকে কয়েকটা বড় বড় গাছও। সেইখান থেকেই শুধু

পাখির ডাক শোনা যায়। অস্ফুট, মধুর। মা যেন শিশু-কোলে ঘুমপাড়ানি গান ধরেন। অতি শান্ত মনোরম পরিবেশ। নিস্তরঙ্গ শান্ত জল-ভরা কুণ্ড। জলের নীচে বালি চিকমিক করে। চিকন দেহে আলো যেন ঠিকরে পড়ে।

ধীরপদে বাঁধানো ঘাটের উপর দিয়ে এগিয়ে চলি। কুণ্ডের বাঁ দিকের ঘাটের পাশে লম্বা পাকা ঘর। নতুন তৈরি। পরিষ্কার ঝকঝক করে। যাত্রীদের বিশ্রাম করার, মালপত্র রাখার প্রশস্ত ব্যবস্থা। স্নান সেরে কাপড়-চোপড় ছাড়বারও নিভৃতি। চার-পাঁচজন পুরুষ ও মহিলা যাত্রী। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মেয়েরা ভিজা কাপড় রোদে রেলিঙের উপর ছড়িয়ে শুকোতে দেন। দলপতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাত-মুখে শ্বেতীর মত চিহ্ন। পাকা চুল, আরও যেন সাদা দেখায়। স্নানান্তে শুচিবস্ত্র পরনে। খালি গা। এগিয়ে এসে আলাপ করেন। বাংলা দেশ থেকে আসছি শুনে যেমন আশ্চর্য হন, তেমনি আনন্দও পান। বলেন, ওসব দূর দেশ থেকে এ অঞ্চলে যাত্রী আসতে কদাচিৎ দেখি। আমি কুর্গ-এরই বাসিন্দা। মারকারায় থাকি। সময় পেলেই সপরিবারে চলে আসি এখানে। পুণ্য-ক্ষেত্র তো বটেই, শান্তিপূর্ণ স্থানও, কুণ্ডের জলে স্নান করে আমার রুগ্ন দেহে উপকারও পাই। মোটরে মারকারা থেকে আসতে কতটুকুই বা সময় লাগে! স্নান করবেন আপনারাও নিশ্চয়?

বলি, করব বইকি! কিন্তু তার আগে আপনার কাছে শুনি, এখানকার দর্শনীয় কি কি এবং মাহাত্ম্য-কাহিনীই বা কি?

বলেন, এই যে বাঁধানো বড় কুণ্ড, এইখানেই তীর্থস্নান হয়। কিন্তু কাবেরীর উৎস হল, ঐ যে কোণে কুণ্ডের পাড়ে ধাপের পাশে ছোট্ট মন্দিরটা দেখছেন—এগিয়ে চলুন ওদিকে—

দুজনে কয়েক পা মাত্র এগুতে সেখানে পৌঁছুই। পাথরের অতি ছোট মন্দির। হাত-দুই মাত্র উঁচু। মাথার উপর পাথরের টালু ছাদ, চালাঘরের মত আকার। ছোট্ট দরজা। সামান্য কারুকার্য। হেঁট হয়ে দেখলে ভিতরে দেখা যায়,—ফুল, আভরণ ও বস্ত্রে ঢাকা মূর্তি,—শুনি, কাবেরীর। তারই সামনে মন্দিরের বাইরে কুণ্ডের দিকে ছোট্ট আর একটা কুণ্ড। চার-কোণা বাঁধানো,—ফুট-দেড়েক মাত্র লম্বা-চওড়া। ভিতরে জল। পূজার ফুল ও পাতায় ছাওয়া।

ভদ্রলোক বলেন, এই হল কাবেরীর আসল উৎস: পাশেই এক হাত দূরে —এই বড় কুণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয় এর যোগাযোগ আছে! কেন না, দুই কুণ্ডের জল ঠিক সমানভাবে এক লেভেলে থাকে। আশ্চর্য,—প্রবল বর্ষাতেও জল কোন কুণ্ডেই বাড়ে না। অন্য সময়ে কমেও না। বড় কুণ্ডের একদিকে—যেখানে ঐ যাত্রীঘরটা—তারই কাছে নজর করেছেন কিনা জানি না—মাটির নীচে দিয়ে জল নিকাশের একটা পথ আছে, কিন্তু দেখবেন, শুকনা খটখটে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার ধারা নেমে যাওয়ার খদ,

দেখলেই বোঝা যায়। অথচ জল নেই। অদৃশ্য হয়ে নদী নেমে গেছে। এ যেন মানুষ হেঁটে চলে গেল,—সে নেই, পায়ের চিহ্নটুকু আছে। কাবেরীর কাহিনীও ঐ কিনা।

উৎসুক হয়ে বলি কাহিনীটা শোনান।

কান্তিসেনরা ফটো তোলায় ওদিকে ব্যস্ত ছিল। তাদেরও ডাকি।—

তিনি বলেন, জানেন নিশ্চয়, পুরাণের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এক এক রূপ নেয়, কোথাও বা সামঞ্জস্যহীনও হয়। কাবেরীর কাহিনীও তেমনি। স্কন্দপুরাণে কাবেরী-মাহাত্ম্য পাওয়া যায়। মোটমাট কাহিনীটা বলি। কাবেরী নামের উৎপত্তি জানেন তো?

ভদ্রলোকের দলের আর সবাই এসে পড়েন। তাঁদের বলে দেন, ওপরের শিবমন্দিরে পূজা সেরে এস, আমি এখানে আছি।

গল্প শুরু করেন, কবের নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি এই পাহাড়ে ব্রহ্মার উপাসনা করেন। ব্রহ্মার উপাসনা এখানে কেন, তাও বলি। কুরুগ দেশের একটা নাম, ব্রহ্মক্ষেত্র। প্রবাদ, এই পাহাড়ে পিপল বৃক্ষকে বিষ্ণুরূপে দেখে ব্রহ্মা তপস্যায় বসেন। এই যে কুণ্ডের পাশেই ওপরে পাহাড়ের মাথা দেখতে পাচ্ছেন,—ঐ শিখরের নাম ব্রহ্মগিরি। ঐ নামে অন্য পাহাড়ও আছে সহ্যাদ্রিতে।

মাথা উঁচু করে পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাই। এখান থেকে তেমন কিছু উঁচু নয়, আগেই আসার পথে নজর করেছিলাম —এখানকার চেয়ে দু-তিন শ' ফুট মাত্র উঁচু হবে। উপরে একটা পোস্ট বা থাম দেখা যায়।

ভদ্রলোক হেসে বলেন, ওটা একটা ইলেকট্রিক লাইট-পোস্ট। রোজ সন্ধ্যায় এখানে আলো জ্বলে। বহুদূর থেকে দেখা যায়। ওপরে উঠবেন, গিয়ে দেখবেন।

বলি, যাব তো নিশ্চয়। এখন গল্পটা বলুন।

ঐ ব্রহ্মগিরিতে কবের মুনি তপস্যার ফলে ব্রহ্মার দর্শন পান। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। অত বড় ঋষি অমন তপস্যা করে শেষে প্রার্থনা করলেন কি, জানেন? বললেন সন্তানহীন আমি। একটি সন্তান দিন আমাকে! ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু। তাই হবে। কিন্তু তোমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে আপন ঔরসে সন্তান লাভ তোমার সম্ভব নয়। তাই আমার পালিত-কন্যা লোপামুদ্রা, তাকেই তোমার কন্যারূপে দিলাম।

লোপমুদ্রা পার্বতীর অবতার। তাঁরও জীবনের নানান্ কাহিনী আছে। সেকথা থাক। তিনি এখন হলেন কবের ঋষির কন্যা। নামও তাই হয়ে গেল কাবেরী। কাবেরী রূপে গুণে ঋষিপিতার আশ্রম আলো করে এই ব্রহ্মগিরিতে লালিত হতে থাকতেন। ওদিকে উত্তর-ভারত থেকে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে অগস্ত্যমুনি এসে হাজির হলেন এই অঞ্চলে,—ব্রহ্মগিরিতে শিবের আরাধনা করতে। কবের ও তাঁর স্ত্রীর তখন মৃত্যু হয়েছে। কাবেরী একাই থাকেন। তারপর ঘটে এক বিচিত্র ঘটনা। অমন মহামুনি অগস্ত্য, এলেন তপস্যা করতে,

—তিনিও কাবেরীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন, বিবাহের প্রস্তাব করেন। কাবেরী সম্মতি জানিয়ে বলেন, ঠিক আছে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেও একা ছেড়ে চলে গেলে আমিও যাব চলে। প্রেম-পাগল ঋষি তাতেও রাজী। ঐ ব্রহ্মগিরি চূড়ার ওপর বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিমণ্ডল সে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়ের মাথায় এখনও তাঁদের চিহ্ন আছে।

কান্তিসেন হেসে বলে, এখানে অগস্ত্যের বিয়ের হোমের অগ্নি জ্বলেছিল, এখন ইলেকট্রিক আলো!

ভদ্রলোকও হাসেন। বলেন, যখনকার যা। তারপর শুনুন, বিয়ের পর অগস্ত্য সব সময় স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এই ব্রহ্মগিরির আর এক অঞ্চলে—মাইলখানেক মাত্র দূরে—আর এক নদীর উৎপত্তি। নাম তার কনক।

শুনে বলি, তার কাহিনী জানি। ভাগমণ্ডলে এই কাবেরীর সঙ্গে কনকের সঙ্গম।

তিনি বলেন, ঠিকই। সেই নদীতে অগস্ত্যমুনির স্নানের ইচ্ছা হয় একদিন। ভাবেন, এই তো এইখানে। যাব আর আসব। কাবেরীকে এক কমণ্ডলুতে ভরে শিষ্যের জিম্মায় রেখে চলে যান। তারপর, কেউ বলে, শিষ্যটি হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ফলে, কমণ্ডলুও উল্টে যায়। আবার, কারও মতে সে-বছর এদেশে ভীষণ জলাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় নারদ ঋষি কাকের রূপ ধরে এসে এই সুযোগে কমণ্ডলু উল্টে দেন। মোট কথা, কাবেরী কমণ্ডলু থেকে বেরিয়ে পড়েন, স্বামী তাঁকে ছেড়ে রেখে কোথায় গেছেন দেখে, তখনি নদী হয়ে বইতে শুরু করেন। শিষ্যরা গতিপথ রুদ্ধ করতে যান। কাবেরীও ভূতলে অদৃশ্য হন। মাইল তিনেক নীচে সেই ভাগমণ্ডলে পৌঁছে আবার প্রকট হলেন। কনকের সঙ্গে সেইখানে যোগ্যও। এদিকে অগস্ত্য স্নান সেরে ফিরে এসে খবর শুনে স্তম্ভিত। ভাবেন, দোষ তো আমারই। ছেড়ে গেলাম কেন?—পাগলের মত ছুটে চলেন স্ত্রীর সন্ধানে।

কথাটা শুনে হেসে ফেলি। তখনি মনে পড়ে, G. K. Chesterton-এর On runnig after one s hat প্রবন্ধটিতে রসাত্মক সেই মন্তব্য: 'The most comic things of all are exactly the things that are most worthdoing - such as making love. A man runing after a hat is not half so ridiculous as a man running after a wife!'

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকান, আমার মনের ভাব বোঝেন না, গম্ভীর হয়ে বলে চলেন: পাহাড়ের নীচে পৌঁছে অগস্ত্য স্ত্রীর দেখা পান। কাবেরী বলেন, বিয়ের শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। আমার আজন্ম স্বপ্ন জগতের কল্যাণ করব। জলদায়িনী রূপে এখন চললাম, এই পার্বত্য উষার অনুর্বর দেশ সুজলা সুফলা করতে, জগজ্জনের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাতে। কর্তব্যশেষে সাগরে আত্মবিসর্জন দেব।—অগস্ত্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। স্বামীর দুঃখ দেখে কাবেরীর অন্তরে মমতা জাগে, বলেন, বেশ। আমি দ্বিধা হলাম, এক অংশ লোপামুদ্রা-রূপে আপনার সহধর্মিণী রইলেন, অপর অংশ কাবেরী নামে বইতে থাকব।

অগস্ত্যও সন্তুষ্ট। কোন্ পথ দিয়ে সমুদ্রে যেতে হবে বলেও দেন।

হেসে বলি, অগস্ত্য তো বহু ঘুরেছেন, ভূগোল তাঁর নখদর্পণে।

মনে মনে ভাবি, মহাভারতের বনপর্বে অগস্ত্য-লোপামুদ্রার বিবাহ-কাহিনী সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তা হোক। কিন্তু সেই মহামুনি অগস্ত্য,—বৃদ্ধ বিন্ধ্যপর্বতের দর্প চূর্ণ করে মাথা নত করান, আর তুলতে দেন না; এক গণ্ডূষে সমুদ্রের জলরাশি পান করে নিঃশেষ করেন,—আশ্রম-পালিতা এক সুন্দরীকে দেখে তাঁরও কম দুর্ভোগ নয়! মুনি-ঋষিরও এই দর্গতি!

ভদ্রলোক বলেন, কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। কাবেরী তো বয়ে চললেন—এই কুর্গ্-এর পার্বত্যদেশ ভেদ করে। এই সঙ্গে আরও একটা কাহিনী শোনাই। আগের গল্পের সঙ্গে কোথাও কোথাও সামান্য মিল থাকলেও প্রভেদও অনেক। তবে, এ গল্পের মধ্যে আবার দেখবেন, এই কুর্গ্ দেশ, এখানকার নদী, জনসাধারণ,—এই তিনের মধ্যে একটা যোগসূত্রের ইঙ্গিত আছে। তবে, এ কাহিনী যে প্রাচীন নয়,—শুনেই বুঝতে পারবেন।

বলি, চলুন, ঐ ধাপটার ওপর সবাই বসি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? গল্পটা জমছে বেশ।

তিনি বলেন, বসব না, ঐখানে দাঁড়িয়েই বলি। মেয়েরা ওপরের মন্দির থেকে ফিরলেই সকলে কাবেরী মায়ের পুজোয় বসব। শুনুন বলি। মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন সিদ্ধার্থ। তাঁর চার ছেলে। সর্বকনিষ্ঠ,—চন্দ্রবর্মা। সকল গুণের সে অধিকারী। বড় হয়ে চন্দ্রবর্মা পিতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে চলেন। এই ব্রহ্মগিরিতে পৌঁছে এইখানে পার্বতীর ধ্যানে বসেন। দেবীর দর্শনও পান। বর প্রার্থনা করেন, রাজত্ব, ক্ষত্রিয়-বংশের পত্নী ও সন্ততি এবং জীবনান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি।

কান্তিসেন বলে, এখানে দেখছি তপস্যা করে সবাই সন্তান কামনা করেন,—মুনিঋষিরাও, আবার রাজপুত্রও।

তিনি বলেন, আগের গল্পের সঙ্গে আরও একটু মিল আছে। পার্বতী বরগুলি দিলেন বটে, কিন্তু জানালেন, আগের জন্মের পাপের ফলে চন্দ্রবর্মার ক্ষত্রিয়-পত্নী সন্তানহীনা হবেন, তবে শূদ্র স্ত্রী সন্ততির জন্ম দেবেন। দেবী স্বয়ং এক শূদ্রকন্যাও এনে দেন। বলেন, একে বিবাহ কর। এর এগারোটি পুত্র জন্মাবে, তাদের 'উগ্র' বলে পরিচয় হবে। সবাই তারা হবে সৎ ও সাহসী। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী তারা পেলেও বেদাচার মানবে না।

একটু থেমে বলেন, জানেন হয়ত, কুর্গ্-এর অধিবাসীরা হিন্দু হলেও বেদাচার মানে না। রামায়ণ মহাভারত আমাদেরও মহাকাব্য। হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও আছে, পুজোপার্বণও হয়। কিন্তু এখানকার দেশীয় প্রথায়। এমন কি, বিবাহাদি ও শুভকর্মেও বেদাচার অনুযায়ী মন্ত্রাদি পাঠ হয় না,—স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান মানা হয়। এই কাহিনীর ভিত্তিও তাই।

তারপর, গল্পের বাকিটুকুও বলি। পার্বতী আরও জানিয়ে যান, তিনি স্বয়ং এই দেশে কাবেরী নদীর রূপ নিয়ে অবতীর্ণা হবেন এবং রাজ্যের

জনকল্যাণ আনবেন। চন্দ্রবর্মাকে আরও আদেশ করেন, এ দেশ এখন ম্লেচ্ছদের দখলে। তোমাকে দান করলাম এই জয়যুক্ত তরবারি, তেজীয়ান ঐ শ্বেত অশ্ব, আর ঐ দিলাম সৈন্যবাহিনী,—ম্লেচ্ছদের পরাজিত করে এদেশের রাজা হও, দেশের উন্নতিসাধন কর।

কান্তিসেন বলে, কুরুগ তো টিপু সুলতানের রাজ্যভুক্ত হল এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আর সে-রাজত্বের অবসান ঘটে বৃটিশদের হাতে সেই মহীশূর যুদ্ধে। ইংরেজরা বীর রাজাকে ওখানকার সিংহাসনে বসিয়ে দেন, যুদ্ধে ইংরেজদের তিনি সাহায্য করেন বলে। পরে বীর রাজা অপুত্রক মারা গেলে সিংহাসন দখল নিয়ে তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়। অবশেষে তাঁর ভাই লিঙ্গরাজ রাজা বলে ঘোষিত হন—সেও তো এই ১৮১১ সালে। কিন্তু তাঁর ছেলে যখন আবাব রাজ্যভার পায়, ইংরেজরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেদের সাম্রাজ্য ওখানেও বিস্তার করে—১৮৩৪ সালে। চন্দ্রবর্মা ম্লেচ্ছ উচ্ছেদ করলেন কবে?

ভদ্রলোক হেসে বলেন, আপনি তো সব ঐতিহাসিক তথ্য বলছেন, আমি শোনাচ্ছি প্রচলিত কাহিনী। তবে ম্লেচ্ছ অর্থে মুসলমান না হয়ে অনার্য জাতিও তো হতে পাবে? আর্য বাজপুত্র চন্দ্রবর্মা সেই অহিন্দু অনার্যদের জয় করে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। পিতৃ-রাজ্যের নাম অনুকরণ করে এ-দেশেরও নাম দিলেন—মৎস্যদেশ। যেমন শুনেছি, ইংরেজরাও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে বিলেতের শহরের নামে নতুন শহর গড়ে তোলে। চন্দ্রবর্মার সন্তানভাগ্য পার্বতী যেমন বলেছিলেন তেমনি ঘটল। স্বজাতি-পত্নী নিঃসন্তান রইলেন, আর সেই শূদ্ররাণী জন্ম দেন—এগারোটি পুত্রের। বড় হয়ে তারা বিদর্ভরাজের একশো কন্যার পাণিগ্রহণ করে। প্রতি সন্তানের একশোর বেশি সন্তান জন্মায়।

মনে মনে ভাবি, হবে না। প্রজাপতি ব্রহ্মার পুণ্যভূমি—ব্রহ্মগিরি যে!

ভদ্রলোক বলেন, সেই সব সন্তানই ছিল বলশালী এবং অতি সদাচারী। অথচ বেদাচার মানে না। তাদের আঙুলের নখরগুলি ছিল বরাহের দন্তের মত তীক্ষ্ণধার। তারই সাহায্যে দেশের ভূমি থেকে বনজঙ্গল তুলে তারা এই পাহাড়ী অঞ্চলও উর্বর, শস্যশ্যামল ও সমতল করার মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করল। তাদের বরাহাবতারের মত আচরণ হওয়ায় দেশের নামও হয়ে যায়—ক্রোধদেশ অর্থাৎ **Boar Country**। সেই **Kroda** থেকেই **Kodagu,**—এখন কুরুগ। দেখুন, এই এক গল্পের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, দেশাচার—কত কী মিশে আছে,—কিন্তু ঐ মেয়েরা নেমে আসছেন—গল্পের শেষটুকু বলি। সেই রাজা চন্দ্রবর্মার পুত্র,—দেবকান্ত। **First of libra**—তুলা রাশির দুদিন আগে সেই রাজা দেবকান্তকে দেবী পার্বতী স্বপ্নাদেশ দেন, সবাই যেন বালমুরিতে সমবেত হয়, পার্বতী সেদিন সেখানে কাবেরী নদীরূপে নেমে আসবেন।

প্রশ্ন করি, বালমুরি? সে জায়গাটা আবার কোথায়?

তিনি বললেন, ভাগমণ্ডলে দেখে থাকবেন, এখানে আসবার পথে নদীর ধার দিয়ে বাঁ দিকে আর একটা রাস্তা চলে গেছে—সেই দিকে। এখান থেকে মাইল পঁচিশ-ত্রিশ হবে। মোটরের ভাল রাস্তা, গাড়িতে এসেছেন, সেখানেও ঘুরে আসবেন। কাবেরী সেখানে সমতলভূমি দিয়ে বয়ে চলেছেন। রাজা দেবকান্তর পাওয়া স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী সবাই সেই বালমুরিতে গিয়ে হাজির হয়,—কাবরীও নেমে আসেন। দেশবাসী আবাহনী সঙ্গীত গেয়ে পূজা করে, কাবেরীও বয়ে চলেন। সবাই করজোড়ে প্রার্থনা করে, আমাদের দেশ ছেড়ে কোথায় চলেছেন মা? সন্তান আমরা,—ছাড়ব না। কাবেরী আশ্বাস দেন, ভয় নেই তোমাদের। নিশ্চিন্ত হও। আশীর্বাদ করে যাই, তোমাদের ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি হোক, রাজ্যে সুখ শান্তি থাকুক, আমি চললাম জগতের অন্য দেশেরও কল্যাণ-দানের সঙ্কল্প নিয়ে।

মেয়েরা শোনে না। ভাবে, মায়ের ওপর তাদেরই জোর বেশি। সারি সারি দাঁড়িয়ে মায়ের পথরোধ করে। দেবী কাবেরী জলকল্লোল হাসির উচ্ছ্বাস তোলেন। যেন আদর করে তাদের ভোলান। চকিতে ডানদিকে বেঁকে ঘুরে বয়ে চলে যান। নদীর আচমকা স্রোতের টানে মেয়েদের পরনের শাড়ির আঁচলও সেইমত পিছনে ঘুরে যায়। সেই দিন থেকে কুরুগবাসী মহিলারা সবাই উল্টে পিছন দিকে শাড়ির আঁচল ডান কাঁধ দিয়ে ঘুরিয়ে পরতে থাকে। নজর করবেন, এখনও সেই প্রথাই চলে আসছে। ভারতের আর কোথাও এইভাবে শাড়ি পরার রীতি আছে বলে জানি না। বালিমুরিতে দেখবেন নদীও সেখানে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে গেছে। স্থানীয় ভাষায় বালমুরি কথাটার অর্থও তাই,—ডানদিকে মোড় নেওয়া। সেখানে একটা শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কাবেরী যাবার আগে কথা দিয়ে যান, তোমাদের ভুলব না,—প্রতি বছর ফিরে আসব এই সময়ে থল-কাবেরীতে তোমাদের দেখা দিতে।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে গম্ভীরভাবে বলেন,—এবং আশ্চর্য ঘটনা! প্রতি বছরই কাবেরী আসেন সেইমত এইখানে,—চলুন আরও এগিয়ে ঐ ছোট্ট কুণ্ডিকার পাশে, দেখিয়ে বলছি, সেদিন কি ঘটে। আমার নিজের চোখে দেখা—প্রতি বছরেই। এইখানেই আমরা এখনি পূজোতে বসবও।

বড় কুণ্ডের ধারে সেই ছোট্ট কুণ্ডিকার নিকটে এসে আবার দাঁড়াই। ভদ্রলোক বলেন, কাবেরীর এইটেই প্রধান তীর্থ, আগেই বলেছি। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ নাগাদ—লগ্ন, রাশি দেখে ঠিক দিনটি স্থির হয়—*এই কুণ্ডিকার মধ্যে যে জল দেখছেন তাতেই কাবেরী মাতার পূজা হয়।* এরই নাম "তীর্থোৎভব" বা "কাবেরী সংক্রমণ" উৎস। হাজার হাজার যাত্রী আসে সে সময়ে এখানে—হাজার পনেরোর কম নয়। শুধু কোডাভা জাতিই নয়,—কুরুগ-এর বিভিন্ন অধিবাসী। বহু দূর অঞ্চল থেকেও যাত্রী আসে। বড় *কুণ্ডে স্নান করে সবাই তীর্থবারি নিয়ে ঘরে ফেরে। এক মাস ব্যাপী এই যাত্রা চলে—সেই "কিরুসংক্রান্তি" পর্যন্ত। সে সময়ে সারা দেশে ঘরে ঘরে*

উৎসবের সাড়া পড়ে। যাত্রা এক মাস ধরে চললেও "কাবেরী-সংক্রমণ" উৎসব মাত্র দুদিনের। বৎসরান্তে মা আসছেন আপন ঘরে ফিরে,—সবারই মুখে আনন্দের হাসি, পরনে নতুন বেশভূষা; প্রতি গৃহ পরিচ্ছন্ন করে রাখা; দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গলঘট, ফুলের মালা, আলপনা। যেখানে যার যা জমি, সব চাষ করা। মা এসে যেন না দেখেন, তাঁর হাতেব দান—জমির উর্বরতা—হেলায় পড়ে আছে। দেশবাসীর মন যেমন আনন্দে ভরা, গৃহ-প্রাঙ্গন, মাঠ ঘাট, অরণ্য-প্রান্তর দশদিকও তেমনি আনন্দে ঝলমল করে। ঘরে ঘরে কাবেরীর মূর্তিরও পূজা হয়। তিনদিন পরে নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন।

মনে মনে ভাবি কাবেরী অগস্ত্য-পত্নী। এইখানেই তাঁর স্বামী-গৃহ। শরৎকালে নদীরূপে কাবেরী আসেন এইখানে ফিরে সন্তানদের মায়ার টানে। আবার আকাশে নক্ষত্র-রূপী অগস্ত্য Canopus-এর উদয়ও সেই শরৎ ঋতুরই আগমন সূচনা করে। শুভ্রকান্তি (white-star-l-type) পরিত্যক্ত বিরহী স্বামী কি সুদূর গগন থেকে প্রিয়া অর্ধাঙ্গিনীকে দেখতে থাকেন?

জিজ্ঞাসা করি, কাবেরী যে এ কুণ্ডিকায় ফিরে আসেন, তার চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু পান?

বলেন, সেই কথাই তো শোনাব,—নিজের চোখে কতবার দেখা। ঠিক সেই দিনটিতেই পূজা শেষ হলেই এই কুণ্ডিকার জলে—দেখছেন তো কী রকম স্থির জল—কিন্তু হঠাৎ এতে বুদ্বুদ উঠতে থাকে—জল যেন ফুটে ওঠে। খানিকক্ষণ ঐ রকম ঘটতে থাকে—যাত্রীরাও দর্শন পায়। চারপাশে আনন্দধ্বনি গুঠে—মা এলেন, আবাব মা এসে গেলেন। সে কী প্রচণ্ড উম্মাদনা সেই শুভলগ্নে! অথচ আশ্চর্য! বছরের আর কোনদিন কখনও এমন হতে দেখা যায় না,—সেই একদিনই কিছুক্ষণের জন্যে! কেন যে হয়, কারণও মেলে না।

কান্তিসেন রাসায়নিক। অস্ফুটে বলে, হয়ত কোন কেমিক্যাল অ্যাক্‌সন বা গ্যাস জন্মানোর ফলে ঘটে।

ভদ্রলোক বলতে থাকেন, আরও একটা ব্যাপার, জলের রঙ দেখছেন সবুজ ধরনের,—অথচ কোন কিছুতেই এ রঙ বদলায় না, এমন কি সিঁদুর দিলেও নয়। আপনাদের যেমন উত্তরভারতের ভাগীরথী-গঙ্গার মাহাত্ম্য, আমাদেরও তেমনি এখানে কাবেরীর মহিমা,—এঁকে বলা হয় দক্ষিণ গঙ্গা। লোকেদেব বিশ্বাস, বৎসরের ঐ পুণ্যলগ্নে গঙ্গা ও আর সব পবিত্র নদীর জল কাবেরীর এই উৎসমুখে আসে। তাই এই তীর্থেও পিণ্ডদানের প্রথাও আছে। *গুপ্তপথে নাকি কাবেরীর সঙ্গে বারাণসী-গঙ্গার যোগাযোগ আছে।*

শেষের কথাগুলি শুনে কান্তিসেন উৎসুক হয়ে বলে, তাই নাকি? এ প্রবাদও আছে? আশ্চর্য!

জিজ্ঞাসা করি, এ-ধরনের জনপ্রবাদ নতুন নয়। অনেক তীর্থক্ষেত্রেই আছে। অবাক হলে কেন?

কান্তি বলে, জানেন না বুঝি? কিছুকাল ধরেই আমাদের

গভর্মেন্টের পরিকল্পনা চলেছে—গঙ্গার সঙ্গে কাবেরীর সংযোগ করার। সাময়িক পত্রিকাতে মাঝে মাঝে তার রিপোর্টও দেখি। সার্ভের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

কুর্গ থেকে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে পত্রিকার দুটো cuttings-ও হাতে আসে। তাতে দেখি, কেন্দ্রীয় সরকারের এক মন্ত্রীর বিবৃতি: The Union Goverment has decided to undertake, with U. N. expert assistance, a survey for linking the Ganga with the Cauvery · ···

···The survey would involve a study of many land and water aspects, including water links, storages and hilly plateaus along the proposed 1,500 mile grid ·····This project, if implemented, was estimated to irrigate 20 million acres.

ভাবি, পুরাকালের কল্পনা-কাহিনী প্রকৃতই কি বিরাট বাস্তবে পরিণতি পাবে!

যাত্রী ভদ্রলোক সপরিবার পূজায় বসেন কুণ্ডিকার পাশে। আমরা ঘাটের সোপান বেয়ে উপরে উঠি। ডান পাশে ছোট গেট মত, রেলিং দিয়ে ঘেরা ছোট বাগান। সিঁড়ির শেষে কয়েক হাত দূরে দুটি মন্দির, একটা ছোট ঘরও। ঘরটি পূজারীর। মন্দির গণপতির, অপরটিতে শিবলিঙ্গ। প্রবাদ, অগস্ত্যমুনির নিজের হাতে স্থাপন করা শিবলিঙ্গ। বালি দিয়ে গড়া। নাম, অগস্ত্যেশ্বর মহাদেব। মন্দিরে পূজারীর ছেলে পূজার আয়োজন করে। দেবতার ভোগ হয়, অন্ন ও পরমান্ন। আবার সেও কাবেরীর কাহিনী শোনায়।

মন্দির ও যাত্রীদের সেই ঘরের মাঝামাঝি পাহাড়ের খাঁজ। পাহাড়ী ঝরনার নেমে যাওয়ার পথ, শুকনো খট্‌খট্‌ করে। উপলখণ্ডে ভরা। এই হয়ত কাবেরীর গুপ্ত পথে নেমে যাওয়ার ইঙ্গিত। এরই ধারে কয়েকটা বড় বড় গাছের ছায়াতলে ছোট একটি বাংলো। নতুন বাড়ি। দরজা জানলা বন্ধ। পূজারীর ছেলে বলে, যাত্রীদের থাকবার জন্যে সবে তৈরি হয়েছে।

কান্তিসেনকে বলি, এখানে রাত্রি কাটালে কেমন হয়। তবে ঘরটা দুপাশে পাহাড় ও গাছে চাপা।

পূজারীর ছেলে জানায়, রাত্রিবাস যদি করতেই চান, তবে এখানে কেন? ঐ ব্রহ্মগিরির যে চূড়া দেখছেন, তারই অপর পাশে সুন্দর বাংলো তৈরি হয়েছে—বনবিভাগের—সেখানে গিয়ে থাকুন। সেখান থেকে যেমন চমৎকার দৃশ্য, বাংলোটিও তেমনি। মোটরও যাবে, ঐ যে নতুন মঠ তৈরি হচ্ছে, তারই পাশ দিয়ে রাস্তা ঘুরে ওদিকে গেছে। এখান থেকে মাইলখানেক হবে।

কান্তিসেনেরও উৎসাহ জাগে। বলে, আপনি এখানে ততক্ষণ ঘুরে দেখুন, স্নান করতে চান তো তাও করে নিন। আমি চট করে মোটর নিয়ে

ঘুরে দেখে আসি জায়গাটা কি রকম।

আমিও সেইমত ব্রহ্মগিরির চূড়ায় উঠে চারিদিক দেখতে চলি। দু'তিনশ ফুট মাত্র ওঠা। মাটি, পাথর-ছাওয়া পাহাড়ের গা। গাছপালা নেই। নেড়া পাহাড়। যেন গায়ে ধুলা-বালি-মাখা উলঙ্গ অধিবাসী শিশু। সামান্য চড়াই হলেও রোদের তাপ দেহে অনুভব করি। ফিরে ফিরে নীচের দিকে তাকাই। কুণ্ডের জল পাহাড়ের কোলে শুয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে যেন হাসতে থাকে। বলি, আসছি এখুনি, এসেই তোমায় কোলে নেব। এই তো এলাম বলে!

মাথার উপর পৌঁছুই। খানিকটা সমতলভূমি। বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বোল্ডারস্। পাথরগুলির গায়ে নানারকম রেখা। এই সবই বুঝি কাবেরীর বিবাহ-মণ্ডপের স্মৃতিচিহ্ন, সপ্তর্ষি মণ্ডলের চরণবেণুর অবশেষ।

এরই মাঝখানে ইলেকট্রিক আলোর খুঁটি। যেন দম্ভভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রসাভাসের সৃষ্টি করে। উঁচু পাহাড়ের মাথায় খোলা জায়গায় দাঁড়ালে মানুষের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, আবদ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত পাহাড়ের শ্রেণী। ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে নিশ্চল হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আশপাশে যতগুলো গিরিচূড়া, এই শিখরই সব চেয়ে উঁচু। প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট। শুনেছি আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আরব সাগরও এখান থেকে দেখা যায়। আকাশ-পথে হয়ত ৬০-৭০ মাইল দূর হবে। এখন বেলা বাড়ায়, বোধ হয় দীপ্তিও বাড়ে, দিগন্তের বলয়রেখাও অস্পষ্ট দেখায়।

ফিরে আসি চূড়া থেকে। কুণ্ডের জলে স্নানও পরম তৃপ্তি দেয়। এক কোমর মাত্র জল। কখনও কমেও না, বাড়েও না।

কান্তিসেনও ঘুরে আসে। আনন্দ-সংবাদ আনে। উৎফুল্ল হয়ে বলে, ওদিকেও অতি শান্ত জায়গা। পাহাড়ের গায়ে নতুন বাংলো। সাজানো গোছানো। ইলেকট্রিসিটিও আছে। কোন অসুবিধে নেই। ফরেস্ট গার্ড, চৌকিদার—দুজনের সঙ্গেই দেখা। তারা বলে, এখানে কেউ আসে না। যে কদিন খুশি থাকুন। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। এখুনি লোক চলে যাচ্ছে ভাগমণ্ডলে, শাক্-সব্জি, আটা চাল ডাল আনিয়ে দিচ্ছি। কতজন আপনারা আছেন, বলুন। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমরা এখানেই থাকব। কিন্তু ভাগমণ্ডলের বাংলোয় খাবার অর্ডার দেওয়া আছে। খেয়েদেয়ে এখানে ফিরে আসছি। কদিনের রেশন যা দরকার তাও কিনে আনব। চৌকিদার তখন বলে, তাহলে গাড়িতে যে মালপত্র ব্যাগ রয়েছে, নামিয়ে রাখি,—অযথা বইবেন কেন? লোকটার বোধ হয় সন্দেহ হয়, যদি পরে মত বদলে যায়, ফিরে না আসি, যা নির্জন শান্ত জায়গা! বেচারী তো জানে না, ঐটেই আমাদের আকর্ষণ!

ফিরে চলি তখনি ভাগমণ্ডলে। খল-কাবেরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা নয়,—'ফিরে আসছি' বলে আসা, তাই মনও আনন্দে ভরা।

ঠিক বারোটায় বাংলোর খাবার টেবিলে সব খাবার সাজানো। ছিমছাম, পরিপাটি। চৌকিদারও হাজির। তবু দেখি, তার মেয়েটি পরিবেশন করে। রঙিন বেশভূষা। মাথার চুলে ফুল গোঁজা। মুখভরা হাসি। চন্দা তার দিকে তাকায়। কান্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে হাসে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারে এরা খ্রীষ্টান। কান্তি শুনে বলে, সেইজন্যেই এত পরিচ্ছন্ন, সময়জ্ঞানও। চন্দা হেসে বলে, তা হোক, এই কাবেরী-ই আবার একদিন কোন্ অগস্ত্যমুনির চোখে পড়ে, কে জানে!

খাওয়া-দাওয়া সেরেই ফিরে আসি আবার চার মাইল দূরে, পাহাড়ের উপর থল-কাবেরীর ফরেস্ট বাংলোতে।

বাংলোতে প্রবেশ করার আগে চারদিকে তাকিয়ে দেখি। বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে। এ যেন পথের মাঝে আচম্বিতে দেখা অতি প্রিয়জনের সঙ্গে। এ কি হিমালয়ের আপন-ঘরেই ফিরে এলাম? আকাশে মাথা তুলে পাহাড়ের পর পাহাড়। বহু নীচে পাহাড়ী নদীর উপত্যকা। সেখান থেকে পুঞ্জীভূত মেঘের দল পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে। যেন, ফুটফুটে-রঙ শিশুর দল হামা দিয়ে মায়ের বুকের পানে ধায়। আবার, ওদিকে আকাশের মাথা জুড়েও মেঘ আসে উড়ে। যেন, সাদা পাখনা মেলে পরীরা আসে নেমে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নেমে থমকে দাঁড়ায়, গা এলিয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে থাকে নীচে। নীচের ও উপরের মেঘের পুঞ্জ একাকার হয়। পাহাড়ের গা, নীচের উপত্যকা ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে। শুধু উঁচু পাহাড়ের মাথাগুলো যেন সেই মেঘ-সমুদ্রে দ্বীপের মত ভেসে থাকে। কিন্তু তাও ক্ষণিক মাত্র। হঠাৎ আবার আকাশ জুড়ে নতুন মেঘের দল আসে। সারা পাহাড়, দূরদিগন্ত—সব কিছুই মেঘের নিশ্ছিদ্র আবরণে বিলুপ্ত হয়। তখন মনে হয়, বিশ্বের সীমানাদেশে একা দাঁড়িয়ে আমি, সুমুখে অরূপ অসীম শূন্য। কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্ত মাত্র। মেঘে মেঘে মেশামেশির ছেদ ঘটে। মেঘের জাল কাটে। ছিদ্র পথে আবার দূরের পাহাড় ছবির মত আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে। মেঘ উড়ে যায়, দিগন্ত আবার যেন ঘোমটা তুলে হাসিমুখে নীলনয়নে তাকায়। আবার মেঘ জমে, চকিতে আবার সব মুছে যায়। মেঘের এই অপরূপ আলোছায়ায় লুকোচুরি খেলা হিমালয়েরই বৈচিত্র্য। শুধু নেই এখানে দূরদিগন্তে অভ্রভেদী হিমাদ্রির শুভ্র তুষারশ্রেণী। হিমালয়ের মত অমন বিশাল পাহাড়ও নয়। চার, সাড়ে চার হাজার ফুট মাত্র উঁচু। তবুও, মনে হয়, হিমালয়েরই স্বজাতি। এখানকার পাহাড়গুলোর মাথা নেড়া, কিন্তু কটিদেশে গাঢ় সবুজ ঘন বনের মেখলা, যেন অর্ধ-উলঙ্গ আফ্রিকান অরণ্যবাসী। বনরক্ষী জানায়, এ-সব পাহাড়ের অধিকাংশরই উপরদিকে শুধু পাথরের স্তূপ, শুকনো মাটি, বালি কাঁকর। কিন্তু নীচের দিকে গভীর বন। বনমুরগী, হরিণ ওদিকে অজস্র। হাতী, বাঘও আছে। বাংলো থেকে মাইল তিন চার হেঁটে নেমে গেলেই দেখতে পাবেন।

বলি, চল, এখন তোমার বাংলোটি তো দেখি।

বাংলোর পিছনে ব্রহ্মগিরির চূড়া। সেই মাথার উপর আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক পোস্ট। পাহাড়ের কোলে সুন্দর বাংলো। সম্মুখে ফুলের বাগান। অল্প দূরে কুয়া। মাত্র পাঁচ-ছ হাত নীচেই জল। কারণ হয়ত, কাছেই ঝরনা। ভাবি কনকই হবেন এ-পাশে। তার আরও খানিক পাহাড়ের নীচে ফরেস্ট গার্ড ও চৌকিদারের থাকবার বাড়ি। কুয়ার কাছেই শাক-সব্জির ছোট বাগান। টম্যাটো ফলেছে প্রচুর।

বাংলোর মধ্যে ঢুকেই ঢাকা লম্বা কাঁচে-ঘেরা বারান্দা। ঘরেরই মতন। তারই কোলে দুপাশে দুটি শোবার ঘর, মাঝখানে ডাইনিং রুম। দুদিকের ঘরের পাশেই স্নানাগার, স্যানিটারি ব্যবস্থাও। ঘরে ঘরে বিজলী বাতি। রাত্রি নটার পর আলো বন্ধ হয়। নিখুঁত সব ব্যবস্থা।

বাংলোর মধ্যে মানুষের হাতে সাজানো দেহ-সুখভোগের উপযোগী আয়োজন। ঘরের বাইরে প্রকৃতির অকুণ্ঠ দান,—মনের শান্তি ও আনন্দের অমূল্য সম্ভার।

সময় কেটে যায় পাহাড়ী ঝরনার স্বচ্ছ সাবলীল গতির ছন্দে।

কান্তিসেন এসে বলে, মার্কারায় এতবার আসি, কাছেই এমন যে মনোরম স্থান, জানতামই না। এবার থেকে সুযোগ পেলেই এইখানে আসব।

পরের দিন। সকালে মোটর নিয়ে সেই বালমুরিতে ঘুরতে যাওয়া। থল-কাবেরী থেকে আবার নীচে ভাগমণ্ডলে নামা। গ্রামে ঢোকার আগেই নদীর ধার দিয়ে নতুন পথ এদিক থেকে ডান দিকে ঘুরে যায়। মোড়ের উপর যাত্রী-ভরা ছোট বাস দাঁড়িয়ে। ওদিকের পথে গ্রামগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত করে। রাস্তা কখনও নদীর পাশ দিয়ে ছোটে, কখনও বা নদী আশপাশে গাছপালার আড়ালে লুকায়। ক্রমে ছোট ছোট পাহাড়, টিলা দূরে সরে। সমতলভূমি যেন দু হাত বাড়িয়ে নদীর বুকে ধরে। চারিদিকে চাষ-আবাদ। ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ফলের বাগান। কলা, কমলা লেবুর প্রচুর ফলন কুর্গ-এ। পথের ধারে কখনও বা বড় গ্রাম। নাম শুনি, নাপোকলু, মুরনাদ ইত্যাদি।

বালমুরি পেঁাছে যাই। গ্রামের স্কুলের পাশ দিয়ে রাস্তা বেঁকে নদীর ধারে নামে। পুল পার হয়ে অপর পারে আসি। এখানে আর পাহাড়ী নদীর ঝিরঝিরে ধারা নয়। সমতল ক্ষেত্রে নেমে কাবেরী উদার মনের বিস্তৃতির পরিচয় দেয়। এই সেই কাহিনী-ক্ষেত্র, এইখানেই নদীরূপিণী দেবী পার্বতীর পথরোধ করেন কুর্গ-রমণীগণ। তাই অবরোধ-এড়িয়ে-যাওয়া নদীর ডান দিকে বাঁকও। এপারে বাঁধানো ঘাট। তটে প্রাচীর-ঘেরা এলাকায় শিব-মন্দির, দেবস্থান। মেয়েদের এক আশ্রমও। মন্দিরে দর্শন করে বাইরে এসে নদীর ধারে প্রাচীন বিশাল এক পিপ্পল বা অশ্বত্থ গাছের তলায় অপেক্ষা করি। চন্দা গেছেন আশ্রমে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে।

দেখি, পুলের দিক থেকে হেঁটে এক ভদ্রলোক আসেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বেশভূষা, চলার বিশেষ ধরন-ধারণ। গ্রামবাসী নন, দেখেই বোঝা যায়। সাহেবী পোশাক, প্যাণ্ট, বুশ শার্ট। মাথায় "বোলার ক্যাপ"—সবুজ রঙ। হাতে ছড়ি। লম্বা দোহারা শরীর। প্রাণবন্ত, সবল। ফিটফাট চালচলন,—যাকে বলে 'স্মার্ট'। কাছে এলে দেখি প্রৌঢ় বয়স ভদ্র ব্যক্তি। ফর্সা রঙ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। রাস্তা ছেড়ে সোজা এগিয়ে আসেন গাছতলায় আমাদের কাছে। এসেই মুখে মৃদু হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেন—করমর্দন প্রথায়। মুখে বলেন, আমি সোমান্না। প্রত্যুত্তরে আমাদেরও নাম বলতে হয়। তিনি নিজের পরিচয় দেন,—এইখানেই মাইলখানেক দূরে তাঁর গ্রামের বাড়ি। মারকারাতে এক হোটেলের মালিক। যেখানে 'অনুরাধা প্রিণ্টিং প্রেস' নামে এক ছাপাখানাও চালান। না, মিলিটারিতে কখনও যোগ দেননি। যদিও নিকট-আত্মীয় কয়েকজনই আর্মিতে বড় অফিসার। নিজের ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়; তবে, রক্তে মিলিটারি-ধারা—তার টান সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তাই, ছোটবেলা থেকেই 'স্কাউটমুভমেণ্টে' আছেন, এখন এই অঞ্চলের স্কাউটদের 'ইনচার্জ'। শহরে থাকলেও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হয়। এখানে প্ল্যানটেশন আছে—কফি, cardamom (ছোট এলাচ) ও pepper (মরিচ)-এর। সে-সব দেখাশুনার জন্যে মাঝে মাঝে এখানে আসতেই হয়। তবে, সুবিধের মধ্যে—যদিও পরিবারের পুরুষ সবাই বাইরে কাজকর্মে কাটান,—এক বৃদ্ধ কাকীমা গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করেন। তিনিই সব দেখেন শোনেন—যদিও তাঁদের সঙ্গে চাষ-আবাদের জমিজমা, বাগান সব এখন ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এক নিশ্বাসে নিজের কথা অনেক কিছুই বলে যান, যেন কতকালের জানাশোনা, হঠাৎ অনেকদিন পরে দেখা। আগ্রহের সঙ্গে বলেন, চলুন না, আমাদের বাড়িতে। গাড়ি রয়েছে আপনাদের, কতটুকুই বা সময় লাগবে। তারপর ফিরবেন থল-কাবেরীর ডেরায়। এলেন কত দূর দেশ থেকে—আপনি তো সেই বেঙ্গল থেকে?—ভাল কথা, এই পরশুই আমার হোটেলে এক বাঙালী এসেছিলেন, চকরবর্তী না কি নাম বললেন,—অনেক গল্প শোনালাম আমাদের দেশ সম্বধে। মারকারাতে বাঙালী কখনও কখনও দেখি বটে,—কিন্তু থল-কাবেরী বা এই বালমুরিতে কাউকে দেখিনি। চলুন গাড়িতে,—আমাদের কফি ও এলাচের বাগান দেখিয়ে আনি।

তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও আমাদের কৌতূহল তাঁর গ্রামের বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়।

মোটরে যেতে যেতে সোমান্না আবার কাবেরী-কাহিনী শোনান। কাবেরীই হল কুরুগ-এর প্রাণ,—অন্নদাত্রী। এ-দেশের কফি, ছোট এলাচ, মধু, কমলালেবু, ইত্যাদির কথা শুনেছেন, কিন্তু জানেন হয়ত, এখানকার প্রধান ফসল হল—ধান। এই পাহাড়ী দেশের এই নদীর কৃপায় শস্যশ্যামল, ফল-ফসলে হাস্যময়; আপনাদের গঙ্গা-মাতৃক দেশও যেমনি। আবার দেখুন,

আপনাদের হিমালয়, এখানে আমাদের সমুদ্রের ধারে সহ্যাদ্রি—Western Ghat। তাই হিমালয়ের মত এদেশের এই পাহাড়ে মেঘ আটকে যায়, ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়,—জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে সেই অক্টোবরের মাঝ অবধি বর্ষা চলে। মারকারাতে বছরে প্রায় ১২০ ইঞ্চি জল হয়, আর ভাগমণ্ডল বা এই সব অঞ্চলে? তা প্রায় দু'শ ইঞ্চি। এই কারণেই কুর্‌গ্‌-এর লোকেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। আবার আশ্চর্য। কৃষিজীবীরা নিরীহ বলেই সাধারণ ধারণ, কিন্তু এরাই আবার রণকুশল। অস্ত্রশস্ত্র এদের প্রাণপ্রিয়, গৃহদেবতা। একদিকে মাতৃরূপী কাবেরীমূর্তি, অপরদিকে উন্মত্ত রণনৃত্য। হয়ত, পাহাড়ের রুক্ষতা আর নদীর উদারতা,—এই দুয়ের সমাবেশেই আমাদের প্রকৃতির এই গঠন। মাছ ধরা, শিকার খেলা,—এও আমাদের নেশা। আমিও ফুরসৎ পেলেই বেরিয়ে পড়ি। তাকিয়ে দেখুন, পথের দুপাশে ছোট এলাচের বাগান। নেমে দেখবেন নাকি?

গাড়ি দাঁড়ায়। পথের পাশে বেড়া-ঘেরা বাগান। ডিঙিয়ে ভিতরে নিয়ে চলেন। চাবাগাছের কোন্‌খানে কিভাবে এলাচ ফলে, দেখান। বলেন, আসতেন যদি এলাচের সময়,—সেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে,—সুগন্ধে সারা দিক ভরে থাকত, এলাচের সাদা রঙ বনও আলো করে রাখত।

আবার গাড়ি চলে। দুদিকে আরম্ভ হয় কফির বাগান। তাঁর নিজের বাগানের সামনে নামেন। ভিতরে গিয়ে বোঝান কি ভাবে কফির চাষ হয়। মোগলরাই নাকি প্রথম এদেশে কফির প্রবর্তন করে। আরব দেশ থেকে আমদানি কফির নাম Robusta,—তার গাছগুলো কেমন ঝাঁকালো সতেজ হয়, অন্য কফির তুলনায় তার উৎপাদন-শক্তিও বেশি।—মেতে ওঠেন, আপন হাতে সযত্নে গড়ে তোলা ফসলের গুণকীর্তনে, যেমন অনাবিল আনন্দ ও গৌরব বোধ করেন স্নেহময় পিতা সুপুত্রের প্রশংসায়।

আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি ফেরবার জন্যে। তিনি বলেন, অত তাড়া কিসের? চলুন এবার আমাদের বাড়িতে।

রাস্তা ছেড়ে বাগানের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে পৈতৃক বাসগৃহ। বলেন, দেড়শ' বছরের বাড়ি। চারপাশ বড় বড় গাছে ঘেরা। নারিকেল-কুঞ্জ। কলাগাছের ঝাড়। শান্ত নিভৃত গ্রাম্য পরিবেশ। তারই মাঝে খানিকটা খোলা জমি। ছড়ানো তিনখানা বাড়ি। পাকা গাঁথুনি। টালির ছাদ। সুমুখে ঢাকা বারান্দা। সিমেন্ট বাঁধানো রেলিং, সারি সারি কাঠের থাম, কাঠের উপর কারুকার্য। বাড়ির সামনে প্রশস্ত নিকানো উঠান। সেখানে ছড়িয়ে কফির বীজ শুকাতে দেওয়া। সামনের বাড়িখানি দেখিয়ে সোমান্না বলেন, ঐটে আমার ভাগের। এখন বন্ধই পড়ে থাকে। পাশের ঐ বাড়িটা আণ্টির,—চলুন, ঐখানে যাব। এদেশের গ্রামের ঘরবাড়ি লক্ষ্য করেছেন হয়ত,—বাড়ি-ঘরের জটলা নিয়ে গ্রাম নয়,—ছড়ানো বাড়ি।

বারান্দায় উঠেই তিনি অন্দরে ঢোকেন।

তখনি একটি কিশোরী থালার উপর জলভরা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস

সাজিয়ে আমাদের সামনে এনে ধরে। এদেশে অতিথি ঘরে এলেই তৃষ্ণা-বারি এনে দেওয়া প্রথা। শুধু জল-দেওয়াই দেখি না, মেয়েটির পরনের শাড়িখানির উপরও দৃষ্টি পড়ে,—সেই আঁচল ঘুরিয়ে পরা। যেন কাবেরীর চলে-যাওয়ার চরণচিহ্ন দেহে ধরা!

বারান্দার দেওয়ালের গায়ে সারি সারি ফটো টাঙানো। সোমান্না এসে আগ্রহ সহকারে দেখান, কোন্‌টি কার। কে জীবিত, কেই বা মৃত। কার কোথায় কি লেখাপড়া শেখা, কার জীবনের কোন্ সময়ই বা ফটো তোলা, কার কী প্রতিষ্ঠা হয়, এখনই বা কোথায় উচ্চপদে আসীন,—সব গল্পই শোনান। সেই দেড়শ' বছরের প্রাচীন,—এখন শূন্যপ্রায় গৃহ,—ছায়াশীতল মৌন গ্রাম্য পরিবেশ—তাঁর স্মৃতিবিজড়িত কাহিনীর মধ্যে সজীব মুখর হয়ে ওঠে।

মূর্তিমতী-স্মৃতি-স্বরূপ্য এক বৃদ্ধা এসে দ্বারমুখে দাঁড়ান। শুভ্রকেশ, লোলচর্ম, শ্যামবর্ণ। সেই ঘুরিয়ে শাড়ি পরা। বলিচিহ্ন-আঁকা-মুখমণ্ডলে স্নেহ-সিক্ত মধুর হাসির রেখা,—যেন কুরগ-এর বন্ধুর গিরিশিরে অস্তগামী রবির ম্লান দীপ্তি। হাত তুলে স্বাগত সম্ভাষণ জানান, সোমান্নাকে কি যেন বলেন। সোমান্না আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, আন্টি বলছেন চা খাবেন, না কফি? বাড়ির ভেতরটাও দেখবেন তো?

ভিতরে নিয়ে চলেন। এ যেন কাশীতে পুরনো কোন বাড়িতে ঢুকি। তবে অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। আলোয় ভরা। মাঝখানে খোলা উঠান। চারিপাশ ঘিরে ঢাকা-বারান্দা। তারই কোলে সারি সারি ঘর। সম্মুখের ঘরের দরজার উপরে দেওয়ালে টাঙানো কাবেরীর ছবি।

ঘণ্টাখানেক সোমান্নার সঙ্গে গল্প করে আনন্দে কেটে যায়।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পরদেশীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ করার আগ্রহ, অন্তরঙ্গ মন-খোলা কথাবার্তা, আন্তরিক আতিথেয়তা দেখে মুগ্ধ হই।

আবার ফিরে আসি থল-কাবেরীতে। এ যেন আপন ঘরে মায়ের কাছে ফেরা। পাহাড়ের কোলে কী গভীর শান্তির আবেশ!

কান্তি ও চন্দা বিকেলে থল-কাবেরীর কুণ্ডে যায়। বলে, আমরা চললাম ব্রহ্মগিরির চূড়ায় উঠতে। কাল তো আমাদের ওঠা হয়নি। দুঃখ হয়, স্কেচ্ বই নেই। তবে, কাগজ-পেনসিল আছে। ছবির মতই দেশ।

আমিও বাংলো ছাড়িয়ে এই দিকের পাহাড়-পথে ঘুরি। আপন মনে। একান্তে। আশপাশের শিলাখণ্ডগুলি কত বিভিন্ন বিচিত্র আকারের। যেন, পাষাণে পরিণত অপরূপ জীবজন্তু। প্রকৃতির যাদুঘরে সাজিয়ে-রাখা আদিম যুগের প্রাণীদেহ।

একটা বড় পাথরের উপর স্থির হয়ে বসি। মনে আসে, কাবেরীর কাহিনী। সেও যেন কোন্ যুগ-যুগান্তের বার্তা নিয়ে আসে। তবে, প্রাণহীন নিশ্চল পাষাণের ভাষাহীন কঙ্কাল নয়। বিগলিত-করুণা প্রবাহিণী। সুমধুর কল-কল্লোলিনী। দেশবাসীর অন্নদায়িনী। শীর্ণতনু একা কুরগ্

দেশেরই নয়। সারা ভারতময় তাঁর খ্যাতি। প্রসিদ্ধ সপ্তনদীরই অন্যতমা ঃ

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কাবেরীকে দেখি। আবার মহাভারতে ভীষ্মপর্ব ও বনপর্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কালিকাপুরাণেও এঁর নাম। শ্রীমদ্ ভগবতেও মহানদীর নামগুলির মধ্যে কাবেরীর উল্লেখ। আর এক স্কন্ধে, নারদমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রহ্লাদ ও অজগরব্রতী এক মুনির যে কাহিনী শোনান তাতে বলেন সহ্যপর্বতের সানুদেশে সেই অজগরব্রতী মুনি শয়ান ছিলেন—এই কাবেরীর তীরে। সেই ভাগবতেরই অন্যত্র আবার এই মহানদীর গরিমা দেখা যায়,—বলদেব ভ্রান্তিবশতঃ নৈমিষারণ্যে মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য সূত রোমহর্ষণকে বধ করেন। সেই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার যে সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা, তারও মধ্যে 'সরিদ্বরা কাবেরী'। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও কাবেরীর বর্ণনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চারটি নদীর সহ্যাদ্রি থেকে নিঃসৃত হয়ে সুদূর পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরে অবসান, তাদের নাম লেখেন, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার ও কাবেরী। কিন্তু কন্দপুরাণেই কাবেরী-কাহিনীর রসঘন বিস্তার।

তবু, এসবই পুরাণের কথা। তাই, পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণীর মাহাত্ম্য-কীর্তন।

মহকবি কালিদাসের কাব্যলোকেই শুধু কাবেরীর তরঙ্গমালার ক্ষণিক নূপুর-কিঙ্কিনী। প্রেয়সী রমণীর অভিসারিকা রূপমাধুরী। রঘুবংশ—চতুর্থ সর্গ। মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনী। পূর্বাঞ্চলে কলিঙ্গ জয় করে সসৈন্য রঘু নেমে চলেন দক্ষিণে—অগস্ত্যাচরিতামাশাম—যেদিকে অগস্ত্য যান। মহারাজ সমুদ্র বেলাভূমি ধরেন। কাবেরী-সঙ্গমের নিকটে আসেন। সেনা-বাহিনী নদীর জলে নামে। কবির অপূর্ব ভাষায় সেই উদ্বেলিত কাবেরীর রূপবর্ণনা ঃ

স সৈন্য পরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ ॥

হস্তিদলের মদগন্ধে সুরভিতা ও সৈনিকদের যথেচ্ছ স্নান-পান-বিলোড়নে উপভুক্তা কাবেরী রূপধারণ করেন এমনি যে কাবেরী-পতি সমুদ্রের মনে তাঁকে দেখেই সন্দেহ জাগারই কথা!

পরে রঘুর বিজয়বাহিনীর সহ্যাদ্রি অতিক্রম করার বর্ণনাও আছে। বিস্ময় জাগে, সেকালেও সেখানে মহাকবি মরিচ, এলাচ, চন্দন-বনের উল্লেখ করেন।

কাবেরী মহানদী। দাক্ষিণাত্য-জাহ্নবী।

ভাবি, কোথায় সেই 'উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়'। তারই শিখরদেশে চিরতুষারাচ্ছন্ন গোমুখ-বিবর। ভাগীরথীর পুণ্য জন্মভূমি। গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণ। মহাদেবের জটাজালে প্রচণ্ড প্রবাহের অন্তর্ধান। আবার আত্মপ্রকাশ।

আর, কোথায় ভারতের সুদূর পশ্চিম। আরবসাগরের উপকণ্ঠ।

সহ্যাদ্রির ব্রহ্মগিরি চূড়া। তারই ক্রোড়ে ক্ষুদ্র জলকুণ্ড। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নিভৃত গোপন পথে ব্রহ্মকন্যা কাবেরীর অলক্ষ্য প্রবাহ।

হিমালয়-দুহিতার ভগীরথ-কাহিনী, জহ্নুর উপাখ্যান, শান্তনু-পরিণয়। শুভদা গঙ্গা ভীষ্ম-জননী। হিমগিরি শিবভূমি! সহ্যাদ্রি ব্রহ্মালয়।

উত্তরাপথের আর্য-ঋষি দাক্ষিণাত্যে নেমে এসে শিব-স্থাপনা করেন।

তাই, কাবেরী-জীবনে শুধু অগস্ত্য ঋষিরই বিচিত্র কাহিনী।

কিন্তু, দুই মহানদীরই একই পরিসমাপ্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে অবলুপ্তি।

কাবেরীর জন্মভূমির অদূরেই আরব-সাগরের কল্লোল-আহ্বান। পশ্চিমের সে আসক্তি উপেক্ষা করে নদী বয়ে চলে পূর্বমুখে। এ যে দূরদেশবাসিনী ভগিনীর সঙ্গে মিলনপ্রয়াস।

কুরগ্-এর শৈলপ্রাকার ভেদ করে নদীর প্রবাহ মহীশূরের অন্তর্দেশ প্লাবিত করে। পার্বত্য মালভূমি অতিক্রম করে নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হয়। কোথাও বা গিরিখাদ, উন্মত্ত জলপ্রপাত। চুনচানকট্রে জলধারার সত্তর-আশি ফুট উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া। গঙ্গার অলঙ্ঘ্য আহ্বান। বঙ্গপসাগরে মিলতেই হবে। দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেন কাবেরী। দুর্গম পার্বত্য পথ উত্তীর্ণ হয়ে ক্লান্তকায়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে নদী এবার ছড়িয়ে পড়ে। জলরাশির আঁচল বিছিয়ে বিশ্রাম খোঁজে। স্রোতের বিশাল ধারা দুই শাখায় বিভক্ত হয়। যেন, ঘুমন্ত মায়ের কোল ছেড়ে দুরন্ত দুই শিশু দুদিকে ধায়। মায়ের চকিতে ঘুম ভাঙে। উঠে গিয়ে আবার দুটিকে কোলে ধরেন। ক্ষণিকের বিচ্ছেদ। মাত্র কয়েক মাইল ঘুরে গিয়ে দুই শাখায় পুনরায় মিলন ঘটে। এ নদীর চলার পথে এ ঘটনা একবারই নয়। মহীশূর প্রদেশে দুবার এমন ঘটে, পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধানে। ফলে নদীর ধারার এই দুই বাহুর আবেষ্টনে দুই প্রকাণ্ড দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেরিঙ্গাপট্টম্ ও শিবসমুদ্রম। শিবসমুদ্রমেরই জলপ্রপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন হয়, আজ প্রায় ৭০ বছর আগে। প্রায় একশ মাইল দূরবর্তী কোলার স্বর্ণখনির কার্যে সে-শক্তির প্রয়োগ হয়। ভারতে সেই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের বৃহৎ কীর্তি।

মহীশূরে কাবেরীর এই প্রচণ্ড শক্তিমত্তার সহায়ক হয় আরও কয়েকটি উপনদী।

কাবেরীর বাম দিক থেকে নেমে আসে দশটি প্রবাহ। তার মধ্যে শিম্সা (Shimsa) প্রধান। দক্ষিণ দিকেও যে আটটি বড় নদী কাবেরীর বুকে জল-ভার ঢেলে দেয় তাদের মধ্যে কাব্বাণী নুগু (Kabbani Nugu), মোয়ার ভবানী (Moyar Bhabani), নোয়িল (Noyil) ও অমরাবতী বা অর্কাবতী বা হেমবতী মুখ্য।

ভবানী নদীর সঙ্গে যোগ হবার পর কাবেরী দক্ষিণ-পূর্বে ঘুরে যায়, আবার দুই ধারায় বিভক্ত হয়। তৃতীয়বার নদীর বুকে দ্বীপের সৃষ্টিও

ঘটে,—এরই নাম প্রসিদ্ধ তীর্থ শ্রীরঙ্গম্। কাবেরীর জীবন-ব্রত জনকল্যাণ, চলার পথে তাই দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন জলভার। কিন্তু ওদিকে আবার মহাসিন্ধুর মুক্তির আহ্বান। তরঙ্গভঙ্গে ছুটে চলেন কাবেরী। গতির আবেগে শ্রীরঙ্গম ছাড়িয়ে এসেই নদীর স্রোত আবার দুভাগ হয়ে দুদিক পানে ধায়। এক ধারা কাবেরী নামই রাখে, অপরটির নাম হয় কোলেরুন।

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় নদীর ধারাগুলি প্রবেশ করে। সাগরের সুগম্ভীর মহান আহ্বান এবার যেন কাবেরীর কানে এসে বাজে। কাবেরীর জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত প্রায়। দশ বাহু বিস্তার করে সাগরবুকে আত্ম-বিসর্জন দিতে ছুটে চলেন।

দিকে দিকে জলের ধারা। আকাশ-পথ থেকে দেখায়, যেন সাগর-তীরে ধরার বুকে নীল জলের আলপনা। অপরূপ ব-দ্বীপের সৃষ্টি, যেমন গঙ্গার দীর্ঘ যাত্রাশেষে সাগর-সঙ্গমেও।

সমভাবেই হয় কাবেরীরও জীবন-সমাপ্তি, সাগরবক্ষে অবলুপ্তি। একই উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে গঙ্গার ও পশ্চিমাংশে কাবেরীর জলস্রোতের যাত্রাশেষ।

কিন্তু, দুই নদীর রূপমাধুরীর যেন পার্থক্য থাকে।

গঙ্গার আজীবন উচ্ছলিত মাতৃমাধুর্য। তবুও, গৈরিক বসনা। বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। অপার্থিব শান্তিপ্রদায়িনী।

কাবেরী সুন্দরী। মনোরমা। উদ্বেলিতা, প্রাণময়ী। বুকে তার অলঙ্কার, অমূল্য রত্নসম্ভার। এককালে কাবেরীর জলতলে শুক্তিজাত মুক্তার অশেষ খ্যাতি ছিল। প্রাচীন চোল-সাম্রাজ্যের প্রধান নগর উর্গপুর—আধুনিক উরাইউর (Uraiyur)—কাবেরীর দক্ষিণ তটে গড়ে ওঠে। মুক্তা-ব্যবসার বিপুল প্রসারও হয়।

চোল রাজাদের রাজত্বকাল থেকে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্যে কাবেরীর বর্ষা-স্ফীত জলধারার সুব্যবহারও শুরু হয়।

কাবেরী তাঁর ৪৭৫ মাইলব্যাপী দীর্ঘ যাত্রাপথে দাক্ষিণাত্যের দেশে দেশে শস্যসম্পদের ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখে যান। মাদ্রাজের তাঞ্জোর বা আধুনিক তামিলনাড়ুর Thanjavur ব-দ্বীপ জেলাতে প্রায় ১'৪ মিলিয়ন একর ধান-জমির মধ্যে ১'২ মিলিয়ন একর জমি কাবেরীর বা তার উপনদীগুলির জল-প্রণালীর উপরই নির্ভর করে। মাদ্রাজের Mettur reservoir এই জল-বিভাগের কাজে অশেষ সাহায্যকারী হয়। ওদিকে মহীশূরেও তেমনি নদীর বাঁধের (Dam) সৃষ্টি। কাবেরীর জলধারার এই বিভাগ ও বাঁধ তৈরি নিয়ে দুই প্রতিবেশী প্রদেশের সরকারের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে, বিবাদও জাগে। এ যেন বিবদমান পুত্রদের মধ্যে অভাগা জননীর ভাগাভাগির দুর্বিপাক!

কিন্তু, থাক্ সে-সব জাগতিক ও সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুখের কথা, মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজন মেটাবার প্রচেষ্টা। আজ কাবেরীর জন্ম-স্থানে বসে, সহ্যাগিরির মহান রূপ হৃদয়ে অন্য ভাব আনে। মনে হয়, মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হাসি-কান্না,—এমন কি, জন্মমৃত্যু—জীবনের তুচ্ছ অংশ।

প্রকৃতির নিস্তব্ধ নিভৃত কোলে বসে অপর্যাপ্ত শান্তিতে মন ভরে ওঠে। মর্মে মর্মে অনুভব করি, এই বিরাট বিশ্বসৃষ্টির মাঝে অতি ক্ষুদ্র আমারও অন্তরাত্মার কোথায় যেন নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগ আছে।

চকিতে যেন সাড়া দিয়ে সান্ধ্যসমীকরণ বহে আসে। দেহমনে আনন্দ-হিল্লোল তোলে। মনে গুঞ্জরণ ওঠে Mathew Arnold-এর ঃ

"Blow, ye wind ! Lift me with you
I come to the wild
Fold closely; O Nature !
Thine arms round thy child.
To thee only God granted
A heart ever new--
To all always open,
To all always true."

ধীরে সন্ধ্যা নামে। নীল আকাশ যেন আয়ত নয়নে কোলের শিশুর প্রতি তাকান। ধরণীর বুকে পা ফেলে বাংলোতে ফিরে আসি।

রাত কাটে গভীর আনন্দে শান্তিময়ী নিদ্রার আবেশে।

কিন্তু, কত ভিন্ন রুচিই না বিভিন্ন মানুষের !

কান্তি সেন সকালে উঠে আসে। মুখে তার দুশ্চিন্তার মেঘভার। সসঙ্কোচে বলে, দাদা, দুদিন তো কাটল এখানে, আজ রওনা দেওয়া যাক। পথে আবার জোগ-ফল্‌স্‌ ও গোয়াতেও তো দুদিন কাটাতে হবে।

আশ্চর্য হই ! বলি আরও দুদিন এখানে থাকলে হতো না ? তোমার বম্বে ফেরবার দিন আসতে এখনও তো দেরি ?

গম্ভীর মুখে সে জানায়, তা ঠিকই। জায়গাও ভাল। অদ্ভুত লাগছেও। সেই জন্যেই পালিয়ে যাওয়া। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি,—ঠিক কি, মনে নেই। ফ্যাক্টরীর মেশিন—কাজের তাড়া, এই সব কী যেন ! কি ঘটছে সেখানে, কি জানি ! ফেরাই যাক, কি বলেন ?

করুণ চোখে আমার দিকে চায়।

অতএব, কাবেরীর কাছে বিদায় নিয়ে আবার পথে নামতে হয়।

লীলাঞ্জন

লীলাঞ্জন,—নামটা জানা নাকি ? বোধ হয়, না। কিন্তু নামটি মধুর অস্বীকার করবার উপায় নেই। ছেলেবেলার ডাকনাম, মিষ্ট হবার কথাই। প্রকৃত নাম,—নৈরঞ্জনা। লোকে আদর করে ডাকে, লীলাঞ্জন নামে। তার শিশুকালের কাহিনী অতি-সাধারণ। জন্মও অতি নগণ্য ঘরে। লোকের না জানারই কথা। ডাকনাম শুনে তাই কেউ তাকে চিনতেও পারে না। অথচ, কিশোর বয়সে বনভূমির কুটির ছেড়ে সে যখন শহরে আসে, তার রূপ ও

মহিমা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে, পোশাকী ভিন্ন নামকরণও তার হয়। সভ্য জগতে সেই নতুন নামের খ্যাতিও ছড়ায়। সে-নাম সবারই জানা,—ফল্গু।—গয়াতীর্থক্ষেত্রের সেই নাম-করা ফল্গু। গোপন-পথ-চারিণী অন্তঃসলিলা প্রবাহিনী। সারাজীবন তার বালুকারাশি ও অলক্ষ্য জলধারার লুকোচুরি খেলা। সেই ফল্গুরই বালিকা-বয়সের নাম—লীলাঞ্জন। লীলাজনের এই পরিচয় আমারও জানা ছিল না। জানলাম কি ভাবে, তাই বলি।

এই বছরেই—১৯৭১ সালে—ঘুরতে ঘুরতে চাতরায় চলে আসি। চাতরাতেই আগেকার দিনের বাঘ শিকারের জঙ্গল। হাজারিবাগ শহর থেকে ৪৩ মাইল দূরে। হাজারিবাগ জেলারই এক সাবডিভিসন। হাজারিবাগ থেকে যে পাকা-বাঁধানো বড় সড়ক পালামৌ-ডালটনগঞ্জের দিকে চলে যায়, তারই উপর ত্রিশ মাইল দূরে সিমারিয়া। সিমারিয়াতে ডালটনগঞ্জের রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে আর এক শাখা-পথ। সেই পথে ১৩ মাইল দূরে চাতরা শহর।

যেমন নদ-নদীর জন্ম-কাহিনী থাকে, তেমনি পথ ও জনপদের ইতিহাস রচিত হয়। নদ-নদী প্রকৃতির সৃষ্টি। পথ শহর মানুষেব কীর্তি। অথচ পাহাড়-পর্বতে, আদিম অরণ্যরাজ্যে নদী ও পথের সঙ্গে গভীর মিতালি। নদীর ধারা ধরে ধরে নতুন পথ চলে। কিন্তু মানুষের কীর্তি ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃতির সৃষ্টি দীর্ঘকাল-প্রসারী।

চাতরা শহর সমতল ক্ষেত্র। একদিকে হাজারিবাগের উঁচু মালভূমি। পশ্চিম দিকে পাহাড়ী অঞ্চল। বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপ। নদ-নদীর গভীর খদ। বিজন আদিম অরণ্যানী। বিন্ধ্যপর্বতমালার পূর্বসীমানার বিচ্ছিন্ন বিস্তার। যেন আদিবাসী কালো মেয়ের দিগন্ত ছড়ানো ঘনকালো কেশদাম। ভূতত্ত্ববিদদের অভিমত, বিন্ধ্যাগিরির বয়সের তুলনায় হিমালয় নাবালক মাত্র। হিমালয়ের যখন জন্ম হয়নি. আধুনিক ভারতবর্ষের উত্তরাংশ ও হিমাচলের পার্বত্য-অঞ্চল যখন অতল-সমুদ্রগর্ভে, তখন ভারতের মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল। এখন যেমন ভারতের মুকুটমণি হিমালয়, তেমনি সেই সুদূর-অতীত প্রাচীন ভারতের উত্তর সীমানা ছিল বিন্ধ্যাগিরি। যুগান্তরে হিমালয়ের আবির্ভাব ঘটে। শৈল-জটাজাল ভেদ করে গঙ্গা অবতরণ করেন। ভাগীরথীর কল্যাণময়ী উদার বিস্তৃতি উত্তর ভারতভূমিকে সুজলা সুফলা করে তোলে। কালক্রমে গঙ্গার পলিমাটির স্তরও বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাঞ্চলে পুঞ্জীভূত হতে আরম্ভ করে। আধুনিক বিন্ধ্যাগিরি তাই প্রাচীন ও নবীন ভূভাগের বিচিত্র সমাবেশ।

বিন্ধ্যাগিরি ও তার দক্ষিণাঞ্চল সেকালে ছিল নিবিড়-অরণ্যময়। সেখানে বসবাস করত অরণ্যচারী আদিম অধিবাসী উপজাতিগণ। ক্রমে ক্রমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে আর্য-সভ্যতার প্রবল স্রোত নেমে আসে দাক্ষিণাত্যের দিকে। গঙ্গার ধারারই মতন। আর্য-অনার্যের ইতিহাসবিশ্রুত সংঘর্ষ বাধে। বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে সুদূর দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতার সেই

প্লাবন বহে চলে। বিন্ধ্যপর্বতের মত, তার আদিম অধিবাসীদের জীবনেও প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় ঘটে। এই মহামিলনের ভিত্তির উপর ভারতীয় সভ্যতার সৌধ গড়ে ওঠে। কিন্তু ভাঙা-গড়া মহাকালের খেলা। জাতীয় জীবনেও স্রোতের পর স্রোত বয়ে চলে। রাজ্য গঠিত হয়, ভেঙে পড়ে। আবার নতুন রাজ্য আসে, তারও পতন ঘটে। এইভাবেই হিন্দু-রাজশক্তির লোপ হয়, মুঘল-সাম্রাজ্যও ধ্বংস পায়। ব্রিটিশ-রাজশক্তির অভ্যুদয় দেখা দেয়। বাণিজ্যের জাল ফেলে ইংরেজরা ভারতে রাজ্যবিস্তারে উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

রেলপথ নেই। মোটরযান নেই। অথচ উত্তর ভারতের সঙ্গে মধ্য ও পূর্ব ভারতের যোগাযোগ রাখা বিদেশী শাসকের একান্ত প্রয়োজন। বনে-জঙ্গলে যে-সব রাস্তা ও শহর ছিল সেগুলি নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে ইংরেজরা তৎপর হয়। এই কারণেই ১৭৮০ সালে রামগড় জেলার পত্তন। সে-সময়ে জেলার কেন্দ্র ছিল কখনো সেরঘাটিতে, কখনো বা এই চাতরাতে।

মেজর রেনেল, ভারতের প্রথম সারভেয়ার-জেনারেল। ১৭৭৯ সালে তাঁরই তত্ত্বাবধানে রামগড়-অঞ্চলের প্রথম মানচিত্র প্রস্তুত হয়। তাতে দেখা যায়, গয়া থেকে সেরঘাটি ও জোরিঘাট হয়ে চাতরা আসবার সে-সময়েও যে পথ ছিল, তা এই লীলাজন নদীরই উপত্যকা ধরে।

গয়া ও উত্তরভারতের গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশ থেকে ছোটনাগপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে যাতায়াতের এই ছিল তখন সোজা ও প্রধান পথ। ১৭৮২ সালে সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্যে এই পথের উন্নতিও হয়।

বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও চাতরার প্রাধান্য থাকে। ১৮৩৪ সালে হাজারীবাগ জেলার সৃষ্টি। তবুও চাতরার সে-প্রাধান্য ম্লান হয় না। কিন্তু, চার বছর পরের কথা,—১৮৩৮ সালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার হয়, ইংরাজ-সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতও সেই পথে শুরু হয়। ক্রমে বিভিন্ন রেলপথও খোলে। চাতরার প্রাধান্যও হ্রাস পায়। এখন চাতরা থেকে ইস্টার্ন রেলওয়ে গ্র্যান্ড-কর্ড লাইনের নিকটতম রেলস্টেশন কোডারমা—প্রায় ৬৬ মাইল।

১৯১৪ সালে চাতরা হাজারিবাগ জেলার এক সাবডিভিসন রূপে পরিগণিত হয়। ১৫৪৫ বর্গমাইল এর বিস্তৃতি। গভীর বন ও ছোট ছোট পাহাড়ের জালে ঘেরা চাতরা শহরের উচ্চতা সাগরবক্ষ থেকে ১,৪০০ ফুট। শহরের সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে সে-কথা মনেই হয় না।

চাতরা ছোট শহর। তবু ইতিহাসের পাতায় কখনও-সখনও এর নাম উঁকি মারে। চাতরা-দুহিতা ফল্গুর ধারারই মতন। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময় চাতরার নাম শোনা যায়। আবার, ১৮৫৭ সালে সিপাহী আন্দোলনের রক্তাক্ষরে লেখা কাহিনীতেও এর উজ্জ্বল সাক্ষর দেখি। চাতরার সরকারী রেস্ট-হাউসের পিছনের মাঠে ইংরেজ-সৈন্যদলের কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসারের সমাধির উপর স্মৃতিফলক এবং ডি-এফ্-ওর বাংলোর নিকটে ভারতীয় সিপাহীদের উদ্দেশে গঠিত স্মারকস্তম্ভ তারই প্রমাণ রাখে।

মাঠের উপর সমাধিতে লেখা :

"In this grave are buried the 56 men of Her Majesty's 53rd regiment of foot and a party of Rattary's Sikhs who were killed at Chatra on Oct. 2. 1857 in action against mutineers of the Ramgarh battalion. Lieutenant J. C. C. Daunt of the 70th Bengal Infantry and Sgt. D. Dynon of the 53rd regiment were awarded Victoria Crosses for conspicuous gallantry in the battle in which the mutineers were completely defeated and lost all their four guns and ammunitions."

এ-সবই মানুষের ইতিহাস। পৃথিবীর বুকে সদর্পে পা ফেলে চলার অস্থায়ী চরণ-চিহ্ন।

কিন্তু এরই অদূরে যুগ-যুগান্তরের আদিম অরণ্যানী। লীলাজনের বালাভূমি। কোন সে সুদূর অতীতকাল থেকে একই ভাবে গোপনে অবস্থান করে, কে জানে?

চাতরায় যখন প্রথম আসি, লীলাজনের নাম শুনলেও তার প্রকৃত পরিচয় জানি না। এ-বছরও যখন যাই, চাতরা থেকে দূরে গভীর অরণ্যাবাসে গিয়ে আমার থাকার কথা। চাতরায় ডি. এফ. ও. শ্রীঅলোককুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমার সারাণ্ডা-বনবাসের উদ্যোক্তা শ্রীচট্টরাজের সুব্যবস্থায় সব কিছুই প্রস্তুত। দুপুরে যাত্রার সময়ও ঠিক আছে। সকালে অন্য কোন কাজ নেই। চ্যাটার্জি তাঁর বন-এলাকার মধ্যে এক মনোরম দৃশ্য দেখাতে নিয়ে চলেন। জীপ চালাতে চালাতে বলেন, সে বছর এসে এখানকার লাবালং-এর জঙ্গলে ছিলেন, কিন্তু আজ যেখানে চলেছি সে জায়গা আপনার দেখা হয়নি। এমন সুন্দর দৃশ্য যে এত নিকটে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আমিও প্রথমে জানতাম না। পরে খবর পেয়ে দেখতে আসি। একবার নয়, কয়েকবারই এসেছি। সারাদিন আনন্দে কাটিয়েছি। দলবল নিয়ে বন-ভোজনও হয়েছে।

সোৎসাহে গল্প করেন, মোটরও চালান। আবার বলতে থাকেন, চাতরা থেকে সিমারিয়া যাবার রাস্তা ঐ বাঁদিকে পড়ে রইল, আমরা এবার বাগরার পথ ধরলাম। গতবার লাবালং যাবার সময় এই পথ দিয়েই তো গিয়েছিলেন। ছ'মাইল পরে এ বড় রাস্তা ছাড়তে হবে। তারপর ডানদিকে ঐ বনের ভেতর ঢোকা। সেখানে কাঁচা রাস্তায় আরও মাইল চার-পাঁচ যাওয়া। আগে চাতরা থেকে ভিন্ন আর এক পথে ছ'মাইল হেঁটে গেলেই পৌঁছানো যেত, এখন যেখানে চলেছি সেদিক দিয়ে গাড়ি যাবার উপায় নেই। তাই, জীপ যাওয়ার মত একটা পথ এই দিক দিয়ে তৈরী করানো শুরু করেছি। লোকে তাহলে সহজেই যেতে-আসতে পারবে। জায়গাটার পরিচয় দিয়ে রাখি। অল্প পরেই নিজের চোখেই তো দেখতে পাবেন। নামটা কিন্তু জমকালো ধরনের দেওয়া গেছে। লীলাজনের ক্যানিয়ন—Lilajan Canyon!

স্টিয়ারিং থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকান। হেসে বলেন, তা

বলে যেন নর্থ আমেরিকার Yellowstone নদীর কিংবা Arizonaর Colorado নদীর Grand Canyon,—বা, কি জানি, আপনার কোন হিমালয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করতে যাবেন না! এ আমাদের ছোট জায়গা,—তবু দেখবেন কত সুন্দর! মাঠের জংলী ফুলেরও যেমন বাহার থাকে—

সাহিত্যরসিক চট্টরাজ তখনি অবৃত্তি করেন,

> **Full many a gem of purest ray serene**
> **The dark unfathomed caves of ocean bear :**
> **Full many a flower is born to blush unseen,**
> **And waste its sweetness on the desert air.**

একটু থেমে মন্তব্য করেন, কিন্তু এর অজ্ঞাত-পরিচয় এবার ঘুচবে! চ্যাটার্জী এটা একটা 'টুরিস্ট-অ্যাট্রাকশান' করানোর চেষ্টায় আছেন। গত বছর আমাকে দেখিয়ে এনেছেন। সত্যি, জায়গাটা ভালই।

চ্যাটার্জী বলেন, শুধু জায়গাটাই নয়। লীলাজনেরও যে মাহাত্ম্য আছে। জানেন তো এই নদীরই গয়াতে গিয়ে নাম হয়েছে—ফল্গু ?

সেই প্রথম লীলাজনের এই পরিচয় পাই।

চ্যাটার্জী জানান, চাতরার জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে আরও দুটো ছোট ধারা লীলাজনের সঙ্গে মেশে—সিন্দুরী আর আমঝর।

চট্টরাজ বলেন, বাঃ! চমৎকার নাম তো! যেমন পাহাড়ী আদিম অঞ্চল, তেমনি সব মিষ্টি নামও—লীলাজন, সিনদুরী, আমঝর।

চ্যাটার্জী হেসে বলেন, কেবল নামেই মধুর নয়, লীলাজনের রূপেরও শোভা আছে। এই বন-জঙ্গলের মধ্যে তার একরকম চেহারা এখনি দেখবেন, আবার ওবেলা যখন প্রতাপপুরের জঙ্গলের দিকে যাবেন, তখন জোরিঘাটের কাছে দেখতে পাবেন, এই ছোট্ট নদী পাহাড় আর জঙ্গলের জটাজাল থেকে মুক্তি পেয়ে কেমন সমতলভূমির বালুশয্যায় ছড়িয়ে পড়ে। গয়ার ছ'মাইল আগে মোহনা নদী এসে লীলাজনে পড়ে, সেইখান থেকে ফল্গু নামেরও প্রচলন হয়।

কথাগুলি শুনে তখনই হঠাৎ মনে আসে—ফল্গু—গয়া—লীলাজন! এসব নাম তো আধুনিক নয়। ঠিকই তো, বুদ্ধদেবের জীবনীতে আছে বটে, উরুবিল্ব গ্রামে কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন ও আধুনিক বোধগয়ায় বোধিতরুতলে ধ্যানাসনে বসেন।

প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে তাই বারংবার এই নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পালি ভাষায় নাম হয়,—নেরঞ্জনা। প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ এই নদী পার হয়ে গয়া নগরে প্রবেশ করেন। চীনা উচ্চারণে গয়ার নাম হয়ে যায়,—'কিয়া-য়ে' আর নেরঞ্জনা হয়,—'নিলিয়েন সেন্'।

সেই নৈরঞ্জনাই লোকমুখে 'নিরাজনা'—'নিলাজনা'—ক্রমে লীলাজনই হয়। ভেবে আনন্দ জাগে, এখন চলেছি সেই পবিত্র নদীরই বাল্যভূমিতে।

চ্যাটার্জিকে কৌতূহলী প্রশ্ন করি, ফল্গুর উৎস তা হলে এইখানে ?

চ্যাটার্জি বলেন, যেখানে এখন যাচ্ছি, সেটা উৎস নয়। ঠিক যে জায়গা থেকে এ নদী বার হয়, তা আরও কিছু দূরে, এই চাতরা সাব্ ডিভিসনেই। বলেন তো এখান থেকে সেখানেও যাব, কিন্তু—

কথা থামিয়ে কি যেন ভাবেন। পরে বলেন, যাবেন কি সেখানে? তাই ভাবছি।

প্রশ্ন করি, আপনার কোনো অসুবিধা আছে? তা হলে না হয় থাক।

না, না,—অসুবিধে আমার কোন কিছুই নেই। মোটরে যেতে অল্প সময়ই লাগবে,—আর হাজারিবাগ ডালটনগঞ্জ মেন রোডের ওপরেই, হাঁটতেও হবে না,—সে কথা নয়। কিন্তু সে উৎস দেখে হতাশ হবেন নিশ্চয়। যে জায়গায় এখন চলেছি,—তারপর সেটা দেখা, আকাশ-পাতাল তফাত—

চট্টরাজ বলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে bathos! তা হোক, তবু দেখতে হবে বইকি!

চট্টরাজ চুপ করে কি ভাবেন। তারপর বলেন, দেখুন, এ জগতে মানুষের কত কীই না অজানা থাকে। চাতরার এই লীলাজনও যেমন লোকচক্ষুর আগোচরে থাকে, তেমন এখানকার সরকারী দপ্তরেও মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বহস্তে লেখা কাগজপত্র এখনও আছে—কেউ কি জানে?

আশ্চর্য হয়ে বলি, তাই নাকি? এখানে এল কি করে?

চট্টরাজ বলেন, কেন? মনে নেই আপনার? তাঁর জীবন-চরিতেই তো আছে, রামমোহন ১৮০৫ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত সরকারী চাকরি করেন। সিভিলিয়ান ডিগ্বি সাহেবের অধীনে। ১৮০৫ থেকে ১৮০৮ পর্যন্ত তখনকার এই রামগড় জেলার দপ্তরে ছিলেন। তারপর ভাগলপুরে ও রঙপুরে কাজ করেন। বর্ধমান মহারাজার সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় তার জবানবন্দিতে রামমোহন নিজেই সে কথা বলে গেছেন। প্রথমে সামান্য কেরানী হয়ে ঢুকলেও নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি কর্মকুশলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে দেওয়ানী পদও পান। জজের ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারিকে সে-সময়ে 'দেওয়ানি' বলত;—জানেন নিশ্চয়? তাই-ই ছিল সেকালে আমাদের দেশীয়দের পক্ষে সরকারী সবচেয়ে উঁচু পদ। রামমোহন তাঁর বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ও কেনোপনিষদের চূর্ণক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। ডিগ্বি সাহেবের সম্পাদনায় তা প্রকাশিত হয়। সাহেব তাঁর ভূমিকায় রামমোহনের ভূয়সী সুখ্যাতি করেন। রামমোহন রামগড়ের তখনকার কেন্দ্র শহরঘাটি—এখন বলে সেরঘাটি—চাতরা থেকে গয়া যাবার পথে—সেইখানেই থাকতেন। পরে দপ্তর চলে আসে সেই চাতরায়। তাঁর অন্য আর কোনো স্মৃতিচিহ্ন এ অঞ্চলে আছে কি না জানি না,—তবে এই চাতরার—কিংবা এখন হয়ত সদরে বা পাটনার দপ্তরে তাঁর হাতে-লেখা কাগজপত্র এখনও আছে, শুনেছি। কিন্তু আমাদেরই এই লীলাজনের মতন তাদের গুপ্ত অবস্থান! এগুলি দেশের সম্পদ,—ভালভাবে রক্ষা হওয়া উচিত,—কিন্তু এখনও এ বিষয়ে কোন কিছু হয়েছে বলে তো শুনিনি।

আশ্চর্য হয়ে চট্টরাজের কথাগুলি শুনতে থাকি।

কাঁচা রাস্তায় গাড়ি ঢোকে। নামেই পথ। জীপ বলেই চলতে পারে। উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো! বনের মধ্যে—পায়ে-চলা পাহাড়ী পথ। লাফাতে লাফাতে ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি চলতে থাকে।

চট্টরাজ হেসে বলেন, হল ভাল। সকালের ব্রেকফাস্টটা, এরই মধ্যে বিলকুল হজম। আজ দুপুরে চক্রবর্তীর বাড়িতে নেমন্তন্নর পাটটা জমবে ভাল।

চ্যাটার্জি আশ্বাস দেন, সঙ্গে এখানেও মিষ্টি এনেছি—ভয় নেই!

দুপাশে ছোট ছোট গাছের ঝোপ। আঁকা-বাঁকা বড় পলাশ গাছ। লাল ফুলে যেন আগুন লেগেছে বনে বনে। হঠাৎ চ্যাটার্জী গাড়ি থামান। হাতের ইশারা করে পথের পাশেই ঝোপের ফাঁকে দেখান। পাঁচটা ময়ূর। গাড়ির শব্দ পেয়ে পা দুলিয়ে লম্বা পা ফেলে ছুটে পালায়। মাটিতে ঝড়ে-পড়ে রাঙা পলাশ। তাই মাড়িয়ে চলে রঙিন-দেহ ময়ূরের দল। সকালের রোদ গায়ে লেগে নানা রঙের ছটা ছড়ায়। যেন, আবীর-ছাওয়া রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরা নর্তকীর দল।

মনে পড়ে, এই তো কয়েক বছর আগেও হরিদ্বার, দিল্লী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে যেতে রেলপথের দুপাশে মাঠে কত ময়ূর, হরিণই না ঘুরে বেড়াতে দেখেছি! এখন আর দেখাই যায় না। মানুষে মেরে, ধরে, খেয়ে উজাড় করে দিল। এমন সুশ্রী পক্ষীরও মাংস খায়! ভাবতেই কেমন লাগে! কিছুকাল আগে এক বিদেশী শিকারী ভারতে আসেন শিকার করতে। আমাদেরই স্বাধীন সরকারের আমন্ত্রণে। তাঁর লেখা বইয়ে এই ময়ূরের মাংসের স্বাদের লালসাতুর দীর্ঘ উচ্ছ্বাস পড়ি। বইখানি শেষ করবার আগ্রহও হারাই।

পথের অদূরে কয়েকটা চালাঘর। আদিবাসীদের ছোট গ্রাম।

জীপ আরও এগিয়ে চলে। মাঝপথে ছোট পাহাড়ী নদী। পুল নেই। নদীর বুকে জীপ নামে। পাড়ের কাছে সামান্য ঝিরঝিরে ধারা। জলের নীচে বালির চিকিমিকি। সেই ক্ষীণধারাও ক'হাত দূরে দেখি মিলিয়ে যায়। সেখানে নদীর বুক জুড়ে বালুচর।

চ্যাটার্জি বলেন, এই লীলাজন। এরই আরও খানিক নীচের দিকে আমাদের গন্তব্যস্থান,—ঐ সামনের পাহাড়গুলোর মধ্যে। পায়ে হেঁটে নদী ধরে এখান থেকে নিশ্চয় যাওয়া যায়, আমরা যাব মোটরে চড়ে ঘুরে। এখানেও দেখছেন ফল্গুর সেই বিশেষত্ব—অলক্ষে বয়ে যাওয়া ধারা? এইখানে জল, আবার ঐ ওখানে নদীর সারা 'বেড্' শুকনো। অথচ, অল্প বালি খুঁড়লেই নীচে পরিষ্কার জল। এই এ নদীর জন্মগত স্বভাব, এইভাবে তার জীবনও শেষ হয়!

কৌতূহল জাগে। প্রশ্ন করি, ভাল কথা;—লীলাজন তো এখন দেখছি, এর উৎসও পরে দেখব। জোরিঘাটের নিকটে আজ বিকেলে এ নদী পারও

হব। গয়ার ফল্গুও দেখা তারপর এ নদী গেল কোথায় ?

চ্যাটার্জি জানান, সেইটেই তো এর দুর্ভাগ্য। গয়ায় এর এত খ্যাতি, অথচ খবর এর আর কম লোকেই রাখে। সমতলভূমিতে এর বালির বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু নিজের নাম ক্রমশঃই লুকিয়ে ফেলে। নিজের গোপনে বয়ে-যাওয়া ধারার মতন। কিউল স্টেশনের কাছে কিউল নদ দেখে থাকবেন নিশ্চয় ? তারই সঙ্গে মিশে মুঙ্গের জেলায় লক্ষ্মীসরাই-এর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে গঙ্গায় গিয়ে আশ্রয় নেয় এই নদী।

গল্প চলে, জীপও চলে। পাহাড়ী উঁচু-নীচু পথে আরও কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামে। মাঠের উপর দুটো চালাঘর। চ্যাটার্জি বলেন, চলুন-এবার আধ মাইলটাক হাঁটাপথ।

চট্টরাজ হেসে বলেন, গাড়ির যা ঝাঁকুনি, এর চেয়ে পায়ে হাঁটা আরামের।

ছোট ছোট ঢেউ-খেলানো পাহাড়। মাঠের শেষে অল্প জঙ্গল। তারই ভিতর দিয়ে ঢালু পথে নীচে নামা।

কিছুদূরে যেতেই দুদিকের পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকা দেখা দেয়। আশ-পাশে রাশীকৃত শিলাস্তূপ। কিন্তু উপত্যকার সাবা মেঝে উপর থেকে দেখায় যেন বিরাট একখণ্ড পাথর দিয়ে বাঁধানো।

চ্যাটার্জি বলেন, ঐ লীলাজনের বেড়্।

ঢালু বাকি পথটুকু নামতে নামতে ভাবি, কিন্তু নদীর জল কই ? এখানেও কি বালির বদলে পাথরের নীচে অন্তঃসলিলা ?

দু'পাড়ে সমান্তরালে ছোট পাহাড়। মাঝখানে দু-তিনশ হাত চওড়া ভ্যালি। লম্বাতেও চার-পাঁচশ' গজ দেখা যায়। যেন, সিমেন্ট-করা খেলার জায়গা। দূর থেকে দেখি, তারই মাঝখানে লম্বালম্বি একটা ফাটল। পাথরের উপর যেন বিশাল দীর্ঘ এক সর্পদেহ। নিকটে পেঁছে ব্যাপারটা বুঝি। সেই ফাটল তিন-চার হাত চওড়া, কোথাও বা তার বেশি। ফাটলের ধারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখলে দেখা যায়, দশ-বারো ফুট নীচে সেই ফাটলের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে নদীর ধারা বয়ে চলে। জানি না, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা ভূমিকম্পের ফলে এমনভাবে পাথর ফেটে নদীর পথ হয়েছে কিনা। অথবা, হয়ত বহুকাল ধরে জলধারার অবিরাম তীব্র গতিবেগে দুপাশের পাথর গভীর-ভাবে কেটে খাদের মধ্যে নদী নিজেই আপন পথ করে নেয়। জীবনে মুক্তি লাভের কতই না প্রচণ্ড আবেগ! তরল জলও কঠিন পাথর কাটে!

খাদের দুই পাশের গায়ে নানান বিচিত্র আকারের পাথরগুলি জলের বেগে ক্ষত-বিক্ষত, ক্ষয়িত, ক্ষরিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। এক এক জায়গায় স্তরে স্তরে যেন ধাপের মত ফাটা। কোথাও পাথরের ফাটলে, বা পাথর আঁকড়ে, আঁকাবাঁকা ছোট গাছ, যেন পাথরেরই বিকৃত অংশ। সেই গভীর খাদ, বিভিন্ন আকারের ও বহু বর্ণের পাথর, তারই সুড়ঙ্গপথে বয়ে-যাওয়া জলের ধারা,—কখনও স্থির, কখনও সচল,—কোথাও জলের ছায়াচ্ছন্ন কালিবরণ, কোথাও বা

স্বচ্ছ সুনীল স্ফটিকদীপ্ত,—সব মিলে এক অপরূপ সৌন্দর্য-রাজ্যের সৃষ্টি করে।

খাদের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবি, বিন্ধ্যগিরির এ কী প্রাচীন অথবা নবীন রূপসজ্জা? সেই কোন্ যুগযুগান্তর পূর্বে সূর্য থেকে স্খলিত অংশ হতেই কি এই বিচিত্র ভূভাগের সৃষ্টি, কিংবা আধুনিককালের এ কোন প্রাকৃতিক খামখেয়াল?

হঠাৎ এক অদ্ভুত শব্দে চমকে উঠি। খাদের মধ্যে থেকে পায়রার ঝাঁক সশব্দে বেরিয়ে আসে। চোখের পলকে বিদ্যুৎ-চমকের মত গতি ও রঙের রেখা টেনে আকাশে উড়ে যায়।

চ্যাটার্জি বলেন, খাদের পাথরের খাঁজে যেমন পায়রার বাস, তেমনি আবার জলেও মাছ।

চট্টরাজ উৎসাহী মৎস্য-শিকারী। চ্যাটার্জি সমধর্মী দেখি। সাগ্রহে আলোচনা চলে, কি মাছ, কোন্‌খানে থাকতে পারে, পরের বার ছিপ এনে কোথায় বা বসা চলে। জলে পাথর ফেলে জানবারও চেষ্টা করেন। দেখান জল যেখানে স্থির, গভীরতাও সেখানে তত বেশি।

চট্টরাজ মন্তব্য করেন, যেমন গভীর-জ্ঞানী মানুষও!

চ্যাটার্জি বলেন, লোকে বলে এরই মধ্যে এক জায়গায় নাকি ছোট মেছো কুমীরও থাকে। আমার নজরে কখনও পড়েনি।

ঘুরে ঘুরে নদীর ধারে বেড়াতে থাকি,—পাথরের গা বেয়ে, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলি। স্থানটি নিভৃত, নির্জন মনোরম। দর্শনীয় নিঃসন্দেহ।

চ্যাটার্জি জানান, এ জায়গাটার নাম—খাউ বন্দারু বা খয় বনারু। হয়ত পাথর ক্ষয়ে নদী চলে, তাই 'খয়'। আর বন্দারু বা বনারু হোল নিকটের গ্রামটার নাম। এখানে কেউ কেউ নদীটাকেও সেই নামে বনারু নদী বলে।

স্থানটির বিশদ পরিচয় পরে Bihar District Gazetters—হাজারিবাগ খণ্ডে পাইও। তাতে লেখে ঃ

"Khaya-Banaroo - This is a beauty spot about six miles South-west of Chatra town···The scenery is exquisite with deep forests and hills. The Banaroo stream cuts its way through the rocks and at places has cut terraces with balconies out of stone walls on its banks. The deep gorge with numerous shapes in the stones that form the wall of the two sides of the gorge is a rare sight. At places it looks as if the portions of trees has been transformed into rocks···The rocky river bed is also peculiar."

এর পর খয়-বনারু থেকে লীলাজনের উৎস দেখতে চলি! জীপ-এ বসে

আবার বড় রাস্তায় ফেরা। লাবালং বনে ঢোকবার পথ ছেড়ে এসে বাগরার মোড়ে পৌঁছানো। এখানে সিমারিয়ার দিক থেকে সেই হাজারিবাগ ডালটনগঞ্জের মেন রোড এসে মেশে। সেই পথ ধরে জীপ চলে। সিমারিয়া পৌঁছুবার মাইল চারেক আগে পথের পাশেই বাঁদিকে একটা বড় পুকুর। বেলগাড্ডা গ্রাম। পুকুরের পাড়ের অপর দিকে অল্প নীচে খানিকটা জলাজমি। লতা ও ঘাসে ভরা। সেইখান থেকে একটা ক্ষীণ জলধারা বেরিয়ে আসে। ঢালু মাঠের গা বেয়ে নেমে চলে। অতি সাধারণ ছোট নালা। চ্যাটার্জি দেখিয়ে বলেন, এই হল লীলাজন বা ফল্গুর উৎস। এই জলাটার তলায় হয়ত ঝরণা—স্প্রিং থাকতে পারে, জল কখনও শুকোয় না। পুকুরের পাড়ের মাটির নীচে এ-পাশে জলাতে জল আসাও বিচিত্র নয়। কত লোক মোটরে, বাসে বাসে ঐ বড় রাস্তা দিয়ে যায়, পথের পাশেই যে এই নদীর উৎস, কেউই খবর রাখে না। অবশ্য, এখানে দেখবার মতনও কিছুই নেই। কারও নজরে পড়বার কথাও নয়।

ভাবি, গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-নর্মদার মতন এর উৎপত্তিস্থলে নাই-ই হল কোন মন্দির-প্রতিষ্ঠার গরিমা, তবুও এই-ই তো সেই নৈরঞ্জনা! বুদ্ধদেবের পুত-স্নানোদক-দাত্রী। গয়া তীর্থক্ষেত্রে এই ফল্গুরই তো কত মাহাত্ম্য!

কৃতপিণ্ডঃ ফল্গুতীর্থে পশ্যেদ্দেবং পিতামহম্।
গদাধরং ততঃ পশ্যেৎ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ॥

ফল্গুতীর্থে পিণ্ডদানে মহাদেবকে দর্শন হয়। গদাধরকে অবলোকন করে মানুষ পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়।

আবার,—

ফল্গুতীর্থে নরঃস্নাত্বা দৃষ্টবা দেবং গদাধরম্।
আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশপূর্বান দশাববান্॥

ফল্গুতীর্থে স্নান করে এই গদাধর দেবের দর্শন পেয়ে মানুষ পূর্বতন দশ পুরুষ অধস্তন দশ পুরুষ এবং স্বয়ং এই একবিংশতি পুরুষকে ত্রাণ করতে পারে।

এই তীর্থে পিণ্ড দানের অত্যদ্ভুত প্রথা। পিণ্ডদাতা জীবিত মানুষ,— আপন পিণ্ডও দান করে। ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান—সকলেরই পিণ্ডদান। সীমাহীন অক্ষয় শান্তির অনুষ্ঠান।

ফল্গুর এমনি বিপুল প্রভাব! তবু, কে ভাবতে পারে সেই মুক্তিদাত্রী পুণ্যতোয়া নির্ঝরিণীর এমনি দীনহীন জন্মভূমি।

কিন্তু, তখুনি মনে হয়, ফল্গুর জন্মস্থান যেমনি হোক না কেন, তার শিশুকালের ডাকনামটি কত মধুর। কোন্ স্নেহময়ী জননী কবে কোন্ কালে আদর করে সর্বপ্রথম একে ডাকেন লীলাজন নামে, কে বলতে পারে? মায়ের কোল ছেড়ে শিশু খিলখিল হেসে পালিয়ে যায়। বালিকা-বয়সে লুকোচুরির খেলা শুরু বালুচরের সঙ্গে। তাই বুঝি শৈল্যরূপী পিতা

কঠোর বাঁধনে বাঁধতে চান চপলমতি কন্যাকে খাউ-বনারুতে। পাষাণের সে শিকলও কেটে লীলাজন আবার পালায়। আবার শুরু করে তার আজন্ম-স্বভাব লুকোচুরি খেলা। নতুন নাম নেয়—ফল্গু। নামই শুধু বদলায়, আপন স্বভাব ছাড়ে না। অন্তঃসলিলা নদীর গুরুগম্ভীর খ্যাতি ছড়ায়। কিন্তু, মুখে তার তেমনি ঝিরঝিরে ধারার সরল খিলখিল হাসি। সেই বালুচরের অন্তরালে গোপন খেলা চলতেই থাকে। এই বিরাট বিশ্বে হঠাৎ-বিখ্যাত নদীর শেষ পরিণতির কথা লোকের মনে হারিয়ে যায়। অলক্ষ্যে বয়ে-যাওয়া সেই ক্ষীণকায়া ধরা যেন চিরতরে আত্মগোপন করে। শুধু অমর হয়ে থাকে মানসলোকে কবির কাব্যজগতে—

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা ॥

যেখানে বাঘের ভয়

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।'—অনেক কালের জানা কথা। কতবার ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে হঠাৎ অবাঞ্ছিত কেউ এসে গেলেই প্রবাদটি স্মরণ হয়েছে। যা এড়াবার ইচ্ছা, তাইই যেন অতর্কিতে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে—বাঘের মতন। আজ যে ঘটনাগুলি বলছি, এও প্রায় সেই ধরনেরই ব্যাপার। তবে, যেখানকার ঘটনা, সেখানে প্রকৃতই বাঘের ভয়। এককালে বাঘ শিকার করতে বিহার প্রদেশের সেইখানেই যেতেন সাহেবসুবারা, রাজা-জমিদাররা, উৎসাহী সাহসী শিকারীরা।

আমি সাহেবও নই, রাজা-জমিদাবও নই, শিকারীও নই। তবে, সে-সব দিনও নেই, ও-সব লোকও নেই। ঘুরে বেড়াই মনের আনন্দে। দিন কাটে শান্ত নির্জন নিভৃতির অন্তরালে। সুদূর হিমালয়ে বা গহন অরণ্যে। অথবা লোকালয়ে বাধ্য হয়ে এলে, ঘরের নিরালা এক কোণে। মনের গোপন কথা বলি। বনের পশু আমার মনে ভয় জাগায় না। ভয় করি শুধু মানুষকেই। কথাটা হয়ত ঠিক বলা হল না। মানুষ-সঙ্গও আমার ভাল লাগে। ভয় করি তাব পশু-স্বভাবকে। যেখানে সে বন্যপশুর চেয়েও হিংস্র, ক্রূর, পরশ্রীকাতর, মদমত্ত, লোভাতুর। অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে দ্বিধা করে না। দেশের স্থানবিশেষে দেখি, অসহায় নিরস্ত্র লোকের প্রাণ নিতেও মানুষের এখন বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ নেই।

কিন্তু, থাক ও-সব প্রসঙ্গ।

একা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসি হাজারিবাগে। আসার কারণও থাকে। সেই ক'বছর আগে 'সাতশ' পাহাড়ের দেশ—সারাণ্ডার গভীর জঙ্গলে আমার নিভৃত-বাসের উদ্যোক্তা চট্টরাজ এখন হাজারিবাগে। আবার প্রলোভন দেখান—বিহারের অন্য বনগুলিও ঘোরবার আয়োজন প্রস্তুত। অতএব সশরীরে হাজিরও হই।

চট্টরাজের ছোটখাটো হৃষ্টপুষ্ট দেহ। মুখে চোখে দিল-খোলা হাসির লহরি। সরকারি চাকরি-জীবনের নানান রসাল কাহিনী। আসর-জমানো অফুরন্ত গল্পগুজব। ভুরি-ভোজের অঢেল আয়োজন তো আছেই। পরিবার-বর্গের আন্তরিক আতিথেয়তাও। আপন-ঘরের ও শহরের মায়াজালে বৃথাই আমাকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করেন। তাগিদ দিই বনে যাবার জন্যে। জরুরী সরকারী কাজে তাঁর বাধা সৃষ্টি করে। বলি, কোথাও গভীর বনের মধ্যে আমাকে রেখে দিয়ে চলে আসুন। তাহলেই আমি খুশী।

ব্যবস্থাও সেইমতই হয়। দুজনে মটর নিয়ে চাতরায় চলি।

হাজারিবাগ থেকে ডালটনগঞ্জ যাবার পথে ত্রিশ মাইল গিয়ে সিমারিয়া। সেখানে এ-পথ ছেড়ে ডানদিকে অপর আর এক পথ ধরা। ১৩ মাইল গিয়ে

চাতরা। সিমারিয়ার মোড়ের নিকটে বাঁদিকে একটা টিলার উপর ফরেস্ট দপ্তরের সুন্দর রেস্ট হাউস। রাত কাটানোর কথা সেইখানেই। তবু নামি না। সোজা চলি চাতরায়। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছেও যাই।

চাতরা এককালে রামগড়-রাজার এলাকায় ছিল। এখন হাজারিবাগ জেলার সাবডিভিসন শহর। অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। তারই মাঝে ছোট শহর। দেখে বোঝাই যায় না ১,৪০০ ফুট উঁচুতে এর অবস্থিতি। বন কেটে বসতি। এখনও শহরের চারিদিক ঘেরা বন। কিছুকাল আগেও এইসব জঙ্গল বাঘ-শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন বনের বুক চিরে ঘুরে ঘুরে চলে চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা। যেন, যোগাসীন মহাদেবের ভস্মমাখা দেহ ঘিরে বিরাট অজগর সাপ। লকলকে জিভ নেড়ে কর্দয শব্দ তোলে। হাঁ-করা মুখের ভিতর ক্ষণে ক্ষণে ছুটে চলে ট্রাক লরি জীপ মোটর। বনের পশুও ভীত-চকিত হয়ে আশ্রয় নেয় গভীরতর বনের নিভৃততম অঞ্চলে। কিন্তু সব প্রাণীই নয়। শুধু যেগুলি অস্ত্রধারী মানুষের হাত থেকে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে থাকে।

'এ-সব জঙ্গলে—এমন কি মোটর পথেও বাঘ দেখা যেত হামেশাই। এখন ক্বচিৎ কখনো ছিটকে চলে আসে। আসবেই বা কোথা থেকে? জানোয়ারের ভয় এখন আর এ-সব জঙ্গলে বিশেষ নেই। আগেকার তুলনায় আছেই বা কটা! একসময়ে শিকারীদের এটা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। স্পোর্টসের নামে হত্যা হয়েছে অনেক। সব চেয়ে বেশি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। যেসব সেনাদল এখানে থাকত, তাদের হাতে ছিল মারণাস্ত্র, আর বনে ছিল বাঘ, ভালুক, হরিণ ইত্যাদি। তখন নাকি প্রাণীহত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছিল শুনেছি। প্রায়ই দেখা যেত গরুর গাড়ির ওপর মরা বাঘ বা বিরাট সম্বর—পিছনে আসেন বীর সৈনিক—হাতে রাইফেল, মুখে বিজয়গর্ব, ঠোঁট-বাঁকানো হাসি। তখনি এই জঙ্গলে প্রাণী-জগতের সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। এ-ছাড়া, আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের বলে 'পোচারস্' (Poachers)—লুকিয়ে বনে ঢুকে জন্তু মারে;—চোর শিকারী। তারাও ক্ষতি করে যথেষ্ট। এখন এ-সব রিজার্ভড্ ফরেস্ট—সংরক্ষিত বন বলে ঘোষিত হয়েছে, তাই প্রাণী-শিকারও আইনতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু 'পোচিং' সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারা গেছে—তা বলতে পারি না।'—কথাগুলি বলেন, দক্ষিণ চাতরার ডি. এফ. ও.—শ্রীঅলোককুমার চট্টোপাধ্যায়। অরণ্যের প্রতি তাঁর সুগভীর সহানুভূতি। কর্মজীবনের শুধু কর্তব্যবোধেই নয়, এ তাঁর মর্মান্তিক বেদনার কথা। বনজীবন তিনি প্রকৃতই ভালবাসেন।

ডি. এফ. ও.-র বাড়ির বিরাট কম্পাউণ্ড। গেট খুলে ঢুকতেই প্রকাণ্ড কুকুর হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এগিয়ে আসে। তার প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে দেখে লেজ নেড়ে আশপাশে ঘোরে। গেটের বাইরে তাই নোটিস বোর্ড ঝোলে—Beware of dogs! ছিমছাম বাড়ি। সাজানো-গোছানো বসবার ঘর। দেওয়ালে টাঙানো বন্য জীবজন্তুর ফটো বা হাতে-আঁকা ছবি। মাণ্টলপিসে

নকশা-আঁকা মাটির ফুলদানি। র‍্যাকে সাজানো সাহিত্যের বই, বন-জঙ্গলেরও। ধূমায়মান কফির কাপ হাতে সোফায় আরামে বসে ক'জনে গল্প করি। যেন, শহরের শৌখিন আবহাওয়ার মাঝে সোনার খাঁচায় ধরে-রাখা বনের কটি পাখি। সবারই বনমুখী মন।

সঙ্গী আছেন চট্টরাজ ও তাঁর বন্ধু চক্রবর্তী। চক্রবর্তীও চাতরার এক বড় অফিসার। বন-ঘেরা এ শহরে থাকতে বাধ্য হয়েও অরণ্যের অমোঘ মোহ তাঁরও মন ছেয়ে রাখে। সুযোগ পেলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বনে বনে ঘুরতে, অথবা মোটরেই কোথাও লম্বা পাড়ি। দুঃখ জানিয়ে বলেন, এখন কাজের চাপ, ছুটি নেবার উপায় নাই। না হলে একসঙ্গে বনের মধ্যে কাটিয়ে আসতাম আনন্দে। তবু সেটা সম্ভব না হলেও যে-জঙ্গলেই যান, গিয়ে পেঁৗছে দিয়ে আসব।—চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, কোথায় বনবাসে এঁকে পাঠানো যায়, বলুন।

চট্টরাজ, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি—যেমন নামে মিল, তেমনি সম-উৎসাহী। তিনজনে পরামর্শ শুরু করেন। আমি শুধু বলে রাখি, যেখানেই পাঠান, যেন গভীর বন হয়, লোকালয়ের ছোঁয়াচ না থাকে।

চাতরা অঞ্চলের ফরেস্ট রেস্ট হাউসগুলির একে একে নাম ওঠে।

সিমারিয়ার বাংলো ?—ও তো রাজপথের ওপর। নিকটে বনও নেই।

লাবালং-এর রেস্ট হাউস ?—হ্যাঁ, বনের মধ্যে ঠিকই। কিন্তু এই তো দেড় বছর আগে কদিন ওখানে কাটিয়ে এলাম। একটা খরগোশ ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ার দেখিনি। নতুন জায়গার নাম করুন।

চ্যাটার্জি বলেন, তবে নর্থ চাতরার এলাকায় গিয়ে থাকুন। সেদিকে নাম-করা জঙ্গল,—প্রতাপপুর।

চক্রবর্তী সাগ্রহে বলেন, তাহলে ওদিকে ঘাংরিয়ার বাংলোতে থাকবেন চলুন। নতুন বাংলো। একেবারে লীলাজন নদীর ওপর। সুমুখেই প্রকাণ্ড চর। চমৎকার দৃশ্য। ইলেকট্রিকও হয়েছে। আরামে থাকবার সব ব্যবস্থাই আছে,—খাসা থাকবেন সেখানে।

চট্টরাজ সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ?

চক্রবর্তী বলেন, তাও হয়ে যাবে। গ্রাম দূরে নয়। চৌকিদারই সব ঠিক করে দেবে।

চ্যাটার্জি জানান, সে-ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। কিন্তু বাংলো খালি আছে কিনা খোঁজ নিতে হয় একবার।

আমি জানাই আমার কিন্তু মনোমত হচ্ছে না, বুঝতে পারছি, জঙ্গলের ভেতরে নয়, বাইরে একপাশে। বলেছি তো গভীর বনের মধ্যে থাকতে চাই।

চ্যাটার্জি বলেন, তাহলে আরও এগিয়ে গিয়ে সেই প্রতাপপুরে থাকুন।

কিন্তু, তখনি জানতে পারি, প্রতাপপুরেও এখন অনেক লোকের বাস। বাংলোয় বসে মনেই হবে না, জঙ্গলের মধ্যে আছি। কাছাকাছি বনও পাতলা হয়ে গেছে।

অগত্যা চ্যাটার্জি বলেন, তাহলে আপনার পক্ষে সব চেয়ে ভাল,—হিন্দিয়ার রেস্ট হাউস। চারপাশেই গভীর জঙ্গল। ছোট ছোট পাহাড়। চাতরার ওদিকের শেষ বাংলো। হাজারিবাগ জেলারও শেষ। ওর পরই শুরু—পালামৌর জঙ্গল। লোকজনের মুখ দেখতেই পাবেন না। অল্প দূরে ছোট্ট একটা বসতি। খাবার-দাবারও সব সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কিছুই পাওয়া যায় না সেখানে। হয়ত আলু পেতে পারেন। বাংলোটা অবশ্য ভাল। নতুনও। ইলেকট্রিক ওখানে থাকবার কথাই ওঠে না। চান তো এখান থেকে বা প্রতাপপুর থেকে একটা পেট্রোমাক্সের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। রিজার্ভেশনেরও প্রশ্ন নেই। ও-বাংলো খালিই পড়ে থাকে। ওখানে আর শখ করে যাচ্ছে কে? বাধ্য হয়ে অফিসাররাই ক্বচিৎ কখনো যান। আমার এলাকা না হলেও আমি কয়েকবারেই ঘুরে এসেছি—খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, ভীষণ নির্জন! একটা লোক পাবেন না কথা বলবার, যে কদিন থাকবেন।

উৎফুল্ল হয়ে জানাই, এতক্ষণে মনের মত জায়গার সন্ধান দিলেন।—চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলি, বনবাসে ছেড়ে আসবার আয়োজন এবার করুন। পেট্রোম্যাক্সের প্রয়োজন নেই। অত জোরালো আলো বনে মানায় না। লণ্ঠন নিশ্চয় পাওয়া যাবে? তাতেই স্বচ্ছন্দে কাজ চলবে? কালই চাল ডাল বেঁধে নিয়ে রওনা হই। কখন বেরুতে পারবেন, বলুন?

চক্রবর্তী জানান, সকালে এখন আমার কোর্ট। কাজ সেরে দুপুরে রওনা হওয়া যাবে। হিন্দিয়ার কথা অনেক শুনেছি। তবু এখনও যাওয়ার সুযোগ পাইনি। এবার পথটা দেখে আসা যাক।

হঠাৎ কি ভেবে একটু গম্ভীর হন। প্রশ্ন করেন, সঙ্গে 'ফায়ার আর্মস্' (Fire arms) আছে তো?

হেসে ফেলি। বলি, না, কোন কিছুই নেই। কখনো রাখিও না। প্রয়োজনও বোধ করিনি। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে—বিশেষতঃ হিমালয়ে—কতবার যাতায়াত করতে হয়েছে; জন্তু-জানোয়ারও হঠাৎ দু-একবার দেখেছিও, তবু, কেন জানি না, জানোয়ারের ভয় কখনও মনে জাগেনি,—এখানেও নির্ভয়ে কাটবে, নিশ্চিন্ত থাকুন।

তবু, মুখে দুশ্চিন্তার রেখা টেনে তিনি বলেন, একটা কিছু কাছে থাকলেই ভাল ছিল। সেই ঘোর জঙ্গলে একেবারে একা থাকবেন। কি করে কাটাবেন বুঝতেই পারি না।

চ্যাটার্জি হেসে বলেন, উনি আমারই মত ফরেস্টরই লোক বুঝতে পারছেন না?

চট্টরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, যাক, আপনার বনবাসের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। কাল খাওয়ার জিনিসপত্র দেখেশুনে কিনে যাত্রা করা যাক। একটু বেশি করেই সঙ্গে রাখবেন, উপোস করতে না হয়। বলেছিলাম না,—চ্যাটার্জি-চক্রবর্তী একসঙ্গে মিললেই

সুব্যবস্থা একটা হবেই।

হেসে বলি, ত্রি-মূর্তির চট্টরাজকেও বাদ দেবেন না!

পরদিন দুপুরে আড়াইটের পরই যাত্রা করা হয়। জীপের চালক চক্রবর্তী স্বয়ং। চালনায় আনন্দ পান, চালানও ভালই। চট্টরাজ বলেন, আমি কিন্তু বসছি আপনাদের দুজনের মাঝখানে। খাওয়াটা আজ বেশিই হয়ে গেছে, মাংসটা শেষে আবার একবার না নিলেই হত। খাওয়ার পর আমার একটু লম্বা হওয়ার অভ্যেস। মোটরে বসেই ঝিমোতে হবে। আপনি তো দেখতে দেখতে যাবেন, ধারেই বসুন—সেই সারাণ্ডার জঙ্গলে যাবার মতন। তবে, সেটা ছিল গভীর রাত, আর এখন বেলা দুপুর। তরিতরকারি এখান থেকেই কিনে নেবেন তো?

তাই-ই করা হয়। কতটুকুই বা আমার প্রয়োজন? অল্প চাল, ডাল, আটা, আলু, বেগুন, টমাটো ও মশলা।

চক্রবর্তী বলেন, প্রতাপপুরে ভাল ঘি পাবেন, সেখান থেকে নেবেন।

শহর ছাড়িয়ে মোটর ছোটে। চাতরা থেকে এ-পথ জোরিগ্রাম, হাণ্টারগঞ্জ হয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে মেশে এবং তারপর শেরঘাটি হয়ে গয়া চলে যায়। পিচ-ঢালা ভাল রাস্তা। কিন্তু আমাদের এ-পথ ধরে যাওয়া ঐ জোরিগ্রাম পর্যন্ত। মাইল দশ-বারো মাত্র। তারপর সেখান থেকে ফরেস্ট রোড ধরা।

শহর ছাড়তেই শুরু হয় দুপাশে জঙ্গল, ছোট ছোট পাহাড়। হাজারিবাগ জেলার এই অঞ্চলের ভূভাগ পার্বত্য অধিত্যকার মতন। মাঝে মাঝে পাহাড়ের শ্রেণী। তারই মধ্যে কোথাও সমতলভূমি। সেইখানেই আবার লোকের বসতি। চাষ আবাদও। মানুষ আর বনের মধ্যে এখানে যেন নিবিড় সম্পর্ক। অঙ্গাঙ্গীভাব। বনের পাশেই মানুষের ঘর। শুনি বিন্ধ্য-পর্বতেরই পূর্ব সীমান্ত এই অঞ্চল। ৮০০ থেকে ১৪০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু-নীচু এই বিশাল ভূমি যেন ঢেউ খেলে অরণ্য ও পাষাণের রূপ ধরে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। তারই উপর মাঝে মাঝে মাথা তুলে ছোট বড় পাহাড়। ঘুরে ঘুরে পথ ওঠে, নামে। হঠাৎ বাঁ দিকে নীচে নদী দেখা যায়। চক্রবর্তী গাড়ির বেগ কমান। বলেন ঐ হল লীলাজন নদী। লাবালং-এর পথে দেখেছিলেন নিশ্চয়? এখানে কত চওড়া হয়ে গেছে দেখছেন তো? পাহাড়ের জাল কেটে বেরিয়ে এসে এবার সমতলভূমি পেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

চট্টরাজেরও তন্দ্রার জাল কাটে। চোখ তুলে তাকান। মন্তব্য করেন, লীলাজন নামটা কজনই বা জানে? এই নদীই তো গয়ার ছ'মাইল আগে মোহনা নদীর সঙ্গে মেশে, আর নাম হয়ে যায় ফল্গু। চক্রবর্তী, আমরা তো নদীর ওপারে যাব? পার হব কোনখানে?

চক্রবর্তী বলেন, আর কিছু এগিয়েই জোরিগ্রাম। সেখানেও পার হওয়া যায়, বালির চরের ওপর দিয়ে। নদীর জল তো সামান্যই। ঐটেই চাতরা থেকে প্রতাপপুরে যাবার সোজা রাস্তা। কিন্তু আমি এখন নিয়ে যাব আপনাদের ঘাংরিয়ার ফরেস্ট বাংলো দেখাতে। জোরি থেকে মাত্র মাইল

দুই-তিন এগিয়ে গেলে নদীর ওপর এমন চমৎকার পুল হয়েছে। ওপারে গিয়েই বাংলো। সেখান থেকেও প্রতাপপুরে যাবার ফরেস্ট রোড আছে। ঘাংরিয়াতে আমাদের সঙ্গে এ-অঞ্চলের ডি. এফ. ও.-র হয়ত দেখাও হয়ে যাবে।

পাহাড় ও জঙ্গলের অন্তরালে লুকোচুরি খেলে পথ ও লীলাজন যেন ছুটে চলে। জোরিগ্রাম আসে। পথের পাশে সারি সারি ঘরবাড়ি, দোকানপাট। বাঁদিকে একট কাঁচা রাস্তা দেখিয়ে চক্রবর্তী বলেন, ঐ গেল প্রতাপপুরের রাস্তা।

জোরি ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। নদীর উপর পুল আসে। বালুময় নদী। ক্ষীণ ধারা। ওপারে নতুন বাংলো দেখা যায়। পুল পার হয়ে বাঁদিকে অল্প গিয়ে বাংলোর গেট। পীচের বড় রাস্তা ছেড়ে সেদিকে যাই।

নতুন ঝকঝকে বাংলো। দৃশ্যও সুন্দর। সম্মুখেই প্রশস্ত নদীর উদার উন্মুক্ত বিস্তার। স্বর্ণবরণ বালুকার বিশাল চর। অবারিত দৃষ্টি চলে। বহুদূরে দেখা যায় মাথা তুলে কয়েকটা পাহাড়। বাংলোর পিছনে অল্প গেলেই শুরু হয় প্রতাপপুরের জঙ্গল।

চৌকিদার জানায়, ডি. এফ. সাহাব কাল এসেছিলেন, চলে গেছেন।

চক্রবর্তী আবার বলেন, দেখুন, এইখানে থাকতে চান তো আজ আমরাও রাত কাটিয়ে যাই।

কিন্তু গভীর বনের ডাকে মন আমার সাড়া দিয়েছে। তাই বলি, চলুন আমার আস্তানার দিকে এগিয়ে, যতদূর আজ যাওয়া যায়।

আবার জীপ ছোটে। ফরেস্ট রোডে। জীপের পক্ষে ভাল রাস্তা। শুরু হয় দুপাশে বন জঙ্গল। কিন্তু দিনের বেলা, জীবজন্তুর দর্শন মেলে না। আমাদের দিন তাদের রাত্রি, তাদের দিন আমাদের গভীর রাত। আমরা যখন ঘুমোই, ওরা তখন ঘোরে-ফেরে, শিকার খোঁজে। আবার আমরা যখন দিনের আলোয় ঘুরি-ফিরি, কাজ করি, ওরা তখন ঝোপ জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকে, ঘুমোয়। দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে হঠাৎ উভয়পক্ষে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে। শুনেছি নাকি—আফ্রিকার জঙ্গলে দিনের আলোতেও জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়ায়, তাই দেখাও যায়। আমাদের দেশে ওদের স্বভাব আলাদা।

বনের ভিতর দিয়ে ১২ মাইল এসে প্রতাপপুরের বাংলোতে পৌঁছুই। বেলা সাড়ে চারটে। মে মাস তবুও বাংলোর চারপাশে বড় বড় গাছ থাকায় সন্ধ্যা-সন্ধ্যা ভাব মনে হয়। ছোট বাজার দোকানপাট। সরকারী কয়েকটা দপ্তর। লোকজনের ঘোরাঘুরি। জঙ্গল-রাজ্যে এসেছি বুঝতেই পারি না।

চক্রবর্তী বলেন, রাত্রের খাওয়ার পাট এইখানেই সারা যাক। তারপর অল্প বিশ্রাম নিয়ে আজ রাত্রেই আপনাকে হিন্দিয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসব, জানোয়ারও তাহলে পথে নিশ্চয় দেখা যাবে।

চট্টরাজ ও আমি তখনি সায় দিই।

স্থানীয় একজন আসেন। কাগজের মোড়ক খুলে সযত্নে কটি পাথরের টুকরো দেখান। বলেন, গোমেদ ও চুনি। বিক্রি করাই উদ্দেশ্য। এক-একটার কুড়ি-পঁচিশ টাকা দাম। এ-সব দামী পাথর চিনি না, কেনবার কখনও প্রয়োজন বোধ করি না, তাই কোনই আগ্রহও দেখাই না। শুনি এই প্রতাপপুর রেঞ্জেরই আহিরাপুরা জঙ্গলে একটা জায়গায় এই সব পাথর কিছু কিছু পাওয়া যায়। লোক সংগ্রহও করে, বিক্রিও করে। গভর্ণমেণ্টের হয়ত এখনও এদিকে দৃষ্টি পড়েনি, অথবা পড়লেও সামান্য বোধে হাত দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

চক্রবর্তী বলেন, আমাদের পথের পাশেই তো ঐ জঙ্গল ফেলে এলাম।

বলি, ভালই করেছি।

ফরেস্ট রেঞ্জারও দেখা করতে আসেন। হিন্দিয়ার প্রোগ্রাম শুনে বলেন, সেখানকার বাংলোর চৌকিদার হয়ত সন্ধ্যার মধ্যেই এখানে পৌঁছুবে মাইনে নিতে। আজ না এলে কাল সকালে তো আসবেই। আপনারা পৌঁছে সেখানে তাকে না পেলে বাংলোর চাবিও পাবে না।

চক্রবর্তী জানান, সে যদি আজ সন্ধ্যায় আসে, আমাদের সঙ্গেই সে ফিরে যাবে। আজ আর না আসে তো আমরা রাত্রের মধ্যেই হিন্দিয়া পৌঁছে যাব —সকাল হবার আগে সে নিশ্চয় রওনা হবে না।

রাত্রে যাওযার প্রোগ্রাম শুনে রেঞ্জার চিন্তিত হন। বলেন, রাত্তিরে বরং না-ই বার হলেন,—এ-জঙ্গলটা তো ভাল নয়। তাছাড়া এই সেদিন এক অফিসারের গাড়িতে পাথর পড়েছে—

তারপর চক্রবর্তীর সঙ্গে ফিস ফিস করে কি যেন পরামর্শ চলে। চুপ করে বসে থাকি। ভাবি, এই সব ছোট পাহাড়েও ধ্বস নামে নাকি?

কথা শেষ হলে চক্রবর্তী বলেন, ঠিক আছে। আমরা না হয় ভোরের দিকেই রওনা হব, শেষরাতে এখনও চাঁদের আলোর জোর থাকে। কিন্তু প্রতাপপুরের পর পথ আমার জানা নেই, কখনও তো ওদিকে যাইনি। সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর যেন সঙ্গে যায়, ঠিক করে রাখবেন। কাল সকালে ফেরবার পথে আবার নামিয়ে দিয়ে যাব।

আমার জন্যে কিছু ঘিও কিনে আনবার ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। ন-টাকা করে সের।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মশারির আশ্রয় নিই। এক ঘরে চক্রবর্তী ও চট্টরাজ, অপর ঘরে আমি। বহুদিনের পুরনো বাংলো। তাহলেও পরিচ্ছন্নভাবে রাখা। তবু ইঁদুরের কায়েমী স্বত্ব রোধ করে কে? ঘরের ভিতর স্বচ্ছন্দ-বিহার করে যেন। যেন, তাদেরই ঘর, আমাদেরই বে আইনী প্রবেশ। শব্দ শুনে উঠে টর্চ জ্বালি। উঁচু টেবিলের উপর থেকে প্রকাণ্ড ইঁদুর লাফিয়ে পালায়। সেখানে রাখা, চট্টরাজের নতুন রঙিন প্লাস্টিকের জালি-কাটা বাস্কেট। একপাশে খানিকটা কেটে টুকরো টুকরো করেছে। ইঁদুরের দোষ নেই। ঠিক সেইখানে রাখা আছে বিস্কুটের প্যাকেট ও পাঁউরুটি। রুটিটা সবে খেতে

আরম্ভ করেছিল।

চট্টরাজকে বলি, রুটি যাক ক্ষতি নেই! অমন বাস্কেটটা নষ্ট হল—ফিরে গিয়ে বকুনি খাবেন তো?

পাশের ঘর থেকে তাঁর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনি, এই রে! তিন ব্রাহ্মণের যাত্রার ফল ফলছে। জানোয়ার তো এখনও দেখাই গেল না, আবার রুটিটাও গেল। বাস্কেটের জন্যে ভাবনা কি? সঙ্গে দিয়েছে, ফেরত যায় তো সেই যথেষ্ট!

দেওয়ালের অনেক উপরে পেরেকে খাওয়ার জিনিসপত্রের ঝোলাঝুলি টাঙিয়ে রাখা হয়।

শেষরাতে উঠে সবাই প্রস্তুত হই। গরম চাও তৈরী। চারটের সময় যাত্রা শুরু। চক্রবর্তী এখনও সারথি। পিছনে বসে সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর। সম্মুখে পাশে বসে চট্টরাজ ও আমি। বাংলো থেকে বেরিয়ে পথ বেঁকে যায়। শেষরাতে চাঁদের আলো উজ্জ্বল আছে ঠিকই। কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ী জায়গায় উঁচু-নীচু রাস্তা। পথ চলেও এঁকেবেঁকে। তাই জীপের হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। জীপ ছোটে যেন এক প্রকাণ্ড গুবরে পোকা। ঘুমন্ত শান্ত বনকে বিকট শব্দ তুলে চমকে দেয়। দু'চোখের জোরালো আলোর অভদ্র দৃষ্টি দেখে ভীত চরণে অবলা জ্যোৎস্না কালো ঘোমটা টেনে কোথায় লুকিয়ে পড়ে।

পথের দুপাশে অন্ধকার যেন নিবিড় হয়ে দেখা দেয়। শুধু পথেরই উপর আলোর ছটা।

হঠাৎ একটা মোড় নিতেই দেখা যায়—সামনে পথ জুড়ে পশুর দল। কুচকুচে কালো দেহ, আলো পড়ে চিকন দেখায়।

দেখেই চমকে উঠি। হাতি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ হই। একপাল মহিষ! সঙ্গে একটা লোকও। এত ভোরে চরাতে চলে?

চক্রবর্তী বলেন, হাতি এখানে পাবে কোথায়? পালামৌর জঙ্গলে আছে। তাছাড়া এটা তো একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে এখন চলেছি—মাঠের মধ্যে চালাঘর দেখছেন না? গরমের দিন, একটু পরেই সকাল হয়ে যাবে।

ভাবী অদম্য আশা ও অসীম কৌতূহল মনে কত মায়া-কাননই না সৃষ্টি করে।

চট্টরাজ বলেন, মনে আছে সারাণ্ডার জঙ্গলে সেই রাত্রে জীপে যাওয়া? কালো পাথর ও গাছের ডালপালায় হস্তি-ভ্রম! বলে হো হো করে হেসে ওঠেন।

অল্প পরেই পথে দেখি সারি সারি লোক—মেয়ে-পুরুষ। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা চলে ঝুড়ি হাতে। বনে বনে মহুয়া কুড়াবে।

একদল পুরুষ চলে কুড়ুল কাঁধে। জমা-দেওয়া জঙ্গলে বাঁশ কাটবে।

পথের দুপাশে তাকিয়ে বুঝতেই পারি না—কোথায় বা জঙ্গল, কোথায় বা

লোকের বসতি। বোঝা যায়, যখন সমতল বিস্তীর্ণ ময়দান, অথবা হয়ত খেতের জমি আসে। সেখানে যেন অন্ধকার চোখ তুলে তাকায়। আবার, এক এক সময় ছোট ছোট পাহাড়ের রাজ্যে গাড়ি ঢোকে। আবছা বোঝা যায়, এক পাশে গভীর খাদ, অপর পাশে মসি-মাখা উঁচু পাহাড়। হঠাৎ দু-একটা পাহাড়ী নালা। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি যদি কোন জন্তুর দেখা পাই। কিন্তু কোথায় কে? মাত্র দু-একটা খরগোশ। পথের এক ধার থেকে অপর ধারে লাফিয়ে পালায়। পথের পাশে গাছের ফাঁকে থমকে দাঁড়ায়। চোখে তার হেডলাইটের আলো পড়ে জলজল করে।

আবার দু'পাশে ঘন বন। অন্ধকার। পথ থেকে হাত দশেক দূরে সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আচমকা জোরালো টর্চ জ্বলে ওঠে। চলন্ত গাড়ির উপর আলো ঠিকরে পড়ে। গাড়ি নিমেষে বেরিয়ে যায়, আলোও পিছনে অদৃশ্য হয়।

নিকটে গ্রাম নাকি?

সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর অস্ফুটে বলে, না, কাছে লোকালয় নেই। এখানটায় ঘোর জঙ্গল। আলোটা ভাল নয়।

ভাবি, 'ভাল নয়'—কি ব্যাপার? এদের কি ভূতের ভয়? ভূতে কি টর্চ জ্বালায়?

দিনের আলো ফোটে। বনের গাছপালা, পাহাড়, মাঠ নদীনালা, রাস্তা-ঘাট ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই আবছা আঁধারে মায়াজালও মন থেকে কেটে যায়। একটা মোড়ের কাছে রাস্তার উপর সাইন পোস্ট। সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর বলে, এ জায়গার নাম চক্। ডানদিকের ঐ রাস্তা চলে যায় ডালটনগঞ্জে। এখান থেকে মাত্র মাইল পঁয়ত্রিশ। বাসও যাতায়াত করে। আমরা বাঁদিকের পথ ধরব। এখনও হিন্দিয়া আট মাইল দূরে।

দিনের আলো পেয়ে চক্রবর্তী সজোরে গাড়ি চালান। তাঁদের সকালের মধ্যেই চাতরায় ফিরতেই হবে। উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল। প্রচুর বাঁশঝাড়। একুই মধ্যে উঁচু একটা পাহাড়। মাথার উপর কালো কালো পাথরের স্তূপ। তারই গা বেয়ে খানিক উঠে আবার অল্প নামা। খানিকটা সমতল মাঠ। খানকয়েক চালাঘর। সেইগুলো ছাড়িয়ে এসেই দেখা যায় একটা টিলার মাথায় ছবির মতো একতলা বাংলো। নতুন ঝক-ঝক করে। একটা রাস্তা পাক দিয়ে টিলার ওপরে ওঠে। বাংলোর সামনে গিয়ে মোটর দাঁড়ায়—নীচের ফরেস্ট রোডও যেন এখানে পৌঁছে দিয়ে বিদায় জানিয়ে বাংলোর বাঁ পাশের জঙ্গলে সাপের মত ঘুরে প্রবেশ করে।

সকাল সাড়ে পাঁচটা বাজে। আমাদের কাছে বেলা হয়েছে। চৌকিদার কিন্তু বেরিয়ে আসে ঘুম-ভাঙা চোখে। বলে, আর একটু পরেই তার প্রতাপপুরে রওনা হবার কথাই বটে।

চক্রবর্তী জানান, তোমায় আর যেতে হবে না। রেঞ্জার বলে দিয়েছেন, মাইনের টাকা তোমার এখানেই কেউ পৌঁছে দিয়ে যাবে। এখন ঘর খোল।

এ সাহেব এখানে থাকবেন কদিন। একাই। ভালভাবে যেন এ'র দেখাশুনা কোরো।

মাটি থেকে দুটো ধাপ উঠে ছোট বারান্দা। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে একটা ঘর। বারান্দার বাঁ দিকে আর একটা ঘরের দরজা। সেই ঘরটাতে থাকবার ব্যবস্থা হয়। বড় ঘর। তিনদিকে বড় বড় জানালা। রঙিন পর্দা। প্রকাণ্ড জোড়া খাট। ডানলপিলোর ফুলকাটা গদি, বালিশ। বড় রাইটিং টেবিল। একপাশে খাবার টেবিল। কোণে আবার ড্রেসিং টেবিলও। আলনা চেয়ার, আরাম-কেদারা—এসব তো আছেই। পাশেই স্নানাগার। ওয়াশ বেসিন। আয়না। স্যানিটারী প্রিভি। জলের কল। শাওয়ার বাথের আয়োজনও। একেবারে রাজকীয় সাজ-সরঞ্জাম—এই গভীর জঙ্গলে!

চক্রবর্তী বলেন, আমাদের এখনি রওনা হতে হবে, নইলে পেঁছিতে দেরি হয়ে যাবে। বাংলোটা ভালই দেখছি। জায়গাটাও মনোরম। কিন্তু ভীষণ নির্জন। শুনেছি এটা প্রায় দেড় হাজার ফুট উঁচু। বোধহয় গরমও এখন লাগবে না। এখনও ভেবে বলুন, এখানেই থাকবেন, না, আমাদের সঙ্গে ফিরবেন? চারপাশেই যা গভীর জঙ্গল! লোকজনের মুখও দেখতে পাবেন না, কথা বলার সঙ্গী তো দূরের কথা। থাকবেন কি করে একা বুঝছি না—ফায়ার আর্মস তো নেই!

কথা শুনে আবার হাসি। বলি ভয় নেই। চমৎকার থাকব। চারদিন পরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাটা করতে ভুলবেন না যেন। পালামৌর জঙ্গলের প্রোগ্রামটা আর কদিন পরে করলেই ভাল হত দেখছি, এখানে আরও ক'দিন বেশি তাহলে কাটানো যেত।

চট্টরাজের সুব্যবস্থায় আমার এই বনবাসের আনন্দ উৎসব। আমার মনের তৃপ্তি দেখে তিনি খুশী হন। বলেন, চক্রবর্তী, ওঁর জন্যে ভাবতে হবে না। মনের মত জায়গা পেয়েছেন। ওঁর সেই সারাণ্ডার জঙ্গলে থাকার কথা জানি তো। এখন চলুন, তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যাক। আমার আবার আজই চাতরা থেকে হাজারিবাগ পেঁছিতেই হবে।

চক্রবর্তী বলেন আমারও তো কাল হাজারিবাগের সেই মিটিংয়ে থাকতেই হবে,—এস. ডি. ও. নেই—কর্মজীবনের নানান সমস্যার দুর্ভাবনা নিয়ে তাঁরা দুজনে তখনি বিদায় নেন।

ঘর্ঘর শব্দ তুলে জীপ আবার ছোটে। নিস্তব্ধ বনভূমি গুমরে ওঠে। জঙ্গলের মধ্যে জীপ অদৃশ্য হয়। শব্দও ধীরে মিলিয়ে যায়।

ঘরের ভিতর জিনিসপত্র খুলে সাজিয়ে রাখি। ইজিচেয়ার টেনে বারান্দায় নিশ্চিন্ত মনে বসি। বাংলোর আরামপ্রদ আয়োজন ভুলে যাই। গোপনে বহে-আনা আমার অরণ্যমুখী মনকে চারিপাশের বনময় আবেষ্টনীর হাতে ফিরিয়ে দিই।

বাংলোটির অবস্থান অপরূপ পরিবেশে।

এই টিলার গায়েও বন ছিল। সে সব গাছ এখন নিশ্চিহ্ন। ঘরের

হাত কয়েক দূরে একটিমাত্র গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সঙ্গীহীন একা একে রাখা হল কেন জানি না। হয়ত সম্পূর্ণ নেড়া পাহাড় বৈরাগীর বেশ ধরবে, তাই একটু সবুজ পাতার ছোঁয়াচ রাখা।

অথবা এ-বাংলো নিঃসঙ্গ বাসেরই পরম উপযোগী, তারই ঐ নির্বাক সাক্ষী।

টিলার মাথায় বাংলোর চারিপাশের এলাকা সযত্নে পরিচ্ছন্ন করে রাখা। বাড়ির বাইরে ফুলগাছের বেড। কয়েকটা ক্যানাফুলের গাছ। এখন ফুল নেই। কম্পাউণ্ডের চতুর্দিক ঘিরে মাটিতে ছোট ছোট পাথর সাজানো, চুন মাখিয়ে সাদা রঙ করা। দূর থেকে দেখায়, সাদা ধবধবে বাংলো যেন শ্বেত পদ্ম, সাদা বর্ডার দেওয়া ফুলদানিতে তুলে রাখা। বাড়ির পিছনে সামান্য দূরে, অল্প নীচে চৌকিদারের থাকবার ঘর। তারই উপর অংশে মোটর গ্যারাজ। চৌকিদারের ঘর ছেড়ে আরও নেমে ছোট মাঠ। সেখানে কয়েকটা বড় বড় গাছ, যেন বাংলোর নিকটে আসার তাদের অনুমতি নেই। সেইখানেই বাঁধানো প্রকাণ্ড পাতকুয়া। বারান্দায় বসে মনে হয়, যেন উঁচু এক প্ল্যাটফর্মে বসে আছি। চারিদিকে দৃষ্টি চলে। সম্মুখে টিলার নীচে ধনুকের আকারে বড় রাস্তা বেঁকে চলে যায় বাঁদিকে বনের মধ্যে। রাস্তার অপর পারে অনেকখানি খোলা মাঠ। পাহাড়ী জায়গা। তাই ঢেউ খেলানো। মাঝে মাঝে চাষের জমি। এখানে ওখানে কয়েকটা গাছ। ডাল পাতা ছড়িয়ে বট-অশ্বথ। তিনটে তালগাছ, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যেন ময়ূরের পেখম-চূড়া-ধারী আদিবাসী। পলাশ গাছই বেশি। দু-একটা গাছে এখনও লাল ফুলের বাহার। যেন দীপান্বিতার উৎসব শেষে এখনও জ্বলে দু'একটা প্রদীপ। অনেক গাছই এখন ফুল-হীন, পাতা-ঝরা। বিবস্ত্র। শুষ্ক শীর্ণ আঁকাবাঁকা শাখা নানান ভঙ্গিমায় তুলে ধরে গাছগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। একটা গাছের গুঁড়ি থেকে দুটি মাত্র ডাল এমনিভাবে বেঁকে আকাশের দিকে উঠে আছে, ঠিক মনে হয় দুই বাহু তুলে কে যেন কীর্তন গাইতে গাইতে ভাবাবেগে নিশ্চল হয়ে গেছে। মনের এ সব অলীক কল্পনা, জানি। তবু আনন্দ জাগে মনে যখন পরে এখানকার 'ভিজিটার্স বুকে' দেখি, কয়েক মাস আগে হাজারিবাগের তৎকালীন ডি. সি. শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চাতরার ডি. এফ. ও. শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানে আসেন এবং এই গাছটির অদ্ভুত আকার তাঁর রসগ্রাহী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইয়ের শেষ পাতায় গাছটির নিখুঁত স্কেচ এঁকে লেখা—'দি কীর্তনীয়া'!

মনে পড়ে, হিমালয়ের কুয়ারি-পাশ-এ ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের বর্ণিত সেই জরাজীর্ণ অর্ধমৃত পাইন গাছটির কথা। তাঁর কয়েকটি বইয়ে ছবি দিয়ে সেই গাছটিকে অমর করে রাখেন। তাই, কুয়ারি-গিরিপথে যখন যাই, অতি পরিচিতের মতই সেই গাছের নিকটে গিয়ে দাঁড়াইও!

প্রাকৃতিক জগতের তরুলতার সঙ্গেও মানুষের অন্তরের নিবিড় বন্ধন অভিনব নয়। সাহিত্যেও তার বহু প্রমাণ থাকে।

আশ্রমের বৃক্ষ-লতাকে বনবালা শকুন্তলার 'প্রিয় সম্ভাষণ' মহাকবির নিছক কাব্য-কল্পনাই নয়, মানব মনের নিগূঢ় চিত্র। একটি উইলো (Willow) গাছ Rousseau-র মত মানুষের মনও টলায়!

সুমুখের পাহাড়ী মাঠ ঢেউ খেলে অদূরে বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। শুরু হয় শুধু পাহাড়। তিন-চারশ ফুট উঁচু। শুধু সামনেই নয়। সেই পাহাড়ের শ্রেণী গোলাকার হয়ে ঘিরে রাখে আমার দৃষ্টিপথের অবাধ গতি। নিশ্ছিদ্র চারিধারে নয়। ডানদিকে—পশ্চিমে—যে-পথে এখানে এসেছি, সেখানে সেই কালো শিলাস্তূপ মাথায় এই পাহাড়েরই উঁচু একটা চূড়া। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে রাখা—যেন ভাঙা দুর্গপ্রাচীরের অংশ। একেবারে মাথার উপর ছোট একটা পাথর। দেখায় যেন কোলা ব্যাঙ বসে। পাহাড়টার নাম শুনি, হাড়কোলা। পরে জানতে পারি, ঐ সব পাথরের ফাঁকে নাকি ভালুকের বাস। সেই পাহাড়ের পরেই পশ্চিমে অনেকখানি ফাঁক। যেন গিরিপ্রাকারে উন্মুক্ত তোরণ। সেই রন্ধ্রপথে দৃষ্টি ভেসে যায় সুদূর দিগন্তে—তরঙ্গায়িত ধূসর অরণ্য-সাগরের উপর দিয়ে। সেদিকেও বহুদূরে আকাশের গায়ে পাহাড়। ঘন-নীল বরণ: পালামৌর কিনা, কি জানি।

তিনদিকের পাহাড়গুলি দৃষ্টি রোধ করলেও বন্দীজীবনের ভাব আনে না। সামনের পাহাড় প্রায় মাইলখানেক দূরে। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে বাংলোর বাঁ পাশে এসেছে কাছেই ঘেঁষে। এ-টিলাও হয়ত ঐ একই পরিবারের। এখন ইনি অরণ্যবেশ ছেড়ে সভ্য, ভদ্র, সুসজ্জিত! বনময় পাহাড়ও তাই নিকটে এসে হঠাৎ দেখে থমকে যায়। সঙ্কোচে আবার সরে পড়ে পিছন দিকে, প্রায় আধ মাইল দূরে।

চারিপাশে পাহাড়তলী ও পাহাড়ের জংলী গাছে ভরা। এখন বৈশাখ মাস। বেশিরভাগই ঝরা-পাতা। শুকনো। যেদিকে তাকাই কেমন একটা খটখটে রুক্ষ ভাব। যেন, বিশ্বের জ্বালানী কাঠ এই পাহাড়-ঘেরা এলাকায় হেলান দিয়ে সাজিয়ে রাখা! ভাবি, এ যেন ধ্যানমগ্ন রুদ্র বৈশাখের কঠোর তপস্যার হোমাগ্নি প্রস্তুতি।

ধ্যান ভেঙে যায় আমার। চৌকিদার এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, ওপরের ট্যাঙ্কে জল ভরে দেব?

বলি, দরকার নেই আমার অত জলের। দু'বেলা দু'বালতি জল থাকলেই চলে যাবে।

ভাবি, কি হবে অকারণ আয়েশে? এসেছি বনবাসে। অযথা মানুষকে কষ্ট দিয়ে নিজেই কষ্ট পাওয়া।

বলি, নাম কি তোমার? দেশ কোথায়?

শুনি, প্রতাপপুরে! নাম রামদেও রাম।

বলি, অত বড় নাম মনে থাকবে না। ডাকব রামচন্দর বলে। ওটা ভুলব না।

তার ঘরের খবর নিই। জাতিতে কাহার। বয়স পঁয়ত্রিশ। আগে

কুন্ডার ভাটিখানায় কাজ করত। কালো ঠোঁট, লাল চোখ, চিমড়ে চেহারা তারই হয়ত প্রমাণ রাখে। সাত বছর হল চৌকিদারী চাকরি পেয়েছে। এ-বাংলো চার বছরের। শুরু থেকেই এখানে আছে। মাইনে পায় ১১৬ টাকা। থাকে এই জঙ্গলে, তবু চলে না। না-চলবার কারণও তখনি মূর্তি ধরে দেখা দেয়। দেওয়ালের পাশ থেকে উঁকি মারে। ইশারা করে ডাকে। সলজ্জভাবে এগিয়ে আসে—একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পঞ্চমটি তার দিদির কোলে! বুঝলাম, পরিবার-পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী এই রামচন্দর। কিন্তু, পরম সেবাপরায়ণ। রান্নার ব্যবস্থাভার কোনোমতেই আমাকে নিতে দেয় না। বলে, যা দেবার আমাকে দিন. আমিই করে দেব।

নিয়েও যায় তাই। করবার এমন আছেই বা কি? দু'মুঠো ভাত, অল্প ডাল, একটা সবজি। রাত্রে রুটি।

খবর নিই, দুধ পাওয়া যায় না গ্রামে? মাঠে গরু চরছে দেখছি।

বলে, দুধ দই ঘি মাখন – এ-সব পাবেন। শাক-সবজি কিছুই নেই।

ভাবি তবে আর খাওয়ার ভাবনাই বা কি! হিমালয়ের সেই অনসূয়া মায়ের মন্দিরেই আবার এলাম নাকি?—সাগ্রহে প্রশ্ন করি. দুধে জল মেশায় না তো?

অবাক হয়ে তাকায়। মর্মার্থ বোঝে না। একটু ভেবে বলে, হাঁ—জল? জল এখানে কুয়ার জল। ঐ যে পেছনের মাঠে। জানিয়ে দিই, দুধ, দই, মাখন—সবই রোজ চাই। সঙ্গে আনা ঘি ফুরালে ঘিও যেন আনে। দামও শুনি। দুধ এক টাকা সের। দইও তাই। মাখন—এক ডেলা চার আনা। ঘি—ন'টাকা। এসব জিনিস এখান থেকে প্রতাপপুরে চালান যায়।

খাবার সময় দেখি, জিনিসগুলি নির্ভেজাল। তাজা। দুধ জ্বাল দিতেই ঘন সর পড়ে। জাল দেওয়া দুধের সুবাস ওঠে। দইও সোনার বরণ। আর সাদা ধবধবে মাখন? তার স্বাদ? বলছি।

মানুষের স্মৃতিশক্তি অতি বিচিত্র। অনেক কিছুই মনে রাখে, অনেক কিছুই ভোলে। কিন্তু মনে রাখা ঘটনারও সুখ-দুঃখের অনুভূতি কখনও সঠিক ধরা থাকে না। পদার্থের স্বাদও তেমনি। দ্রব্য মনে থাকে, স্বাদের স্বরূপ থাকে না।

প্রায় ষাট বছর আগেকার একটা কথা বলি। সাঁওতাল পরগণায় তখন দুধ পাওয়া যেত টাকায় ষোল সের। গল্পের মত শোনালেও গল্পকথা নয়। তখন রোজ সকালে গয়লা মাখন বিক্রি করতে আসত। বড় পিতলের থালা। তারই উপর শালপাতার ছোট ছোট ঠোঙা। মধ্যে সাজানো সাদা মাখনের ডেলা। থালার উপর ভেজা কাপড় ঢাকা। আবরণ সরাতেই মাখনগুলি চকচকে চোখ তুলে যেন তাকাত। আমরাও সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতাম, পেতামও। মিশ্রির টুকরো মাখিয়ে তখনই খাওয়া। এসব ঘটনা পরিষ্কার মনে আছে এতকাল। কিন্তু সে মাখনের স্বাদ ছিল যে ঠিক কেমন, কোনোমতেই তা ভেবে পাই না। আজ এই দীর্ঘকাল পরে কোন এক বিজন বনে ছোট্ট মাখনের ডেলাটি স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে

অবিকল সেই অমৃতময় স্বাদটি পুনরায় জিহ্বাগ্রে ফিরিয়ে আনে।

দুপুরে খাওয়া শেষ করে আবার বারান্দায় এসে বসি। জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। গ্রাম সেই হাড়কোলা পাহাড়ের কাছে। এখান থেকে ঘরবাড়ি দেখাও যায় না। শুনি ৩০।৩২ ঘর লোকের বাস। সংখ্যায় শ'দেড়েক হবে। অনেকেরই গরুমোষ আছে। চরে খায়। তাই পালন করার খরচা নেই। গ্রামবাসীদের বেশির ভাগ আদিবাসী। গনঝু (Ganjhu) জাত। হোরও আছে কিছু। জঙ্গলে ঠিকাদারদের অধীনে কাজ করে অনেকে, কেউ বা খেতির কাজও। ভুট্টাই হল এদের প্রধান খাদ্য। শুকিয়ে ছাতু করে রাখে। সারা বছর চালায়। ক্ষেতে কিছু গম চাষও হয়। ধান হয় কমই। তাও গোঁড়া ধান। বেশি হয় মড়ুয়া আর গুদাল। গুদাল থেকেও ছাতু বা ভাতের মত কি যেন রান্না করে। এ-ছাড়া উরদ ও বরাইলও হয়। শাক-সবজি লাগায় না। গ্রামে পাঁচকড়ির একটা দোকান। সেখানে চালানি আলু পাওয়া যায়। কিন্তু আলু কিনে খাবে কে? আদিবাসীদের হাতে পয়সা থাকে না। ভাবি জঙ্গলে কাজ করে, রোজগারও ভালই করে। পয়সা যায় কোথায়? এর উত্তর জানতে পারি পরে।

বসে আছি একা, কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়। আমার মন আমার সাথী। নতুন সঙ্গীও পায় নির্জন বনকে। জনহীন হলেও শব্দহীন নয়। দুপুরের রোদে চারিদিকের শুকনো গাছের ডালপালা, ধূসর পাহাড়—দেখায় যেন ভস্মমাখা সন্ন্যাসীদের আখড়া। তারই মাঝে হঠাৎ কোথায় দু'একটা কাঁচ-সবুজ পাতা-ভরা গাছ। যেন, তাঁবুর মাথায় ঝাণ্ডা ওড়ায়। নিকটে বনের মধ্যে কোথাও ঘুঘু ডাকে। একটানা ক্লান্ত কাতর রব। হঠাৎ তিতিরের ডাক। অতি তীক্ষ্ণ স্বর। আর একদিকেও একটা ডেকে ওঠে! বনের মধ্যেও এদের লড়াইয়ের মেজাজ নাকি? একটা ফিঙা উড়ে এসে বসে। ভীমরাজ নামটি এদের বেশ। ইংরেজরা বলে drongo। মাছের ল্যাজার মত লম্বা চেরা লেজ। কালো কুচকুচে রঙ। আরও একটা উড়ে তার কাছে আসে। এটা পালায়। অন্য পাখিদের শিস নকল করতে এরা ওস্তাদ। দুর্বৃত্ত পাখিদের হাত থেকে দুর্বল পাখিদের রক্ষা করে—হিন্দীতে নাম তাই 'কোতোয়াল'। পথের পাশে গাছের শুকনো সরু ডালের উপর উড়ে এল—ছোট সবুজ পাখি। টিয়ার মত রঙ। বাঁশপাতি না (Green bee-eater)? হ্যাঁ, তাই তো। লেজের শেষে সরু কাঠির মতন। চোখের উপর যেন কাজল-পরা দাগ। মাথায় সোনালী আভা। ঐ তো হঠাৎ উড়ে হাওয়ার মধ্যে ঘুরে পোকা ধরে ফিরে এসে বসে। লেজ নাড়ে, এদিক-ওদিক দেখে। আবার ওড়ে, আবার বসে। ভাবি, এখানে তো মধুপুরের মত ইলেকট্রিকের বা টেলিগ্রাফের লম্বা তারের লাইন নেই, তাই গাছের সরু ডালই এদের শিকারে বসবার মাচান। ঝোপের মধ্যে আবার ও-শব্দটা কার উঠল? ধুক্ ধুক্ ধুক্—পংক পংক পংক—একটানা চলতেই থাকে। চেনা স্বর,—কিন্তু ঝোপঝাড়ের অন্তরালে বড় গোঁড়া পর্দানশিন। ইংরেজরা বলে Coppersmith।—সেকরাপাখি।

ভাল নাম barbet। হিন্দী ভাষায় বলে ছোটা বসন্ত্। উড়ে এল অতি-পরিচিত বুলবুল, মাথায় ঝুঁটি। কালো মুখ ঘোর বাদামী রঙ। লেজের নীচে টকটকে লাল আভা। ডাকছে কেমন মধুর সুরেলা স্বরে। ভাল লাগছে, সইল না বুঝি? ফুরুৎ করে উড়ে গেল। ওঃ! বুঝেছি, ঝগড়াটে কটা শালিক এল। গানের আসরে হট্টগোল কি মানায়, না, তখন গাওয়াই চলে? শালিকগুলোর স্বভাবই এমনি। প্রকাণ্ড লেজওয়ালা ধেড়ে একটা পাখি ঝোপের মধ্যে থেকে উড়ে এসে মাটিতে বসে। থপ-থপ করে দু'পা গিয়ে ঠোঁটে কি ধরে। আবার তখন উড়ে যায় ঝোপের মধ্যে। ডাকতে থাকে 'গুপ্গুপ্'—গম্ভীর শব্দ করে! এও অচেনা না। কাণাকুয়া Crow pheasant। হিন্দী নাম—মহুকল। এরা নাকি সাপের মহাশত্রু।

ভাবি, এসব পাখিই মধুপুরের বাগানেও দেখা। এরাও কি বনচারী? অথবা লোকালয়ের পাশ থেকে বনবাসেরও আনন্দ লোটে?

দুপুর গড়িয়ে চলে বিকেলের দিকে। রামচন্দর আসে। ট্রেতে করে আনে—চায়ের কাপ, ডিস, টী-পট-এ গরম জল। চায়ের পাতা, চিনি তার কাছে নেই। নিজেই তৈরি করে নেব। ঢাকনি খুললে চায়ের পাতা ছাড়তে গিয়ে দেখি, বাঃ! এ তো "লিকার" তৈরি করে ছেঁকে আনা। আর একটু স্ট্রং করলেই পারত। তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলি, চা-পাতা তোমার কাছে ছিল দেখছি?

বুঝতে পারে না। চায়ের জল দেখিয়ে বোঝাই। তখন হেসে বলে, হাঁ, কুয়ার জলের রংটা ঐরকম।

সে কী! নোংরা নয় তো?

না। খারাপ কিছু নয়। প্যাশেই পলাশ আর মহুয়ার গাছ। তারই ফুল পড়ে অমন রং।

বলি, তা হোক। মহুয়ার চা আমার দরকার নেই। অন্য কুয়া আছে কাছাকাছি?

অল্প দূরেই ফরেস্ট-গার্ডদের কোয়ার্টার্স। সেখানকার কুয়োর জল পরিষ্কার। পানীয় জল সেখান থেকেই আনবার ব্যবস্থা হয়।

চায়ের সাজ-সরঞ্জামের পিছু পিছু রেজিমেন্টও আসে। সেই ভীরু সলজ্জ ধূলামলিন ছোট ছোট পায়ের সারি। উঁকি-মেরে-দেখা কালো কালো সরল কাঁচ মুখগুলি। বিস্কুটের প্যাকেট খুলে কাছে ডাকি। মেজ মেয়েটার ভয়-ডর নেই। পা ফেলে এগিয়ে আসে। সামনে এসে ছোট্ট হাতের তুল-তুলে চেটো পাতে। আর সবাইকে ডাকে। বিস্কুট বিতরণ করে জিজ্ঞাসা করি, নাম কি তোমাদের?

মেজ মেয়েটাই গিন্নীবান্নীর মত উত্তর দেয়, ওর নাম ছুছিলা। আমি ইন্দি, ও বিন্দি। আর এই ভাই—ইন্দির, ওটা দেবেন্দির।

বলি, বেশ ভাল নাম তো তোমাদের। সবে ভাব জমাতে শুরু করেছি,

রামচন্দর এসে হাজির। বাচ্ছাগুলোও কর্পূরের মত উবে যায়।

চৌকিদারকে বলি, ভোরে উঠে বেড়াতে যাব। বাঁ দিকের ঐ জঙ্গলের পথটাই ভাল হবে, কি বল?

সে চমকে উঠে তখনি বলে, না না, ওদিকে একা যাবেন না। ওদিকটা ভাল না। ডান দিকের রাস্তা ধরে বেড়াতে যাবেন।

সেদিকে তো গ্রাম! ভাল লাগবে না। এসব জঙ্গলে জানোয়ার আছে? দেখেছ কখন?

সে জানায়, জানোয়ার হামেশাই দেখা যায়,—এই বারান্দা থেকেও,—ঐসব মাঠে ঘোরে।

প্রশ্ন করে জানি জানোয়ার অর্থে হরিণ ও বুনো শুয়ার—এই-ই সে বোঝে। বাঘ-ভালুক সে এখানে এসে পর্যন্ত নিজে দেখেনি, অপরে দেখেছে বলে।

হেসে বলি, এতদিনেও তুমি যখন দেখনি, তবে আর ভয় কিসের?—তবু ঘাড় নেড়ে গম্ভীর মুখে সে নিষেধ করে, না, ওদিকপানে একা ভোরে যাবেন না—জঙ্গল ভাল নয়।

বিকালে বাংলোর আশেপাশে পায়চারি করি। একটা কোকিল কোথা থেকে হঠাৎ আবেগমাখা স্বরে রব তোলে—'কু-উ', 'কু-উ'। অন্য দিক থেকে অপর একটা সাড়া দেয়। ডাক শুনে বোঝা যায়, দুজনে পরস্পরের কাছে উড়ে চলে।

কার আবার 'চোখ গেল'? আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কান্না ধরে 'চোখ গেল', 'চোখ গেল' 'চোখ গেল'! অল্প থেমে আবার চেঁচাতে থাকে। এ জগতে বেচারীর কেউ-ই নেই নাকি? অনেকক্ষণ ডাকার পর শান্ত হয়। কিন্তু, বনদেবীর বুঝি শান্তি নেই। 'ম্যাও-ম্যাও' বিকট চীৎকার। আকাশ যেন চিরে দেয়। ওঃ! ময়ূরের ডাক। এ-পাশে একটা ডাকে, ওদিকে আর একটা চেঁচায়। চোখে দেখি না। কানে শুনি। মনে ভাবি, পাখির রাজ্যে ময়ূর কত সুশ্রী। রঙের কত ছটা। নিজের চোখেই একবার দেখেছিলাম একটা ময়ূরের আপন মনে নাচ। বনের ধারে এক সাধুর আশ্রমে। কালো মেঘে সেদিন আকাশ ছিল ছেয়ে। দুর্গা-প্রতিমার রঙিন চালচিত্রের মত পেখম তুলে ময়ূর দাঁড়িয়ে। নিশ্চল নিস্পন্দ। যেন কাঠের পুতুল। তারপর হঠাৎ অতি ধীরে ছড়ানো পেখমে শিহরণ জাগে। থরথর কেঁপে ওঠে। ঝিরঝির শব্দ তোলে। কাঁপনের বেগ বাড়ে। যেন তারের যন্ত্রে সুর ফোটে। মৃদু থেকে ক্রমে অতি দ্রুত লয়ে ঝঙ্কার শুরু হয় পেখমে। রঙের ছটা, সুরের লহরি, বিদ্যুৎ-শিখার চমক ছড়ায়। পেখম কাঁপে। ময়ূর নাচে। যেন বীণার সঙ্গে নূপুর বাজে। রূপ-সাগরে ঢেউ ওঠে, নর্তকের দেহেও পুলক জাগে। অপূর্ব ভঙ্গিমায় দেহ দোলায়। তাল মনে রেখে চকিতে পা ফেলে দু'কদম এগিয়ে আসে। আবার স্থির দেহ। নিস্পন্দ পেখম। কাঠের পুতুল! আবার শুরু হয় শিহরণ, আবার নর্তন। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি।

রূপরাজ্যের সে এক অপূর্ব লীলা! ভাবি, স্বয়ং নটরাজই কি আপন হা শেখান একে নৃত্যছন্দ? নাচ শিখিয়ে প্রিয়পুত্র রূপবান কার্তিকেয়কে উপহ দেন বাহনরূপে?

কিন্তু সেই কারণেই মনে হয়, এত রূপ, এত গুণ,—তবু এ পাখির স্ব এমন কর্কশ কেন? সৃষ্টিজগতে পূর্ণসুন্দর কোন কিছুই বুঝি থাকি পারে না?

আবার ভাবি, গভীর বনে ময়ূরের এক মহৎ কর্তব্যও থাকে। বন কাঁপি তারস্বরে অবণ্যচর পশুকে সচেতন করে, বাঘ চলেছে খাদ্যের সন্ধানে ময়ূরের কেকাধ্বনি তাই-ই কি অমন তীক্ষ্ণ, কর্কশ?

পাহাড়তলীতে সন্ধ্যার ছায়া নামে। পাখিদের কলকাকলিও থামে। ত দিনের শেষে বনদেবী যেন শীতল সরোবরে স্নান সেরে ওঠেন। ধূসর বা ছেড়ে ঘন নীল শাড়ি পরেন। জপমালা হাতে নিবিষ্ট মনে সন্ধ্যাপূজা বসেন। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। রামচন্দর লণ্ঠন হাতে আসে। বা নিভিয়ে দিয়ে বারান্দার ঐ কোণে রেখে যাও। দরকার হলে জ্বালব খাওয়ার আগে দরকারও হবে না।

আশ্চর্য হয়ে বলে, অন্ধকারে—একা—

হেসে বলি, ভয় নেই, যাও তুমি রান্নার কাজে।

ইযে ঠিক নেহি—অস্ফুটে প্রতিবাদ জানিয়ে চলে যায়।

হ্যারিকেনের আলো নিভতেই অন্ধকারের বুকে স্বচ্ছ সুনীল আলো ফোটে কেমন এক ম্লান স্নিগ্ধ প্রভা চোখে মনে আনন্দের প্রলেপ বোলায়। শরৎচন্দ্রে সেই অন্ধকারের রূপ-বর্ণনা! জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে উপরে নীল কাচের মত আকাশ। সেখানে বেলোয়ারি ঝাড়ে অযুত তারা প্রদীপ ঝলমল করে। নীচে কালিবরণ পাহাড় বন। তারও বুকে লক্ষ জোনাকির ঝিকিমিকি। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। দেহ-স্পন্দন নেই সারা জগৎ অঘোরে ঘুমোয়। আমিই শুধু জেগে, একা তার শিয়রে বসে। অন্তরভরা নিবিড় শান্তির অনুভূতি। সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে এ যেন আর এক দেশ। এখানে আমি নেই, তুমি নেই, দ্বিত্ব ভাব নেই, একাকিত্ববোধ নেই। দূর নেই, নিকট নেই, এখন-তখন ভাবনাও নেই। সীমাহীন বিশ্বে একাকার হয়ে এ শুধু মিলিয়ে যাওয়া। নদী যেমন লুপ্ত হয় সাগর মোহনায়।

হঠাৎ চমকে উঠি। অন্ধকার ভেদ করে মানুষের স্বর শুনি না? কথা কইতে কইতে কারা যেন আসে। কে? এই দিকেই তো মনে হয়। আজ ভোরে বনের মধ্যে দেখা সেই টর্চের আলো যেন আবার জ্বলে ওঠে। হ্যাঁ, টর্চের আলোই বটে। লম্বা দুটো পা ফেলে কে একজন এগিয়ে আসে। সঙ্গে আরও একজন। এবার কথা স্পষ্ট হয়, বোঝাও যায়। কে যেন ধমক দিয়েই বলে, এই অন্ধকারে আলো না জেবলে একা রেখে গেছ—এই জঙ্গলের মধ্যে—কি রকম হুঁশিয়ার আদমি তুমি? রামচন্দরেরও গলা শুনি। ন্যায্য কৈফিয়ৎ

দেবার চেষ্টা করে। দুজনে সামনে আসে। লম্বা লোকটি আটেনশন হয়ে দাঁড়ায়, স্যালুট করে। তখুনি টর্চের আলোয় লণ্ঠনটা দেখে বারান্দায় উঠে জ্বালিয়েও দেয়।

পরিচয় শুনি ফরেস্ট গার্ড। নাম, বীরভদ্র সিং। বনের মধ্যে সারাদিনের কাজ সেরে ডেরায় ফিরে খবর পায়, বাংলোতে কোন সাহেব এসেছেন। তাই খোঁজ নিতে এসে দেখে অন্ধকারে এমনভাবে বসে—এ কী কথা! এ জঙ্গলে এরকম করে থাকা নিরাপদও নয়।

বুঝিয়ে বলি, চৌকিদারের কোনই দোষ নেই। আমার হুকুম মতই সব করেছে।

সে শুনে খুশী হয় না, দুশ্চিন্তাও তার কাটে না। আবার সাবধান করিয়ে দেয়, অন্ধকারে বাইরে এভাবে একলা বসে থাকা ঠিক নয়।

হঠাৎ মনে পড়ে চৌকিদারেরও সাবধান-বাণী। ভোরে উঠে বাঁ দিকের বনে যেন বেড়াতে না যাই। জিজ্ঞাসা করি, কাল সকালে বনের মধ্যে কাজে যাবে না? যাও তো তোমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি।

খুশী হয়ে সে রাজী হয়। ঠিক ছটার সময় সে আসবে বলে।

চৌকিদারকে আবার হুঁশিয়ার করে দেয় যেন আমার দেখাশুনা ঠিকভাবে করে, কোন তকলিফ না হয়।—আবার সেলাম করে টর্চ জেলে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের আস্তানার দিকে চলে যায়।

আমিও আবার লণ্ঠন নিভিয়ে আঁধারের স্ফটিক আলোকে মনে প্রশান্তির দীপ জেলে একা বসে থাকি।

যথারীতি অতি ভোরে ঘুম ভাঙে। প্রাতঃকৃত্য সেরে বাংলোর বাইরে পায়চারি করি। দিনের আলো ফোটে। পাহাড়-বনও জেগে ওঠে। চারদিকে পাখিরাও প্রভাত-বন্দনার সুমধুর তান ধরে। চা খেয়ে জামা-জুতো পরি। বাংলোর বাইরে নেমে দাঁড়াই। ছটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট দেরি। ভাবি লোকটা ছটায় আসবে? না, এদের ছটা মানে সাতটা, কিংবা আটটাই হবে? —আর ভাবতে হয় না। টিলার নীচে রাস্তায় খাকি রং দেখা যায়। সেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা। দেখতে দেখতে উপরে উঠে আসে। সোজা হয়ে সামনে দাঁড়ায়। সেলাম করে। মুখে-চোখে প্রফুল্লতার দীপ্তি। আপন কর্তব্য পালনের সহজাত পরিতৃপ্তি।

হবার কথাই। ঘড়িতে দেখি কাঁটায় কাঁটায় ছটা!

সময় দিয়ে সময় রাখার মূল্য আমার জানা। অভ্যাস করলে এ গুণ স্বভাবে পরিণত হয়। তখন সময় রাখা অতি সহজ হয়ে ওঠে। নির্ধারিত সময়ের পিছু তখন ছুটতে হয় না, সময় চলে সহজ স্বচ্ছন্দ চালে পিছু পিছু —পালিত বাধ্য কুকুরটির মত।

একবারের এক ঘটনা মনে পড়ে। বাবার কাছে শোনা। তিনি গেছেন সিমলা পাহাড়ে কি এক কাজে। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের কাছে ওঠেন। রাসবিহারীবাবুর কাছে এককালে বাবা 'আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক (articled clerk)

শিক্ষানবীশ ছিলেন, উকীল হবার আগে। স্নেহ-ভাজন অতিথির ঠিক ভা৷ থাকবার সব আয়োজনই হয়। রাসবিহারীবাবু এক ফাঁকে কথায় কথা জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে খাও কটার সময়ে? · বাবা বলেন, এই নটায়।

সন্ধ্যার পর দুজনে বসে গল্প করেন। বাবা বলেন, কিছুক্ষণ ধরে নজ করি তাঁর যেন অন্যমনস্ক ভাব, বার বার দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিে তাকান। একটু পরেই ঢং ঢং করে নটা বাজে। অমনি বজ্র গম্ভীর স্বে ডাক দেন, বাড়ির যিনি সব দেখাশোনা করেন তাঁকে। তিনি সামনে এে দাঁড়াতেই অমনি ধমক দেন, নটা বেজে গেল, খাবার দেওয়া হয়নি কেন? আশ নটার সময় খায় বলিনি আমি? সময়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমাদের?

বাবা ব্যস্ত হয়ে বোঝাতে চান নটায় খান মানে ঠিক নটাতেই এমন কথ নয়। কিন্তু বোঝাবেন কাকে? মেজাজী রাশভারী বিরাট পুরুষ রাসবিহা্রী তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, কথাটা তা নয়। আমি বলেছি নটায় খাবার ি ে ঠিক নটায় তৈরী থাকবে না কেন?

এ-ধরনের সময়নিষ্ঠা কজনেরই বা থাকে!

যারা কথা দিযে কথা রাখে, সময় দিয়ে সময় রাখে, তাদের আমি শ্রদ্ধ করি। ফরেস্ট গার্ডটি অজানিতভাবে তার এই আচরণে আমার মনে আপন আসন পাতে।

ছ ফুটের হয়ত কিছু কমই হবে লম্বা চেহারা। লম্বা বলেই যেন রোগ দেখায়। কিন্তু সবল স্বাস্থ্যবান। পরিচ্ছন্ন খাঁকি হাফসার্ট, হাফপ্যান্ট খাঁকি মোজা। পুরনো চামড়ার জুতো। জুতোর চেহারা দেখে বোঝা যায় বনে-জঙ্গলে ঘোরাই তার পেশা। মাথার উপর বেঁকিয়ে-পড়া স্কাউটদের গোল টুপি, সবুজ রং। ফরেস্ট গার্ডদের টুপির এই রং আমার কাছে সুপরিচিত এ যেন গভীর বনের গাঢ়-সবুজ চিহ্ন নিয়ে বনেরই সচল প্রতিনিধি। পরে অবশ্য গার্ডটি আমায় জানায়, এ-সব পোশাক তার নিজেরই খরচায় তৈরী করানো। সরকারী যে পোশাকগুলি দেয়—সব খদ্দরের। যেমন তার ফিকে রং, তেমনি তার কাটছাঁট—ঢলঢলে ঝোলা-ঝোলা ভাব। পরলে দেখায় যেন— একমুখ হাসি নিযে বলে,—একেবারে ব্যাণ্ড-মাস্টার! ঐ পরে ঘুরলে কেউ কখনো মানে, না ভয় পায়? এই পোশাক তাই বানিয়েছি—একা আমিই নই, সব গার্ডই,—এখন দেখায় দেখুন না, যেন পুলিস বা মিলিটারী!

তার এই সব অকপট মনের কথা, সরল হাসি—আমার কাছে প্রকাশ পায় আরও কিছু পরে, তখন সরকারী কর্মীর নিয়ম-কানুন-বাঁধা সংযত আচরণের আড়ষ্ট ভাব আমারই প্ররোচনায় সম্পূর্ণ তার কেটে যায়। এখন দেখি তার তরুণ চোখমুখে সজীব উৎসাহ। অল্প গোঁফের রেখা। কামানো দাড়ি। রোদে পোড়া তামাটে রং। টিলার উপর উঠে এসেই হঠাৎ স্থির হয়ে এমনি-ভাবে দাঁড়ায়, মনে হয় যে-কোন কাজের ভার নিতে সে প্রস্তুত। দুজনে তখনি নেমে চলি। টিলার গায়ে ধাপ-কাটা হাঁটা-পথ নেমে বড় রাস্তায় দাঁড়াই। সে বলে, চলুন, বাংলোর সামনের ঐ জঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে এখন যাব।—

কথা বলেই আবার লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলে।

বলি বীরভদ্রজী! আগে একটা কথা আছে, শোন। তোমার বয়স কত।

পঁচিশ বছর।

আমার কত জান? সত্তর হতে চলেছে। তুমি জোয়ান, আমি বুড়ো মানুষ। তার ওপর তোমার পা দুটো কত লম্বা! একটু আস্তে চল, নইলে পারব কেন তোমার সঙ্গে চলতে?

সে-খুশি-ভরা চোখে আমার দিকে তাকায়। অসঙ্কোচে স্বীকার করে, আমার বার্ধক্য। বলে, তার বাবার চেয়েও বুড়ো! তাঁর তো এখনও কাঁচা চুল, টাকও পড়েনি। হ্যাঁ, ধীরে ধীরেই চলবে সে।

কিন্তু, বড় রাস্তা ছেড়ে যেই বনের পথ ধরা হয়, জঙ্গলের গল্পও জমে ওঠে, তার প্রতিশ্রুতিও সে ভোলে। আবার সবেগেই চলতে থাকে। বনে ঢুকে পাহাড়ী পথে পা ফেলতেই আমারও সুপ্ত মন হিমালয়-পথের স্বপ্নলোকে জেগে ওঠে। অজানিত কোথা থেকে বৃদ্ধদেহেও নবীন উৎসাহের বন্যা নামে। বীরভদ্রের বীরদর্পে চরণ ফেলার তালের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলি,—মনের আনন্দে, সহজ সাবলীল গতিতে।

হাড়কোলা পাহাড় ডান পাশে পড়ে থাকে। পাহাড়টার যেমন নাম, তেমনি হাড়-বার করা চেহারা। মাথার উপর কালো কালো পাথরগুলো যেন কঙ্কালের কালি-পড়া মাথার খুলি, হাঁ-করা চোয়াল। কালো ভালুক ওখানেই বাস করবে, আশ্চর্য কি!

বীরভদ্রকে জিজ্ঞাসা করি, দেখনি কখনো?

বলে, এক বছর তো এখানে এসেছি। এ-সব জানোয়ার এখন এখানে কমেও গেছে, যে কটা আছে, আরও জঙ্গলের মধ্যে সরে গিয়ে থাকে। বর্ষা-কালে ঐ সব উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেয়। আর ক্ষেতে ফসল থাকলে অত্যাচার শুরু হয়। মহুয়া ধরলে তো কথাই নেই। মহুয়ার নেশা ওদেরও খুব। অনেকে তখন দেখতে পায়ও শুনি, আমার কিন্তু এখনও চোখে পড়েনি। ঘোরাফেরার চিহ্ন অবশ্য দেখেছি। কয়েকদিন আগে একটা বাঘের সামনে পড়ি, জানেন?

তাই নাকি? কোথায়, কেমনভাবে, বল শুনি।

এই বনেরই ঐদিকপানে। দিনের আলোয়। এই রকম সময়ে। একটা বাঁক বেঁকতেই পথের ওপর সামনে। মাত্র হাত কুড়ি দূরে। প্রকাণ্ড ডোরা-কাটা বাঘ। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে। আমি তো দেখেই পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন, নড়বার ক্ষমতাই নেই। আমি তাকিয়ে আছি তার দিকে, সে তাকিয়ে আমার দিকে। সেও নড়েচড়ে না, আমিও নড়ি না। কেমন করে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম, কতক্ষণই বা কেটে গেল— তখনও টের পাইনি, আজও জানি না। হুঁশ হল বাঘটা যখন মুখ ঘুরিয়ে হেলেদুলে ওপাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। যাবার আগে ভীষণ এক গর্জন! আমারও বুক কেঁপে উঠল। তখনি অন্য দিক দিয়ে ছুট। কিন্তু মজা কি জানেন? যতক্ষণ বাঘের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কেন জানি না, ভয়ের কথা

মনে হয়নি। ভয় জাগল, বাঘটা চলে যাবার পর।

আশেপাশে জঙ্গলের দিকে তাকাই। বলি, খবর পাঠাও না, আজও যদি দর্শন দেন!

সে হেসে বলে, এ-সব হঠাৎই হয়। এই তো এক বছরে ঐ একবারই ঘটেছে। বাঘও এখন এ জঙ্গলে খুব কমই আসে। বনে গাছ কাটা চলেছে, কত লোকজন ঘোরে, ট্রাক লরি চলে—জানোয়ার থাকবে কেন? আগে নাকি অনেক ছিল।

কথা বলতে বলতে জঙ্গলের অনেকখানি ভিতরে চলে আসি! পায়ে হাঁটা সরু পথ। কোথাও ওঠে, কোথাও নামে। পাহাড়ী জায়গা। কোথাও বা একরাশ কালো পাথর। যেন জড়াজড়ি করে বসে। চতুর্দিকে নানান আকারের গাছ। বেশির ভাগই শুকনা। চেনা গাছের মধ্যে বট, পিপল—এ সব তো আছেই। মাঝে মাঝে বেল গাছও। ছোট ছোট বেলে ভর্তি। মহুয়া গাছের তলায় ঝড়ে-পড়া মহুয়া। এখনও টুপ্‌টাপ করে পড়ে,—শরতে শিউলি ফুলের মত। ফিকে হলুদ রং—প্রায় সাদা বললেই হয়। কিন্তু উগ্র গন্ধ. বেশিক্ষণ নাকে এলে গা ঘিনঘিন করে।

অবশ্য জানি মহুয়ার অনেক গুণ। রূপও অশেষ। সেই রসবতী রূপসীকে কবি তাঁর কাব্যে অমর করে রাখেন মহুয়া কবিতায়।

মহুয়া আদিবাসীদের খাদ্যও। শুকিয়ে সবজিও করে। গরুর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার চলে। মহুয়ার তেলেরও চাহিদা আছে। কিন্তু এর প্রকৃত প্রসিদ্ধি—সুরার উপকরণরূপে। তার পরিণতিই বা এখানে কেমন, যথাস্থানে তা বলা যাবে। এখন চলি বনের ভিতর দিয়ে ঝরা মহুয়ার মদির গন্ধের আবেশ মেখে। আশেপাশে ভূমিশয্যাশায়ী ঝরা পলাশের রক্তিম আঁখির আবিল চাহনি। এই সময়ে এই বনের মধ্যে রংয়ের মাধুর্য শুধু এই পলাশেরই। তাকিয়ে বুঝতে পারি, কিছুদিন আগেও পলাশের গাছভরা রক্তরাঙা ফুলে সারা বনে আগুনের লক্ষ লক্ষ শিখা জ্বলেছিল। সার্থক নাম—**The Flames of the forest**।

বনরক্ষী বীরভদ্র। অরণ্য তার আপন গৃহ। আগ্রহভরে নিজ এলাকার ধনরত্ন সব কিছুই দেখাতে চায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোঝাতে থাকে। প্রথমেই তার এলাকাব সীমানার পরিচয় দেয়। চাতরার দুটো ডিভিশন। উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তর ডিভিশনে চারটে রেঞ্জ। প্রতাপপুর, কুন্ডা, হান্টারগঞ্জ, রাজপুর। প্রতাপপুব ও কুন্ডার সংযোগস্থানে হিন্দিয়া। বাংলোটা প্রতাপ-পুরের মধ্যে। বাংলোর সামনে, বাঁ পাশের ও পিছনের সব জঙ্গলই কুন্ডা রেঞ্জে। সে হল কুন্ডা রেঞ্জের গার্ড। এখন চলেছি তারই এলাকার মধ্যে দিয়ে। দু পাশের গাছের ঝোপ। মাথা-উঁচু বড় গাছও; গাছগুলির দিকে তাকায় যেন তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন। এরাই তার একপাল ছেলেপিলে—ইন্দি, বিন্দি, দেবেন্দিরের দল। ঝোপঝাপ দু'হাতে সরিয়ে বলে, চলে আসুন এইখানে,—এ গাছটা চেনেন?

উঁচু লম্বা ধরনের গাছ। খুব ছোট ছোট পাতা। এখন প্রায় নেড়া। বীরভদ্র বলে, চেনেন না নিশ্চয়। খয়ের গাছ (Acacia catechu)। এর ছাল ছাড়িয়ে একটু কাটলেই গুঁড়ির ভেতর গাঢ় লাল কাঠের মত দেখা যাবে। সেইটে আগুনে সেদ্ধ করে কাত তৈরী করা হয়। এ গাছের দাম আছে।

এইভাবে পরিচয় দিতে দিতে এগিয়ে চলে,—এগুলো শিশম্। ঐ হল স্পন্দন। এটা আসান। পিয়াল চেনেন নিশ্চয়?—বলে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

অরণ্য-মায়ামুগ্ধ মনে আমার গুঞ্জরণ ওঠে!

ফাল্গুনে সে পিয়াল-তলায়,
কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন হাওয়ার চঞ্চলতার সনে।
কে তারে বাঁধলে অকারণে॥
সে কোন্ বনের হরিণ
ছিল আমার মনে।

প্রশ্ন করি, শাল গাছ দেখছি না তো?

সে বলে, এটা শালের জঙ্গল নয়। পারেন আর একটু এগিয়ে কয়েকটা দেখতে। এখানকার শালের তেমন নাম নেই--

বলি, শাল দেখেছি বটে সারাণ্ডার জঙ্গলে। হিমালয়ের তরাই ছাড়া আর কোথাও অত বড় শাল দেখিনি—

বীরভদ্র এ-কথা কানেও তোলে না; বলে চলে, আমার এ বনে মহুয়া গাছ খুব বেশি আর আসল সম্পত্তি হল—বাঁশ। দেখতেই পাচ্ছেন কত বাঁশের ঝাড়। বিকেলে নিয়ে যাব, বাঁদিকের জঙ্গলে। তখন দেখবেন, কি রকম মোটা মজবুত বাঁশের ঝাড়। কেবল বাঁশেরই জঙ্গল সেদিকটায়। এখানে অনেকটা পাঁচমিশালী জঙ্গল। পাহাড়ের ওপর ঐ যে দেখছেন সারি সারি গাছগুলো—

চোখ তুলে দেখি যেন সারা পাহাড়ের মাথায় 'কিউ' করে দাঁড়িয়ে গাছের দল। পাতাঝরা, শুকনা, সরু সরু ডাল। যেন সর্বাঙ্গে কাঁটা খাড়া করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সজারুর পাল। বীরভদ্র জানায়, ওগুলো সলাই গাছ। ওর কাঠও বিক্রি হয়। প্যাকিংয়ের কাজে লাগে। শুনেছি নাকি ও থেকে দেশলাইয়ের কাঠিও তৈরি হয়।

হঠাৎ থেমে কি যেন ভেবে মুচকি হাসে। চোখ কুঁচকে বলে, কি জানি, সেই জন্যেই হয়ত 'মাচিশ'কে 'সলাই' বলে!

কদিন পরে চাতরায় ফিরে চ্যাটার্জির কাছে কথাটা তুলি। তিনি শুনে হাসেন। বলেন, লোকটার রিসার্চ করবারও ঝোঁক দেখছি! নাঃ,—ও গাছগুলো সলাই ঠিকই—Boswellia Serrata—কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠি ও থেকে করে না।

ভাবি, তা না হোক, বীরভদ্র তার জঙ্গল সম্পর্কে খবর রাখে অনেক। কাজও করে মন দিয়ে, যত্ন নিয়ে। যেখানে বাঁশঝাড় জমা দেওয়া হয়েছে,

কাটার কাজ চলেছে,—তখন লোকজন নেই, পরে বিকেলে নিয়ে যায় সেইখানে।

জঙ্গলে ঢুকে ভালভাবে দেখে ঠিকমত ঠিকাদাররা কাটছে কিনা। বলে, এটা সত্যি করে বাঁশেরই জঙ্গল। আর যত সব দেখছেন—চারদিকে তার বেশির ভাগই বাজে কাঠ। জ্বালানির কাজেই লাগে,—সব শুধু 'লকড়ি'। দামও তার তাই বেশি নয়। ওঃ। আপনাকে বুঝি এখনও বলাই হয়নি। জঙ্গল জমা দেওয়া হয় কিভাবে জানেন? প্রথমে জঙ্গলকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এক-একটা অংশকে বলে কুপ্ (Coupe)। জমা দেবার মত গাছ তৈরী হলেই সেই কুপ্ তখন নিলামে তোলা হয়। যার ডাক বেশি ওঠে, সে-ই পায়। এখানকার এই সব সাধারণ গাছের কুপ-এর দাম ওঠে দশ এগারো হাজার টাকা। সেই সব কুপ-এর গাছ একবার কাটবার পর আবার জমা দেওয়ার মত তৈরী হতে পঁচিশ-ত্রিশ বছর লেগে যায়। কিন্তু, বাঁশঝাড়ের কুপ্ জমা দেওয়া চলে চার পাঁচ বছর অন্তর। জানেনই তো, বাঁশঝাড় বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। আবার বাঁশের একটা কুপ-এর দর ওঠে কত জানেন? আশি-নব্বুই হাজার টাকা। এক লাখ বা তার বেশিও কখনও চড়ে যায়! এই তো একটা ভাল বাঁশের কুপ্ আটকে পড়ে আছে কিছুকাল থেকেই। দুই কনট্রাকটারের মধ্যে মামলা চলেছে কোর্টে। কে সেটা পাবে তাই নিয়ে ঝগড়া। সেটার দাম উঠেছিল,—এক লাখ বিশ হাজার টাকা। সেইজন্যেই তো বলেছিলাম, এ জঙ্গলে সরকারের মস্ত রেভিনিউ—বাঁশ।

কাগজ তৈরীর কাজে এই সব বাঁশের চাহিদা। কেটে-রাখা বাঁশের বাণ্ডিলও দেখায়।

একটা ঝাড়ের নিকটে গিয়ে ডাকে, এগিয়ে আসুন এই দিকে। এই দেখুন, কি রকম ভুল করেছে এইখানে। লোকগুলোকে বলেও পারা যায় না, কেবলি ফাঁকি আর চুরি। নিয়ম হল, ঝাড়ের মাঝখানের বাঁশগুলো কাটবে। বাঁশগাছ যেমন লম্বায় বাড়ে তেমনি ঝাড়ের বাইরের দিকে নতুন বাঁশও গজাতে থাকে। সেই সব বাইরের নতুন বাঁশ কাটা চলবে না, শুধু তাই নয়। প্রতিটি নতুন বাঁশের পাশে একটা করে পুরনো বাঁশও ছাড়তেই হবে। এ ছাড়া আরও নিয়ম, কাটবার পর প্রত্যেক ঝাড়ে অন্তত ছটা বাঁশ যেন থাকেই। এই সব নিয়মের জন্যেই আবার বছর চারেকের মধ্যে নতুন ঝাড় তৈরি হয়ে যায়। এই দেখুন, এই দুটো ঝাড়ে নিয়মমত কাটা হয়নি, এই ধারে কচি বাঁশের পাশে পুরনো বাঁশও রাখেনি!—বুক পকেট থেকে কলম বার করে কাটা বাঁশের মাথার উপর ও গায়ে কি লিখে রাখে। মাথা তুলে বলে, এ-সব চিহ্ন দিয়ে রাখছি। অফিসার এদিকে দেখতে এলে তখনি বুঝতে পারবেন, আমি নোট করে গেছি।

এ-সবই বিকেলে ওদিকের জঙ্গলে ঘোরবার সময়ের কথা। এখন সকালে চলেছি ভিন্ন জঙ্গলে। এ ধারটায় সেই 'লকড়ি'র জঙ্গলই বেশি। তাই, ঘন

বনও। তবু, বীরভদ্র খুশী নয়। বলে, আপনি এলেন এমন সময়ে, যখন বন দেখে বনই মনে হয় না। এখন তো দু'পাশ গাছপালার মধ্যে দিয়ে বনের ভেতরে অনেক দূর দেখা যায়, বনের মধ্যে আলোও ঢোকে। গাছে পাতা প্রায় নেই-ই, তাই খালি খালি দেখায়। আসতেন যদি বর্ষাকালে বা তার পরে—তখন দেখতেন বনের চেহারাই যেত বদলে। সমস্ত গাছভর্তি পাতা, নীচেও মাটিতে বড় বড় ঘাস, ঝোপঝাড়। গাছে গাছে লতার বাঁধন সব সাপের মতন ঝোলে। মাথা তুলে হাঁটবার উপায় নেই। চারদিকে ঘন সবুজ। জঙ্গল ভেদ করে দুহাত দূরেও কি আছে দেখবার উপায় নেই। আলোও তখন ঢুকতে পায় না। চলতে হয় যেন আবছা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। চলতে গা ছমছম করে। কী রকম হাঁপ লাগে। কেবলই মনে হয়, জঙ্গল বুঝি পিষেই মেরে ফেলে। বাঘ ভালুক কোন জানোয়ার দু' হাত দূরেই ঘাপটি মেরে হয়ত বসে আছে, বোঝাই যায় না, দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা। আচমকা হয়ত শুনতে পেতেন, ক'হাত দূরেই জানোয়ার পালাচ্ছে, শুধু দেখতেন গাছপালা হঠাৎ নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় শব্দ। বুকের ভেতরও তখন ধুপধুপ করে।

একমনে শুনি তার বনের রূপ-বর্ণনা। কল্পনার চোখে যেন দেখিও। তারপর বলি, সেই জন্যেই দেখ চলে এলাম এই সময়ে। তখন এলে জঙ্গলই শুধু দেখা হত, জানোয়ার দেখার উপায় থাকত না। সব লুকিয়ে থাকত। এখন গরমের সময় খোলা জঙ্গল। তাছাড়া এ সময় জলও অনেক জায়গায় শুকিয়ে যায়, যে দু-চার জায়গায় জমে থাকে, জানোয়ার আসেই সে জায়গায় জল খেতে।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও চলে, পাও চলে। সেই দূরে দেখা পাহাড় কাছে আসে। ছোট পাহাড়। পার হতে সময় লাগে না। পাহাড়ের উপর দিকে পাহাড়ী ঝরনার আঁকাবাঁকা বিশীর্ণ বালুরেখা। তিন চার হাত মাত্র চওড়া। অপর পারে উঁচু জমি। ঘন বনও। বীরভদ্র বলে, এই নালাই হল আমার এলাকার সীমানা। শুধু কুণ্ডারই নয়, হাজারিবাগ জেলারও। ওদিকটায় শুরু হল পালামৌ। বাংলো থেকে মাইল তিনেকও হবে না।

নালা ধরে এগিয়ে চলি। এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। শুধু বালি, কাঁকর মাঝে মাঝে পাথর। হঠাৎ কি দেখে বীরভদ্র উৎসুক হয়ে এগিয়ে যায়। নালার বুকে বালির ভিতর হাতখানেক গোল ও গভীর গর্ত। ভিতরে সামান্য জল। নীচু হয়ে ভালোভাবে দেখে সে বলে, ভেবেছিলাম লোকে কেউ করেছে। কিন্তু এখানে মানুষ আসছেই বা কে, করবেই বা কেন? এটা জানোয়ারের করা। এই দেখুন পায়ের সব ছাপ। ঠিই কোন্ জানোয়ারের বোঝা যাচ্ছে না। শুয়োরের নয়।

ভালুক এসেছিল নাকি?

গা ছমছম করে। চারপাশে তাকিয়ে দেখি কোথাও দেখা যায় যদি। কিন্তু, কোথায় কি? চারপাশেই সেই শূন্য বন, পাতাঝরা গাছ। শুকনো

লম্বা-লম্বা ডালগুলো যেন আঙুল নেড়ে বলে, নেই, নেই, নেই !

নালা ধরে অনেকখানি চলি। বাঁ পাড়ে উঠি। এইবার দেখি শালবন। সোজা উঁচু গাছ। কচি সবুজ পাতা। এই নীরস শুষ্ক বনের পটভূমিতে দেখায় যেন মরুভূমির মাঝখানে স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সরোবর। আনন্দ প্রকাশ করে বলি, শালের পাতা এখনও ঝরেনি দেখছি !

বীরভদ্র হাসে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এসব গাছের পাতা ঝরে যায় শীতকালে। এখন আবার নতুন পাতা। ক্রমে ঘন সবুজ রং হয়ে যাবে, বেশি গরমের সময় একটু শুকোবেও।

মনে মনে ভাবি, বিচিত্র নিয়ম সৃষ্টিজগতের। প্রায় আর সব গাছে ঝরাপাতা, এদেরই শুধু সবুজের মেলা। যেন, পাশাপাশি ঘর করে মানুষ,—কারও শুরু কারও সারা, কারও সুখ, কারও শোকের পালা। ছোট পাহাড়ের রেঞ্জটা আবার এখানে পার হই। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে খানিক ওঠানামা। ছোট হলেও হিমালয়ের কথা মনে আসে। এ পাহাড়টার মাথার উপর সেই হাড়কোলা পাহাড়ের মতন। কালো কালো বড় পাথর, এলোমেলো জড় হয়ে পড়ে। আশেপাশে গুহা। বীরভদ্র দেখিয়ে বলে, এইখানেই বর্ষাকালে বাঘ এসে থাকে। তবে চারপাশের জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে এল, বাঘের রাজত্বও শেষ হয়ে গেল।

ভাবি সত্যিই তো। সভ্য মানুষের প্রয়োজন-বোধ অরণ্য জীবন গ্রাস করতে চলেছে।—ভাবতে ভাবতে নেমে আসি পাহাড়ের নীচে। সুমুখেই আর একটা টিলা। মাঝখানে খানিক সমতল জমি—জঙ্গল ভরা। হঠাৎ সেইখানে ডালপাতা ভেঙে জানোয়ার ছুটে যাওয়ার শব্দ ওঠে। দুজনেই থমকে দাঁড়াই, সেদিকে তাকাই। নাঃ—বাঘও নয়, ভালুকও নয়। হুড়মুড় করে ছুটে পালায়—দুটো চিতল হরিণ। চোখের পলকে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়।

আবার জঙ্গল। একটা বনমোরগ। মানুষ দেখে ঝটপট শব্দ তুলে সেও লুকোয়। দুটো ময়ূর। মানুষের সাড়া পেয়ে তারাও ঝোপঝাপে গা ঢাকে। সবাই ভাবে হয়ত, মানুষ তাদের শত্রু। মিথ্যাই বা কী।

একটা বড় গাছের গুঁড়ির কাছে বীরভদ্র এগিয়ে যায়। বলে, এটা দেখুন, এটা সেই পিয়াল গাছ। গুঁড়ির অংশ চিরে আঠা বার করে নিয়েছে। এর গঁদ খুব ভাল হয়। কার দরকার পড়েছে, লুকিয়ে কাজটিও করেছে। কত জায়গায় আর নজর রাখা যায়, বলুন।

বন ছেড়ে মাঠের উপর আসি।

বন ছাড়িয়ে এসেই খান দুই চালাঘর। পাশেই ক্ষেত। বীরভদ্র চেঁচিয়ে কাকে ডাকে। একটা লোক বেরিয়ে আসে। আদিবাসী। জঙ্গল পাহারার কাজে বীরভদ্রর অধীনে চাকুরি করে। কি সব তাকে হুকুম দিয়ে বীরভদ্র আবার চলতে থাকে। বলে, সকালের মত বেড়ানো হয়ে গেল। ঐ তো মাঠটা পার হলেই বাংলো—টিলার ওপর দেখা যাচ্ছে।

এতক্ষণ বনে-জঙ্গলে ঘোরা, জানোয়ারের গল্প,—সে যেন এক স্বপ্নালোকে ছিলাম। একদিনের চেনা বাড়িটা এখন আজন্মপরিচিত আত্মীয়ের মত মুখ তুলে তাকায়,—স্বপ্নজালও কাটে।

মাঠের উপর দিয়ে চলি। সামনে এক বিরাট গাছ। বাংলো থেকেই আগে এটা চোখে পড়েছিল। ঠিক যেন, খুব ভিড়ের মধ্যেও প্রকাণ্ড লম্বা মানুষ মাথা তুলে থাকে, নজরে পড়েই। গাছটার মাথা-ভরা হলুদ রঙের পাতা। দেখায় যেন, মাথায় সোনার টোপর। শুকনো গাছের সভায় এমন সজীব সতেজ ভীমকায় বৃক্ষ নিশ্চয় তরুরাজ্যে গণ্যমান্য কেউ হবেন ভেবে বীরভদ্রকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। আশ্চর্য হই তার অবজ্ঞা সূচক মন্তব্য শুনে। বলে, ও গাছটা ? ওটা কোন কাজেরই নয়। বাজে গাছ। গিঙ্গন (Ghingan), পার্মি (Parmi)-ও বলে। ওর কাঠও খারাপ। এমন কি শুকোয়ও না। তাই জ্বালানী কাঠের কাজেও লাগে না। কোন দামই নেই ও-গাছের। দেখতেই অমন।

ভাবি, মানুষের মধ্যেও অমন দু-চারজন থাকে। লম্বা-চওড়া বিশাল দেহ, সাজগোছের জাঁকজমক,—অথচ অপদার্থ। বৃক্ষজগতেও তাহলে অমন থাকে!

মাঠের মধ্যেও বহু মহুয়া গাছ।

বনের মধ্যে মহুয়ার কাহিনী শোনাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম, এইবার বলি। অনেক মহুয়া গাছের তলায় মাটিতে আগুন ধরানোর চিহ্ন। পোড়া তালপাতা, ছাই। বীরভদ্র বলে, আপনাকে বলেছি বটে এ জঙ্গলের সম্পদ হল বাঁশ, কিন্তু সরকারের সবচেয়ে বেশি রোজগার—রেভিনিউ হয় এই মহুয়া গাছের দরুণ। প্রতাপপুর এলাকায় তিনটে ভাটিখানা (Distillary) আছে। এর জন্যেও লাইসেন্স নিতে হয়। প্রতি বছর লাইসেন্সের জন্যে নিলাম ডাকও হয়। এই ভাটিখানা খুলতে দেবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট, শুনি নাকি, প্রতি মাসে বাষট্টি হাজার টাকা করে পায়—শুধু তিনটে ভাটিখানা বাবদ। ভেবে দেখুন তাহলে যারা লাইসেন্স নিয়েছে—তারা কত টাকা মাসে কামাচ্ছে—এই জঙ্গলে, এই সব গরীব লোকদের কাছ থেকে।

শুনে সত্যিই স্তম্ভিত হই,—এ কি করে সম্ভব!

কারণ তখনি জানতে পারি। যে কেউ জঙ্গলে মহুয়া সংগ্রহ করতে পারে, —বিনা পয়সায়। ঝুড়ি হাতে ছেলে-মেয়েদের করতে দেখিও। মহুয়ার ফুল ঝরার আগে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, গাছের তলায় ঝোপ-জঙ্গলও থাকে। তাই ফুল ঝরবার আগে গাছের নীচে আগুন লাগিয়ে দেয়, ঝরা পাতা জঞ্জাল ছাই হয়ে উড়ে যায়, সাদা ফুল দেখে তোলার সুবিধা হয়। সুবিধা হয় ঠিকই ; কিন্তু এই সব শুকনো খটখটে বনে ঐ কারণে অগ্নিকাণ্ড হওয়াও বিচিত্র নয়। হয়ও বখনও-সখনও। যাতে না হয় তার জন্য সতর্ক দৃষ্টিও রাখা হয়। আদিবাসীরা মহুয়া সংগ্রহ করে ভাটিখানার বিক্রী করে। তারপর সেখানে তৈরি হয় সুরা। কী বিরাট পরিমাণে,—টাকার অঙ্ক থেকেই তার খানিক ধারণা হয়। এ ছাড়া গোপনে মদ চোলাই,—এ জঙ্গলে বন্ধ করা হয়ত

সম্ভব নয়।

বীরভদ্র বলে, ঠিকাদাররা কুপ্ জমা নিয়ে কাঠ কাটায়। কাজ করে এই সব আদিবাসীরা। কাজ চলে আট মাস। নভেম্বর থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত। তার মধ্যে যা কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি কাটবার সব কেটে সরিয়ে নিতে হবে, যদি কিছু জঙ্গলে পড়ে থাকে, পরে আর সরানো চলে না। ১লা জুলাই থেকে জঙ্গলে তাদের কারও ঢোকবার অধিকার নেই। তখন বর্ষায় আবার গাছপালা বাড়তে থাকে, জঙ্গলেরও যা ভীষণ অবস্থা হয় ঘোরাফেরাও চলে না। আদিবাসীরা কিন্তু সেই যে রোজগার করে নেয় তাতেই তাদের বারো মাস স্বচ্ছন্দে চলা উচিত। কিন্তু তা চলে না। টাকা হাতে এলেই তখনি খরচ হয়ে যায় ঐ মদে। তাই দেখেছেনও ওদের শোচনীয় অবস্থা। ছোট ছেলেমেয়ে, ছোকরা-ছুকরী, বুড়ো-বুড়ি—একজনও এমন নেই যে মদ খায় না। বিকেলের পরই সব চুর। কথা বলার উপায় নেই কারও সঙ্গে, কাজ করানো তো দূরের কথা। পয়সা হাতে এসেও খাওয়া-পরার পয়সা হাতে থাকে না। তবে তার জন্যে তাদের মনে কোন ক্ষোভ বা অভাব বোধও আছে বলে মনে হয় না। এক-একবার ভাবি, এরাও কি মানুষ, না জঙ্গলেরই জানোয়ার!

পরে শুনেছিলাম, প্রতাপপুরে একটা হাইস্কুল আছে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প। পড়বে কে. বাচ্ছাগুলোও যেন জন্মাবধি ঐ রসে ডুবে আছে।

খবরগুলি শুনে ভাবি সত্যিই কি এর কোন প্রতিকার নেই? গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বাড়ে ঠিকই।—কিন্তু কিসের বিনিময়ে? মনে পড়ে, এককালে চীনদেশের লোকেদের অবস্থা। আফিং ধরিয়ে ইংরেজদের ব্যবসা চালানো,—একটা জাতিকে নিস্তেজ, অমানুষ করে রাখা।—সেই কুম্ভকর্ণের যেদিন নিদ্রা ভাঙল, জগৎ কেঁপে উঠল।

এখনকার মত বনভ্রমণ শেষ করে বাংলোয় ফিরি।

চা খেতে খেতে আবার গল্প চলে। জঙ্গলের নয়। বীরভদ্রের আপন কথা। চাতরা থানায় ঘর। মা বাবা আছেন। এক দাদা ও ছোট ভাই বোনও। ক'বছর আগে স্কুল ফাইনাল পাস করে। ফরেস্ট-গার্ডের জন্যে লোক চাই শুনে দরখাস্ত করে দেয়। বাড়িতে কাউকে না জানিয়েই। চাকরি পেয়েও যায়। বাবা-মার তখন আপত্তি। গ্রামে কিছু জমিজমা আছে, দাদাই দেখাশুনা করেন। বাবা আগে ফরেস্ট দপ্তরে সামান্য কি চাকরি করতেন। তাই বনে বনে থাকা, ঘোরাঘুরি করা,—এসব জীবনের ভয় ও অসুবিধার কথা তাঁর জানা। সেই কারণেই তাঁর ঘোরতর আপত্তি। বলেন, ব্যবসা কর্ বা দোকান খোল্, অন্য চাকরিরও না হয় চেষ্টা কর্। বন-জঙ্গলে চাকরি করবি কি? পড়ালেখা শিখলি কীসের জন্যে? বীরভদ্র তাঁদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চাকরি নেয়। প্রথম পোস্টিং ঐ কুন্ডাতে। ভাল লাগে না সেখানকার লোকজনদের। সকলেই খুব মদ খায়। বিকেলের

পর কারও সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই—ভরভর করছে গন্ধ। তাছাড়া লোকগুলো অশিক্ষিত। ভাষাও একটু আলাদা। বড় সাহেবকে বলে-কয়ে এক বছর পরে অন্যত্র বদলি হয়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এই বছরখানেক হল এসেছে—আবার সেই কুন্ডা এলাকাতেই। কিন্তু এখন নিজের কাজ শিখে নিয়েছে, আবহাওয়াও ধাতস্থ হয়েছে। লোকদের সঙ্গে কীভাবে কথাবার্তা বলতে বা মিশতে হয়, তাও জেনে গেছে।

হেসে প্রশ্ন করি, মদও খেতে শিখেছ নাকি ?

শুনে চমকে উঠে গম্ভীর হয়। বলে, ছিঃ! জীবনে কখনও ছুঁইওনি, ছোঁবও না। জানেন ? প্রথমে যখন চাকরি নিয়ে আসি, বাবা একটি কাগজে লিখে দেন কিভাবে আমাকে থাকতে হবে, কাজ শিখতে হবে—সব কিছুই এক দুই তিন নম্বর করে। তাতে এই নেশাটেশা থেকে সাবধান হওয়ার কথা তো ছিলই, কাজ করার সম্বন্ধেও লেখেন, যা শেখবার আগাগোড়া ভালভাবে শিখবে এবং শুধু শেখাই নয়, ঠিকমত করতে হবে। যা যখন করা উচিত মন বলবে, তা করতে কখনও যেন ভয় না পাই—এই সব উপদেশ। সেইমত থাকতেও সব সময়ে চেষ্টা করি।

বিয়ে করেছ ?

সলজ্জ নয়নে মুখ নীচু করে। মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। তারপর বলে, এই এক বছর হয়েছে। বাবাই ঠিক করে ডেকে পাঠান। হাজারিবাগের মেয়ে। ফোর্থ স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছে। সেও আমার এ চাকরি পছন্দ করে না। জঙ্গলে আসতেও চায় না। আনাও বিপদ। দেখছেন তো কি জায়গা! মেয়েছেলে নিয়ে থাকার অসুবিধে কত। তার উপর সারাদিনই ঘুরতে হয় বনে বনে, মাঝে মাঝে সদরেও যেতে হয়। তাই তাকে আনাও সম্ভব নয়। তবু এ কাজ আমি ছাড়ছি না। বন-জঙ্গল আমার খুব ভাল লাগে। গাছপালার মধ্যে সারাদিন কাটানো, তাদের যত্ন নিয়ে দেখাশুনা করা,—মনে হয় ওরাই যেন আমার সব বন্ধু। তবে হ্যাঁ, এও ঠিক কথা,—এ-সব কাজ ভালভাবে করতে হলে, খাটতে হয় খুব বেশি। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা—এলাকাও অনেকখানি। খাওয়া-দাওয়ার সময়-অসময় নেই! জিনিসপত্রও কিছু মেলে না। চাল-আটা, সেই প্রতাপপুর থেকে কিংবা বুধবার চক-এ বাজার বসে—সেখান থেকে আনা। কাজ থেকে ফিরে নিজেই রান্না করা। এ-সব অসুবিধে আছেই। নিজেই একটা সাইকেল কিনেছি। ঘোরাফেরার তাতে অনেকটা সুবিধে হয়। তার জন্যে অবশ্য ভাতা পাই না। অথচ মজা কি জানেন ? জঙ্গলে কাউকে কোন অপরাধে ধরলে সদরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রিপোর্ট করার কথা,—যেন পায়ে হেঁটে গিয়ে তা করা সম্ভব।—একটু চুপ করে থেকে আবার দৃঢ়স্বরে বলে, তা হোক, এসব অসুবিধে, বন-জঙ্গলের কাজ আমি ছাড়ছি না!

মাহিনার কথা জিজ্ঞাসা করি। জানায়, মাসে ১২৫ টাকা। এই মাস থেকে বেড়ে দেড়শ হবে। ৭৫ টাকা নিজের খরচার জন্যে রাখি। বাকি টাকা

বাড়িতে পাঠাই। সম্প্রতি নোটিশ পেয়েছি আগেকার মাইনের দরুন কি বাবদে ছ টাকা দপ্তরে নাকি জমা পড়ে আছে। কিন্তু সদর থেকে আনতে যাব কি? যাতায়াতের খরচা ও টাকা বার করার উপরি দিতেই ছ টাকা চলে যাবে—বলে হাসে।

বেলা বাড়ে। বীরভদ্র বিদায় নিয়ে তার ডেরায় ফেরে। বলে যায়, বিকেলে পাঁচটায় আসবে। বাঁদিকের বনে তখন ঘোরা যাবে।

আশা নিয়ে থাকি, তখন যদি বাঘের দেখা পাওয়া যায়।

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিই। দিনে ঘুমানো আমার স্বভাব নয়। চুপ করে ঘণ্টাখানেক পা ছড়িয়ে বসা বা লম্বা হওয়া। বারান্দার দিকে কপাট বন্ধ। জানালাগুলো খোলা। নিস্তব্ধ দুপুর। কেবল পাখিদের সেই পরিচিত স্বর। কান পেতে অলস শয়নে শুনতে থাকি। বেশ লাগে। হঠাৎ কচি পায়ের মৃদু শব্দ তুলে বারান্দায় কারা ওঠে। নিশ্চয়, ইন্দি বিন্দির রেজিমেন্ট। ফিসফাস কথা, খুটখাট শব্দ। ক্রমে গলার স্বর ওঠে, আওয়াজ বাড়ে, হুটোপাটি শুরু হয়। আমার শান্তির ব্যাঘাতও ঘটে। কিছুক্ষণ সহ্য করি। পরে ধৈর্য হারাই। চেঁচিয়ে বলি, ওরে নিজের ঘরে গিয়ে তোরা খেলা কর,—এখানে এখন গোলযোগ করিস না।

আগুনে জল পড়ে। তাদের উৎসাহ তখনি নিবে যায়। দু একটা ফিসফাস শব্দ। জানালার পাশ দিয়ে পা টিপে চলে যাওয়ার আওয়াজ। আমিও নিশ্চিন্ত হই।

বিকেলে রামচন্দর চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে আনে। বলে আপনার কাছে দাওয়াই আছে—পেটের অসুখের?

জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে? তোমার নিজের নাকি?

বলে, না—আমার লেড়কা-লেড়কির মাতাজির।

তখন শুনি, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে রামচন্দর গ্রামে যায় ঘি আনতে। ফিরতে একটু দেরিই হয়। দুদিন থেকে তার স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছে না,—ফিরে এসে দেখে, পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কয়েকবার দাস্তও হয়েছে।

সঙ্গে যা ওষুধ ছিল এনে দিই। কিন্তু তখন মনে ভাবি, বাচ্চাগুলো হয়ত দুপুরে পীড়িত মায়ের কাছে গোলমাল করছিল, মায়ের ধমক খেয়ে সম্ভবতঃ চলে আসে এখানে। আবার এখান থেকে আমিও দিই তাড়িয়ে। বেচারীরা! কিংবা কে জানে, হয়ত ঐ গিন্নিপনা একটুকরো মেয়ে ইন্দিটা মায়ের কষ্ট দেখে বলেই আসে, বাবুজির কাছ থেকে ওষুধ আনছি এখুনি, —হয়ত বুক ফুলিয়ে এসে মাথা নীচু করে ফিরে গেছে।

ভাবতেও মনে লজ্জা পাই। রামচন্দর ওষুধ নিয়ে ফিরে যায়। বলি, তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায়? পাঠিয়ে দাও তো এখানে।

তারা আবার পা টিপে সলজ্জভাবে আসে। বিস্কুট বিতরণ করি। সবার মুখে হাসি ফোটে। আমার মনের কালো মেঘও খানিক কাটে।

বিকেলে ঠিক সময়েই বীরভদ্র এসে হাজির। বাঁদিকের বনের ভিতর নিয়ে

চলে। বাংলোর এলাকা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েই বন শুরু। বড় রাস্তা ধরে চলি। দুধারে সেই উঁচুনীচু পাহাড় জঙ্গল। তবে এখানে বাঁশঝাড় অনেক বেশি। এ কূপ-এ কাজও চলেছে, তাই বাঁশও অনেক কাটা হয়েছে। এইখানে বীরভদ্র বাঁশ কাটবার নিয়মকানুন সব শোনায়। পথের পাশে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড উইয়ের ঢিবির মত উঁচু করা। দেখিয়ে বলে, ঐগুলো বনের সীমানা-চিহ্ন—বাউণ্ডারি পিলার। গাছের গায়ে দাগ কাটা বা নম্বর লেখা। কূপ জমা দেওয়া হলে ঠিকাদার কোন গাছ কাটতে পারে, না পারে,—এসব দেখে বুঝতে পারবে।

প্রায় দু কিলোমিটার পথ আসবার পর রাস্তা দু ভাগে ভাগ হয়। পথের মাঝখানে সাইন-বোর্ড। সুমুখের রাস্তা গেছে কুণ্ডায়,—এখান থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার। তারপর চলে যায় প্রতাপপুরে। ডানদিকের পথ গেছে কুটিল। ২০ কিলোমিটার: সেখান থেকে লাবালং—প্রায় ৩০ কিলোমিটার।

লাবালং! শুনেই বলি, দেড় বছর আগে সেইখানকার ফরেস্ট রেস্টহাউসে ছিলাম। চাতরা থেকে সোজা সেবার যাই। এ জঙ্গলও তাহলে সেদিকে ঘুরে গেল? সে বছর সেখানেও কোন জানোয়ার দেখা যায়নি। এবার এখানে যদি দেখাতে পার দেখি।

বীরভদ্রের মুখ গম্ভীর; বলে, চলুন। আর এখানে দাঁড়ায় না। বাঁদিকের জঙ্গলের গাছে ঐ যে সাদা সাদা মাকা, ঐটেই আমার রেঞ্জের সীমানা। ওদিকে প্রতাপপুর রেঞ্জ শুরু। চলুন তাড়াতাড়ি। রাস্তা ছেড়ে আমরা রেঞ্জের বনের ভেতরে নামি। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আবার বড় রাস্তায় উঠব—বাংলোর কাছেই।

পথ ছাড়বার আগেই ফিসফিস করে বলে, জমানা বহুৎ খারাব হো গয়ি।

আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকাই।

সে ইশারা করে দেখায়—রাস্তার ওপর ঐ জায়গাটা—ঐখানটায়।—চলুন নীচের জঙ্গলে যেতে যেতে বলছি।

ব্যাপার কি বুঝি না।

পাহাড়ের গা দিয়ে সরু পায়ে-হাঁটা পথ। নামতে নামতে চুপিচুপি বলে, বছর দেড়েক আগে ঐখানটায় দাঙ্গা হয়, লোকও জখম হয়।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, এখানে এই বনের ভেতর। কে কার সঙ্গে দাঙ্গা করলে? কি জন্যই বা?

সে বলে, এখন চুপ। পরে সব বলব। লুঠতরাজ হয় এই জঙ্গলটায় মাঝে মাঝে। দুশমন আদমি ঘোরে এই জঙ্গলে। সেদিন কজন লোক কুণ্ডার পথে যাচ্ছিল, ডাকুরা ঐ লাবালং-কুটিলের দিক থেকে এসে মারপিট শুরু করে। ঐ জায়গাটায়। আমি এখানে বদলি হয়ে এসেই শুনি। চলুন, এখন কথাবার্তা না বলে। এদিকটা ভাল নয়।

ভাবি, এই গভীর জঙ্গলে এলাম—বাঘ-ভালুক নয়, অন্য জানোয়ার নয়—মানুষের ভয়।

গা ছমছম করে। দুজন লোকের গলা শোনা যায়। বীরভদ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমিও দাঁড়াই। মাথা তুলে উপরে পথের দিকে একদৃষ্টে সে তাকায়। তারপর বলে, নাঃ আদমি চলেছে। ঠিকই আছে। চলুন।

এতক্ষণে বুঝতে পারি, এ জঙ্গল সম্পর্কে চৌকিদারের সাবধান করানোর যথার্থ কারণ। ভাবি চক্রবর্তীর 'ফায়ার আর্মস'-এর বারংবার উল্লেখও কি এই জন্যেই?

হঠাৎ তখনি মনে আসে লাবালং-এর এক ঘটনা। সেও তো বছর দেড়েক আগে। ঠিকই তো! সেখানে সেবার একদিন বিকেলে বনের পথে ঘুরছি, হঠাৎ দেখি একদল পুলিস ফৌজ আসে মার্চ করে। হাতে বন্দুক। ভাবি হয়ত ট্রেনিং ক্যাম্প করতে কোন দল এসেছে। অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়। তখন শুনি, তা নয়। বনের ভিতর একদল সশস্ত্র ডাকাত লুকিয়ে থাকে। মেয়েছেলেও আছে তাদের মধ্যে। তারা লুঠতরাজ তো করেই, কিছুদিন আগে নাকি একটা পুলিসকে হত্যাই করে ফেলে। তাদের ধরবার জন্যে তাই অত আয়োজন। পুলিস ট্রাকে করে রাত্রেও বনের মধ্যে টহল দেয়, সার্চ-লাইট ফেলে খোঁজাখুঁজি চালায়। ট্রাকের উপর দু-একদিন বনের মধ্যে গুলিও এসে পড়ে। কিন্তু তবু কাউকে ধরা যায় নি। একে গভীর বন, তার উপর গ্রামের লোকও বিশেষ খোঁজখবর দেয় না, সাহায্য করে না--হয়ত প্রাণভয়েই। —ভাবি, এও তো সেই লাবালং জঙ্গলেরই একটানা অংশ।

বাংলোতে ফিরে বীরভদ্রকে সেই গল্প করি। সে বলে, ঠিকই ধরেছেন। বলছি আপনাকে ব্যাপারটা। আমিও যে ওদের খপ্পরে একবার পড়ি।

তুমি! বলে শোনবার আগ্রহে সোজা হয়ে বসি।

সে বলতে থাকে: এই মাস চারেক আগেকার কথা। সাইকেল চড়ে চলেছি কুন্ডায় দপ্তরের কাজে। ঐ যে রাস্তা আজ দেখলেন সেইখানে। বনের মধ্যে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারি—তাদের দল। জন দশবারো লোক—আমারই দিকে এগিয়ে আসে। তখুনি মাথায় বুদ্ধি জাগে, চট করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ি। কানে পৈতে জড়িয়ে পথের পাশে গিয়ে বসি। উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য। হাতের রিস্টওয়াচ খুলে এই ছেঁড়া জুতোর ফাঁকে লুকিয়ে রাখি। আবার সাইকেলে উঠে এগিয়ে যেতেই তারা ঘিরে ফেলে। কিছুই যেন জানি না এমনি ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা শিকার খেলতে বার হয়েছেন বুঝি? আমি এখানকার ফরেস্ট গার্ড—

সর্দার বলে, শিকার তো খেলতে বেরিয়েছি। শিকার তুমি নিজেই। কি আছে দেখি, বার কর শীগগির।

পকেটে বারোটা টাকা ছিল। তখনি বার করে দিই। বলি, নিতে চান সবই নিন, তবে দুটো টাকা ছেড়ে দিলে উপকার হত, সদরে যেতে হচ্ছে—

তারা ছাড়ে না। সব টাকাই নিয়ে নেয়। হাফপ্যান্ট, সার্টও খুলতে বলে। সর্দারের কেন দয়া হয়, জানি না, ছেড়ে দেন। সাইকেলের টায়ারও একজন ছেঁদা করায় চেষ্টায় ছিল, সর্দার মানা করে।

এতক্ষণ যে কথাবার্তা চলেছিল, ওদের মুখের দিকে তাকাতে দেয় নি, কেবলই গুঁতিয়ে বলে, খবরদার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাক। কিন্তু তার আগেই সাইকেলে আসার পথে ওদের চেহারা দেখে নিয়েছি। তিন-চারজনের রঙ ফর্সা। সর্দারের ফুলপ্যান্ট, মিলিটারীর মত পোশাক। কোমরে পিস্তল। দলের আর সকলের হাফ্‌প্যান্ট, সার্ট। দু-তিনটে বন্দুকও তাদের কাছে ছিল। টাঙি, কুড়ুল, বর্শা এসব তো কাছে থাকেই।

জিজ্ঞাসা করি, কথা কইছিল কোন্‌ ভাষায় ?

আমাদের ভাষাতেই। লেখাপড়া জানা লোক। বিশেষ করে সর্দারটি। আমাকে কি আর ভালভাবে দেখতে দিলে ? ঐ আসবার সময় যেটুকু দেখতে পেয়েছিলাম। ছাড়া পাবার পর সাইকেলে ওঠবার সময় একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে ফেলি, তখনই আবার ধরে, চেঁচিয়ে ওঠে, খবরদার, ফের যদি তাকাও—

সঙ্গে সঙ্গে বলি, আর কখনও করব না। কাউকে এ ঘটনা বলব না কথা দেবার পর আবার ছাড়ে। দু-একজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কাউকে এ-কথা বলিওনি। কিন্তু এ-রকম ঘটনা আরও ঘটেছে। একবার এক ট্রাক-ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে আসছে। সন্ধ্যে তখন হয়-হয়। জোরেই চালাচ্ছে। হঠাৎ গাড়ির কি খারাপ হল। পথের ওপর থামিয়ে বনেট খুলে দেখছে। এমন সময় কোথা থেকে একটা লোক এসে হাজির। এসে দেশলাই চায়। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতেই জন দশ-বারো লোক এসে ঘিরে ফেলে, যা কিছু ছিল কেড়েও নেয়। দু-একটা খুনজখমও মাঝে মাঝে হয়। এই তো ক'মাস আগে এক অফিসারের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিও চালিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করি, এরা সব কারা ? কোথা থেকে এল ?

বীরভদ্র বলে, এ-ধরনের ঘটনা আজ বছর দুই থেকেই বেশি ঘটছে। তবে ইদানীং অনেকটা কমেছে, তার কারণও পরে বলছি। অনেকেই বলে, এ-সব নাকি এক জাতের জংলী আদিবাসীদের কাণ্ড। তাদের বলে, পাড়াহিয়া।

প্রশ্ন করি, পাহাড়িয়া ?

সে বলে, হতে পারে, তার থেকেই 'পাড়াহিয়া' হয়েছে। এরা দল বেঁধে থাকে। মেয়েরাও আছে। কিন্তু কোথাও ঘর বাঁধে না। জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়—আজ এখানে, কাল আর এক জায়গায়—

শুনে বলি, নোমাড্‌ (Nomad)—যাযাবর জাতি তাহলে ?

বীরভদ্র কথাটা বোঝে না। বলে, হতে পারে, জানি না। ঐ অঞ্চলে বনে বনে ঘোরে। অস্ত্রশস্ত্র রাখে। লুঠতরাজ করে। যা পায় কেড়ে নেয়। শুনেছি কি এই সব গরীব অধিবাসীদের গ্রামেও চড়াও হয়, তাদের সামান্য যা কিছু থাকে—থাকবেই বা কি ? খুদ-কুঁড়োটুকুও লুঠ করে নিয়ে যায়, মারধোরও করে। ভয় দেখিয়ে আদিবাসীদের দু-চারজনকে দলেও টানে। দু-একবার এদিকে প্রতাপপুরের জঙ্গলেও চলে এসেছে।

মনে পড়ে যায়, প্রতাপপুরে শোনা সেই মোটরে পাথর-পড়ার কাহিনী

গতকাল ভোরে এখানে আসার পথে জঙ্গল থেকে জীপের ওপর সেই টর্চের আলো ফেলা, সার্কেল ইন্‌সপেক্টরেরর প্রচ্ছন্ন মন্তব্য।

বীরভদ্র জানায়, তবে বলছিলাম যা, মাস দুই থেকে এদের অত্যাচার কমেছে। দুটো বড় দল ধরা পড়ে যায়। ওদের জঙ্গলের ভেতর ধরা সহজ কথা নয়। পুলিস অফিসাররা নাকি আশ্চর্যরকম সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কি করে ধরেন জানেন? আমার অবশ্য শোনা গল্প। পুলিস কি করে খবর পায় তারা তখন কোন্ জঙ্গলে কোথায় ঘুরছে। ফৌজ নিয়ে অফিসার তখন বেরিয়ে পড়েন। দূরে গাড়ি রেখে দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জঙ্গলে ঢোকেন—মাটির ওপর হামা দিয়ে শুয়ে—এগিয়ে যান চুপিচুপি। তারপর কাছাকাছি পৌঁছেই গুলি চালান। চারদিক থেকে পুলিসের দলও এসে যায়, ডাকাতদের ঘিরে ফেলে। আর একজন ধরা পড়ে অফিসারের অদ্ভুত চালাকিতে। সেখানেও পুলিস ফৌজ থাকে কিছু দূরে ট্রাকে বসে। অফিসার নিজে সাজেন মেয়েদের মতন; গয়না শাড়ি পড়েন। ভেতরে কোমরে গোঁজা অস্ত্রশস্ত্র। সঙ্গে তিন-চারজন পুলিস, তাদের পরনে সাধারণ কাপড়চোপড়, তবে অবস্থাপন্ন এমনি ভাব। তাদেরও কাছে লুকানো পিস্তল, রিভলবার। সহজভাবেই তাঁরা বনের পথে চলেন যেন গ্রামে যাচ্ছেন। ডাকাতও ঠিক টোপ খায়। বেরিয়ে এসে এঁদের ঘিরতে যাবে, এঁরাও তখুনি গুলি ছোঁড়েন। অন্য পুলিস এসে যায়।—এই দল দুটো ধরা পড়বার পর থেকে এখন অনেকটা চুপচাপ।—বীরভদ্র চুপ করে, কি যেন ভাবে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু আমার নিজের ধারণা বলব? এরা সবাই যে ঐ বুনো পাড়াহিয়ার দল তা আমার মনে হয় না। এদের মধ্যে লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকও আছে। আমার তো খুবই সন্দেহ হয়, আজকাল ঐ সব কি বিদ্রোহী দলবল হয়েছে,—তাদেরই কেউ কিনা কি জানি।

একটু থেমে আবার বলে সেই একই কথা, জবানা বহুৎ খারাপ হো গয়ি বাবুজি।

বারান্দার বাইরে তাকাই। কখন অলক্ষ্যে দিনের আলো নিভে গেছে রাতের আঁধার নেমেছে। আমারও মনের কোণে দেখি বনদেবীর সেই শান্ত সৌম্য স্বর্ণ-প্রতিমার অঙ্গে কারা যেন কালিমা লেপন করে।

নির্বাক হয়ে বসে থাকি। হঠাৎ মনে পড়ে, বীরভদ্র বিকেলে এসেছে, টর্চ আনেনি। ফিরবে কি করে?

বলি, যাবার সময় চৌকিদারকে বোলো, লণ্ঠত জেলে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

সে অন্ধকারের দিকে তাকায়। বলে, হাঁ, তাই তো রাত হয়ে গেছে!

আলো আনতে বলি এখুনি। কিন্তু লণ্ঠন নিয়ে গেলে আপনি থাকবেন কি করে।

তাকে বোঝাই, আমার তাতে অসুবিধা হবে না। তাছাড়া পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণই বা লাগবে? ঐ তো রামচন্দর আসছে লণ্ঠন জ্বালিয়ে।

বীরভদ্রর দুশ্চিন্তা কাটে না। আবার বাইরের দিকে তাকায়। সেখানে কি দেখে সে-ই জানে। আমি দেখি তার চোখে-মুখে কেমন যেন ভয়ের ছায়া নামে।

হেসে বলি, গতকাল বুনো জানোয়ারের কথা মনে হয়েছিল, আজ আবার ডাকাতের কথা বললে। ডাকাত আসে আসুক। আমার কাছে আছেই বা কি? যা আছে নিতে চায় নেবে।

বীরভদ্র গম্ভীর মুখে বলে, জানোয়ারের কথা নয়। ডাকুরও নয়। ওরা জঙ্গল ছেড়ে এ-বাংলোতে আসবে না। কিন্তু, এই অন্ধকারে—একা—সভয় দৃষ্টিতে আবার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখে।

বুঝতে পারি ব্যাপারটা। হেসে বলি, ওঃ। ভূতের ভাবনা ভাবছ নাকি?

চমকে আমার দিকে তাকায়। বলে, বিশ্বাস করেন না আপনি? চুপ,—বলবেন না ও-কথা। সন্ধ্যের পর অন্ধকারে কোথাও যাই না আমি। হাতে আলো থাকলেও পিপল গাছের তলা দিয়ে তো রাত্রে কখনই নয়—সেখানে কারা যেন থাকেই।

আবার হেসে উঠি। বলি, তুমি ভাবনা কোরো না। আলো নিয়ে ঘরে যাও। আমার কেউ ক্ষতি করবে না। ভূত কখনও ভূতের ভয় পায়?

সে অবাক হয়ে মুখের পানে তাকায়। ছোট ছেলের মত বলে, না, বাবুজি, না।

চৌকিদারের সঙ্গে আলো দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিই। দেখতে থাকি, সেই লম্বা লম্বা সদর্পে এগিয়ে-চলা পা দুখানি ভীতি-বিজড়িত হয়ে চলতে থাকে।

ভাবি, অত বড় সাহসী জোয়ান বুদ্ধিমান বনরক্ষী। বনে জঙ্গলে একা ঘোরে। বাঘের সুমুখে দাঁড়িয়ে ভয় পায় না। ডাকাতদল ঘিরে ধরলেও সাহস হারায় না। ঘরে বসে মোহাচ্ছন্ন মনের ভিতরই শুধু ভয়কে পোষে।

এর পরের ঘটনা অতি সামান্যই। তব লিখি।

পরদিন ভোরে বীরভদ্র আসে সাজগোজ করে সাইকেল নিয়ে। গতকালই সে জানায়, আজ তাকে কুন্ডায় যেতে হবে, মাহিনা আনতে। আমাকে ছেড়ে যেতে তার মোটেই ইচ্ছা নেই। মাহিনার টাকা দু'দিন পরে আনলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কুন্ডা থেকে চাতরা যেতেই হবে। কোর্টে একটা ফরেস্ট-কেস্-এর রায় দেবার দিন আগামী কাল। সেখানে তার হাজির থাকা চাই-ই। সরকারী কাজ—ডিউটি। না করে উপায় নেই।

ম্লান মুখে দাঁড়ায়। ভাঙা ভাঙা কথায় বলে, বাবুজি—ভাল লাগছে না—চলে যেতে—

সস্নেহে বলি, এস তুমি। নিজের কাজ কর ঠিকভাবে। ভাল থাক।

হেঁট হয়ে প্রণাম করে। মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়েই গম্ভীর হয়। চকিতে ফিরে দাঁড়ায়। সেই লম্বা লম্বা পা ফেলে টিলা থেকে নেমে যায়। পাহাড়ী পথে মন্থর গতিতে সাইকেল চলে। অদূরে বনের মধ্যে অচিরে অদৃশ্য হয়।

সঙ্গীবিহীন ঘুরে বেড়াই কাছাকাছি বনে বনে।

দুপুরে কালো মেঘ করে আসে। পাহাড়ের মাথায় আকাশ চিরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। গুরু গুরু মেঘের ডম্বরু বাজে। ময়ূরের ডাকে বন সজাগ হয়ে ওঠে। বারান্দায় একা বসে দেখতে থাকি, অরণ্যের নবঘনশ্যাম রূপসজ্জা। মনেই হয় না, দিনের বেলা। এ-যেন সন্ধ্যার ছায়া ঘনায়। চারিপাশ নিশ্চল। শুধু ঝলসে ওঠে থেকে থেকে বিদ্যুতের চমক। আমিও স্থির হয়ে বসে। হঠাৎ কি যেন চলতে দেখে চমকে উঠি। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরেই বাংলোর বাঁ পাশে যে শুকনা নালা ও তার পরেই বন ও পাহাড়,--সেইখানে ধীরে চলে এক নেকড়ে বাঘ। প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মত দেহ, হয়ত তার চেয়েও বড়। ছাই-ছাই রঙ মোটাসোটা চেহারা। লোমভরা লেজ। মুখটা মনে হয় সবুজ ধরনের। হেলেদুলে ধীর পায়ে এগিয়ে যায়। নালার পাশে ঘন ঝোপ। তারই ভিতর ঢোকে। আর দেখা যায় না।

সেই আসন্ন দুর্যোগের পটভূমিকার সম্মুখে বসে ভাবতে থাকি, এককালের এই প্রসিদ্ধ গহন বন। এখন 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নয়, ভাল্লুক নয়, হিংস্র চতুর চিতাও নয়,—সামান্য এক নেকড়ে বাঘ,—ঘুরে বেড়ায় যেন হারাধনের হারিয়ে যাওয়া ছেলের মতন। যেখানে ছিল বাঘের ভয় এখন সেখানে দেখা দেয় মানুষের ভয়। বন্যপশুর স্থান দখল করে মানুষবেশী দুর্বৃত্তের দল। অরণ্যের শান্তি ও শোভা হরণ করে। যাদের থেকে দূরে সরে এই গভীর বনে চলে আসা, তারাই যেন অলক্ষিতে লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে।

বিচিত্র চরিত্র মানব ভাগ্য। মানুষ সুন্দরের উপাসক, শান্তির পূজারী। আবার মানুষই শান্ত সুন্দরের বিঘ্নকারী।

—ভ্রমণকাহিনী সমগ্র তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত—

ভ্রমণ অমনিবাস

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থসূচী

গঙ্গাবতরণ
হিমালয়ের পথে পথে
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি
আফ্রিদি মুলুকে

*

ভ্রমণ অমনিবাস

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রন্থসূচী

মণিমহেশ
ত্রিলোকনাথের পথে
কুয়ারী গিরিপথে
বৈষ্ণোদেবী
অরুণাচলে মোনপাদের দেশে
রেণুকা হ্রদের তীরে
পরশুরাম কুণ্ড

ভ্রমণ অমনিবাস

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থসূচী

ভ্রমণ অমনিবাস

পঞ্চম খণ্ড

গ্রন্থসূচী